সৎপ্রেম

শ্রীঅরবিন্দ
অথবা
চেতনার অভিযান

মীরা অদিতি
মহীশূর । কলকাতা

পুস্তকটি মীরা অদিতি মহীশূর-কর্তৃক প্রকাশিত
Sri Aurobindo or The Adventure of Consciousness
Institut de Recherches Evolutives প্যারিস্, ১৯৬২।

পরিবেশক :

MIRA ADITI CENTRE
62 'Sriranga' 2nd Main
1st Cross, T K Layout
Saraswatipuram
Mysore - 570009

মীরা অদিতি সেণ্টার
৯৯ 'শ্রীরঙ্গ' ২য় মেন্
১ম ক্রস্, টি কে লে-আউট
সরস্বতীপুরম্
মহীশূর - ৫৭০০০৯

শ্রীমাকে

সূচী

প্রাক্‌কথন

দুঃসাহসিক অভিযানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এমন-কি, যদি আমরা সপ্তম ছায়াপথেও যাই, সেখানে আমরা যাব শিরস্ত্রাণ-সজ্জিত ও যন্ত্রচালিত হয়ে এবং নিজেদের পাব, ঠিক যেমন আছি তেমনই : মৃত্যুর সম্মুখে সব শিশু, জীবন্ত সব প্রাণী, যারা সুনিশ্চিত নয় কীভাবে ও কীজন্য তারা জীবনধারণ করে আছে, কিংবা কোথায় তারা যাচ্ছে। আমরা জানি, পৃথিবীতে কোর্টেজ্‌ ও পিজারোর সময় চলে গেছে। সর্বত্র সেই একই যন্ত্র আমাদের ঘিরে রয়েছে, ফাঁদ বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু সবসময়ের মতো, আমাদের অন্ধকারতম বিপদগুলো আমাদের শ্রেষ্ঠ সুযোগে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং আমরা যে নিরাশাময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গতি করি, তা অধিকতর আলোকের অভিমুখী এক পরিবর্তন বলেই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং আমরা ধাক্কা খেয়ে এসে পড়েছি এক দেওয়ালের সামনে, সম্মুখে আমাদের জন্য অবশিষ্ট এক শেষ অনুসন্ধান, এক অন্তিম অভিযান : লক্ষ্য শুধু আমরা।

সংকেত অনেক রয়েছে : সরল ও স্বাভাবিক। ষাটের দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চন্দ্র-যাত্রা নয়, বরং ড্রাগ-সেবনের "যাত্রা", হিপিদের দেশান্তর-ভ্রমণ, এবং বিশ্বব্যাপী ছাত্র আন্দোলন— কিন্তু কোথায় যাবে তারা? সমুদ্রের জনাকীর্ণ বেলাভূমিগুলোতে আর স্থান নেই। কোলাহলময় রাস্তাগুলোতেও আর স্থান নেই, আমাদের মহানগরীগুলোর চিরবর্ধমান বল্মীকস্তূপেও আর স্থান নেই। বাইরে যাওয়ার পথ অন্য কোথাও আছে।

কিন্তু অনেক প্রকারের "অন্য কোথাও" আছে। ড্রাগ-সেবনের পথগুলো অনিশ্চিত ও বিপদ্‌পূর্ণ; সর্বোপরি, তারা *নির্ভর করে* বাইরের উপায়ের উপর। অনুভূতি উপলভ্য হওয়া উচিত ইচ্ছাপ্রসূতভাবে, যে-কোনো স্থানে, হাটের মধ্যে ও আমাদের প্রকোষ্ঠের নিভৃততার মধ্যে ; তা না হলে এটা কোনো অনুভূতিই নয়, বরং একটা অনিয়ম, বা দাসত্ব। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথগুলো আপাতত সীমিত— কিছু স্বল্প-আলোকিত গুহার মধ্যে ; এবং সর্বোপরি, এখানে অভাব চেতনারূপী সেই উত্তোলনের, যা আমাদের সক্ষম করে আত্মসংকল্পের দ্বারা পরিচালিত হতে, আত্মনিয়ামকরূপে, অসহায় সাক্ষী বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি হওয়ার

পরিবর্তে। ধর্মের পথগুলো আরো আলোকিত, কিন্তু এগুলো নির্ভর করে জনৈক ভগবানের উপর বা কোনো এক অন্ধমতের উপর ; সর্বোপরি, তারা আমাদের সীমিত করে রাখে *একই* প্রকারের অনুভূতির মধ্যে ; কারণ, এ জগতের একজন বন্দী হওয়ার মতো অন্য জগৎসমূহের বন্দী হওয়াও সম্ভব— বাস্তবিক, তাই অধিকতর সত্য। সর্বশেষে, কোনো এক অনুভূতির মূল্য তার জীবন-রূপান্তরকারী শক্তির দ্বারা পরিমিত হয় ; অন্যথা, তা এক শূন্য স্বপ্ন বা এক ভ্রান্তি।

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের নিয়ে যান এক যুগ্ম-আবিষ্কারে, যার তীব্র প্রয়োজন আমরা অনুভব করি, শুধু যদি আমরা আমাদের শ্বাসরুদ্ধকারী বিশৃঙ্খলার মধ্য হতে বাইরে যাওয়ার পথের সন্ধান পেতে চাই, সেজন্য নয়, বরং আমাদের জগৎকে রূপান্তরিত করবার জন্যও। তাঁর অসাধারণ অন্বেষণে— তাঁর আন্তর মহাকাশীয় প্রযুক্তি-কৌশলে, আমরা তা যদি বলতে পারি— তাঁকে প্রতি পদে অনুসরণ করে আমরা উপনীত হই সবসময়ের সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ আবিষ্কারের নিকটে, মহান্ গূঢ়তত্ত্বের দ্বারদেশে, যা এই বিশ্বের মুখমণ্ডলকে রূপান্তরিত করে দেবে : অর্থাৎ *চেতনাই শক্তি*। বর্তমানের "অপরিহার্য" বিজ্ঞানপ্রসূত অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের একমাত্র আশা হল অধিক হতে অধিকতর যন্ত্রের সৃষ্টি, যারা আমাদের চেয়ে ভালোভাবে দেখবে, আমাদের চেয়ে ভালোভাবে শুনবে, আমাদের চেয়ে ভালোভাবে হিসেব করবে, আমাদের চেয়ে ভালোভাবে চিকিৎসা করবে, এবং অবশেষে হয়তো আমাদের চেয়ে ভালোভাবে জীবনধারণ করতে পারবে। আমাদের জানা উচিত যে আমরা সে-সব-কিছুর চেয়ে ভালোভাবে কার্যসম্পাদন করতে পারি, এবং এই শ্বাসরুদ্ধকারী বিরাট্ যন্ত্র যত শীঘ্র এসেছে তত শীঘ্রই বিনষ্ট হতে বাধ্য, যদি আমরা প্রকৃত শক্তির উত্তোলক-দণ্ডকে ধারণ করতে ইচ্ছা করি, এবং অবতরণ করতে পারি আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে, সুশৃঙ্খল, অনমনীয় ও স্বচ্ছমস্তিষ্ক অনুসন্ধানকারীদের মতো।

তখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের অত্যুজ্জ্বল বিংশ শতাব্দী এখনও মনস্তত্ত্বের প্রস্তরযুগেই রয়েছে, এবং আমাদের সকল বিজ্ঞান সত্ত্বেও এখনও আমরা প্রবেশ করি নি জীবনধারণের প্রকৃত বিজ্ঞানে, বিশ্বসমূহের উপর ও আমাদের নিজেদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বে ; এবং আমাদের সম্মুখে পূর্ণতার, সুষমার ও সৌন্দর্যের দিগন্তসমূহ প্রসারিত হতে পারে, যার তুলনায় আমাদের সকল শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার একজন শিক্ষানবিশের অমার্জিত কৃতির মতো।

সৎপ্রেম

আমি তাই হয়ে উঠি, যা নিজের মধ্যে দেখি। চিন্তা আমাকে যে সূচনা দেয়, আমি তা কার্যে পরিণত করতে পারি; চিন্তা আমার মধ্যে যা প্রকাশ করে, আমি তা হয়ে উঠতে পারি। নিজের উপর এই অটল বিশ্বাস মানুষের প্রয়োজন, কারণ, ভগবান তার মধ্যে বাস করেন।[১]

উপস্থাপন

কোনো এক সময়ে মন্দ-প্রকৃতির এক মহারাজা ছিলেন; তাঁর চেয়ে কেউ বড়ো আছেন, এ চিন্তাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেজন্য, তিনি রাজ্যের সকল পণ্ডিতদের ডাকলেন, কারণ গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষগুলিতে তাই ছিল প্রথা; এবং তারপর তাঁদের প্রশ্ন করলেন: "ঈশ্বর এবং আমি— এ দুজনের মধ্যে কে বড়ো?" পণ্ডিতেরা ভয়ে কাঁপলেন। তাঁরা ছিলেন বৃত্তিগত ভাবেই জ্ঞানী, সেজন্য তাঁরা সময় চাইলেন; এবং পুরোনো অভ্যাসের বশে তাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠা ও জীবনকেই আঁকড়ে ধরে রাখলেন। তথাপি, তাঁরা গুণীও ছিলেন এবং ঈশ্বরকেও অবমাননা করতে চাইলেন না। যখন তাঁরা তাঁদের দুর্ভাগ্যের জন্য শোচনামগ্ন ছিলেন, তখন সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন— "এটা আমার উপরই ছেড়ে দাও, আগামীকাল আমি রাজার সঙ্গে কথা বলব।" তার পরদিন, যখন সমগ্র বিচারালয়ে গম্ভীরভাবে দরবার বসেছিল, বৃদ্ধ পণ্ডিত তখন সেখানে পৌঁছলেন, বিনয়ের সাথে হাত জোড় করে কপালে শ্বেত ভস্ম মেখে। বিনম্র নমস্কার সহকারে তিনি এই কথাগুলো বললেন— "হে প্রভো, নিঃসন্দেহে আপনিই মহত্তর।" রাজা তাঁর দীর্ঘ গুম্ফে তিনবার পাক দিয়ে মাথা উঁচু করলেন। "আপনিই মহত্তর, হে রাজন্, কারণ আপনার রাজ্য হতে আপনি আমাদের নির্বাসিত করতে পারবেন, কিন্তু ঈশ্বর তা পারবেন না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে সকলই তাঁর রাজত্ব, তাঁর বাইরে যাওয়ার জন্য কোনো স্থানই নেই।"

এই ভারতীয় কাহিনীটি আমরা শুনেছি বঙ্গে, যেখানে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাঁর সঙ্গে এই কাহিনীর নৈকট্য আছে এবং তিনি বলেছেন— সব-

কিছুই ভগবান্— দেবতা অসুর মানুষ পৃথিবী ; শুধুই যে সকল স্বর্গ ভগবান্ তা নয় ; তাঁর সমগ্র অনুভূতি নির্দেশ করে জড়ের দিব্যতত্ত্বে প্রতিষ্ঠার দিকে। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে মনস্তত্ত্ব মানবের মধ্যে দানবের পুনঃপূর্ণায়ন ব্যতীত অন্য কিছুই করে নি। আঁদ্রে ম্যাল্‌র † বিশ্বাস করতেন যে সম্ভবত পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর কাজ হবে "মানবের মধ্যে দেবতার পুনঃপূর্ণায়ন", এবং "পৃথিবীপৃষ্ঠে দিব্যজীবনের" সৃষ্টি : *দূরের সকল স্বর্গ মহান্ ও আশ্চর্যজনক, কিন্তু মহত্তর ও আরো আশ্চর্যজনক তোমার অন্তর্নিহিত স্বর্গসকল। দিব্যকর্মীর জন্য এইসব স্বর্গোদ্যান অপেক্ষমাণ।*[২]

দিব্যকর্ম আরম্ভ করবার অনেক পথ আছে ; প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তার নিজস্ব এক প্রবেশ পথ আছে : একজনের পক্ষে তা হতে পারে এক সুকুশল লক্ষ্যসাধন বা সুসম্পন্ন কর্ম ; অন্যজনের জন্য, এক সুউচ্চ ধারণা, এক মনোমুগ্ধকর দার্শনিক ধারা ; অন্য আরেকজনের জন্য, এক সংগীতের মূর্ছনা, নদীর প্রবাহ, সাগরের উপর সূর্যালোকের বিস্ফোরণ— এ সকলই অসীমের মধ্যে নিশ্বাসগ্রহণের পন্থা। কিন্তু এসব-কিছু সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত, এবং আমরা চাই স্থায়িত্ব। এ সমস্ত ক্ষণস্থায়ী নিমেষমাত্র, অনেক ছলনাময় অবস্থার অধীন। পক্ষান্তরে আমরা সন্ধান করছি এমন কিছু যা হস্তান্তরিত হতে পারবে না, এবং অবস্থা ও পরিস্থিতি হতে স্বাধীন— আমাদের অন্তরে এমন এক গবাক্ষ যা আর কখনও বন্ধ হবে না।

এখানে এই পৃথিবীতে এ প্রকার অবস্থা পাওয়া খুবই দুষ্কর— সেজন্য আমরা "ভগবানের" বিষয়ে, "আধ্যাত্মিকতার" বিষয়ে, খৃস্ট বা বুদ্ধ, কিংবা মহান্ ধর্মসমূহের প্রতিষ্ঠাতাদের সমগ্র গোষ্ঠীর বিষয়ে আলোচনা করি— সব-কিছুই স্থায়িত্ব খুঁজে পাওয়ার পন্থা। কিন্তু হয়তো আমরা ধার্মিক কিংবা আধ্যাত্মিক মানুষ নই। আমরা শুধুমাত্র মানুষ, মতবাদের ভারে ক্লান্ত, পৃথিবীতে বিশ্বাসী, এবং বড়ো বড়ো কথায় সন্দিগ্ধমনা ; বোধহয় আমরা আমাদের অত্যুত্তম চিন্তাধারাতেও শ্রান্ত —আমরা যা চাই তা হচ্ছে, আমাদের ছোটো নদীটি অসীমের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যাক। ভারতবর্ষে একজন মহান্ সন্ন্যাসী ছিলেন, যে প্রকৃত শান্তির সন্ধান পাওয়ার পূর্বে বছর বছর ধরে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তাকেই জিজ্ঞাসা করতেন, "আপনি কি ভগবান্‌কে দেখেছেন?... আপনি কি ভগবান্‌কে দেখেছেন?" তিনি ফিরে যেতেন ক্রুদ্ধ হয়ে কারণ লোকেরা তাঁকে সব গল্প শোনাত। তিনি ভগবান্‌কে *দেখতে* চাইতেন। এই শব্দটির পশ্চাতে ও আরো অন্যান্য শব্দের পশ্চাতে লোকেরা যত মিথ্যার প্রয়োগ করেছেন, তা ভাবলে তিনি কিছুই ভুল করেন নি। একবার দেখবার পরই আমরা সে-বিষয়ে বলতে পারব

---

† André Malraux.

—কিংবা খুব সম্ভবত নীরব রইব। না, আমরা সুন্দর শব্দ নিয়ে নিজেদের আর প্রবঞ্চিত করতে চাই না। আমরা আরম্ভ করতে চাই আমাদের যা আছে, ঠিক যেখানে আছি, তাই নিয়ে— আমাদের কাদামাখা জুতো ও সুদিনগুলোতে পাওয়া স্বল্প সূর্যালোক নিয়ে ; কারণ, সেই আমাদের সরল বিশ্বাস। এবং আমরা আরো দেখি যে আমাদের পৃথিবী এক দুঃখজনক অবস্থায় আছে, আমরা তার পরিবর্তন চাই ; কিন্তু আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছি সার্বজনীন সর্বৌষধির পর, আন্দোলন, দল ও মতবাদের উপর। সেজন্য আমরা আরম্ভ করব পুনর্বার আরম্ভ হতেই —অর্থাৎ আমাদের নিজেদের নিয়ে। এটা খুব বেশি নয়, কিন্তু এটাই যা-কিছু আমাদের আছে। আমরা জগতের এই ক্ষুদ্র অংশটিকে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করব, অন্যান্য অংশগুলিকে উদ্ধার করবার প্রয়াস আরম্ভের পূর্বে। এবং তা বোধ হয় খুব একটা মূর্খতাপূর্ণ ধারণা নয় ; কারণ কে জানে একজনকে পরিবর্তিত করা অন্যজনকে পরিবর্তিত করবার সবচেয়ে ফলপ্রদ পন্থা নয় বলে?

তুঙ্গিমার এত নিম্নমানে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের জন্য কী করতে পারেন?

শ্রীঅরবিন্দ একজন দার্শনিক, শ্রীঅরবিন্দ একজন কবি— মূলত তিনি তাই ছিলেন— বিবর্তনের স্বপ্নদ্রষ্টা ; কিন্তু প্রত্যেকেই তো দার্শনিক কিংবা কবি নন, দ্রষ্টা তো দূরের কথা। তথাপি আমরা কি আশ্বস্ত হব না, একথা জেনে যে তিনি আমাদের নিজেদের সকল সম্ভাবনায় বিশ্বাস করবার উপায় প্রদান করেছেন : শুধু আমাদের মানবীয় সম্ভাবনারাজিতে নয়, বরং আমাদের অতিমানবিক ও দিব্য সম্ভাবনাসমূহেও এবং শুধুই সেসব-কিছুতে বিশ্বাস করবার উপায় নয়, বরং আমরাই স্বয়ং সেসব-কিছুকে ধীরে ধীরে উন্মীলিত কীভাবে করব তার উপায়, নিজেরাই দর্শন করবার উপায়, যে পৃথিবীকে আমরা ভালোবাসি তারই মতো, আমাদের অন্তরস্থ সকল দেশ ও সাগরের মতো বিরাট হওয়ার উপায়। কারণ, শ্রীঅরবিন্দ একজন অন্বেষণকারীও ছিলেন— তিনি একজন যোগীও ছিলেন —তিনি কি বলেন নি যে, যোগ *হচ্ছে সচেতনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করবার কুশলতা?*[৩] আমরা তাঁর সঙ্গে চেতনার এই অন্বেষণ আরম্ভ করতে চাই। যদি আমরা শান্ত ও ধৈর্যশীল হয়ে, ঐকান্তিকতার সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে, পথের সকল সংকটের সম্মুখীন হয়ে অগ্রসর হই— ভগবান্ জানেন এ পথ খুবই বন্ধুর— তাহলে এমন কোনো কারণই নেই যে, একদিন গবাক্ষ উন্মুক্ত হয়ে আমাদের সূর্যকে চিরকাল ভাস্বর হতে দেবে না। প্রকৃতপক্ষে, একটি নয়, অনেকগুলো গবাক্ষই একের পর এক উন্মুক্ত হবে। প্রত্যেকবারই এক বিশালতর দৃশ্যের সম্মুখে। আমাদেরই নিজেদের সাম্রাজ্যের এক নূতনতর পরিসবের সম্মুখে, প্রত্যেকবারই *চেতনার এক আমূল পরিবর্তনের* সূচনা নিয়ে, যেমন, ধরা যাক, নিদ্রা থেকে জাগরণের অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া। শ্রীঅরবিন্দ-কর্তৃক অনুভূত ও তাঁর *পূর্ণযোগে* তাঁর শিষ্যদের নিকট বর্ণিত চেতনার রূপান্তরের মুখ্যস্তরগুলোকে আমরা অনুধ্যান

করতে যাচ্ছি সেই সীমা পর্যন্ত, যেখানে সেসব আমাদের পৌঁছে দেবে এ-যাবৎ অজানা এক নতুন অনুভূতিতে যা জীবনকেও পরিবর্তিত করবার শক্তি ধারণ করতে পারে।

কারণ, শ্রীঅরবিন্দ শুধুই চেতনার অন্বেষণকারী নন, তিনি এক নতুন জগতের নির্মাতা। বাস্তবিক, আমাদের নিজেদের চেতনার পরিবর্তনে কী লাভ, যদি আমাদের চতুর্দিকের জগৎ যেমন আছে তেমনই রয়ে যায়? হ্যান্স্ ক্রিস্টিয়্যান অ্যান্ডার্সনের সম্রাট যেমন উলঙ্গ হয়ে তাঁর রাজধানীর পথে পথে পদচারণা করেছিলেন আমরাও তেমনই হব। সেজন্য প্রাচীন প্রজ্ঞার নিকট অজ্ঞাত না থাকা জগৎসমূহের দূরতম সীমান্তগুলিকে আবিষ্কার করবার পর শ্রীঅরবিন্দ আরো একটি জগৎ আবিষ্কার করলেন যা কোনো মানচিত্রেই নেই ; তার নামকরণ তিনি করলেন অতিমানস, এবং তাকে পৃথিবীর উপর অবতরণ করাতে চাইলেন। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করছেন তাঁর সহযোগী হয়ে কিছুটা অবতারণের কার্যে সাহায্য করতে এবং এক সুন্দর কাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে, যদি আমরা তা ভালোবাসি। কারণ, শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলছেন, অতিমানস পার্থিব-চেতনার বিবর্তনে এক চূড়ান্ত পরিবর্তন নিয়ে আসে— বস্তুত চেতনার এই পরিবর্তনেরই ক্ষমতা থাকবে আমাদের জড়জগৎকে রূপান্তরিত করবার জন্য, এবং সে তা করবে ঠিক যেমন মন করেছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও স্থায়ী ভাবে, জড়ের মধ্যে মনের প্রথম আবির্ভাবের সময়ে এবং আশা করা যায় আরো ভালো করবে। তখন আমবা দেখব কীভাবে পূর্ণযোগ এগিয়ে নেয় *অতিমানসিক যোগে* বা পার্থিব রূপান্তরের যোগে যার রূপরেখা দেওয়ার প্রয়াস আমরা করব— শুধুই রূপরেখা, কারণ কাহিনীটি এখনও রচনায় আছে। তা সম্পূর্ণ নতুন ও কষ্টসাধ্য ; এবং আমরা এখনও জানি না এ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, এবং আমরা আদৌ সফল হব কি না।

যাই হোক, তা নির্ভর করে কিছু কিছু আমাদের সকলের উপর।

১

সুমার্জিত পশ্চিমী

মানবিকভাবে বলতে গেলে, শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যের নিকটবর্তী। কারণ, "প্রাচ্যের প্রজ্ঞা"কে এবং আমাদের সুন্দর নিয়মগুলিকে তুচ্ছ-করা অসামান্য তপস্বিগণকে আমরা শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করেছি; কিন্তু তারপর দেখি যে আমাদের কৌতূহল স্পর্শলাভ করেছে অথচ জীবন স্পর্শলাভ করে নি— আমাদের প্রয়োজন একটা বাস্তব সত্য যা আমাদের কঠিন শীতেরও সম্মুখীন হবে। শ্রীঅরবিন্দ য়ুরোপের শীতের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন; সাত বছর বয়স থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর বর্ধনশীল বছরগুলির পরিবেশই ছিল এই শীতগুলি। দিনে একবার মাত্র আহার করে, শরীরে একটা ওভারকোটও পরিধান না করে। কম-বেশি উদারহৃদয়া গৃহস্বামিনীদের মর্জির উপর নির্ভর করে তাঁকে একটা আবাসস্থল ছেড়ে অন্য একটায় যেতে হয়েছে বার বার, কিন্তু তিনি সবসময়ই থাকতেন গ্রন্থের বোঝায় ভারাক্রান্ত : গ্রীক্ ও ইংরেজি কবিতা, ফরাসি প্রতীকবাদীদের গ্রন্থাবলী— এঁদের মূল রচনা তিনি পড়েছিলেন ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ পাঠ করবার অনেক পূর্বে। শ্রীঅরবিন্দ এক অনন্য সমন্বয়ের প্রতীক।

তিনি ১৫ আগস্ট ১৮৭২-এ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে বছর রিম্‌বড়্-এর ইল্যুমিনেশন্‌স্ প্রকাশিত হয়। ম্যাক্‌স্ প্ল্যাংক্-এর মাধ্যমে আধুনিক

পদার্থবিদ্যা তখন দিনের আলো দেখেছে, আইনস্টাইন তাঁর চেয়ে কয়েক বছর ছোটো ছিলেন; এবং জুল্ ভার্ন ভবিষ্যতের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। অন্যদিকে তখন রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী হওয়ার উপক্রম করছিলেন, এবং আফ্রিকার উপর জয়লাভ তখনও সম্পূর্ণ হয় নি— দুটো জগতের মধ্যে এ ছিল এক সন্ধিক্ষণ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কখনও কখনও মনে হয় যেন নতুন জগতের আরম্ভে সর্বদাই দুঃখযন্ত্রণা ও ধ্বংসের কিছু কিছু সময় থাকে; কিন্তু তা বোধ হয় একটা ভুল অধ্যয়ন। সম্ভবত নতুন বীজগুলি ইতিমধ্যে জন্মলাভ করবার ফলে বিধ্বংসী (কিংবা বিশুদ্ধকারী) শক্তিরাজি উন্মত্ত হয়ে যায়। যা হোক, য়ুরোপ তখন ছিল গৌরবের শীর্ষে; মনে হচ্ছিল যেন খেলা পাশ্চাত্যেই চলছিল। ঠিক এইরকমই মনে হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের; তিনি ইংল্যান্ডে ডাক্তারি পড়েছিলেন, এবং সেখান থেকে পুরোপুরি ইংরেজি-ভাবাপন্ন হয়ে ভারতে ফিরেছিলেন। তাঁর তিনপুত্র তখন ছিলেন, যাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ। তিনি চাইতেন না, তাঁর দেশ যে বাষ্পাচ্ছন্ন এবং প্রতীপগামী অতীন্দ্রিয়বাদের মধ্যে ধ্বংসের পথে চলেছে, তাঁর পুত্রগণ তার দ্বারা সংক্রামিত হোন। এমন-কি, তিনি চাইতেন না যে তাঁরা ভারতের ঐতিহ্য ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবেন কিছুমাত্রও। সেজন্য শ্রীঅরবিন্দের নামের আরম্ভে "অ্যাক্রয়েড্" যোগ করা হয়েছিল, শুধু তাই নয়, তাঁর জন্য মিস্ প্যাগেট নাম্নী একজন তত্ত্বাবধায়িকাও নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং তারপর তাঁকে পাঁচ বছর বয়সে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দার্জিলিঙে, এক কন্‌ভেন্ট স্কুলে, ব্রিটিশ প্রশাসকদের পুত্রদের সঙ্গে। দু বছর পর, তিনজন ঘোষ-তনয় ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন। শ্রীঅরবিন্দ সাত বছরের তখন। বিশ বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর মাতৃভাষা বাংলা শেখেন নি; তিনি তাঁর পিতাকেও আর দেখতে পান নি, কারণ তাঁর ভারত-প্রত্যাবর্তনের ঠিক পূর্বেই তাঁর পিতা মৃত্যুলাভ করেন। তাঁর মাতাকেও তিনি খুব কমই দেখেছিলেন, কারণ তিনি অসুস্থ থাকতেন ও সেজন্য শ্রীঅরবিন্দকে চিনতে পারেন নি। সুতরাং তিনি শৈশব হতে বেড়ে উঠেছেন পরিবার, দেশ তথা ঐতিহ্যের প্রত্যেক প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র হয়ে —এক মুক্ত আত্মা। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের যে প্রথম শিক্ষা দান করেন, তা বোধহয়, যথার্থভাবে, মুক্তির শিক্ষা।

শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর দুই ভ্রাতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ম্যানচেস্টারের একজন অ্যাংলিক্যান ধর্মযাজকের উপর *এই কঠোর নির্দেশের সঙ্গে যে, তাঁরা যেন কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচিত না হন কিংবা কোনো ভারতীয় প্রভাবের অধীনে না আসেন।*[১] ডাঃ ঘোষ সত্যই একজন অদ্ভুত লোক ছিলেন। তিনি রেভারেন্ড ড্রুয়েটকে এই নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রদের যেন কোনো ধর্মশিক্ষা দেওয়া না হয়। এই উদ্দেশ্যে যে তাঁরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবেন তখন ইচ্ছা করলে নিজেরাই তাঁদের ধর্ম নির্বাচন করবেন। তারপর, তেরো বছরের

জন্য তিনি তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ ঘোষকে একজন কঠোরহৃদয় মানুষ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি সেরকম ছিলেন না; দরিদ্র বাঙালি গ্রামবাসীদের তিনি যে শুধু ডাক্তার হিসেবে তাঁর সেবাই দান করতেন তা নয়, তাঁর অর্থও দান করতেন (এবং অন্যদিকে লন্ডনে তাঁর পুত্রদের কাছে খাদ্য বা পরিধেয় প্রায় কিছুই থাকত না); এবং যখন তিনি এই ভুল সংবাদ পেলেন যে তাঁর প্রিয় সন্তান অরবিন্দ জাহাজডুবিতে প্রাণত্যাগ করেছেন, তখন তিনিও হৃদয়াঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সন্তানেরা নিশ্চয়ই চরিত্রবান হবেন।

শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ম্যান্‌চেস্টারে প্রথম কয়েকটি বছর ছিল কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেই সময় তিনি ফরাসি শিখেছিলেন (অবশ্য ইংরেজি ছিল তাঁর "মাতৃভাষা") এবং ফ্রান্স-এর প্রতি তিনি এক স্বতঃস্ফূর্ত নৈকট্য আবিষ্কার করেছিলেন : *ইংরেজি ও য়ুরোপীয় চিন্তাধারা ও সাহিত্যের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল— ইংল্যান্ডের প্রতি দেশ হিসেবে নয়, সেখানে আমার কোনো বন্ধন ছিল না।... যদি য়ুরোপীয় কোনো দেশের প্রতি দ্বিতীয় স্বদেশরূপে কোনো আকর্ষণ ছিল, তবে তা ছিল বৌদ্ধিকরূপে ও হার্দিকরূপে একটি দেশের প্রতি। এ জীবনে যা দেখা হয় নি বা যেখানে বাস করা হয় নি— ইংল্যান্ড নয়, ফ্রান্‌স্।*[২] তাঁর অন্তর্নিহিত কবির জাগরণ হয়েছিল, তিনি তখন *অদৃশ্য বস্তুসমূহের পদধ্বনি*[৩] শুনছিলেন, যে-কথা তিনি তাঁর প্রথমজীবনের এক কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর অন্তরের গবাক্ষ তখন উন্মুক্ত হয়ে গেছে, যদিও ধর্মের দ্বারা তিনি খুবই কম প্রভাবিত হয়েছিলেন— একথা "ধর্মান্তরকরণের" যে বিবরণী তিনি দিয়েছেন তা থেকে স্পষ্ট জানা যায় ; একথা অনুমানের বাইরে নয় যে ধর্মযাজক ড্রুয়েটের মা এই তিনজন বিধর্মীর আত্মার উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, বিশেষ করে কনিষ্ঠজনের বিষয়ে, যাঁকে তিনি একদিন নিয়ে যান নন্‌কনফরমিস্ট্ ধর্মযাজকদের সভায়। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন : *যখন প্রার্থনা সমাপ্ত হল, প্রায় সকলেই চলে গেলেন, কিন্তু কিছু ভক্তজন রয়ে গেলেন কিছু বেশি সময়, এবং সে সময়েই "ধর্মান্তরকরণ" অনুষ্ঠিত হল। আমি সম্পূর্ণ বিরক্তি অনুভব করছিলাম। একজন ধর্মযাজক তখন আমার কাছে এলেন এবং আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। (আমার বয়স তখন দশ বছর।) আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তাঁরা তখন সবাই চিৎকার করে উঠলেন, "এর উদ্ধার হয়ে গেল, এর উদ্ধার হয়ে গেল।" তারপর তাঁরা আমার জন্য প্রার্থনা শুরু করলেন ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।*[৪]

ঋষি অরবিন্দ কখনও ধার্মিক মানুষ হন নি। পশ্চিমদেশেও নয়, ভারতবর্ষেও নয়— একথা লক্ষণীয়, এবং তিনি মাঝে মাঝে গুরুত্ব দিয়ে বলতেন যে, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই একার্থবোধক নয় : তিনি পরে লিখেছিলেন : *প্রকৃত*

দিব্যশাসন হল মানুষের অন্তরে ভগবানের রাজত্ব, কিন্তু ধর্মগুরুর, পুরোহিতগোষ্ঠীর কিংবা যাজকীয় শ্রেণীর রাজত্ব নয়।[৫]

লণ্ডনে তাঁর জীবনের আরম্ভে, বারো বছর বয়সে, শ্রীঅরবিন্দ ভালোভাবেই ল্যাটিন ও ফরাসি ভাষায় জ্ঞান লাভ করেছিলেন। যেখানে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন, সেই সেন্ট্ পল্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁর ছাত্রের ধীশক্তিতে এত চমৎকৃত হয়ে গেলেন যে তিনি তাঁকে নিজেই গ্রীক শিক্ষা দিলেন। তিনবছর পরে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শ্রেণীগুলোর অর্ধেকই সলম্ফে অতিক্রম করতে এবং তাঁর অধিকাংশ সময় তাঁর প্রিয় কার্য অধ্যয়নে ব্যাপৃত হয়ে ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সর্বগ্রাসী কিশোরের কাছ থেকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারত না (অবশ্য ক্রিকেট ছাড়া, যার প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণই ছিল না, রবিবারের স্কুলের মতো) ; তাঁর নিঃসঙ্গতাকে অধিকার করেছিলেন শেলী এবং *প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড*, ফরাসি কবিবৃন্দ, হোমার, অ্যারিস্টোফেন্স্, এবং শীঘ্রই, সমগ্র য়ুরোপীয় চিন্তাধারা— কারণ তিনি দান্তে ও গ্যেটের মূলরচনা অধ্যয়ন করবার মতো জারমান্ ও ইটালীয় ভাষা দ্রুতভাবেই জেনেছিলেন। তিনি কখনও কারও সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করতে চাইতেন না, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা তাঁর বন্ধু অস্কার ওআইল্‌ডের সঙ্গে লণ্ডনে ঘুরে বেড়াতেন এবং ইংরেজি কবিতায় নিজের যশোলাভের প্রস্তুতিতে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিন ভ্রাতার প্রত্যেকেই এক নিজস্ব পৃথক্ জীবন যাপন করতেন। শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে কিছুই কঠোর বৈরাগ্যপূর্ণ ছিল না এবং নিশ্চয়ই তিনি শুচিনিষ্ঠ (puritan) ছিলেন না (তিনি বলতেন *prurient*[৬] অর্থাৎ বাসনাতুর) ; অবশ্য তিনি রইতেন "অন্যত্র" এবং তাঁর জগৎ ছিল পরিপূর্ণ। সরল মুখে কৌতুক করবার এক নিজস্ব পথও তাঁর ছিল, যা তাঁকে কোনোদিন পরিত্যাগ করে নি : *হাস্যরসবোধ? তা হল জীবনের লবণ, তার অভাবে জগৎ চলে যেত সম্পূর্ণ ভারসাম্যের বাইরে— অবশ্য পূর্ব হতেই এ যথেষ্ট ভারসাম্যহীন— এবং বহু দিন পূর্বেই দ্রুতরূপে ভস্মীভূত হয়ে যেত।*[৭] কারণ শ্রীঅরবিন্দ একজন হাস্যরসিকও ছিলেন, এবং বোধহয় এই রূপে শ্রীঅরবিন্দ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দের অপেক্ষা, যাঁর বিষয়ে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেক গাম্ভীর্যপূর্ণ উক্তি করেন। শ্রীঅরবিন্দের জন্য দর্শনশাস্ত্র এক নির্দিষ্টপ্রকারের লোকেদের নিকট নিজেকে বোধগম্য করবার এক উপায় মাত্র, যাঁরা ব্যাখ্যা ব্যতীত কিছুই বুঝতে পারেন না ; এ এক ভাষা, যেমন তাঁর নিকট কবিতা ছিল অন্য এক ভাষা, স্বচ্ছতর ও সত্যতর। কিন্তু হাস্যরস ছিল তাঁর সত্তার সারমর্ম, তথাকথিত রসবোধের বিদ্রূপময় রসিকতা নয়, বরং একপ্রকারের আনন্দ যা নিজের চলার পথে সর্বদাই নৃত্যরত। সবচেয়ে করুণ ও ব্যথাময় এক মানবীয় অবস্থার পশ্চাতে প্রায় কৌতুকময় হাসি আমরা কখনও কখনও অনুভব করি বিদ্যুতের এক ঝলকের মতো সময়ের মধ্যে, যা আমাদের কিছুটা বিহ্বল করে দেয়, যেন একটি শিশু

করুণরসের অভিনয় করতে করতে নিজের প্রতি একটা মুখভঙ্গি করল, কারণ তার স্বভাবই হাসা ; এবং সেটা এজন্য যে অবশেষে পৃথিবীর কোনো কিছুই ও কোনো ব্যক্তিই আমাদের অন্তর্নিহিত নিভৃতস্থলকে অধিকার করতে পারে না, সেখানে আমরা সবাই রাজা। বোধহয়, এটাই হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের হাস্যরসের প্রকৃত মর্ম— দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিতে কোনো ব্যাপারকে দেখায় অস্বীকৃতি। এবং তার উপর এক রাজকীয় বোধ, যা অপরিবর্তনীয়।

সেণ্ট্ পল্‌স্ স্কুল তাঁর কৌতুকবোধকে পছন্দ করেছিল কি না তা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর জ্ঞানকে নিশ্চয়ই পছন্দ করেছিল ; কেম্ব্রিজে যাওয়ার জন্য তাঁকে একটা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছিল (ঠিক এক উপযুক্ত সময়ে যখন ঘর থেকে টাকা আসা কার্যত বন্ধ হয়ে এসেছিল) কিন্তু তাঁকে শীত ও ক্ষুধা থেকে রক্ষা করব্যার জন্য তা ছিল খুবই স্বল্প, কারণ তাঁর বড়ো ভাইয়েরা সানন্দে এই অপ্রত্যাশিত লাভে অংশগ্রহণ করতেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। ভদ্রব্যক্তিদের এই লালনক্ষেত্রে কীজন্য তিনি গিয়েছিলেন? একটি কারণ হল, তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছাপূরণ করছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য নয়। কিংস্ কলেজে প্রথম বর্ষে তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন পদ্যে সবগুলি পুরস্কারই লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় তাতে ছিল না। জোয়ান অফ আর্ক, ম্যাজিনি, আমেরিকার বিপ্লব— এসবই তাঁকে আহ্বান করত— অর্থাৎ তাঁর স্বদেশের স্বাধীনতা, ভারতের মুক্তি, যার অগ্রণী পথপ্রদর্শকদের মধ্যে পরবর্তীকালে তিনি ছিলেন অন্যতম। এই অদৃষ্টপূর্ব রাজনৈতিক জীবন তাঁকে আহ্বান করত প্রায় বিশ বছর ধরে, কিন্তু সে-সময়ে তিনি ঠিক জানতেন না, 'ভারতীয়ে'র যথার্থ অর্থ কী, 'হিন্দু'র বিষয়ে তো দূরের কথা। কিন্তু শীঘ্রই তিনি জানলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে যেমন দ্রুতগতিতে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন তার দ্বিগুণ ক্ষিপ্রতায় তিনি হিন্দুধর্মের বিষয়ে জানলেন ও তা নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সত্যকারের শ্রীঅরবিন্দ হয়েছিলেন, উভয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবার পর, যখন তিনি উভয়জগতের মিলনবিন্দুর সন্ধানলাভ করলেন, এমন-কিছুর মধ্যে যা উভয়ের একটিও নয়, কিংবা এদের সমন্বয়ও নয়, বরং শ্রীঅরবিন্দের কর্মধারার নির্বাহিকা শ্রীমার ভাষায়, *এক তৃতীয় অবস্থা,* একটা 'অন্য কিছু', যার প্রয়োজন আমরা খুব তীব্র ভাবে বোধ করি, আমরা যারা সংকীর্ণ জড়বাদী নই, কিংবা শুধুমাত্র অধ্যাত্মবাদী নই।

এইভাবে, কেম্ব্রিজ-স্থিত ভারতীয় ছাত্রদের সমিতি ইণ্ডিয়ান মজলিস-এর সম্পাদক হলেন তিনি, অনেক বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিলেন, তাঁর নামের ইংরেজি অংশটি পরিত্যাগ করলেন, এবং "লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার্" (Lotus and Dagger কমল ও অসি) নামের এক গুপ্তসমিতিতে যোগদান করলেন, যা কিছু কম কথা নয়! (অবশ্য এসব ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতা একজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে

দিতে পারে।) অবশেষে, হোয়াইট হলের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ল ও তাঁর নাম ব্ল্যাক্‌লিস্ট-এ উঠল। অবশ্য, তিনি ব্যাচেলর অফ্ আর্টস্-এ উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু উপাধি গ্রহণের জন্য আবেদন করলেন না। যেন এ সব-কিছু তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক এইভাবেই তিনি বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিলেন, যা তাঁর জন্য ভারত সরকারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিত, ব্রিটিশ প্রশাসকদের মধ্যে ; তিনি অতি উজ্জ্বলভাবে উত্তীর্ণ হলেন এবং তারপর অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উপস্থিত হতে অবহেলা করলেন— উল্‌উইচে অশ্বারোহণ করবার পরিবর্তে, সেদিন তিনি ভ্রমণ করতে গেলেন— এবং নিজেকে অযোগ্য প্রতিপাদিত করলেন। এবার, কেম্ব্রিজের এক বরিষ্ঠ অধ্যাপক বিচলিত হয়ে কর্তৃপক্ষকে লিখলেন : "আমি স্বীকার করি যে, এমন সামর্থ্যসম্পন্ন একজন মানুষকে ভারত সরকার হারাবেন শুধু এই কারণে যে, সে ঘোড়ায় চড়তে অসমর্থ হল, বা কোনো এক পূর্ব-নির্ধারিত কার্যক্রমে যোগদান করল না। এই কথাটি আমার কাছে প্রশাসনিক অদূরদর্শিতার এক অনমনীয় নমুনা বলে বোধ হল। গত দুবছর ধরে সে এরজন্য অনেক কষ্ট ও উদ্‌বেগের মধ্যে কালযাপন করছিল। ঘর থেকে টাকা পাঠানো প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং তাকে নিজের সঙ্গে তার দু-ভাইকেও দেখতে হত। তার জন্য আমি অনেকবার তার পিতার নিকট লিখেছিলাম। কিন্তু প্রায়ই অসফল হয়েছিলাম। অনেক বিলম্বেই তাঁর নিকট থেকে কিছু আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কয়েকজন দোকানদারকে দেওয়ার জন্য, যারা অন্যথা তাঁর পুত্রকে কাউণ্টি বিচারালয়ে দাঁড় করাতো।"[৮] অধ্যাপকের যুক্তি কিন্তু ব্যর্থ হল ; ঔপনিবেশিক প্রশাসন দৃঢ়নিশ্চিত ছিল যে, শ্রীঅরবিন্দ এক বিপজ্জনক বিষয়। তাঁরা ভুল করেন নি।

শ্রীঅরবিন্দ যখন সমুদ্র পার হয়ে ভারতে ফিরলেন, তখন তাঁর বিশ বছর বয়স। তখনই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় ; পদমর্যাদা বা উপাধি কিছু তাঁর ছিল না। চোদ্দ বছর ধরে পাশ্চাত্যবাসের আর কী রইল? আমরা এড্‌ওয়ার্ড হ্যারিয়েট-এর ত্রুটিহীন সংজ্ঞার কথা স্মরণ করতে প্রলুব্ধ হই, কারণ এটা যদি সত্য হয় যে, সব-কিছু ভুলে গেলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই শিক্ষা, তাহলে পাশ্চাত্য জগৎ ত্যাগ করবার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা এর গ্রন্থাবলী নয়, এর জাদুঘর বা প্রেক্ষালয় নয়, বরং লব্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানকে জীবন্ত বাস্তবে রূপায়িত করবার এক প্রেরণা। বোধহয়, এতেই রয়েছে পাশ্চাত্যের প্রকৃত শক্তি। দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্যে আমরা অনেক বেশি বুদ্ধিবাদী, যার ফলে আমাদের অভাব রয়েছে বহিঃরূপায়ণের জন্য একটা প্রকৃত পর্যাপ্ত দৃষ্টির। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ অন্তরে অনেক বেশি পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নিজের অবলোকিত সত্যের সঙ্গে জীবনকে সমকক্ষ করবার প্রেরণা তার মধ্যে নেই। এই প্রশিক্ষণটি শ্রীঅরবিন্দের কাছে কখনও নষ্ট হয় নি।

২

সনাতন ধর্ম

ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার অল্পকাল পরেই শ্রীঅরবিন্দ সোচ্চারে ব্যক্ত করলেন, *আমাদের মধ্যে যারা সর্বহারা তারা নিমজ্জিত অজ্ঞানতায়, জর্জরিত দুর্দশায়।*[১] যে প্রশ্নে তিনি অধিকৃত হয়েছিলেন তা দার্শনিক প্রশ্ন নয়, কর্মের প্রশ্ন। কর্মের জন্য : জগতে আমরা আছি কর্মের জন্য। কিন্তু তথাপি আমাদের জানা প্রয়োজন কী প্রকার কাজ, এবং সর্বোপরি, কাজ করবার সর্বাধিক ফলপ্রদ পন্থা কী? ভারতবর্ষে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ হতে আরম্ভ করে উচ্চতম যৌগিক উপলব্ধি পর্যন্ত এই ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিটি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ছিল। (প্রসঙ্গান্তর মার্জনীয়) ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে আছে, আমি হিমালয় যাত্রা করে একজন জ্ঞানীপুরুষের সঙ্গে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করেছিলাম, যা ছিল বিশেষ সুযোগযুক্ত : দেবদারু ও করবীর বনানীর মধ্যে নিজেকে হারিয়েছিলাম, আকাশ ও উপত্যকার মধ্যে আমাদের চারধারে দিগন্তবিস্তৃত তুষার ঝলমল করছিল। অতীব সুন্দর। আমি নিজেকে বলেছিলাম, কত সহজ সেই উচ্চতায় দিব্য চিন্তন, এমন-কি দিব্যদর্শনও, কিন্তু কী হবে নিম্ন অঞ্চলে? আমি ভুল করি নি, যদিও পরে আমি জানলাম যে, নীরবতা ও নিজের শরীরের স্থিরতার মাধ্যমেও জগতের জন্য একজন সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে— এক নাছোড়বান্দা ভ্রান্তির জন্য,

আমরা অস্থিরতাকেই কাজ বলে মনে করি। তথাপি, আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, আমার এই দিব্য মুহূর্তগুলির কী অবশিষ্ট থাকবে, যদি একবার আমার একান্তবাস হতে আমাকে বিচ্যুত করে নিম্নে সমভূমিতে নামিয়ে আনা হয়? হিন্দু ধর্মের পাশ্চাত্য উৎসাহীগণ এই মরীচিকাটির বিষয়ে চিন্তা করবার কথা, কারণ, অবশেষে আমরা যদি সংসার হতে পলায়ন করতে চাই, তাহলে আল্‌প্‌স পর্বতের কিংবা রকি পর্বতমালার কোনো এক ক্ষুদ্র কোণ, কিংবা একটি পরিষ্কারভাবে চুনকাম করা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠই যথেষ্ট হবে। "উৎসের অভিমুখে যাত্রার"* সঙ্গে গঙ্গা কিংবা ব্রহ্মপুত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে, ভারতবর্ষের কী ছিল শ্রীঅরবিন্দকে দেওয়ার জন্য? কোনো গূঢ়সূত্র ভারতের কাছে বিধৃত আছে কি, জীবনের কর্মের জন্য যার প্রয়োজন আছে?

হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থাবলীর অধ্যয়নে মনে হয় যে, এ এক প্রকারের অতিপ্রাচীন-জীবাশ্ম-বিজ্ঞান যার মধ্যে বহুমাত্রিক শব্দাবলী বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, যেন ভারতীয়েরা বিস্ময়জনক দার্শনিক ও নিঃসংকোচ প্রতিমাপূজকদের এক সংমিশ্রণ। কিন্তু আমরা যদি অন্তর থেকে সহজভাবে ভারতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে তাকে বিভক্ত না করে, তাহলে আমরা আবিষ্কার করি যে ভারত একটি দেশ যেখানে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অসাধারণ। (অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা সব সময়ই মিথ্যা। কারণ আমরা সেই ভ্রমণকারীর মতো হব, যে মে মাসে দিল্লীতে গিয়ে দেখল ভারতবর্ষ তাপদগ্ধ ও উষ্ণ, কিন্তু যদি নবেম্বর বা মার্চ মাসে দক্ষিণে বা পূর্বে, কিংবা অন্য কোনো দিকে যেত, তাহলে সে দেখত। ভারতবর্ষ একই সময়ে শীতল, ফুটন্ত, আর্দ্র, মরুময়, ভূমধ্যসাগরীয় ও নাতিশীতোষ্ণ— সে এক সংজ্ঞাতীত জগৎ, যেমন তার হিন্দুধর্ম, বস্তুত যার কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ হিন্দুধর্ম কোনো এক বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক দ্রাঘিমা নয়; আমরা নিজেদের স্থিতির সন্ধান পাই না সেখানে, কারণ সকল সম্ভব স্থিতিই সেখানে বিধৃত।) তথাকথিত হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্যের এক সৃষ্টি ; ভারতবাসী শুধু বলেন *সনাতন ধর্মের* কথা, যার উপর, তিনি জানেন, শুধু ভারতীয়েরই একাধিকার নেই, বরং মুসলমান, নিগ্রো, খৃস্টান, এমন-কি অ্যানাব্যাপ্‌টিস্ট্‌দেরও অধিকার আছে। একজন পাশ্চাত্যবাসীর জন্য যা একটি ধর্মের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে হয়, অর্থাৎ যে গঠনরীতি তাকে অন্য ধর্ম হতে পৃথক বলে চিহ্নিত করে, এবং এই বিধান দেয় যে, এক ব্যক্তি ক্যাথলিক কিংবা প্রোটেস্টান্ট নয়, যে পর্যন্ত সে এক নির্দিষ্ট পথে চিন্তা না করে, বা একটি নির্দিষ্ট ধারায় বিশ্বাস না করে, একজন ভারতীয়ের জন্য সেটাই সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দিক ; সে চায় বাইরের সকল পার্থক্য দূর করে দিতে, যাতে প্রত্যেককেই সেই কেন্দ্রবিন্দুতে

* Lanza del Vasto-কর্তৃক ফরাসি ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের উপরে রচিত গ্রন্থের পরোক্ষ উল্লেখ।

আবার পাওয়া যায়। যেখানে সব-কিছুই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপন করে।

এই ঔদার্য "সহনশীলতা" হতে পৃথক, কারণ তা শুধু অসহনশীলতার বিপরীত ; এ এক নিশ্চয়াত্মক অবধারণা যে প্রত্যেক মানুষেরই এক আন্তরিক প্রয়োজন আছে, যাকে অভিহিত করা যেতে পারে "ভগবান্" বা অন্য কোনো নামে ; এবং নিজের স্তর ও আন্তরিক অভিবৃদ্ধির নির্দিষ্ট ক্রমে সে ভগবান্‌কে যতদূরই বুঝতে পারুক, তাঁকে ভালোবাসার প্রয়োজন তার আছে ; এবং যদুর পথ মধুর জন্য নয়। উদাহরণস্বরূপ প্রত্যেকেই একই ক্রুশবিদ্ধ ভগবানকে ভালোবাসবে, একজন ভারতীয়ের নিকট তা অস্বাভাবিক মনে হয়। খৃস্টের সম্মুখেও সে ভক্তিভরে প্রণত হবে (ঠিক যতটা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাসহ সে প্রণত হবে তার নিজস্ব ভগবৎ প্রতিমার সম্মুখে), কিন্তু তা ছাড়াও সে ভগবানের মুখদর্শন করবে কৃষ্ণের হাসির মধ্যে, কালীর করালতার মধ্যে, সরস্বতীর মাধুর্যের মধ্যে, এবং সহস্র সহস্র অন্যান্য দেবতাদের মধ্যেও, যাঁরা নৃত্যরত, বর্ণবৈচিত্র্যময় ও গুম্ফধারী, সানন্দ বা ভয়ংকর, জ্যোতির্ময় বা করুণাময়, যাঁরা ভারতীয় মন্দিরগুলোর স্তম্ভে স্তম্ভে খোদিত হয়ে আছেন উন্মাদনা সহকারে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, *যে ভগবান হাসতে পারেন না, তিনি এই হাস্যময় বিশ্বের সৃষ্টি করতে পারতেন না।*[২] সবই তাঁর মুখমণ্ডল, সবই তাঁর লীলা, ভয়ংকর হোক কি সুন্দর হোক, আমাদের জগতের মতোই বৈচিত্র্যময়। কারণ, অসংখ্য দেবতায় পরিপূর্ণ এই দেশ, যুগপৎভাবে এক পরম একত্বে অখণ্ড বিশ্বাসের দেশও : "তিনি এক, সকল জনেনোৎসের উপর, সকল প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত, তিনিই বিশ্বের উৎস" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৫-৫)*। কিন্তু সকলেই তো একবারেই হঠাৎ পরমের মধ্যে লম্ফপ্রদান করতে পারে না ; আরোহণের বহু স্তর আছে ; যে ব্যক্তি বালা *ললিতার* শিশুসুলভ মুখমণ্ডলকে ধারণায় আনতে এবং তাঁর জন্য ধূপপুষ্প অর্পণ করতে প্রস্তুত, নিজের হৃদয়ের নীরবতায় শাশ্বত জননীকে আহ্বান করতে সে সক্ষম নাও হতে পারে ; অন্য একজন হয়তো সকল রূপকে প্রত্যাখ্যান করে অরূপতত্ত্বের ধ্যানেই নিজেকে নিমগ্ন করে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলেছেন :

> "যেভাবে যে আমার সমীপবর্তী হয়, আমি সেভাবেই তাকে গ্রহণ করি। আমার পথই সকলে সকল দিক হতে অনুসরণ করে।" (৪-১১)

আমরা যা দেখছি, ভগবদ্ বিষয়ে অনুধ্যান করবার অনেক পথই আছে, তিনজনের জন্য হোক বা ত্রিশ লক্ষ লোকের জন্যই হোক ; সেজন্য, আমরা অন্ধভাবে মতামত গঠন না করলেই ভালো হয়, কারণ, তদ্দ্বারা আমরা সব-কিছু বাদ দিয়ে অবশেষে এক অদ্বিতীয় কার্টসীয় ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই পাব না, যে ভগবান্ এক ও বিশ্বজনীন শুধু নিজের সংকীর্ণতার জন্য। বোধহয় এখনও আমরা একত্বের অর্থ

* এই গ্রন্থে উপনিষদ্, বেদ ও গীতা হতে উদ্ধৃতিগুলি শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদের অনুসারী।

ভুলভাবে একরূপত্ব বলে বুঝি। শীঘ্রই, ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন : *পূর্ণযোগের পূর্ণতা তখনই আসবে, যখন নিজের প্রকৃতির উৎকর্ষসাধনে ব্যাপৃত হয়ে, যা প্রকৃতিকে অতিক্রম করে সেই লক্ষ্যের দিকে ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়ে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব যোগপথ অনুসরণ করতে পারবে। কারণ স্বাতন্ত্র্যই শেষ বিধান ও চরম পূর্ণতা।*[৩]

ভারতবাসী কখনও প্রশ্ন করে না, "তুমি কি ভগবানে বিশ্বাস করো?" তার কাছে প্রশ্নটি ততই শিশুসুলভ, যত এই প্রশ্ন, "তুমি কি কার্বন-ডাই-অক্সাইডে বিশ্বাস করো?" সে শুধু বলে, "*অনুভূতি প্রাপ্ত হও*; এইভাবে প্রয়াস করলে এই ফল পাবে, অন্যভাবে করলে অন্য এক ফল পাবে।" জড়-জাগতিক ঘটনাবলীর অধ্যয়নে গত দু-এক শতাব্দী ধরে যতটা উদ্ভাবন শক্তি, কুশলতা ও সূক্ষ্মতা পাশ্চাত্যবাসী প্রয়োগ করেছে, গত চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতবাসী সমান নিখুঁতভাবে ততটাই তা বিনিয়োগ করেছে অন্তঃস্থ ঘটনাবলীর অনুধ্যানে, কারণ, "স্বপ্নবিলাসী" এক জাতিরূপে তাদের কাছে পাশ্চাত্যের জন্য অনেক বিস্ময়ই গচ্ছিত রয়েছে। সামান্য সাধুতা থাকলেও, পাশ্চাত্যবাসীরা স্বীকার করবে যে, তাদের "আন্তরিক" অনুধ্যান, অর্থাৎ তাদের মনস্তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মানুষের বিষয়ে তাদের জ্ঞান, এখনও ভ্রূণাবস্থায় আছে; কারণ আত্মজ্ঞান দাবি করে এমন এক তপস্যা যা ততটাই সুশৃঙ্খল ও ধৈর্যশালী এমন-কি বিরক্তিকর, যতটা প্রয়োজন পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার দীর্ঘ অধ্যয়নে। যদি আমরা এ পথে অগ্রসর হতে চাই, তাহলে শুধু গ্রন্থাধ্যয়নই যথেষ্ট হবে না, কিংবা আমাদের ভারসাম্যহারা শতাব্দীর সকল স্নায়বিক রোগীর চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গবেষণাগুলো সংগ্রহ করলেই যথেষ্ট হবে না, *আমাদের ঝাঁপ দিতে হবে।* পাশ্চাত্যবাসী তার গ্রন্থাধ্যয়নে যতটা নিষ্ঠা, যত্ন ও অধ্যবসায় বিনিয়োগ করে, ততটাই যদি করে অন্তর্জগতের অধ্যয়নে, তাহলে সে অনেক দ্রুতবেগেই অনেক দূর অগ্রসর হবে। পশ্চিমও অনেক বিস্ময় আমাদের জন্য গচ্ছিত রেখেছে। কিন্তু পশ্চিমের উচিত, প্রথমে তার ভ্রান্ত সংস্কারগুলোর উচ্ছেদ করা— প্যালস ছাড়বার আগে কলম্বাস নিশ্চয়ই আরেমিকার মানচিত্র অঙ্কন করেন নি! এই সহজ সত্যগুলো বারংবার উল্লেখনীয়, কারণ পাশ্চাত্য জগৎ দুটো মিথ্যার মধ্যে আটকে আছে: অধ্যাত্মবাদীদের অতি গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যা— যাঁরা ভগবানের প্রশ্নটিকে কয়েকটি অনুচ্ছেদের মধ্যে স্থায়ী রূপে নির্ধারিত করে রেখেছেন; এবং প্রারম্ভিক স্তরের অলৌকিক-বাদী ও আত্মানুভবীদের যথেষ্ট-গুরুত্ব-না-থাকা মিথ্যা— যাঁরা অদৃশ্যকে কল্পনার খামখেয়ালি প্রদর্শনীতে অবনমিত করেছেন। প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে ভারত আমাদের নির্দেশ দেয় প্রত্যক্ষ অনুভূতির দিকে, প্রয়োগাত্মক পদ্ধতির দিকে। শ্রীঅরবিন্দ প্রয়োগাত্মক আধ্যাত্মিকতার এই মৌলিক প্রশিক্ষণটিকে শীঘ্রই ব্যবহারিক রূপ প্রদান করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর অজানা ভারতবর্ষে কী প্রকার মানুষ, কী মানবিক উপাদানের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন তিনি? পশ্চিমী পর্যটকদের মনোরঞ্জনকারী ও তাদের নিকট রহস্যময় অদ্ভুত মনে-হওয়া প্রথাগুলো ও বিচিত্র আতিশয্যকে আলাদা রাখলেও কিন্তু কিছু-একটা আশ্চর্যময় অবশিষ্ট থাকে। ভারতবাসীরা শান্ত, স্বপ্নবিলাসী, অদৃষ্টবাদী ও জগতে অনাসক্ত লোক, একথা বলা শুধু পরিণতির বিবরণী দেওয়া, কারণের নয়। শব্দটি হল "আশ্চর্যময়" কারণ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তাদের শারীরিক উপাদানের মধ্যেই কোনো "চিন্তা", এমন-কি, "বিশ্বাস" ছাড়াই ভারতীয়েরা অন্য জগতের গভীরেই নিজেকে ডুবিয়ে দেয় সমূলে, সম্পূর্ণভাবে এখানকার অধিবাসী নয় তারা। এবং তাদের মধ্যে অন্য জগৎগুলো বহিঃপৃষ্ঠে অভ্যুত্থিত হয়— শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য, *ন্যূনতম স্পর্শেই আবরণটি ছিন্ন হয়ে যায়।* এই জড়জগৎ পাশ্চাত্যের নিকট এত বাস্তব, চূড়ান্ত এবং অনন্য, কিন্তু ভারতবাসীর নিকট তা জীবনযাপনের অনেক পথের একটি বলে প্রতীত হয়। সমগ্র অস্তিত্বের অনেক প্রকাশভঙ্গির একটি— সংক্ষেপে, *অন্তরালস্থিত অনাবিষ্কৃত বিশাল মহাদেশগুলির সীমানায়*[৪] অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র, বিপর্যস্ত, উত্তেজনাময় ও কিছুটা দুঃখপূর্ণ সীমান্ত। ভারতীয় ও অন্যান্য জাতির মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্যটি সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে প্রতিভাত হয় তাদের শিল্পকলায়, যেমন দেখা যায় মিশরীয় শিল্পকলায় (এবং না জেনেও আমাদের অনুমান, মধ্য আমেরিকার শিল্পকলায়)। মানুষের মধ্যে দিব্য চিন্তাধারায় বিজয়ের মতো উত্তুঙ্গ, হাল্‌কা ও মুক্ত য়ুরোপীয় উপাসনালয়গুলো ছেড়ে, সহসা আমরা যদি নীলনদের উপর অ্যাবিডস্-এর নীরবতায় সেক্‌মেথের সম্মুখে নিজেদের পাই, কিংবা নিজেদের পাই দক্ষিণেশ্বরের স্তম্ভশ্রেণীর অন্তরালে কালীর সঙ্গে মুখোমুখি, তাহলে আমরা কিছু একটা অনুভব করি— একটা অজানা পরিসর সহসা আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়, কিছু-একটা আমাদের স্তব্ধ ও অবাক করে দেয়, যা সমগ্র পাশ্চাত্য শিল্পকলায় মোটেই নেই। য়ুরোপের উপাসনালয়গুলোতে কিছুই রহস্যময় নেই! সব-কিছু সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাইরের প্রত্যেক দৃষ্টির গোচরীভূত হওয়ার জন্য চতুর্দিকের গবাক্ষ উন্মুক্ত— তথাপি, অনেক রহস্য আছে।... একটি সভ্যতার সঙ্গে অন্য এক সভ্যতার তুলনার কোনো আবশ্যকতা নেই— সেটা অবান্তর হবে— কিন্তু কথা এই যে আমরা কিছু *ভুলে গেছি।* এতগুলো সভ্যতা, যারা একদা য়ুরোপীয় সভ্যতার মতোই গৌরবময় ও সুসংস্কৃত ছিল, এবং যাদের জ্ঞানীরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞানীদের চেয়েও কম "বুদ্ধিমান" ছিলেন না, তারা যদি অদৃশ্য স্তরক্রমসমূহের এবং মানবজীবনের— সংক্ষিপ্ত-স্পন্দনের অতীত চৈত্যিক ছন্দোরাজির দর্শন ও অনুভূতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাহলে তা কোনো মানসিক বিচ্যুতি ছিল না— এক অদ্ভুত বিচ্যুতি, যার সন্ধান পাওয়া গেছে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত, পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অজানা, সভ্যতাগুলোর মধ্যে—

কিংবা ছিল না কল্পনাপ্রবণা বৃদ্ধা মহিলাদের কুসংস্কার। একথা সত্য, রহস্যের যুগ য়ুরোপ পিছনে ছেড়ে এসেছে, প্রত্যেক জিনিস এখন আশ্চর্যজনকভাবে কার্টসীয় ও ব্যবহারিক, কিন্তু তথাপি একটা-কিছুর অভাব আছে। নতুন মানুষের চিহ্ন এই যে সে হঠাৎ জেগে ওঠে একটা-কিছুর তীব্র অভাবের প্রতি। যাকে পূর্ণ করতে পারে না তার বিজ্ঞান, বা তার উপাসনালয়, বা তার সাড়ম্বর সম্ভোগরাজি। মানুষ তার সকল রহস্য থেকে বিনা শাস্তিতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এও এক জীবন্ত জ্ঞান যা ভারত দিয়েছে শ্রীঅরবিন্দকে, যদি না তিনি তা জেনে থাকেন সহজাতরূপে।

কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে প্রাচীন রহস্যে পরিপূর্ণ এই ভারতবর্ষ আমাদের দেবে সেই কার্যকারী সমাধান, যার অনুসন্ধান আমরা করছি, তাহলে হয়তো আমরা নিরাশ হব। কোনো সাধককে ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক বিস্তৃতি ও বিশাল প্রয়োগসিদ্ধ জ্ঞান প্রদান করে, শ্রীঅরবিন্দ অবিলম্বে সেসবের মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি সব-কিছুই যে গ্রহণ করলেন, তা নয়। অবশ্য এতে প্রত্যাখ্যান করবার কিছুই নেই। না তথাকথিত হিন্দু ধর্মে, না খৃস্টান ধর্মে, না মানুষের অন্য কোনো আস্পৃহার মধ্যে। কিন্তু সব-কিছুতেই প্রয়োজন বিস্তৃতির, অসীম বিস্তৃতির। যা আমরা পরম সত্য বলে গ্রহণ করি, অধিকাংশ সময়ই তা হয় সত্যের এক অসম্পূর্ণ অনুভূতি— নিঃসন্দেহভাবে, সম্পূর্ণ অনুভূতি সময় ও মহাকাশের কোথাও নেই, কোনো স্থানেই নেই, এবং কোনো সত্তার মধ্যেও নেই, তিনি যত জ্যোতির্ময় হোন-না-কেন ; কারণ সত্য অসীম, সবসময়ই এগিয়ে চলেছে। বৌদ্ধধর্মের উপর এক অভিভাষণে শ্রীমা বলেছেন : *কিন্তু আমরা সব সময় নিজেদের উপর সীমাহীন বোঝা গ্রহণ করি। নিজের অতীত থেকে আমরা কিছু ছেড়ে দিতে রাজি নই, সেজন্য এক নিরর্থক ভারের নীচে আমরা অধিক হতে অধিকতর অবনমিত হয়ে যাই। পথের অংশের জন্য যদি পথপ্রদর্শক সঙ্গে রাখো, পথাংশটি অতিক্রান্ত হলে পিছনে ছেড়ে এসো সে পথাংশকে, এবং তৎসঙ্গে পথপ্রদর্শককেও ; তারপর, এগিয়ে চলো। এটা এমন কিছু যা লোকেরা অতি অনিচ্ছুকভাবে করে। একবার তারা কিছু-একটা পেয়ে গেলে, যা তাদের সাহায্য করেছে তাতেই লেগে থাকে, তাকে আর ছাড়তে চায় না। যারা কিছুটা অগ্রগতি করেছে খৃস্টান ধর্মের সাহায্যে, তাকে আর তারা ছাড়তে চায় না, এবং বহন করে চলে তাকে নিজেদের কাঁধে। যারা বৌদ্ধ ধর্মের সাহায্যে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, তারাও তাকে আর ছাড়তে চায় না, নিজেদের কাঁধেই বহন করে চলে। এই গুরুভারে তুমি অবনত হয়ে যাও, এবং তোমার গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে যায়। একবার তুমি একটা স্তর অতিক্রম করেছ, ছেড়ে দাও তাকে, যেতে দাও, এবং এগিয়ে চলো।* হ্যাঁ, সনাতন ধর্ম আছে, কিন্তু তা সনাতনভাবে তরুণ এবং সনাতনভাবেই প্রগতিশীল। যদিও ভারত বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, ভগবান

তাঁর বিশ্বময় যাত্রায় এক শাশ্বত প্রতিমাভঙ্গকারী ; কিন্তু ভারতের শক্তি ছিল না সর্বদা নিজের প্রজ্ঞাকে বহন করবার জন্য ; *যে বিশাল অদৃশ্য এই দেশকে* পরিব্যাপ্ত করেছে, তা এখান থেকে দ্বিগুণ মূল্য আদায় করেছিল, উভয় মানবিক ও আধ্যাত্মিক ; মানবিক— সর্বাতীতের দ্বারা পূর্ণসিক্ত ভারতীয়েরা বিরাট্ বিশ্বলীলা ও অন্তর্নিহিত পরিসরসমূহের বিষয়ে সচেতন, যেসব-কিছুর মধ্যে আমাদের বহির্জীবন শুধুই একটি বিন্দু, যা সাময়িকভাবে পুষ্পিত হয়, এবং শীঘ্রই আবার গ্রাসিত হয়ে যায়, এবং সেজন্য তারা অবশেষে জগৎকেই অবহেলা করল— জড়তা, প্রগতির প্রতি ঔদাসীন্য এবং নিশ্চেষ্টতা অনেক সময় প্রজ্ঞার মুখোশ ধারণ করত ; আধ্যাত্মিক মূল্যও (যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ)— কারণ, আমাদের *বর্তমানের* ক্ষুদ্র চেতনার তুলনায় এই যে অতিশয় বিশালতা, তার মধ্যে পৃথিবীর, আমাদের পৃথিবীর নিয়তি সমাপ্ত হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ছায়াপথগুলোর সীমানার মধ্যে, কিংবা শূন্যের মধ্যে এবং তারপর ব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেছে, যাঁর মধ্য হতে আর কখনও সে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে নি, শুধুই আমাদের স্বপ্ন ছাড়া —মায়াবাদ, সমাধি এবং যোগীর নিমীলিত চক্ষুদ্বয়ও মাঝে মাঝে ভগবানের মুখোশ পরিধান করেছে। সুতরাং ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষের দৃষ্টির সম্মুখে যে লক্ষ্য রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় ; তারপরই আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব, আমাদের জন্য— আমরা যারা পূর্ণ সত্যের অন্বেষক— ভারতবর্ষ কী করতে পারবে, বা পারবে না।

আরম্ভেই আমাদের স্বীকার করা উচিত, আমরা এক আশ্চর্যজনক অসংগতির সম্মুখীন। ভারত এক দেশ, যা প্রকাশ করেছে এক মহৎ দিব্যজ্ঞান ; ভারত বলেছে : "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"সব-কিছুই ব্রহ্ম", সব-কিছুই পরমাত্মা, এই জগৎও পরমাত্মা, এই পৃথিবী, এই জীবন, এইসকল মানুষও— তাঁর বাইরে কিছুই নেই। "সব-কিছু অবিনশ্বর ব্রহ্ম, অন্য কিছুই নয় ; ব্রহ্ম আমাদের সম্মুখে, ব্রহ্ম আমাদের পশ্চাতে, আমাদের দক্ষিণে, আমাদের উত্তরে, আমাদের নিম্নে আমাদের ঊর্ধ্বে ; তিনি সর্বত্র বিস্তৃত। সব-কিছুই একমাত্র ব্রহ্ম, এই মহান্ বিশ্বও।" (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২/২/১১)। অবশেষে ভগবান ও শয়তানের মধ্যে যে দ্বিধা-বিভাজন এই অসহায় জগৎকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল তা চিরকালের মতো প্রশমিত হল— যেন আমরা স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে একটাকে নির্বাচন করতে বাধ্য ছিলাম সর্বদা, এবং খণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত উদ্ধারলাভ হত না। অথচ, *ব্যবহারিক-ভাবে,* গত তিন হাজার বছর ধরে, ভারতের সমগ্র ধর্মসংক্রান্ত ইতিহাস এভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যেন সত্যই একজন ব্রহ্ম আছেন, বিশ্বাতীত, স্থাণু, সর্বদা এই পাগলাগারদের গন্তব্যের বাইরে, এবং একজন মিথ্যা ব্রহ্ম আছেন, বা এক ন্যূনতর ব্রহ্ম আছেন (যা নির্ভর করে নির্দিষ্ট চিন্তাধারার উপর) এবং তাঁর সঙ্গে আছে এক অন্তর্বর্তী ও সন্দেহজনক বাস্তবতা— অর্থাৎ জীবন, পৃথিবী, আমাদের অসহায়

পৃথিবী। মহান্ শঙ্কর* ঘোষণা করলেন, "এই মায়াময় জগৎ পরিত্যাগ করো।" নির্লম্ব উপনিষদ্ বলছেন : *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।* "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা মোটেই বুঝতে পারছি না কোন্ বিকৃতি কোন্ অসাবধানতার জন্য, "সব-কিছুই ব্রহ্ম" হয়ে গেল, "জগৎ ব্যতীত সব-কিছুই ব্রহ্ম।"

মানুষের মন এত চতুর যে সে সহজেই দেখতে পারে, হাতিও আকাশে ওড়ে। সেজন্য শাস্ত্রগুলোকে একপাশে রেখে, যদি আমরা ভারতের ব্যবহারিক অনুশাসনরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অসংগতিটি তখন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ, ভারতীয় মনস্তত্ত্ব এক অতীব ধীসম্পন্ন পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে —তা এই যে, ধাতব পদার্থ হতে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত বিশ্বের সব-কিছুই গঠিত তিনটি উপাদান বা *গুণের* সহকারে, যা সর্বত্র অবস্থিত, যদিও ভিন্ন ভিন্ন নামে অবিহিত হতে পারে বিবেচ্য সত্তার স্তরের উপর নির্ভর ক'রে : *তমঃ,* জড়তা, অজ্ঞানতা, নিশ্চেতনা ; *রজঃ,* গতি, সংঘর্ষ, চেষ্টা, আবেগ, কর্ম ; *সত্ত্ব,* আলোক, সুষমা, আনন্দ। এই তিনটি উপাদানের কোনো একটিও কখনো অকৃত্রিম অবস্থায় থাকে না ; আমরা সর্বদা জড়তা, আবেগ ও আলোকের এক সংমিশ্রণে অবস্থিত ; আমরা সাত্ত্বিক-তামসিক হতে পারি, ভালো কিন্তু নিশ্চেষ্ট, সদিচ্ছাযুক্ত কিন্তু স্বল্প অচেতন ; কিংবা হতে পারি সাত্ত্বিক-রাজসিক, ঊর্ধ্বায়িত আবেগে পূর্ণ ; কিংবা তামসিক-রাজসিক হতে পারি, নিম্নাভিমুখী আবেগে পূর্ণ ; অধিকাংশ সময় আমরা এই তিনটির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। অন্ধকারতম তিমিরেও আলোক জ্বলে— কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর বিপরীতও সমানভাবে সত্য। এইভাবে, আমরা সবসময় একটা অস্থির ভারসাম্যের মধ্যে অবস্থিত ; যোদ্ধা, তপস্বী ও বর্বর আমাদের সত্তাটিকে বিভিন্ন অনুপাতে সানন্দে অংশাধিকার করে থাকে। সেজন্য বিভিন্ন ভারতীয় অনুশাসন এই ভারসাম্যটিকে পুনরুদ্ধার করতে চায়, আমাদের সাহায্য করতে চায় সেই ত্রিগুণের খেলা হতে মুক্ত করবার জন্য, যে গুণত্রয় অন্তহীনভাবে আমাদের নিক্ষিপ্ত করে আলোক হতে অন্ধকারে, উৎসাহ হতে ক্লান্তিতে, ধূসর অনাসক্তি হতে ক্ষণস্থায়ী সম্ভোগে ও বারংবার দুর্দশাভোগে, এবং এক ঊর্ধ্বস্থ স্থিরতা প্রাপ্তির জন্য অথবা, অন্য কথায়, চায় দিব্যচেতনার পুনঃপ্রাপ্তি (যোগ) যা পূর্ণ সমভাবের অবস্থা। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য এই অনুশাসনরাজি চেষ্টা করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিক্ষেপণ ও অপচয়ের অবস্থা হতে আমাদের উদ্ধার করতে, এবং আমাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী এক একাগ্রতা সৃষ্টি করে সাধারণ সীমাগুলো ভেঙে অন্য এক অবস্থায় আমাদের উন্নীত করতে, যথা সময়ে। এই একাগ্রতার কাজটি আমাদের সত্তার যে-কোনো স্তরে করা যেতে পারে— শারীরিক,

---

* শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০) অতীন্দ্রিয়বাদী, কবি, মায়াবাদের প্রতিষ্ঠাতা, যা ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম লোপের কারণ।

প্রাণিক কিংবা মানসিক। আমাদের নির্বাচিত স্তরের উপর নির্ভর করে আমরা কোনো একটি যোগের অভ্যাস আরম্ভ করি— হঠযোগ, রাজযোগ, মন্ত্রযোগ এবং অন্যান্য আরো অনেক, অসংখ্য যোগ, যা আমাদের প্রচেষ্টার গতিপথ নির্ধারিত করে। এইসব পদ্ধতির উচ্চমূল্য বা তাদের অতি আকর্ষক অন্তর্বর্তী ফলাফলের বিষয়ে আমাদের আলোচনা করবার কোনো প্রয়োজন নেই ; আমরা শুধু পরীক্ষা করব তাদের লক্ষ্য, তাদের শেষ গন্তব্যস্থল। কিন্তু ঘটনাক্রমে, এই "ঊর্ধ্বস্থ স্থিরতার" জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না ; কারণ, প্রথমত, এই অনুশাসনরাজির অত্যন্ত কঠোর দাবি, প্রতিদিন ঘণ্টা ঘণ্টা ধরে অনুশীলনের প্রয়োজন হয় এ-সকলে, সম্পূর্ণ একান্তবাসের প্রয়োজন না হলেও। দ্বিতীয়ত, এদের সফলতার মাপকাঠি হল এক ধ্যানমগ্নতা, যৌগিক চরমোল্লাস, সমাধি, পূর্ণ সমভাব, অনির্বচনীয় আনন্দ, যার মধ্যে জাগতিক বোধ বা সচেতনতা লুপ্ত হয়ে যায়, গ্রাসিত হয়ে যায়। ব্রহ্মের পরমের, আমাদের সাধারণ জাগ্রত চেতনার সঙ্গে কোনো সংযোগ আছে বলে বোধ হয় না। আমরা যা-কিছু জানি, তিনি তার বাইরে ; তিনি এই জগতের নন। অন্যেরা, যাঁরা ভারতীয় নন, তাঁরাও এ কথাই বলেছেন।

বস্তুত, বিশ্বের সব ধর্মই এই কথা বলেছেন। যখন পশ্চিমে পরিত্রাণের কথা বলি, কিংবা প্রাচ্যে মোক্ষ বা মুক্তির কথা বলি, স্বর্গ বা জন্মচক্রের অবসানের কথা বলি, তখন পার্থক্য কিছুই হয় না, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হল বাইরে চলে যাওয়া। কিন্তু ঘটনা সবসময় এ-রকম ছিল না। রহস্যবাদের যুগের শেষ ও মহান ধর্মসমূহের আবির্ভাবের সময়ের মধ্যে, উভয় পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে একটি ভুলের শুরু হল। এক জ্ঞান যা ভগবান ও বিশ্বের মধ্যে পার্থক্যবোধ রাখত না, তা আবৃত হয়ে গেল— সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনশ্রুতি এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য এক আধুনিক সৃষ্টি। তথাকথিত জড়বাদীরা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবাদীদেরই সন্তান, ন্যায়সংগত হোক বা না হোক, ঠিক কৃপণ পিতাদের সন্তানেরা অমিতব্যয়ী হয়। বেদের উত্তরাধিকারী, তিন-চার হাজার বছর পূর্বের প্রথম উপনিষদসমূহ, এই "বিস্ময়জনক বিশ্বের" সর্বত্রই ভগবান বিদ্যমান যাঁদের দৃষ্টিতে এবং শেষের উপনিষদসমূহের মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য হারিয়ে গিয়েছিল— শুধু ভারতবর্ষেই নয়, মেসোপটামিয়া, মিশর, গ্রীস এবং সেন্ট্রাল আমেরিকাতেও এই রহস্য হারিয়ে গিয়েছিল। এই গূঢ় রহস্যই শ্রীঅরবিন্দ পুনর্বার আবিষ্কার করছিলেন, কারণ বোধহয় তাঁর মধ্যে সূক্ষ্মতম পাশ্চাত্য ঐতিহ্য ও এশিয়ার গভীর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের এক সমাহার হয়েছিল। তিনি বলেছেন : *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দুটি পথে যা একই সত্যের দুটো বিপরীত দিক। প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের নৃত্যস্বরূপ উচ্ছ্বাসে বিমোহিত, আধুনিক য়ুরোপের প্রাণময় চিন্তাধারা যে ব্যবহারিক সত্যের উপর তীব্র ও বিশেষ জোর*

দেয়, এবং প্রশান্তি ও স্থিরতায় বিমুগ্ধ ভারতীয় মন যে শাশ্বত অপরিবর্তনীয় সত্যের প্রতি সমান আবেগের সহিত এক বিশেষ আবিষ্কারের জন্য উন্মুখ হতে ভালোবাসে, তাদের মধ্যে তেমন কোনো বিচ্ছেদ ও কলহ নেই, যেমন এখন বিঘোষিত হচ্ছে পক্ষপাতদুষ্ট মন, বিভেদকারী যুক্তি এবং সংসিদ্ধিকামী অবিমিশ্র-সংকল্পময় আগ্রাসী আবেগের দ্বারা। একমাত্র শাশ্বত অপরিবর্তনীয় সত্য হলেন পরমাত্মা, এবং পরমাত্মা ব্যতীত এক স্বয়ংসৃষ্টিশীল বিশ্বের ব্যবহারিক সত্যের কোনো উৎস বা ভিত্তি থাকতে পারে না। তা হয়ে যায় তাৎপর্যশূন্য, অন্তঃনিয়মনহীন, লক্ষ্যহীন এক আতশবাজির প্রদর্শনী, যা শূন্যে ছুটে যায়। শুধুই পতনশীল হয়ে মধ্য আকাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাই বলে ব্যবহারিক সত্যও কোনো অস্তিত্ববিহীনের স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সৃষ্টিশীল কল্পনার ব্যর্থপ্রলাপের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী পতন নয়; যদি তাই হয় তাহলে শাশ্বত চিন্ময় পরিণত হবেন একজন মদ্যপে বা এক স্বপ্নবিলাসীতে। নিজেরই কৃত বিরাট ভ্রমসমূহে মূঢ়। বিশ্বগত অস্তিত্বের সত্যসকল দ্বিবিধ : চিন্ময় সত্যসমূহ, যারা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়; এবং এরা সেই মহৎবস্তুরাজি যারা নিজেদের বাইরে নিক্ষিপ্ত করে সম্ভূতির মধ্যে ও সেখানে সর্বদা উপলব্ধ করে তাদের শক্তি ও তাৎপর্য; এবং তার সঙ্গে চেতনার লীলা, সকল অপস্বর, সাংগীতিক বৈচিত্র্য. সম্ভাবনাময় ধ্বনিমহিমা, ক্রমোত্থানশীল স্বরলিপি, প্রত্যাবর্তন, বিচ্যুতি, এক মহত্তর সাকার সুষমায় আরোহী পরিবর্তন; এবং পরমাত্মা সর্বদা তাঁর রচিত এই বস্তুরাজির দ্বারা নিজের বিশ্বের সৃষ্টি করেন। কিন্তু এতে তিনি স্বয়ং নিজেকেই সৃষ্টি করেন; তিনি নিজেই স্বয়ং স্রষ্টা, সৃষ্টির শক্তি, কারণ, পদ্ধতি ও ক্রিয়ার পরিণতি, যন্ত্রী ও যন্ত্র, সংগীত ও সংগীতজ্ঞ, কবি ও কাব্য, অতিমানস, মন প্রাণ ও জড়তত্ত্ব, আত্মা এবং প্রকৃতি।[৫]

কিন্তু শুধুমাত্র কাগজের উপরই চেতন ও জড়ের সমন্বয় শ্রীঅরবিন্দের নিকট যথেষ্ট ছিল না। পরমাত্মা এই জগতের, কি না, তাতে কোনো পার্থক্য হয় না, যদি না জীবনে নিহিত আত্মার জ্ঞানের সঙ্গে, জীবনের উপর কার্যকরী এক শক্তি থাকে :

কারণ সত্য আর জ্ঞান এক অলস আলোকদ্যুতি,
জ্ঞান যদি শক্তি না আনে জগতের রূপান্তরের।[৬]

হারিয়ে যাওয়া রহস্যটি এক তাত্ত্বিক সত্য নয়, তা জড়ের উপর চেতনের বাস্তব শক্তি। এই ব্যবহারিক রহস্যটিই শ্রীঅরবিন্দ পুনর্বার আবিষ্কার করতে যাচ্ছিলেন, ক্রমশ পরীক্ষামূলকভাবে, তাঁর পাশ্চাত্য পটভূমিকা তথা হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যকে অতিক্রম করবার সাহস সহকারে। কারণ এ কথা বাস্তবিক সত্য যে, প্রকৃত সারতত্ত্ব তখন উদ্ভূত হয়, যখন অন্য সব-কিছু বিস্মৃত হয়ে যায়।

৩

বুদ্ধির শেষে

পাশ্চাত্যের পথভ্রমণে শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজন হয়েছিল চোদ্দ বছর: প্রায় অনুরূপ সময়ই তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল ভারতবর্ষের পথভ্রমণে ও পরম্পরাগত যৌগিক সিদ্ধিগুলোর চরমশিখরে পৌঁছবার জন্য, যা ছিল তাঁর নিজস্ব কার্যের আরম্ভবিন্দু। কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় কথা এই যে, শ্রীঅরবিন্দ এই পারম্পরিক পথ অতিক্রম করেছিলেন (আমাদের বিবেচনায় তা ছিল এক প্রস্তুতি) সকল প্রথাগত নিয়মের বাইরে, ঠিক যেন একজন স্বাধীন কর্মী, কিংবা একজন আবিষ্কারক যিনি কোনো সাবধানতার বিষয়ে বা মানচিত্রের বিষয়ে যত্নশীল নন, এবং অনেক অপ্রয়োজনীয় বক্রতা পরিহার করেন, কারণ তাঁর সাহস আছে সোজা সম্মুখে যাওয়ার। কোনো নির্জন নিবাসে, পদ্মাসনে আসীন হয়ে, কিংবা কোনো আলোকপ্রাপ্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে শ্রীঅরবিন্দ এই যাত্রা আরম্ভ করেন নি, করেছিলেন দৈনন্দিন জীবনের ঠিক মধ্যস্থলে, ঠিক হয়তো আমরা নিজেরা যেমন তা করতাম, কোনো বিশেষ জ্ঞান বিনা— আমাদের জীবন যেমন ব্যস্ত ও বেগশীল হতে পারে, ঠিক তেমনই এক জীবনে— এবং সম্পূর্ণ একাকী। শ্রীঅরবিন্দের প্রথম রহস্য হল জীবনের দ্বিধাবিভাজককে এক দৃঢ় অস্বীকার— যেমন কর্ম বনাম ধ্যান, আন্তরিক বনাম বাহ্যিক এবং আমাদের মিথ্যা বিভাজনের সকল পরিসর

—যেদিন থেকে যোগের বিষয়ে তিনি চিন্তা করলেন। সব-কিছুই তিনি তাতে বিনিযুক্ত করলেন, উচ্চ-নীচ, অন্তর্ভাগ-বহির্ভাগ, সব-কিছু, এবং যাত্রা আরম্ভ করলেন, একবারও পশ্চাদবলোকন না করে। এক অসাধারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অসাধারণ গুণাবলীর প্রদর্শন করতে শ্রীঅরবিন্দ আসেন নি ; তিনি এসেছেন শুধু দেখাতে মানুষের পক্ষে কী সম্ভব, এ কথা দেখাতে যে, যা অসাধারণ তা এক স্বাভাবিক সম্ভাবনা যা এখনও আয়ত্তে আসে নি, তিনি বলছেন : *ঠিক যেমন, অতীন্দ্রিয় সেই প্রকৃতি যেখানে এখনও আমরা উপনীত হই নি, বা যা আমরা এখনও জানি না, বা যা পাওয়ার উপায় আমরা এখনও অধিকার করি নি।*[১] অবশেষে, এ জগতে সবই হল যথার্থ একাগ্রতার বিষয়। এমন কিছুই নেই যা পরিশেষে যথার্থভাবে প্রয়োজিত একাগ্রতার কাছে হার না মানে।

বোম্বের অ্যাপোলো-বন্দরের উপকূলে যখন তিনি পদার্পণ করলেন, এক স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতি, *এক বিপুল প্রশান্তি তাঁর উপর অবতীর্ণ হল ;* কিন্তু তাঁর আরো জরুরি সমস্যা ছিল— আহার্য ও জীবনধারণ। শ্রীঅরবিন্দ বিশ বছরের ছিলেন। বরোদা মহারাজার স্টেট্ সার্ভিসে তিনি যোগদান করলেন, তারপর নিযুক্ত হলেন স্টেট্ কলেজে ফরাসি ভাষায় লেক্‌চারার রূপে, তারপর ইংরেজি ভাষায় প্রফেসার রূপে ; সেখানে অবিলম্বে তিনি হলেন ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল। তিনি মহারাজার সেক্রেটারির কাজও করেছিলেন। রাজপ্রাসাদ ও কলেজের মধ্যে তিনি যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ভারতের ভাগ্যের চিন্তাতেই তিনি তন্ময় থাকতেন। অনেকবার তিনি কলকাতায় ভ্রমণে গিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করলেন, এবং অনেকগুলো ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করলেন যা এক অপবাদের সৃষ্টি করল, কারণ ভারতের সম্রাজ্ঞীকে তিনি শুধুই যে একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা যাঁকে ভদ্রতার খাতিরে তদ্রূপ আখ্যা দেওয়া হয় বলে উল্লেখ করলেন, তাই নয়, তিনি দেশবাসীকেও প্রবর্তিত করলেন ব্রিটিশ অধীনতা হতে নিজেদের মুক্ত করতে, এবং ভারতীয় কংগ্রেস-এর ভিক্ষুকসুলভ নীতিকে আক্রমণ করলেন : কোনো সংস্কার নয়, কোনো সহযোগিতা নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল বৈপ্লবিক কর্মধারার জন্য জাতির শক্তি একত্রীভূত করা ও সংগঠিত করা। এরজন্য কিছু সাহসের প্রয়োজন ছিল কারণ সেটা ছিল ১৮৯৩ খৃস্টাব্দ যখন ব্রিটিশ শাসন বিস্তৃত ছিল ভূমণ্ডলের তিন-চতুর্থাংশে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই সমস্যাটিকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন ; তিনি ইংরেজদের উপর কোনো দোষারোপ করতেন না, দোষ দিতেন ভারতীয়দের উপরই। *আমাদের বাইরের কোনো শক্তি আমাদের শত্রু নয় বরং শত্রু হল আমাদের নিজেদের ক্রন্দনশীল দুর্বলতাগুলো, আমাদের ভীরুতা, আমাদের অন্ধপ্রায় ভাবপ্রবণতা।*[৩] ইতিমধ্যে আমরা শ্রীঅরবিন্দের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি, তিনি আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে ও সকল পরিস্থিতিতে আমাদের দুর্ভাগ্য ও জগতের সমস্ত দুর্দশার কারণ

অনুসন্ধান করবার জন্য নিজেদের অন্তরেই দৃষ্টিপাত করবার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন, বাইরে বা অন্যত্র নয়। শ্রীমা, যিনি পরবর্তী সময়ে শ্রীঅরবিন্দের কার্যে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি বলেছেন : *বাইরের ঘটনাবলী, শুধু ভিতরে আমরা যা, তারই পরিপ্রকাশ।* শ্রীঅরবিন্দ শীঘ্রই হৃদয়ংগম করেছিলেন যে সংবাদপত্রের প্রবন্ধ একটা দেশকে জাগাবার জন্য যথেষ্ট নয় ; তিনি এক গুপ্ত কার্যকলাপ আরম্ভ করলেন, যা তাঁকে নিয়ে যাবে ফাঁসির মঞ্চের নিচে। তেরো বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দ আগুনের সঙ্গে খেলা করছিলেন।

কিন্তু এই যুবক অশান্ত বা উগ্রস্বভাব ছিলেন না : "তাঁর হাসি ছিল শিশুর হাসির মতো সরল, তরল ও সুকোমল," লিখেছেন তাঁর বাংলা শিক্ষক ; তিনি তাঁর সঙ্গে দুবছর বাস করেছিলেন (স্বাভাবিকভাবেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মাতৃভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন)। তাঁর শিক্ষক এক মর্মস্পর্শী অকপটতা নিয়ে আরো লিখেছেন : "শ্রীঅরবিন্দকে দেখবার আগে তাঁকে আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম এক বলিষ্ঠ যুবকরূপে, আপাদমস্তক হ্যাট-কোট-বুট দ্বারা বিমণ্ডিত, নিখুঁত চশমার পিছনে কট্‌মট্‌ চাউনি, মুখে বাঁকা বাঁকা কথা (কেম্ব্রিজ থেকে ফেরবার দরুন) এবং মেজাজ ভয়ংকর রুক্ষ।... কে ভাবতে পেরেছিল যে এই শ্যামবর্ণ যুবক, যার চোখে কোমল স্বপ্নিল ভাব, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবালম্বিত বাবরি চুল, মধ্যে সিঁথি, পরিধানে আহ্‌মেদাবাদের সাধারণ মোটা ধুতি, শরীরে মির্জা কুর্তা, পায়ে শুঁড়ওয়ালা পুরোনো কালের নাগ্‌রাই জুতো, মুখে সামান্য বসন্তের দাগ, ফরাসি, ল্যাটিন ও গ্রীকের জীবন্ত উৎস সে মিস্টার অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া অন্য কেউ নন?"

তাছাড়া, শ্রীঅরবিন্দ তখনও গ্রন্থাধ্যয়ন সমাপ্ত করেন নি, পাশ্চাত্যে লব্ধ গতির রেশ তখনও ছিল ; কেস্‌ ভর্তি বই বোম্বে ও কলকাতা থেকে আনিয়ে তিনি সেগুলো গ্রাস করতেন ; তাঁর বাংলা শিক্ষক আরো লিখেছেন : "শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ডেস্‌ক্‌-এর সামনে বসে তেলের ল্যাম্‌প্‌-এর আলোয় রাত একটা পর্যন্ত পড়তেন, অসহ্য মশার কামড় সহ্য করে। আমি তাঁকে দেখতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভাবে বসে থাকতে, বই-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভগবদনুধ্যানে লীন যোগীর মতো তাঁর চতুর্দিকে যা হচ্ছে সে-বিষয়ে অনবহিত। এমন-কি সেই ঘরে আগুন লেগে গেলেও তাঁর ধ্যানভঙ্গ হত না।" ইংরেজি, রুশ, জার্‌ম্যান ও ফরাসি উপন্যাস তিনি পড়তেন, কিন্তু তাছাড়াও, অধিকতর সংখ্যায় পড়তেন ভারতের পবিত্র গ্রন্থাবলী, উপনিষদ্‌, ভগবদ্‌গীতা, রামায়ণ, যদিও তিনি কখনও মন্দিরে যান নি, দ্রষ্টারূপে ছাড়া। তাঁর এক বন্ধু স্মৃতিচারণ করেছেন, "একবার কলেজ থেকে ফিরে শ্রীঅরবিন্দ বসে পড়লেন, খামখেয়ালিভাবে একটা বই তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। জেড্‌ ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু তখন দাবা খেলতে আরম্ভ করলেন হট্টগোলের সঙ্গে। আধঘণ্টা পরে তিনি বই রেখে এক কাপ চা নিলেন। এর পূর্বে আমরা অনেকবার তাঁকে এরকম করতে দেখেছিলাম, এবং

সাগ্রহে এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, পরীক্ষা করবার জন্য যে, তিনি মলাট থেকে মলাট পর্যন্ত বইগুলো সম্পূর্ণ পড়তেন, না কি, এখানে-সেখানে কয়েকটি পাতার উপরই চোখ বুলিয়ে নিতেন। পরীক্ষা অবিলম্বে শুরু হল। জেড় বইটা খুললেন, উচ্চস্বরে একটা লাইন পড়লেন, তারপর শ্রীঅরবিন্দকে বললেন, এরপর কী আছে আবৃত্তি করতে। শ্রীঅরবিন্দ এক মুহূর্ত একাগ্র হলেন, তারপর সমগ্র পৃষ্ঠাটি নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করলেন। যদি তিনি আধঘণ্টায় একশো পৃষ্ঠা পড়তে পারতেন, তাহলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, কেস্ ভর্তি বই তিনি অবিশ্বাস্যভাবে কম সময়ের মধ্যে পড়ে ফেলতেন।" শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু পবিত্র গ্রন্থগুলির অনুবাদ পাঠ করেই চুপ রইলেন না, তিনি সংস্কৃত শিক্ষাও আরম্ভ করলেন ; তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, তা তিনি নিজেই শিখলেন ; যখন কোনো একটি বিষয় কঠিন বা অসম্ভব মনে হত, তিনি সে-বিষয়ে কারও কথাই গ্রহণ করতেন না, সে যিনিই হোন্-না-কেন, ব্যাকরণবিদ্, পণ্ডিত বা ধর্মযাজক ; তিনি নিজেই সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করবার জন্য জোর দিতেন, মনে হয়, এ পদ্ধতির একটা সুফল আছে, কারণ তিনি শুধু সংস্কৃতই শিখলেন, তা নয়, কয়েক বছর পর বেদের হারানো অর্থ তিনি আবিষ্কার করলেন।*

যা হোক, একদিন এল যখন শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করলেন তাঁর এসব বৌদ্ধিক অনুশীলন যথেষ্ট হয়ে গেছে। সম্ভবত তিনি হৃদয়ংগম করলেন, একজন অফুরন্তভাবে জ্ঞান আহরণ করতে পারে, ভাষা শিখতে ও পড়তে পারে, এমন কি বিশ্বের সব ভাষা শিখে সব বইও পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এক ইঞ্চিও অগ্রসর না হতে পারে সে। কারণ প্রকৃতপক্ষে, মন জ্ঞানের অন্বেষণ করে না, যদিও তাই মনে হয়— মন চায় চূর্ণ করতে। জ্ঞানের জন্য মনের যে প্রয়োজন, তা হল মূলত চূর্ণ করবার জন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন। যদি দৈবাৎ জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়ে গেছে বলে যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে অতিশীঘ্র এ বিদ্রোহ করবে, এবং চূর্ণ করবার জন্য নতুন কিছুর সন্ধান করবে, শুধু অনবরত চূর্ণ করবার জন্য। এই হল তার কাজ। আমাদের যা জ্ঞানের ও প্রগতির অন্বেষণ করে তা মন নয়, মনের পশ্চাতে অবস্থিত কিছু, যা এর ব্যবহার করে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক শিষ্যের নিকট ব্যক্ত করলেন : *আমার বৌদ্ধিক অভিবৃদ্ধির প্রধান সময় হল যখন আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, বুদ্ধি যা বলছে তা সত্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, বুদ্ধি যা প্রমাণিত করছে তা সত্য হতে পারে, এবং তার বিপরীতও সত্য হতে পারে। আমি মনের মধ্যের কোনো সত্যই স্বীকার করি নি, মনকে যুগপৎ তার বিপরীতের দিকে খেলা না রেখে।... এবং প্রথম ফল হল, বুদ্ধির গরিমা-টি বিদায় গ্রহণ করল।*[৪]

---

* বৈদিক যুগ, তার উত্তরাধিকারী ঔপনিষদিক যুগের পূর্বে, খৃস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে আরম্ভ হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন এক সন্ধিক্ষণে : মন্দিরগুলো তাঁকে আকৃষ্ট করত না, এবং গ্রন্থগুলোও শূন্য হয়ে গেল। এক বন্ধু তাঁকে যোগাভ্যাস করতে বললেন— শ্রীঅরবিন্দ অস্বীকার করলেন : *জগৎ পরিত্যাগ করবার প্রয়োজনীয়তা যে যোগে আছে, সে আমার জন্য নয়।*[৫] তিনি আরো বললেন, *জগৎকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে এক একক মুক্তি মনে হল সমান অরুচিকর।*[৬] কিন্তু একদিন শ্রীঅরবিন্দ এক অদ্ভুত ঘটনা দেখলেন, যা অবশ্য ভারতবর্ষে অসাধারণ নয়— সুনিশ্চিতভাবে, সাধারণ ঘটনা অনেক সময় সর্বোত্তম আন্তরিক গতির আরম্ভের কারণ হয়। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন (বারীনের জন্ম ইংল্যাণ্ড-এ ও তিনি বঙ্গে ভারতীয় আন্দোলনের সংগঠনে শ্রীঅরবিন্দের গুপ্তদূত ছিলেন। তখন আবির্ভূত হলেন *নাগা সন্ন্যাসী* নামে পরিচিত অর্ধনগ্ন, যাযাবর সাধুদের একজন, তাঁর শরীর ভস্মে আচ্ছাদিত। সম্ভবত, তাঁদের প্রথানুযায়ী তিনি দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করছিলেন; তখন তিনি দেখলেন বারীনকে, কম্বল মুড়ি দিয়ে জ্বরে কাঁপছিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি এক গ্লাস জল চাইলেন, একটি চিহ্ন আঁকলেন, *মন্ত্র* পড়লেন এবং বারীনকে বললেন সেই জল পান করতে। পাঁচ মিনিট পরে, বারীন সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে গেছেন। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ এইসব তপস্বীদের সকল আশ্চর্য ক্ষমতার বিষয়ে শুনেছিলেন, কিন্তু এবার তিনি নিজের চোখেই তা দেখলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হৃদয়ংগম করলেন, পলায়ন ছাড়াও যোগের মাধ্যমে অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। এবং তাঁর প্রয়োজন ছিল শক্তির, ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য : *আমার মধ্যে অজ্ঞেয়বাদী ছিল, আমার মধ্যে নাস্তিক ছিল, আমার মধ্যে সংশয়ী ছিল, এবং আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত ছিলাম না যে, একজন ভগবান আদৌ আছেন। ... আমি অনুভব করলাম এই যোগের মধ্যে কোথায় একটা বিরাট সত্য নিশ্চয় আছে।... সেজন্য যখন আমি যোগের অভিমুখী হলাম এবং যোগাভ্যাসের সংকল্প গ্রহণ করলাম, আমার ধারণা যথার্থ কি না তা জানবার জন্য, তখন আমি তা করেছিলাম এই মর্মে ও ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করে : যদি তুমি আছ, তাহলে তুমি আমার হৃদয়ের কথা জানো। তুমি জানো আমি মুক্তি চাই না, অন্যেরা যা চায় সেসব আমি কিছুই চাই না। আমি চাই শুধু শক্তি এই জাতির উত্থানের জন্য, চাই আমাকে জীবনধারণ করে কাজ করতে দেওয়া হোক এই জনগণের জন্য, যাদের আমি ভালোবাসি।*[৭]... এইভাবে শ্রীঅরবিন্দ এ পথে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন।

৪

নীরব মন

মানসিক নির্মাণ

শ্রীঅরবিন্দের যোগে প্রথম স্তর হল মনকে নীরব করা। এ এক মৌলিক কাজ যা অনেক উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। আমরা প্রশ্ন করতে পারি মনকে নীরব করা কেন? এ কথা পরিষ্কার যে, আমরা যদি আমাদের মধ্যে এক নতুন দেশ আবিষ্কার করতে চাই, তাহলে পুরোনোটাকে পিছনে ছেড়ে যেতে হবে— সব-কিছু নির্ভর করে এই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে আমাদের দৃঢ়তার উপর। কখনও কখনও তা এক ঝলকেই হয়ে যায় : আমাদের মধ্যে কিছু একটা চিৎকার করে ওঠে, "যথেষ্ট হয়েছে এই অবিরাম চূর্ণীকরণ!" আমরা সব সময়ের জন্য তাতেই লেগে থাকি অধ্যবসায়ের সঙ্গে এবং এগিয়ে যাই পিছনে একবারও দৃষ্টিপাত না করে। অন্যেরা "হ্যাঁ" বলেন, তারপর, "না" ; দুটো জগতের মধ্যে তাঁরা অবিরত আন্দোলিত হতে থাকেন। আমরা শুরুতেই জোর দিয়ে বলতে চাই যে, প্রজ্ঞা-শান্তি-স্থৈর্যের নামে— ভগবান্ জানেন কী এসব— আমাদের কষ্টার্জিত কোনো অধিকার আমাদের কাছ থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করাও লক্ষ্য নয় (এ ক্ষেত্রেও আড়ম্বরপূর্ণ শব্দের দ্বারা আমরা নিজেদের প্রতারিত করব না) ;

পবিত্রতার অন্বেষণ আমরা করছি না, করছি তারুণ্যের— এক শাশ্বতভাবে অভিবৃদ্ধিশীল সত্তার শাশ্বত তারুণ্যের ; এক ক্ষুদ্রতর সত্তার অন্বেষণ আমরা করছি না, অন্বেষণ করছি এক উৎকৃষ্টতর সত্তার, এবং সর্বোপরি এক বিশালতর সত্তার ; শ্রীঅরবিন্দ একবার কৌতুকপূর্ণভাবে মন্তব্য করেছিলেন : *তোমার কি এ কথা মনে হয় নি যে, যদি পরম মঙ্গলময় ভেবে তাঁরা অন্বেষণ করতেন কিছু-একটার যা শীতল, অন্ধকার ও বিষাদময় তাহলে তারা সাধু হতেন না, হতেন গর্দভ?*[১]

প্রকৃতপক্ষে, মনের যন্ত্রটি স্তব্ধ হয়ে গেলে সর্ববিধ আবিষ্কার সম্ভব হয়, এবং প্রথম আবিষ্কারটি এই যে, যদি চিন্তাশক্তি একটি উল্লেখনীয় অবদান হয়ে থাকে, তাহলে *চিন্তা না-করার শক্তি*[২] অনেক বেশি মহত্তর অবদান ; অন্বেষী শুধু কয়েক মিনিট চেষ্টা করলেই দেখতে পাবেন শীঘ্রই, তিনি কোন বিষয় হাতে নিয়েছেন! তিনি উপলব্ধি করবেন যে, তিনি বাস করেন এক শঠতাপূর্ণ কোলাহলের মধ্যে এক ক্লান্তিকর অথচ ক্লান্তিবিহীন ঘূর্ণির মধ্যে, যা পরিপূর্ণ শুধুমাত্র তাঁর নিজের চিন্তা, নিজের অনুভূতি, নিজের আবেগ, নিজের প্রতিক্রিয়া নিয়ে— নিজে, সবসময় নিজে, এক বর্ধিত আকারের বামন সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত, সবকিছু আবৃত করে, শুধু নিজেকে ছাড়া কিছুই দেখেনা, কিছুই শোনে না, নিজেকে ছাড়া কিছুই জানে না (যদি তাও হত!), যার অপরিবর্তিত কথাবস্তু কোনো প্রকারে নবীনতার এক ভ্রান্তি সৃষ্টি করে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে। *এক বিশেষ অর্থে, মানসিক, স্নায়বিক ও শারীরিক অভ্যাসের এক জটিল সমাবেশ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই নই, যা সংহত হয়ে আছে কয়েকটি মুখ্য ধারণা, আকাঙ্ক্ষা ও সম্বন্ধের সাহায্যে —স্বল্প কয়টি প্রধান স্পন্দনের সঙ্গে, অনেকগুলি ছোট ছোট পুনরাবৃত্তিশীল শক্তির সমাবেশ।*[৩] আঠারো বছর বয়সের সময় আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই, আমাদের প্রধান স্পন্দনগুলোর দৃঢ়ীকরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, একথা বলা যেতে পারে ; তারপর, যাকে আমরা বলি সংস্কৃতি বা "আমরা স্বয়ং" সেই একই গতানুগতিক সহস্রমুখ বস্তুর সঞ্চয় অবিরতভাবে বসে যাবে প্রাথমিক গঠনটির চারধারে, ঘন হতে আরও ঘন, অধিক হতে অধিকতর সূক্ষ্ম ও মসৃণ স্তরে— এক কথায় আমরা একটি *নির্মাণের* মধ্যে বন্দী হয়ে আছি, যেটা হয়তো সীসের তৈরী, একটিও বাতায়ন ব্যতীত, কিংবা এক ছোট মিনারের মতো মাধুর্যময় ; কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা বন্দী, গুঞ্জনরত, পুনরাবৃত্তিশীল, গ্র্যানাইটের আবরণে বা কাচের মূর্তিতে। যোগের প্রথম কাজ হল মুক্তভাবে নিঃশ্বাস নেওয়া। এবং অবশ্য মনের পরদাটিকে বিদীর্ণ করা, যা শুধু একই প্রকারের স্পন্দনকে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়, এবং অবশেষে আবিষ্কার করা, বর্ণ-বৈচিত্র্যময় স্পন্দনের অন্তহীনতাকে, এবং জগৎকে ও মানুষদের তাদের প্রকৃত স্বরূপে, আমাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত অন্য এক "আত্মসত্তা"কে, যার মূল্য আমাদের ধারণার চেয়ে বেশি।

সক্রিয় ধ্যান

যখন আমরা চোখ বন্ধ করে মনকে নীরব করতে বসি, তখন প্রথমে আমরা ডুবে যাই চিন্তার খরস্রোতে— সব দিক হতে উদ্‌ভূত হয় তারা, যেন আতঙ্কপীড়িত কিংবা আক্রমণকারী মূষিকের দল। এই হট্টগোল জয় করবার জন্য কিন্তু একটিই পদ্ধতি আছে : বারংবার চেষ্টা করা, ধৈর্যশীল হয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে। এবং সর্বোপরি, মনের সঙ্গে মানসিকভাবে সংঘর্ষ করবার ভুল না করা— আমাদের কেন্দ্রবিন্দুটিকে স্থানান্তরিত করতে হবে। মনের ঊর্ধ্বে বা গভীরতর অন্তর্দেশে, আমাদের সবারই আছে এক *অভীপ্সা*, ঠিক সেই জিনিস যা আমাদের এই পথে এনেছে, আমাদের সত্তার প্রয়োজন, এক সংকেত-শব্দ যা ফলপ্রদ শুধু আমাদের জন্য ; আমরা যদি তার সঙ্গে লেগে থাকি, তাহলে কাজটি সরলতর হয়ে যায়, নাস্তিবাচক হওয়ার পরিবর্তে অস্তিবাচক হয়ে ওঠে— এবং আমরা যতই সেই সংকেত শব্দের পুনরাবৃত্তি করি, ততই তা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমরা কিছু-একটা প্রতিরূপও ব্যবহার করতে পারি, উদাহরণস্বরূপ, এক বিশাল মহাসাগর যেখানে কোনো তরঙ্গ নেই, যার উপর আমরা শায়িত অবস্থায় ভাসমান —আমরা ভেসে চলি, হয়ে যাই সেই প্রশান্ত বিশালতা। এইভাবে, আমরা শুধু যে নীরবতার শিক্ষালাভ করি তাই নয়, চেতনাকে প্রসারিত করবার শিক্ষাও লাভ করি। বস্তুত প্রত্যেককে নিজের পথ নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে, এবং এতে আমরা যত কম উদ্‌বিগ্ন হব, তত শীঘ্রই আমাদের সফলতাপ্রাপ্তি হবে : *সাধারণত এক দীর্ঘ পরিশ্রমের প্রয়োজনবোধ করে এমন কোনো এক প্রণালী এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি আরম্ভ করতে পারে, ও একেবারে আরম্ভেও বিধৃত হতে পারে পরম নীরবতার এক দ্রুত হস্তক্ষেপ বা আবির্ভাবের দ্বারা, আরম্ভে ব্যবহৃত সাধনের তুলনায় যার ফল অনুপাতের বাইরেই হবে। আরম্ভ একটা প্রণালীতে করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি যাঁর প্রতি আস্পৃহান্বিত হয়, তাঁরই কৃপা, ঊর্ধ্বের কৃপা, কিংবা পরমাত্মার অসীমতার এক আকস্মিক অন্তঃপ্রবেশ কাজটি গ্রহণ করে নেয়। এই শেষ উপায়েই মনের পরম নীরবতা আমি পেয়েছিলাম, যা আমার প্রকৃত অনুভূতির পূর্বে আমার কল্পনার বাইরে ছিল।*[৪] এ এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ আমরা ভাবতে প্রলুব্ধ হতে পারি যে, এই যৌগিক অনুভূতিগুলো অনেক ভালো ও আকর্ষণীয়। কিন্তু তারা মোটামুটি আমাদের সাধারণ মানবতার বহুদূরে ; আমরা যেমন, তাতে কীভাবে আমরা কখনও সেখানে উপনীত হতে পারি? যে-সব সম্ভাবনা আমাদের অন্য এক আত্মচেতনার, আমাদের এখনকার আত্মচেতনার সম্ভাবনারাজি দিয়ে তাদের বিচার করা ভুল। যথার্থত শুধু এই ঘটনার জন্য যে আমরা এই পথে যাত্রা আরম্ভ করেছি, স্বতঃস্ফূর্তরূপে যোগ জাগরিত করে সুপ্ত সামর্থ্যসমূহ ও অদৃশ্যশক্তিরাজির এক সম্পূর্ণ পরিসরকে, যা আমাদের বহিঃসত্তার

সকল সম্ভাবনার নাগালের বহুদূরে ও যা-কিছু আমরা সাধারণত করতে পারি না, সে-সব করতেও সক্ষম : *বহির্মানস ও আন্তরসত্তায় নিহিত বিশেষ-কিছুর মধ্যে অবস্থিত পথটি পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ যৌগিক চেতনা ও তার সকল শক্তি পূর্ব হতেই তোমার পথে নিহিত আছে।*[৫] এবং এই পথটিকে পরিষ্কার করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল মনকে নীরব করা। আমরা জানি না আমরা কে, এবং আরও কম জানি আমরা কী করতে পারি বা পারি না।

কিন্তু ধ্যানের অনুশীলনই এ সমস্যার যথার্থ সমাধান নয় (যদিও তার প্রয়োজন রয়েছে প্রারম্ভিক গতিবেগ আহরণের জন্য), কারণ, আমরা এক আপেক্ষিক নীরবতা লাভ করলেও যখনই আমরা আমাদের কক্ষ বা নিভৃতনিবাসের বাইরে পদক্ষেপ করি, আমরা সোজা পড়ে যাই অভ্যাসগত হুলস্থূলের মধ্যে, ভিতর ও বাইরের, আন্তর-জীবন ও জাগতিক জীবনের চিরন্তন বিভেদের মধ্যে। আমাদের প্রয়োজন এক সমগ্র জীবন, আমাদের প্রয়োজন, আমাদের সত্তার সত্য অনুযায়ী জীবনধারণ, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত, শুধুমাত্র ছুটির দিনে নয়, বা নির্জনতায় নয়; নিভৃত তৃণভূমির পরিবেশে সানন্দ ধ্যান মোটেই এর সমাধান নয়। *আমাদের আধ্যাত্মিক একান্তবাসে আমরা কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে যেতে পারি, এবং পরবর্তী সময়ে, আমাদের পক্ষে কঠিন হতে পারে বহির্জগতে নিজেদের বিজয়ীভাবে প্রবাহিত করা এবং ঊর্ধ্বতর প্রকৃতি হতে আমরা যা-কিছু অর্জন করেছি তাকে জীবনে প্রয়োগ করা। যখন আমাদের অভ্যন্তরীণ জয়লাভের সঙ্গে এই বহিঃসাম্রাজ্যকে যোগ করতে চেষ্টা করব, তখন দেখা যাবে আমরা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে অতি বেশি অভ্যস্ত এবং জাগতিক স্তরে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। বহির্জীবন ও শরীরের রূপান্তরে এক বিরাট অসুবিধা হবে। অথবা আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের কর্ম আমাদের অন্তরের আলোকের অনুরূপ নয় : তা এখনও পুরোনো অভ্যস্ত ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করছে, এখনও পুরোনো সাধারণ অপূর্ণ প্রভাবগুলোকে মেনে চলছে ; আমাদের অভ্যন্তরের সত্য আমাদের বহিঃপ্রকৃতির অজ্ঞ যান্ত্রিকত্তা হতে এখনও পৃথক এক ব্যথাপূর্ণ দুরতিক্রম্য ব্যবধান দ্বারা।... মনে হয় যেন আমরা বাস করি অন্য এক বৃহত্তর ও সূক্ষ্মতর জগতে এবং জড় ও পার্থিব অস্তিত্বের উপর কোনো দিব্য কর্তৃত্ব নেই, বোধহয়, কোনোপ্রকারের কর্তৃত্বই নেই।*[৬] সেজন্য, একমাত্র সমাধান হল মনকে নীরব করবার অভ্যাস করা ঠিক সেইখানে, যেখানে তা সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হয় : রাস্তায়, সুড়ঙ্গের মধ্যে, কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র। পশ্চাদ্ধাবিত ও সর্বদা ত্বরান্বিত এক ব্যক্তির মতো দিনে চারবার একই জনাকীর্ণ রাস্তায় চলার পরিবর্তে আমরা সেখানে চলে যেতে পারি সচেতনভাবে, একজন জিজ্ঞাসুর মতো। কোনোরকমের আগ্রহ না-থাকা, ভাঙা রেকর্ডের মতো ক্লান্তিকর, অসংখ্য চিন্তার ভিড়ে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করে এক খামখেয়ালি জীবনযাপন করবার পরিবর্তে

আমরা নিজেদের চেতনার ইতস্ততবিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে একত্র সংগ্রহ করে প্রত্যেক মুহূর্তে সক্রিয় হতে পারি— নিজেদের উপর সক্রিয় হতে পারি। জীবন তখন আশ্চর্যজনকভাবে আকর্ষণীয় হতে পারে, কারণ সবচেয়ে ক্ষুদ্র ঘটনাচক্রগুলিও তখন বিজয়ের সুযোগে পরিণত হতে পারে— আমরা তখন গতিপথের নির্দেশ পাই, আমরা কোনো এক লক্ষ্যের অভিমুখে যাই, লক্ষ্যহীন হয়ে চলার পরিবর্তে।

কারণ যোগ কোনো কিছু করবার পথ নয়, কিছু হওয়ার পথ।

পরিবর্তন

তাহলে, আমরা অন্য এক দেশের সন্ধান করছি। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব, যে-দেশ আমরা পিছনে ছেড়ে যাচ্ছি, এবং যে-দেশে আমরা এখনও উপনীত হই নি, তাদের মধ্যে রয়েছে এক অস্বস্তিকর অঞ্চল যা কোনো দেশেরই নয়। এ এক পরীক্ষার সময় যার দীর্ঘতা নির্ভর করে আমাদের নিজেদের সংকল্পের দৃঢ়তার উপর। কিন্তু আমরা যা জানি, স্মরণাতীত সময় হতে, প্রাচ্য মিশরীয় বা অর্ফিক্ [Orphic] দীক্ষা থেকে শুরু করে পবিত্র গ্রেইল [Holy Grail]-এর জিজ্ঞাসা পর্যন্ত, মানুষের আরোহণের কাহিনী সব সময়ই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। অতীতে সেসব ছিল কল্পনাসমৃদ্ধ ; সে যাই হোক, বংশীধ্বনির মধ্যে নিজেকে প্রস্তর-সমাধিতে আবদ্ধ রাখায় বা চিতার চারধারে নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করায় কী কঠিনতা আছে? প্রস্তর সমাধি আজ সর্বসাধারণ হয়ে গেছে, এবং কিছু মানুষের জীবনও একপ্রকারের সমাধি। সুতরাং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টাতেই সার্থকতা আছে। তাছাড়া, চারধারে ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করে দেখলে ক্ষতির বিশেষ কিছু নেই।

এই পরিবর্তনের প্রধান সমস্যা হল অন্তর্নিহিত শূন্যতা। প্রবল মানসিক উত্তেজনায় জীবনযাপন করে, আমরা সহসা অনুভব করি যেন এক ভীষণ অসুস্থতা হতে আরোগ্যলাভ করছি, কিছুটা অনিশ্চিতভাবে, মাথার মধ্যে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি নিয়ে, যেন এই জগৎ ভয়ানকভাবে কোলাহলময় ও ক্লান্তিকর। আমরা চরমভাবে সংবেদনশীল হয়ে পড়েছি, সব-কিছুর সঙ্গে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আক্রমণকারী লোকেদের সঙ্গে, ভারি ভারি জিনিসের সঙ্গে, নৃশংস ঘটনাবলীর ধাক্কা খাওয়ার একটা ছাপ আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে— জগৎটা বিরাটরূপে অলীক প্রতীয়মান হয়। এ হল অন্তর্মুখীনতার আরম্ভের এক নিশ্চিত চিহ্ন। তথাপি, আমরা যদি সচেতনভাবে অন্তরে অবতরণ করবার চেষ্টা করি, তাহলে সেখানেও শূন্যতাই আমরা পাই, একপ্রকার অন্ধকার কূপ বা আকারহীন নিরপেক্ষতা ; যদি আমরা অবতরণ করবার জন্য জোর করি, হঠাৎ আমরা ঘুমিয়েও পড়তে পারি,

কয়েক সেকেণ্ড-এর জন্য, দুমিনিট-এর জন্য, কখনও কখনও আরও বেশি সময়ের জন্য— বস্তুতঃ এ সাধারণ নিদ্রা নয়, আমরা শুধু অন্য এক চেতনায় প্রবেশ করি, কিন্তু এখনও দুটোর মধ্যে কোনো সংযোগ স্থাপিত হয় নি। এবং যখন আমরা বেরিয়ে আসি তখন আপাতদৃষ্টিতে প্রবেশের সময় থেকে নিজেদের অধিকতর আলোকিত মনে হয় না। পরিবর্তনকালীন এই অবস্থা সহজেই আমাদের নিয়ে যেতে পারে একপ্রকার অদ্ভুত শূন্যবাদের দিকে ; বাইরে কিছু নেই, কিন্তু ভিতরেও কিছু নেই। কোনো দিকেই কিছু নেই। এবং এইখানেই আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে, একবার যখন আমরা আমাদের বাইরের মনের গঠন ভেঙে ফেলেছি, তখন যেন আবার একটা মিথ্যা গভীরতার মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে যাই, অন্য একটি গঠনের অধীনে, যা হতে পারে অদ্ভুতভাবে মায়াবাদী, কিংবা সংশয়বাদী, এমন-কি বিদ্রোহীসুলভও। আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত। একবার যখন যোগ আরম্ভ করেছি, আমাদের উচিত শেষপর্যন্ত যাওয়া, তাতে ফল যাই হোক-না-কেন, কারণ আমরা যদি একবার সূত্রটি হারিয়ে ফেলি, তাহলে খুঁজে আর নাও পেতে পারি। বস্তুত পরীক্ষাটি সেইখানেই। অন্বেষীর নিশ্চয় সহজভাবে বোঝা উচিত যে, তিনি অন্য-কিছু-একটায় জন্মগ্রহণ করছেন এবং তাঁর নতুন চোখ, নতুন ইন্দ্রিয়গুলো এখনও তৈরি হয় নি, জগতে সদ্য আবির্ভূত এক নবজাত শিশুর মতো। প্রকৃপক্ষে, এ এক হ্রাসপ্রাপ্ত চেতনা নয়, বরং এ এক নতুন চেতনায় পরিবর্তন : *পাত্রটিকে বিশুদ্ধ ও শূন্য রাখতে হবে, দিব্য অমৃতধারার বর্ষণের জন্য।*[৭] এমন অবস্থায় আমাদের একমাত্র উপায় হল আমাদের অভীপ্সাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা, এবং তাকে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেওয়া, ঠিক এইসব ভয়ংকর অভাবের মধ্য দিয়ে, এক জ্বলন্ত অগ্নির মতো যার মধ্যে আমরা নিক্ষেপ করি আমাদের সকল পুরোনো বস্তু, আমাদের পুরোনো জীবন, আমাদের পুরোনো সকল ধারণা, আমাদের সকল আবেগ— শুধু এক অটল বিশ্বাস নিয়ে যে, এই পরিবর্তনের শেষে, একটি দ্বার উন্মুক্ত হবে। এবং আমাদের বিশ্বাস নির্বোধ নয়, এ এক অন্ধবিশ্বাসময় বোকামি নয়, বরং এক *পূর্বজ্ঞান,* আমাদের মধ্যে এমন কিছু যা আমরা জানবার পূর্বেই জানতে পারে, আমরা দেখবার পূর্বেই দেখতে পারে, যা তার দিব্যদৃষ্টিকে উপরিভাগে পাঠায় এক প্রয়োজন, এক অন্বেষণ, এক ব্যাখ্যাহীন বিশ্বাসের আকারে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : *বিশ্বাস এক স্বতঃস্ফুরণ যা শুধু অনুভবের অপেক্ষায় নেই নিজের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য, বরং যা নিয়ে যায় অনুভবের অভিমুখে।*[৮]

শক্তির অবতরণ

ধীরে ধীরে শূন্যস্থানটি পূর্ণ হয়ে আসে। প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবলোকন ও অনুভূতির এক ক্রম আমাদের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়, যাকে যুক্তির অনুবর্তী-ক্রমে উপস্থাপিত করা ভুল হবে। কারণ, যে মুহূর্তে আমরা পুরোনো জগৎ পরিত্যাগ করি, সব-কিছুই সম্ভব বলে আমরা দেখি, এবং সর্বোপরি, কোনো দুটো ঘটনাই একরকমের হয় না— সকল আধ্যাত্মিক মতান্ধতার ভুলের এই হল কারণ। শুধু অনুভূতির কিছু স্থূল রেখাচিত্রই আমরা অঙ্কিত করতে পারি।

প্রাথমিকভাবে, প্রশান্তি যখন চূড়ান্ত নীরবতা আনতে অসমর্থ হয়, অথচ অপেক্ষাকৃত ভালোভাবেই মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন আমাদের আস্পৃহা বা আমাদের প্রয়োজন বৃদ্ধিলাভ করে ও হয়ে যায় বিরামবিহীন, উত্থিত হয় বারংবার, একটা ছিদ্রের মতো যা আমাদের মধ্যে আমরা বহন করি, তখন আমরা লক্ষ্য করি একটা প্রথম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার, যা অকলনীয়রূপে ফলপ্রসূ আমাদের যোগের অবশিষ্ট অংশে। আমাদের মস্তকের চতুর্দিকে, বিশেষত গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে আমরা একপ্রকার অসামান্য চাপ অনুভব করি, যা হয়তো মাথাব্যথার এক মিথ্যা অনুভব দিতে পারে। প্রারম্ভে, আমরা মোটেই অনেক সময় ধরে তা সহ্য করতে পারি না, এবং তখন আমরা তা দূর করি ঝাঁকুনি দিয়ে, নিজেদের অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত করি বা "অন্য কিছু চিন্তা করি"। ক্রমে ক্রমে এই চাপ এক স্পষ্ট রূপ ধারণ করে, এবং আমরা সত্যই এক *অবতরণশীল* প্রবাহের অনুভূতি পাই— এক শক্তির প্রবাহ, অস্বস্তিকর বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো নয়, বরং এক তরল পুঞ্জীভূত শক্তির মতো। তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আরম্ভের সেই "চাপ" বা মিথ্যা মাথাব্যথা এই শক্তির অবতরণের বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদের বাধারই পরিণতি, এবং একমাত্র করণীয় হচ্ছে মাথার মধ্যে প্রবাহটিকে বাধাপ্রদান করে গতিপথটিকে অবরোধ না করে, বরং আমাদের সকল স্তরে, উচ্চতম হতে নিম্নতম পর্যন্ত, অবতরণ করবার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া। প্রথমে প্রবাহটি কিছুটা আকস্মিক ও অনিয়মিত থাকে, এবং যখন এ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়, পুনর্বার এর সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য স্বল্পসচেতন প্রয়াস করবার প্রয়োজন হয়; তারপর এ প্রবাহিত হয় অবিরত, স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এক নবীন শক্তির সুখদ সংবেদন প্রদান করে, যেন অন্য একপ্রকার শ্বাসক্রিয়া, যা আমাদের শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া হতেও বিশালতর, যা আমাদের করে আচ্ছাদিত, স্নাত, যা আমাদের করে দেয় আরও হালকা, এবং তা সত্ত্বেও আমাদের ভরে দেয় শক্তিতে। এক শারীরিক অনুভব হয়, ঠিক যেন বাতাসের প্রবাহে পদচারণা করছি। বস্তুত এর প্রকৃত প্রভাব উপলব্ধি করতে পারি না (কারণ, অতিধীরে, অত্যল্প মাত্রায় এ স্থিতিশীল হয়), যে পর্যন্ত না কোনো এক কারণে— চিত্তবিক্ষেপ, ত্রুটি বা আতিশয্য— আমরা

স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি নিজেদের। তখন হঠাৎ নিজেদের বোধ করি শূন্য, সংকুচিত, যেন অক্সিজেনের অভাব, সঙ্গে এক প্রবল নিরানন্দময় ধারণা, যেন শারীরিকভাবে জীর্ণ কুঞ্চিত হয়ে গেছি : আমরা যেন এক পুরোনো আপেল, যার ঔজ্জ্বল্য ও রস নিষ্কাশিত হয়ে গেছে। এবং আমরা সত্যই বিস্ময় বোধ করি, কেমন করে আমরা এর পূর্বে তার অভাবে জীবনযাপন করছিলাম। এই আমাদের সকল শক্তির প্রথম রূপান্তর। আমাদের চতুর্দিকে ও নিম্নে, বিশ্বময় জীবনের সাধারণ উৎস হতে, শক্তি আহরণ করবার পরিবর্তে আমরা তখন ঊর্ধ্ব হতে আহরণ করি। এবং এ এক অধিকতর বিশুদ্ধ শক্তি, অধিকতর স্থায়ী, অবিচ্ছিন্ন এবং অধিকতর সতেজ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের কাজের মধ্যে, আমাদের সহস্র ব্যাপৃতির মধ্যে, শক্তিপ্রবাহটি প্রথমে কিছু পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, কিন্তু যখন আমরা এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চল ও একাগ্র হই, তখন এক বিপুল প্রবাহের প্রবেশ ঘটে। সব-কিছু স্থির হয়ে যায়। কলসীর মতো কানায় কানায় আমরা পূর্ণ হয়ে যাই। "স্রোতের" অনুভবটি অন্তর্হিত হয়ে যায়, যেন সমগ্র শরীরে, আপাদমস্তক, সঞ্চারিত হয় কে শক্তিপুঞ্জ, যা যুগপৎ ঘনসন্নিবিষ্ট ও স্ফটিকতুল্য (শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, *এক দৃঢ় সুশীতল ঘনীভূত প্রশান্তি*[৯])। এবং যদি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হতে আরম্ভ করে, তাহলে আমরা দেখতে পাব, সব-কিছু নীলাভ ; আমরা অ্যাকোয়ামেরিন-এর মতো— এবং বিশাল, কত বিশাল। প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ। এবং সঙ্গে সেই অবর্ণনীয় সতেজতা। সত্যই আমরা ঝাঁপ দিয়েছি পরম উৎসের মাঝে। কারণ এই "অবরোহী শক্তি" পরমাত্মারই শক্তি—*শক্তি*। আত্মিক শক্তি শুধু একটি শব্দমাত্র নয়। চূড়ান্ত অবস্থায়, এর অনুভবের জন্য আমাদের চোখ বন্ধ করে বহির্জগৎ হতে প্রত্যাহৃত হওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যেক মুহূর্তে আছে এর উপস্থিতি, আমরা যা-কিছুই করি-না-কেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়া বা পড়াশুনো, বা কথা বলার মধ্যেও, এবং আমরা দেখতে পাই, আমাদের শরীর যতই এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, এ ততই অধিক হতে অধিকতর তীব্রতা ধারণ করে। বস্তুত এ এক ভীতিসঞ্চারকারী শক্তিপুঞ্জ, যা সীমায়িত শুধু আমাদের গ্রহণশীলতা বা ক্ষমতার ক্ষুদ্রতার জন্য।

এই অবরোহী শক্তির অনুভূতির বিষয়ে উল্লেখ করবার সময়ে শিষ্যেরা একে যখন "শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার শক্তি" বলে অভিহিত করেন, তখন তাঁদের বলার উদ্দেশ্য মোটেই থাকে না যে, তা শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু অজ্ঞাতসারে এই সত্য প্রকাশ করেন যে, কোনো পরিচিত যোগে এর তুলনীয় কিছু নেই। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ ও অন্যান্য যোগের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, এখানে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে তার ঈষৎ উল্লেখ করছি। শ্রীঅরবিন্দের যোগের পূর্বের অন্যান্য যোগপদ্ধতি যদি আমরা পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে আমরা এক অপরিহার্য ব্যবহারিক পার্থক্য লক্ষ্য করব : কিছু সময় পরে, আমাদের

অনুভূতি হয় এক *আরোহী* শক্তির (ভারতে যা *কুণ্ডলিনী* নামে পরিচিত), যা সহসা জাগরিত হয় আমাদের সত্তায়, মেরুদণ্ডের মূলে, এবং আরোহণ করে স্তর হতে স্তরে, মস্তকের ঊর্ধ্বতম প্রদেশে উপনীত হওয়া পর্যন্ত, যেখানে, মনে হয়, তা এক দীপ্তিমান ভাস্বর-স্পন্দনরূপে প্রস্ফুটিত হয়, এক তীব্রতর সংবেদন সহকারে (কখনও কখনও চেতনার অবলোপ বা "সমাধির" সঙ্গে), যেন আমরা আবির্ভূত হয়েছি এক শাশ্বত অন্যত্র। সকল যৌগিক পদ্ধতি, যাদের আমরা বলতে পারি তপোৎপাদক— হঠযোগের আসন, রাজযোগের একাগ্রতা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলনী বা *প্রাণায়াম* ইত্যাদি— তাদের লক্ষ্য হল এই আরোহী শক্তির জাগরণ। সেসব বিপন্মুক্ত নয়, এবং গভীর বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে, যার জন্য একজন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত গুরুর উপস্থিতি ও সংরক্ষণ অপরিহার্য হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমরা পরে আবার আলোচনা করব। স্রোতের গতিপথের এই যে পার্থক্য— আরোহী বা অবরোহী— তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে লক্ষ্যের পার্থক্যের, যার উপর যতই জোর দেওয়া হোক তা অত্যধিক হয় না। পরম্পরাগত যোগসমূহ এবং, আমাদের ধারণায়, পাশ্চাত্যের ধর্মানুশাসনগুলির মুখ্য লক্ষ্য হল চেতনার মুক্তি : সমগ্র সত্তাটি ঊর্ধ্বে উপনীত হয়, এক আরোহী আস্পৃহায়, সকল প্রতীয়মানতা বিদীর্ণ করে, ঊর্ধ্বে, প্রশান্তি বা পরমানন্দে, আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে। এজন্যই আরোহী শক্তির জাগরণ। অপরপক্ষে, আমরা যা বুঝেছি, শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য শুধু আরোহণ নয়, অবরোহণও, শুধু শাশ্বত প্রশান্তির মধ্যে ছুটে যাওয়া নয়, প্রাণ ও জড়কে রূপান্তর করাও ; তার শুরু এই ছোটো প্রাণ, ও জড়ের এই ছোটো অংশে, যা নিয়ে আমরা। এইজন্য অবরোহী শক্তির এই জাগরণ, বা এই প্রতিবেদন। অবরোহী স্রোতকে অনুভব করাই হল রূপান্তরকারী শক্তিকে অনুভব করা। এই শক্তিই আমাদের জন্য যোগের সাধনা করবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে (যদি আমরা তা হতে দিই), এই শক্তিই স্থানগ্রহণ করবে আমাদের শীঘ্র-নিঃশেষিত কর্মশক্তিরও অপটু প্রয়াসের, এই শক্তিই সেখানে আরম্ভ হবে যেখানে অন্যান্য যোগের সমাপ্তি হয়, এবং আলোকিত করবে প্রথমে আমাদের সত্তার শীর্ষদেশকে, তারপর অবতরণ করবে স্তর হতে স্তরে, নম্রভাবে, শান্তভাবে, দুর্নিবারভাবে (এ কখনোই হিংস্র নয়, তা উল্লেখনীয়, এবং এর প্রাবল্য আশ্চর্যজনকভাবে পরিমিত, যেন পরমপুরুষের প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষভাবে একে পরিচালিত করে), এই শক্তিই আমাদের সমগ্র সত্তাকে নিম্নতমস্তর পর্যন্ত, বিশ্বময় করে দেবে। এই হল পূর্ণযোগের মৌলিক অনুভূতি।

যখন প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই ঊর্ধ্বতর বা দিব্যশক্তি ঊর্ধ্ব হতে অবতরণ করতে পারে এবং আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হতে পারে। সাধারণত প্রথমে তা মস্তকে অবতরণ করে আন্তর-মানস-কেন্দ্রসমূহকে মুক্ত করে দেয়। তারপর অবতরণ করে হৃৎকেন্দ্রে, তারপর নাভিকেন্দ্রে ও অন্যান্য প্রাণময়

কেন্দ্রসমূহে, তারপর মূলাধারে (ত্রিকাস্থি অঞ্চলে) ও নিম্নে। যুগপৎভাবে এ কাজ করে পূর্ণতার জন্য ও মুক্তির জন্য; সমগ্র প্রকৃতিকে এ ভিন্ন ভিন্ন অংশে নিয়ে কাজ করে, যা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তাকে প্রত্যাখ্যান করে, যা ঊর্ধ্বায়িত করতে হবে তাকে ঊর্ধ্বায়িত করে, যা সৃষ্টি করতে হবে তা সৃষ্টি করে। এ পূর্ণ করে, সমন্বিত করে, প্রকৃতিতে সৃষ্টি করে এক নতুন ছন্দের।[১০]

জ্ঞানেব নতুন পথেব অভ্যুদয

মনের নীরবতার সঙ্গে আরও একটি ব্যাপার সংঘটিত হয় যার অনেক গুরুত্ব আছে, কিন্তু যা অনেক কঠিন উপায়েই চিহ্নিত হতে পারে, কারণ কখনও কখনও এ বহু বছর ধরে ব্যাপ্ত থাকে, এবং এর লক্ষণগুলো প্রথম দিকে লক্ষ্য করা যায় না। আমরা একে বলতে পারি জ্ঞানের নতুন পথের অভ্যুদয়, এবং সেজন্য কর্মের নতুন পথের অভ্যুদয়।

আমরা বুঝতে পারি, মনকে নীরব করা সম্ভব হতে পারে, ভিড়ের মধ্যে, পায়ে চলার সময়ে, আহার, স্নান বা বিশ্রামের সময়ে, কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব নিজের ডেস্কে কাজের সময়ে, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার মাঝে? চিন্তা করা, স্মরণশক্তিকে আমন্ত্রণ করা, ধারণার অন্বেষণ করা, সকল প্রকারের মানসিক প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করা এসব আমরা বন্ধ করতে পারি না, পারি কি? তা সত্ত্বেও, অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের শেখায় যে তা অপরিহার্য নয়; তা শুধু পরিণতি এক দীর্ঘ বিবর্তনের, যার মধ্যে আমরা জ্ঞান ও কর্মের জন্য মনের উপর নির্ভর করতে অভ্যাস করে ফেলেছি; কিন্তু তা *অভ্যাস* ছাড়া বেশি কিছু না এবং এর পরিবর্তন করা যেতে পারে। বস্তুত যোগ যতটা শিক্ষার এক পথ নয়, তার চেয়ে বেশি এ এক পথ অপরিহার্য-মনে-হওয়া, জান্তব-বিবর্তনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অভ্যাসের এক সমষ্টিকে বিদূরিত করবার।

সাধক যদি মনকে নীরব করবার উদ্যম করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কার্যরত অবস্থায়, তাহলে তাঁকে অনেকগুলো স্তর দিয়ে যেতে হবে। প্রথমে, সময়ে সময়ে তিনি তাঁর আস্পৃহাটিকে স্মরণে রাখতে কোনোরকমে সমর্থ হন, এবং যথার্থ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যটি আবার অধিকার করবার জন্য এক মুহূর্তের জন্য তিনি তাঁর কাজ বন্ধ করেন, সব-কিছু আবার সম্পূর্ণভাবে রুটিনের মধ্যে গ্রাসিত হয়ে যাওয়ার পূর্বে। কিন্তু যখন এই প্রচেষ্টাটি তিনি অন্যত্র করবার অভ্যাস শুরু করেন, রাস্তায় কিংবা ঘরে, সর্বত্র, তাঁর প্রচেষ্টার গতিবেগ নিজেকে বজায় রাখতে চায় ও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়, অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যান্য কাজের মধ্যে— তিনি স্মরণ করেন, প্রায়ই ক্রমবর্ধমানভাবে। তখন এই স্মরণের বৈশিষ্ট্যটিও পরিবর্তিত হয়ে যায়, ক্রমশ আসল ছন্দের সঙ্গে সুর বাঁধবার জন্য স্বেচ্ছাকৃত ধারাবাহিকতা

ভঙ্গ করবার পরিবর্তে, সাধক অনুভব করেন তাঁর অন্তরের গভীরে কিছু-একটা *জীবন্ত,* তাঁর সত্তার পশ্চাদ্‌ভূমিতে, যেন একটা ছোটো চাপা স্পন্দন ; তাঁকে শুধু তাঁর চেতনায় অন্তরালে চলে আসতে হবে নীরবতার স্পন্দনটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য, যে-কোনো সময়ে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে। তিনি আবিষ্কার করেন সেখানে তার স্থিতি, শাশ্বত স্থিতি, যেন পশ্চাদ্‌ভূমিতে এক নীলাভ গভীরতা, যেখানে ইচ্ছা করলে তিনি নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, কোলাহল ও সমস্যার মধ্যেও বিশ্রাম নিতে পারেন, এবং নিজের মধ্যেই তিনি বহন করে চলেছেন প্রশান্তির এক অলঙ্ঘ্য নিভৃত নিবাস।

শীঘ্রই, অন্তরালবর্তী এই স্পন্দন অধিক হতে অধিকতর স্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন হয়, এবং সাধক অনুভব করেন তাঁর সত্তায় এক *বিভাজন* সৃষ্টি হচ্ছে : এক নীরব গভীরতা যা অন্তরালে নিরন্তর স্পন্দনশীল, এবং এক যথেষ্ট ক্ষীণ বহির্ভাগ যেখানে ক্রিয়াশীল হয় সকল কার্যকলাপ, চিন্তন, ইঙ্গিত ও শব্দ। তিনি আবিষ্কার করেছেন নিজের অন্তঃস্থিত সাক্ষীকে, এবং যতদূর সম্ভব কম জড়িত করবেন নিজেকে বাইরের খেলায়, যা অক্টোপাস-এর মতো আমাদের জীবন্ত গ্রাস করবার জন্য অবিরতভাবে প্রয়াসরত। এই আবিষ্কারটি ঋগ্‌বেদের মতোই প্রাচীন :

"সুন্দর পক্ষযুক্ত বিহঙ্গদ্বয়, সখা ও সহযোগী, একই বৃক্ষে সংলগ্ন, একজন স্বাদুফল আহার করে, অন্যজন তাকে নিরীক্ষণ করে এবং আহার হতে বিরত থাকে।" (ঋগ্‌বেদ ১.১৬৪.২০)

অপেক্ষাকৃত সহজ হয় এই অবস্থায় হস্তক্ষেপ করা— প্রথমে ঐচ্ছিক ভাবে —এবং মানসিক চিন্তন, স্মরণ, গণনা এবং যোজনার পুরোনো অভ্যাসের পরিবর্তে এই স্পন্দনশীল গভীরতার সঙ্গে নীরবে সম্পর্কস্থাপন করা। কার্যত, পরিবর্তনের এ এক দীর্ঘসময়, এবং সঙ্গে অবনতি ও অগ্রগতি (যদিও অনুভূতিটি ততটা অবনতি বা অগ্রগতির নয়, যতটা কোনো-কিছু-একটার পর্যায়ক্রমে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত হওয়ার) ; দুটি কার্যধারা পরস্পরের মুখোমুখি হয়, পুরোনো মানসিক পদ্ধতিগুলো অবিরতভাবে হস্তক্ষেপ করতে ও পুরোনো অধিকারগুলো ফিরে পেতে চায়, এবং প্রয়াস থাকে আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাবার জন্য যে আমরা তাদের ছাড়া চলতে পারব না ; তারা তাদের প্রধান অবলম্বন পায় আমাদেরই অন্তর্নিহিত একপ্রকারের অলসতায় যা "গতানুগতিক" আচরণকেই অধিকতর সুবিধাজনক ভাবে। পক্ষান্তরে বিভাজনের এই কার্যটি প্রবলভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, প্রথমত, অবরোহী শক্তির অনুভূতি দ্বারা যে-শক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অক্লান্তভাবে সুবিন্যস্ত করে আমাদের ভবনটিকে, ও কর্মসাধনের অবাধ্য উপায়গুলির উপর প্রয়োগ করে এক শান্ত চাপ, যেন প্রত্যেক চিন্তাতরঙ্গকে অধিকার করে তাকে যথাস্থানে নিশ্চল করে রাখা হয়, এবং দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমানরূপে উপলব্ধি-যোগ্য সহস্র সহস্র ছোটো ছোটো অনুভূতির পুঞ্জীভবন দ্বারা, যে অনুভূতি আমাদের

দেখিয়ে দেয় ও স্পষ্ট অভিজ্ঞতা দেয় যে, আমরা বেশ ভালোভাবেই মনের উপর নির্ভর না করে চলতে পারি, ও তার ব্যবহার বিনা প্রকৃতপক্ষে আরও ভালোভাবে চলি।

বস্তুত, আমরা ক্রমশ আবিষ্কার করি যে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই : অন্তরালবর্তী বা ঊর্ধ্বস্থ কিছু-একটা সব কাজই করে, এক নির্ভুলতা ও অব্যর্থতার সঙ্গে, যা বৃদ্ধিলাভ করে যতই আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অভ্যস্ত হই ; মনে রাখবারও কোনো প্রয়োজন হয় না, কারণ ঠিক ঠিক সূচনা চলে আসে যখনই তার প্রয়োজন হয় ; কাজের কোনো যোজনার প্রয়োজন হয় না, কারণ একটা গোপন উৎস তা আরম্ভ কবে দেয়, সে বিষয়ে আমাদের সংকল্প বা চিন্তা ব্যতীতই, এবং আমাদের দিয়ে ঠিক তাই করায় যা আমাদের করতে হবে, এক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি সহকারে, যা আমাদের অদূরদর্শী মনেব পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমবা যতই দেখি যে, আমরা যতই মেনে চলি এইসব অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত, এইসব সংকেতের ঝলক, ততই তারা হতে চায় পৌনঃপুনিক, স্পষ্ট, দুর্নিবার ও অভ্যস্ত, কিছুটা যেমন হতে পারে অন্তঃস্ফূর্তির কার্যধারা, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের সঙ্গে যে, আমাদের অন্তঃস্ফূর্তিগুলো প্রায় সব সময় আবিল ও বিকৃত হয়ে যায় মনের দ্বারা, যা এসবের অনুকরণ করতে প্রকৃতই উৎকর্ষ প্রদর্শন করে, এবং তার খেয়ালগুলিকে দিব্যশ্রুতি বলে ভুল করতে আমাদের বাধ্য করে অথচ এ ক্ষেত্রে বার্তাপ্রেরণ স্পষ্ট, নীরব ও ত্রুটিহীন, শুধু এই কারণে যে, মন এখন নির্বাক। আমাদের সকলেরই অনুভূতি আছে ঘুমের মধ্যে "রহস্যময়ভাবে" সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যায়, ঠিক যখন চিন্তার যন্ত্রটি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে, এই নতুন কার্যধারাটি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে অনেক বিভ্রান্তি ও পতন হবে, কিন্তু সাধকের প্রস্তুত থাকা উচিত মাঝে মাঝে ভুল করবার জন্য ; বস্তুত তিনি লক্ষ্য করবেন যে, ভুল সর্বদাই মনের অনধিকার প্রবেশের ফল : যখনই মন হস্তক্ষেপ করে, তখনই সে সব-কিছু বিশৃঙ্খল করে দেয়, বিখণ্ডিত করে দেয়, বিলম্বিত করে দেয়। অবশেষে একদিন, বারংবার পরীক্ষা ও বিভ্রান্তির পর, আমরা চূড়ান্তভাবে বুঝি ও নিজের চোখে দেখি যে, *মন জ্ঞানের যন্ত্র নয়, বরং জ্ঞানের সংগঠক*, যে-কথা শ্রীমা বলেছেন, এবং জ্ঞান অন্য কোনো স্থান* হতে আসে। মনের নীরবতায় শব্দ আসে, ভাষা আসে, কর্ম আসে— সবকিছু আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বিস্ময়কর নির্ভুলতা ও বেগের সঙ্গে। এ সত্যই অন্য এক জীবন-পন্থা, যা অনেক লঘুভার। কারণ, প্রকৃতপক্ষে, *এমন কিছুই নেই যা মন করতে পারে, অথচ মনের নিশ্চলতায় ও চিন্তাশূন্য স্থিরতায় তার চেয়ে বেশি ভালো করা যেতে পারে না।*[১১]

* এই অন্য কোনো স্থানের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব, 'অতিচেতনা'র অধ্যায়ে।

বিশ্বমানস

এ পর্যন্ত সাধকের অগ্রগতির বিষয়ে আমরা বিশ্লেষণ করেছি অন্তরের পরিভাষায়, কিন্তু এই অগ্রগতির অভিব্যক্তি বাইরের দিকেও হয়। বস্তুত অন্তর ও বাইরের এই বিভাজনটি ক্রমশ অধিকতরভাবে ক্ষীণ হয়ে যায়, এবং ক্রমে আরও মনে হয় যেন তা এক কিশোর মনের তৈরি এক কৃত্রিম রীতি, যে-মন নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ ও নিজেকে ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। সাধক অনুভব করেন এই বিভাজনটি ধীরে ধীরে তার কঠিনতা হারিয়ে ফেলে, তাঁর সত্তার গঠনেও একপ্রকার পরিবর্তন উপলব্ধি করেন তিনি। যেন তিনি হয়ে যান আরও হালকা, আরও স্বচ্ছ, আরও সরন্ধ্র। গঠনের এই পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি সচেতন হন প্রথমে অপ্রীতিকর লক্ষণের মাধ্যমে, কারণ সাধারণ মানুষ যখন সচরাচর স্থূল ত্বক দিয়ে সুরক্ষিত থাকে, সাধকের সেই সুরক্ষা আর থাকে না : সাধারণ লোকের চিন্তা, সংকল্প ও কামনা তিনি প্রাপ্ত হন তাদের সত্যরূপে ও তাদের সব নগ্নতায়, তাদের প্রকৃত স্বরূপে— প্রহার। এখানে আমরা নিশ্চয়ই জোর দিয়ে বলব যে, "মন্দ চিন্তা" বা "অশুভ সংকল্প"ই শুধু এই তীব্রতায় অংশগ্রহণ করে না, সদিচ্ছা, সূক্ষ্মতর অনুভূতি, পরার্থপরতার চেয়ে বেশি আক্রামক অন্য কিছুই নয়— উভয় দিকেই, তা হল অহং-এর পুষ্টিসাধন— শান্তভাবে, না-হয় বলপ্রয়োগে। আমরা সভ্য, শুধু উপরিভাগেই ; নিম্নদেশে, নরমাংসভোজী জীবিত আছে। সেজন্য আমরা যে শক্তির বর্ণনা করেছি তার অধিকারী হওয়া সাধকের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়— সেই শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সর্বত্র যেতে পারবেন। তাছাড়া, বিশ্বময় প্রজ্ঞা এমনই যে, যথার্থ সংরক্ষণ না নিয়ে এই স্বচ্ছতা আসবে না। তাহলে, "স্বীয়" শক্তি ও একটি নীরব মনের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাধক ক্রমে আবিষ্কার করেন যে, বাইরের সকল প্রভাবের প্রতি তিনি উন্মুক্ত, এবং তিনি গ্রহণশীল— সব দিক হতেই তিনি গ্রহণশীল— এবং সকল দূরত্ব অপ্রকৃত প্রতিবন্ধক : কেউ নেই বহুদূরে, কেউ চলে যায় নি, সব-কিছুই একত্র বিদ্যমান। সব-কিছুই যুগপৎ— দশ হাজার মাইল দূরে, তিনি পরিষ্কারভাবে গ্রহণ করতে পারেন কোনো বন্ধুর উদ্‌বেগ, কারও ক্রোধ বা কোনো ভাইয়ের যন্ত্রণা। সাধককে শুধু সেই স্থান বা ব্যক্তির সঙ্গে নীরবে সুরসমন্বয় করতে হবে, অবস্থার এক ন্যূনাধিক যথার্থ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি পাওয়ার জন্য— যার ন্যূনতা বা আধিক্য নির্ভর করে নীরবতার জন্য তাঁর সামর্থ্যের উপর। কারণ এখানেও মনই সব-কিছু কর্দমাক্ত করে, তার চিরাচরিত কামনা, ভয় ও ইচ্ছা দ্বারা, যার ফলে, যা-কিছু এ প্রত্যক্ষ করে, তা তৎক্ষণাৎ বিকৃত হয়ে যায়, এই কামনা, এই ভয় ও এই ইচ্ছার দ্বারা (অন্যান্য উপাদানও রয়েছে এই কর্দম সৃষ্টির জন্য, আমরা সে বিষয়ে পরে আসব)। এইভাবে, মনের নীরবতা নিয়ে আসে চেতনার এক বিস্তৃতি যা

স্বেচ্ছায় নিজেকে নিক্ষেপ করতে পারে বিশ্বময় অস্তিত্বের যে-কোনো বিন্দুতে, এবং যা জানার প্রয়োজন সে জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

এই নীরব স্বচ্ছতায় শীঘ্রই আমরা আরও একটি আবিষ্কার করি, যা তার তাৎপর্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাই, শুধু যে অন্যান্য লোকের চিন্তাই বাইরে থেকে আমাদের নিকট আসে, তাই নয়, আমাদের নিজেদের চিন্তাগুলোও সেই একই ভাবে আসে, *বাইরে থেকে।* একবার যথেষ্ট স্বচ্ছ হয়ে গেলে, আমরা মনের নিশ্চল নীরবতায় অনুভব করতে পারব। ছোটো ছোটো আবর্তনশীল ঘূর্ণি এসে আমাদের বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে, কিংবা স্বল্প স্পন্দন আমাদের লক্ষ আকর্ষণ করে, এবং যদি আমরা নিকটতরভাবে দৃষ্টিপাত করি "বিষয়টি কী জানবার জন্য", অর্থাৎ যদি আমরা সেই ঘূর্ণিগুলোর একটিকে ভিতরে আসতে দিই, তখন আমরা দেখি, আমরা নিজেরাই হঠাৎ কিছু-একটা ভাবছি : আমাদের সত্তার সীমানায় আমরা যার সন্ধান পেয়েছিলাম, তা এক চিন্তন তার অবিমিশ্র অবস্থায়, বা এক *মানসিক স্পন্দন* যা তখনও সময় পায় নি অলক্ষ্যে ভিতরে প্রবেশ ক'রে এক ব্যক্তিগতরূপে সজ্জিত অবস্থায় বাইরে প্রকাশিত হওয়ার, যার ফলে আমরা বিজয়দর্পে দাবি করতে পারি : "এ চিন্তাধারা *আমার"*। এইভাবেই একজন উত্তম মানসাধ্যয়নকারী অধ্যয়ন করতে পারেন কী চলছে এক ব্যক্তির ভিতরে, যার ভাষাও তাঁর অজানা, তার কারণ নয় যে, তিনি চিন্তাগুলোর সন্ধান পান, *তিনি সন্ধান পান স্পন্দনগুলোর, নিজের মধ্যে এক যথাযথ মানসিক আকার* যাদের তিনি প্রদান করেন। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নেই অত্যধিক বিস্ময়াভিভূত হওয়ার। কারণ আমরা নিজেরা যদি একটি একক বস্তুও সৃষ্টি করতে পারতাম, *এমন-কি ছোটো একটি চিন্তাও, তাহলে আমরা হয়ে যেতাম জগতের স্রষ্টা!* শ্রীমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *তোমার মধ্যে সে 'আমি' কোথায়, যে সব-কিছু সৃষ্টি করতে পারে?* শুধু প্রণালীটি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষকরণের বাইরে। প্রথম কারণ, সে বাস করে এক চিরন্তন কোলাহলে, এবং দ্বিতীয় কারণ, যে প্রণালীর মাধ্যমে স্পন্দনগুলি অধিকৃত হয়, তা প্রায় তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে তার শিক্ষা ও পরিবেশের মাধ্যমে বিশ্বমানস হতে এক যথেষ্ট সংকীর্ণ পরিসরের কিছু স্পন্দন চিরকালের মতো বেছে নেয়, যে-সবের সঙ্গে তার মিল থাকে ; এবং জীবনের অবশিষ্ট অংশ, সে সেই একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে সংযোগস্থাপন করবে, একই ধরনের স্পন্দনের পুনরাবৃত্তি করবে। বিভিন্ন মাত্রার ধ্বননশীল শব্দ এবং নবপ্রবর্তিত ভাষার মোড়ের সঙ্গে— তার খাঁচায় সে ঘুরবে ক্রমাগত। শুধু আমাদের ব্যবহৃত শব্দাবলীর ন্যূনাধিক চাকচিক্যময় পরিসরই আমাদের দিতে পারে প্রগতির এক বিভ্রান্তি। সত্যই আমরা আমাদের ধারণার পরিবর্তন করি, কিন্তু ধারণার পরিবর্তন করাই প্রগতি নয়, তা নয় কোনো অভ্যুত্থান স্পন্দনের কোনো ঊর্ধ্বতর বা দ্রুততর প্রণালীতে : সেই একই

পরিবেশের মধ্যে এ এক নতুন ডিগ্‌বাজি। সেজন্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন *চেতনার পরিবর্তনের* কথা।

একবার সাধক যখন দেখেন যে তাঁর চিন্তাগুলো বাইরে থেকে আসে, এবং তিনি শত শতবার সেই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করেছেন, তখন মনের সত্যকারের নিয়ন্ত্রণের চাবি তাঁর হাতে। কারণ, যে-সকল চিন্তা আমাদের মধ্যে সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা আমাদের বলে বিশ্বাস করি, সেসব থেকে অব্যাহতি পাওয়া কষ্টকর : কিন্তু তা সত্ত্বেও, যখন আমরা দেখি সেই চিন্তাই বাইরে থেকে আসছে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ হয়। একবার যদি আমরা নীরবতা আয়ত্তাধীন করি, তখন অবশ্যই আমরা হই মনোজগতের নিয়ন্ত্রক, কারণ চিরন্তনভাবে একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের পরিবর্তে আমরা তখন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমগ্র পরিসরের মধ্যে এক দ্রুত দৃষ্টিপাত করে আমাদের ইচ্ছানুসারে নির্বাচন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারি। যা হোক, শ্রীঅরবিন্দ নিজে এই অনুভূতির যে বর্ণনা করেছেন তা শোনা যাক ; তিনি এই অনুভূতি প্রথমে পেয়েছিলেন অন্য একজন যোগী ভাস্কর লেলের সান্নিধ্যে, যিনি তাঁর সঙ্গে তিনদিন অতিবাহিত করেছিলেন :

সকল উন্নত মনোময় মানুষ, যাঁরা সাধারণের ঊর্ধ্বে, কোনো-না-কোনো উপায়ে, কিংবা ন্যূনপক্ষে, কোনো-না-কোনো সময়ে ও কোনো উদ্দেশ্যে মনের দুই অংশকে পৃথক করতে বাধ্য হন, সক্রিয় অংশ যা চিন্তার এক কারখানা, এবং প্রশান্ত নিয়ন্ত্রক অংশ যা যুগপৎ এক সাক্ষী, এবং এক সংকল্পশক্তি, যা চিন্তাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে, বিচার করে, প্রত্যাখ্যান করে, পরিহার করে, গ্রহণ করে, সংশোধনের আদেশ দেয়, পরিবর্তিত করে, মানসভবনে প্রভু, স্বরাজ্যে, সাম্রাজ্যে কুশল। যোগী আরও দূরে অগ্রসর হন ; তিনি শুধু সেখানে নিয়ন্ত্রক নন, পরন্তু কোনো এক ভাবে মনের মধ্যে বাস করেও, তিনি যেন মন হতে বেরিয়ে যান, দাঁড়ান তার ঊর্ধ্বে বা ঠিক পশ্চাতে— মুক্ত। তাঁর জন্য চিন্তার কারখানার প্রতিরূপটি আর মোটেই যথার্থ নয় ; কারণ তিনি দেখেন যে চিন্তাগুলো বাইরে হতে আসে, বিশ্বমানস হতে বা বিশ্বপ্রকৃতি হতে, কখনও কখনও সাকার ও স্পষ্ট, কখনও বা আকারবিহীন, ও তারপর তাদের আকৃতিপ্রদান করা হয় আমাদেরই মধ্যে কোথাও। আমাদের মনের প্রধান কাজ হল এক স্বীকৃতিপূর্ণ উত্তর কিংবা প্রত্যাখ্যান, এসব চিন্তাতরঙ্গের প্রতি (এবং, এছাড়াও, প্রাণময় তরঙ্গ ও সূক্ষ্ম-শারীর-শক্তির তরঙ্গের প্রতিও) অথবা পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শক্তি হতে আগত চিন্তাগত উপাদানকে (কিংবা প্রাণিক গতিবৃত্তিকে) এক ব্যক্তিগত-মানস রূপ দেওয়া। এ কথা আমাকে দেখিয়েছেন লেলে, যাঁর প্রতি আমি গভীরভাবে ঋণী। "ধ্যানে বসো", তিনি বললেন, "কিন্তু চিন্তা কোরো না, তোমার মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করো : তুমি দেখবে চিন্তাগুলো মনের মধ্যে

প্রবেশ করছে। এগুলো মনের মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বেই এগুলো তোমার মন হতে দূরে ফেলে দাও, যে পর্যন্ত তোমার মন সম্পূর্ণ নীরবতায় সফল না হয়।" এর পূর্বে আমি কখনও শুনি নি যে চিন্তাগুলো দৃশ্য হয়ে বাইরে হতে মনের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু এই সত্যটিকে বা তার সম্ভাবনাকে প্রশ্ন করবার কথাও ভাবলাম না ; শুধু আমি বসে পড়লাম ও তাই করলাম। এক মুহূর্তে আমার মন নীরব হয়ে গেল, যেন এক উচ্চ পর্বতশিখরের প্রবাহবিহীন বায়ু, এবং তখন আমি দেখলাম একটা চিন্তা আসছে, তারপর অন্য একটা, বাস্তব রূপে বাইরে থেকে : তারা প্রবেশ করে মস্তিষ্ক অধিকার করতে পারবার পূর্বেই আমি তাদের ছুড়ে ফেলে দিলাম, এবং তিনটি দিনেই আমি হলাম মুক্ত। সেই মুহূর্ত হতে, মূলত, মানসসত্তা আমার মধ্যে হয়ে গেল এক মুক্ত ধী, এক বিশ্বমানস, চিন্তার কারখানার শ্রমজীবীর মতো ব্যক্তিগত চিন্তার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমায়িত নয়, কিন্তু যা অস্তিত্বের শত শত অঞ্চল হতে সমাগত জ্ঞানের গ্রহীতা, এবং এই বিশাল দৃশ্য সাম্রাজ্য ও চিন্তাসাম্রাজ্য হতে সংকল্প অনুযায়ী মনোনয়নে যা স্বাধীন।[১২]

সাধক আরম্ভ করেছিলেন এক ক্ষুদ্র মানসিক গঠনে যেখানে তিনি নিজেকে ভাবতেন সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যময় ও জ্ঞানালোকিত, কিন্তু এখন পিছনে তাকিয়ে বিস্মিত হন কীভাবে কখনও এমন এক কারাগারে জীবনযাপন করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে এই দেখে অভিভূত হয়ে যান যে, বছরের পর বছর তিনি জীবনযাপন করেছিলেন কীভাবে সকল অসম্ভবের পরিবেষ্টনীর মধ্যে, ও কীভাবে মানুষেরা বেঁচে থাকে নিষেধের অন্তরালে : "এটা তুমি করতে পারবে না, সেটা তুমি করতে পারবে না : এটা এই আইনের বিরোধী, সেই আইনের বিরোধী ; এটা অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক ; এটা অসম্ভব...।" এখন তিনি আবিষ্কার করছেন যে, সব-কিছুই সম্ভব, এবং প্রকৃত দুঃসাধ্যতা হল এই বিশ্বাস যে কোনো-কিছু দুঃসাধ্য। বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে এই মানসিক খোলসের মধ্যে একরকম চিন্তনশীল শামুকের মতো বাস করে, এখন তিনি শুরু করেছেন মুক্তভাবে নিশ্বাস নেওয়া।

তিনি আরও দেখতে পান যে, ভিতরের ও বাইরের যে চিরন্তন বিরোধ তার সমাধান হয়ে গেছে, এবং তা মানসিক কঠিনীভবনের এক অংশ। বস্তুত, "বহির্জগৎ" সর্বত্রই অন্তর্জগৎ! আমরা সর্বত্রই আছি! ভুল হল এ-কথা বিশ্বাস করা যে, আমরা যদি শান্তি, সৌন্দর্য ও রাখালী নির্জনতার আদর্শ পরিবেশগুলি একত্রীভূত করতে পারি, তাহলে সব-কিছুই খুব সহজ হয়ে যাবে— কিন্তু সবসময় কিছু একটা থাকবে যা আমাদের বিক্ষুব্ধ করবেই, সর্বত্র। সুতরাং আমরা আরও সংকল্প গ্রহণ করতে পারি আমাদের সকল গঠন ভেঙে ফেলবার ও সমগ্র বহির্জগৎকে অন্তরে গ্রহণ করবার— তাহলে আমরা সর্বত্রই স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব। কর্ম ও ধ্যানের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একবার যখন সাধক তাঁর মধ্যে নীরবতার প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর কর্মও তখন ধ্যান হয়ে যায় (তিনি এই সত্যের

আভাসও প্রাপ্ত হবেন যে ধ্যানও কর্ম হতে পারে) ; তিনি স্নানরত হতে পারেন বা নিজের কার্যে ব্যস্ত, শক্তি তাঁর মধ্যে অবিরত প্রবাহিত হচ্ছে। সবসময়ই তাঁর সুর বাধা "অন্যত্র"। অবশেষে, তিনি দেখবেন যে, তাঁর কর্ম হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, অধিকতর স্বচ্ছ-দৃষ্টিসম্পন্ন, অধিকতর ফলপ্রদ, অধিকতর শক্তিসম্পন্ন, অবশ্য তাঁর শান্তির সীমানায় অনধিকার প্রবেশ না করেই :

মানস সত্তার উপাদানটি নিশ্চল, এত নিশ্চল যে তাকে কিছুই বিক্ষুব্ধ করে না। যদি চিন্তা বা কর্ম আসে, তাহলে তারা মনকে পার হয়ে যায়, যেন এক ঝাঁক পাখি আকাশ পার হয়ে যাচ্ছে স্থির বায়ুর মধ্যে। তারা চলে যায়, কিছুই বিশৃঙ্খল করে না, কোনো চিহ্নও ছেড়ে যায় না। যদিও এক হাজার ছবি বা প্রচণ্ডতম ঘটনাবলীও অতিক্রম করে চলে যায়, সেই প্রশান্ত নিশ্চলতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যেন মনের প্রস্তুতিই হয়েছে প্রশান্তির এক শাশ্বত অবিনশ্বর উপাদান দিয়ে। যে মন এই প্রশান্তি পেয়েছে, সে কাজ আরম্ভ করতে পারে। এমন-কি, তীব্র ও প্রবল ভাবে, কিন্তু সে রাখবে তার মৌলিক স্থিরতা— নিজে কিছুই আরম্ভ করবে না, অথচ গ্রহণ করবে ঊর্ধ্ব হতে, তাকে এক মানসিক রূপ দেবে, নিজে কিছুই যোগ না করে, শান্তভাবে, আবেগশূন্যভাবে, অথচ সত্যের আনন্দ এবং তার অতিক্রমণের সহর্ষ সামর্থ্য ও আলোকের সঙ্গে।[১৩]

আমাদের কি মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীঅরবিন্দ তখন ভারতে এক বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে নেতৃত্বপ্রদান করছিলেন, ও এক গরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি করছিলেন?

৫

চেতনা

একবার শ্রীঅরবিন্দের এক শিষ্যের প্রয়োজন হল এক গম্ভীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার। তিনি লিখলেন উপদেশের জন্য এবং পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যখন প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলা হল "তাঁর চেতনার শিখর" হতে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যদেশীয় এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবলেন, কী হতে পারে এর অর্থ: এই 'চেতনার শিখর' কি চিন্তা করবার অতি কঠোর উপায়, একরকমের উৎসাহ যা সৃষ্ট হয় মস্তিষ্ক যখন উদ্দীপ্ত হয়ে যায় বা অন্য কিছু? কারণ, চেতনার একই প্রকার পশ্চিমে জানা আছে, যেখানে চেতনা সব সময়ই মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে একার্থবোধক বলে মনে করা হয় : আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি। সে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি : আপনি নিজেকে জগতের কেন্দ্রে স্থাপিত করছেন এবং চেতনার সুযোগ তাদেরই দিচ্ছেন যারা আপনার অস্তিত্বের ও অনুভবের পথে অংশগ্রহণ করে। কিছুদিন পূর্বেও পশ্চিমীরা বিস্মিত হতেন যে, কোনো ব্যক্তি পারস্যেরও হতে পারেন। তথাপি আমরা যদি বুঝতে ও আবিষ্কার করতে চাই চেতনা কী ও তার ব্যবহারপ্রণালী শিখতে চাই, তাহলে আমাদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে যেতেই হবে। মনের নীরবতা কিছু অংশে অর্জন করবার পর শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন : *মানসিক চেতনা শুধু মানবীয়*

পরিসীমার অন্তর্গত, যা চেতনার সকল সম্ভাব্য পরিসীমাকে নিঃশেষিত করে না, যেমন মানবীয় দৃষ্টি নিঃশেষিত করে না ধ্বনির সকল ক্রমবিন্যাসকে, কিংবা মানবীয় শ্রুতি নিঃশেষিত করে না ধ্বনির সকল ক্রমবিন্যাসকে— কারণ ঊর্ধ্বে ও নিম্নে অনেক কিছু রয়েছে, যা মানুষের দৃষ্টি ও শ্রুতির অগোচর। সুতরাং মানবীয় পরিসীমার ঊর্ধ্বে ও নিম্নেও চেতনার ক্রমবিন্যাস রয়েছে, যার সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের কোনো সংযোগ থাকে না ও তার কাছে নিশ্চেতন মনে হয় —অতিমানস বা অধিমানস এবং মনের নিম্নস্তরের সকল পরিসর।[১] *আমরা যাকে নিশ্চেতনা বলি তা শুধু অন্যচেতনা। যখন আমরা আমাদের বাহ্যচেতনা ও আমাদের পরিবেষ্টনীকে বিস্মৃত হয়ে আন্তর-চিন্তনে মগ্ন হয়ে যাই, বাস্তবিক, তার তুলনায় আমরা অধিকতর অচেতন হই না, যখন আমরা নিদ্রামগ্ন হই, বা আকস্মিকভাবে হতচেতন হই, কিংবা মাদক দ্রব্যে অভিভূত হই, অথবা "মৃত্যুলাভ" করি, বা অন্য কোনো অবস্থায় থাকি। যে-কেউ যোগের পথে অগ্রসর হয়েছে তার কাছে এ হল সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক কথা।*[২] শ্রীঅরবিন্দ আরও বলছেন : *আমরা যখন অগ্রগতি করে আমাদের ও বস্তুসকলের অন্তর্নিহিত আত্মার প্রতি জাগ্রত হই তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, উদ্ভিদে, ধাতব পদার্থে, অণুর মধ্যে, বিদ্যুতের মধ্যে ও জড়প্রকৃতির সব-কিছুতে এক চেতনা নিহিত আছে, এবং আমরা আরও দেখতে পাব যে বস্তুত, সব দিক দিয়ে মনের অপেক্ষা তা নিম্নতর অথবা অধিকতর সীমায়িত ধরনের নয়, বরং অনেক "অচেতন" রূপের মধ্যে তা প্রগাঢ়তর, দ্রুততর, তীব্রতর, যদিও বহিঃপ্রকাশে কম বিবর্তিত।*[২] সুতরাং শিক্ষার্থী যোগীর কাজ হল সচেতন হওয়া, সবদিকে, তাঁর সত্তার সকল স্তরে এবং বিশ্বময় অস্তিত্বের সকল স্তরে, শুধুই মানসিকভাবে নয় ; সচেতন হওয়া নিজের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে তথা বস্তুসকলের মধ্যে, জাগ্রত কিংবা সুপ্ত ; এবং সচেতন হতে শেখা, যা লোকেরা অভিহিত করে "মৃত্যু" নামে তার মধ্যেও, কারণ যতখানি সচেতন আমরা জীবনে হয়েছি, ততখানি সচেতন আমাদের মৃত্যুতেও হতে হবে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে যা বলেছেন তাই যে আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য, তা নয়। এমন-কি, তিনি দৃঢ়ভাবে আমাদের প্রেরণা দিচ্ছেন আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করবার জন্য। সেজন্য আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন ধরনকে— নিদ্রা, জাগরণ, বা "মৃত্যু"— আমাদের মধ্যে যা সংযুক্ত করে এবং যা আমাদের সক্ষম করে চেতনার অন্যান্য রূপের সংস্পর্শে আসবার জন্য, তার জট নিশ্চয়ই আমরা খুলব।

চেতনার বিভিন্ন কেন্দ্র

মনের নীরবতার উপর নির্ভরশীল আমাদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অনুসরণ

করে আমরা উপনীত হই কয়েকটি আবিষ্কারে, যা ক্রমশ আমাদেব ঠিক পথে নিয়ে যাবে। প্রথমে, আমরা দেখি, যে সাধারণ গোলমালের মধ্যে আমরা বাস করি তা ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যায় ; আমরা আরও স্পষ্টভাবে আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তরগুলিকে চিহ্নিত করতে আরম্ভ করি, যেন আমরা তৈরি কয়েকটি খণ্ডিত অংশ নিয়ে, যাদের প্রত্যেকের রয়েছে তার নিজের আলাদা ব্যক্তিত্ব ও এক স্বতন্ত্র কেন্দ্র ; এবং আরও উল্লেখনীয় এই যে প্রত্যেকের নিজের জীবন আছে, অন্যান্যদের থেকে স্বাধীন। এই বহুসুরের সংগীত— একে যদি আমরা তাই বলতে পারি, কারণ এ এক বেসুরো শব্দসমাহার— সাধারণত আমাদের নিকট হতে ছদ্মবেশে আবৃত হয়ে থাকে মনের শব্দ দিয়ে, যা বন্যাপ্লুত করে সব-কিছু অধিকার করে। আমাদের সত্তায় কোনো স্তরে, এমন কোনো গতি নেই, নেই এমন কোনো আবেগ, কোনো এমন কামনা, চোখের কোনো পলকের পতন, যাকে মন তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক অধিকার করে না এবং চিন্তার একটি প্রলেপ দিয়ে আবৃত করে না। অন্য ভাষায়, আমরা সব-কিছুই *মন দ্বারা প্রভাবিত* করে দিই। এবং আমাদের বিবর্তনে সেই হল মনের মহত্ত্বপূর্ণ উপযোগিতা : এ আমাদের সাহায্য করে আমাদের চেতন সত্তার উপরিভাগে নিয়ে আসতে আমাদের সত্তার সকল গতিবিধিকে, অন্যথায় যা রয়ে যাবে আকারবিহীন অবচেতন বা অতিচেতন ম্যাগ্‌মা*রূপে। এ আমাদের আরও সাহায্য করে এই অরাজকতায় শৃঙ্খলার কিছু সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করতে ; বিশ্রীভাবে হলেও এইসব ছোটো ছোটো সামন্তরাজ্যদের নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে সমন্বিত করে। কিন্তু এই কার্যে মন আমাদের কাছে আবৃত করে দেয় তাদের সত্যকারের বাণী ও কার্যকলাপ— সার্বভৌম কর্তৃত্ব উৎপীড়নে পরিণত হওয়ার জন্য অবশিষ্ট শুধু মাত্র একটি পদক্ষেপ। অধিমানস কার্যপ্রক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত, কিন্তু অতিচেতন বাণীসমূহের কিছু যদি পরিস্রুত হয়ে অবতরণ করতে কোনো রূপে সমর্থ হয়, তাহলে তা সেই মুহূর্তেই হয়ে যায় বিকৃত, মিশ্রিত ও অস্পষ্ট ; মনের নিম্নস্তরের প্রক্রিয়াগুলো হয়ে যায় ক্ষয়িষ্ণু, আমাদের বঞ্চিত করে সকল স্বতঃস্ফূর্ত বোধশক্তি হতে, যা আমাদের বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরে অনেক উপযোগী ছিল, এবং এখনও হতে পারত ; আমাদের সত্তার অন্যান্য লঘুতর অংশগুলি বিদ্রোহ করবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করে, এবং অবশিষ্ট অন্যান্য অংশ নীরবে তাদেব স্বল্প শক্তি সঞ্চিত করে প্রথম সুযোগের অপেক্ষায় আমাদের বিরোধ করবার জন্য। কিন্তু যে-সাধক মনকে নীরব করেছেন তিনি এইসব রাজ্যকে তাদের নগ্নস্বরূপে দেখতে আরম্ভ করবেন, তাদের মানসিক পরিধান ছাড়াই ; তাঁর সত্তার বিভিন্ন স্তরে তিনি অনুভব করবেন কয়েকটি কেন্দ্রীভূত বিন্দু, শক্তিময় গ্রন্থির মতো, তাদের প্রত্যেকেবই আছে এক নির্দিষ্ট

---

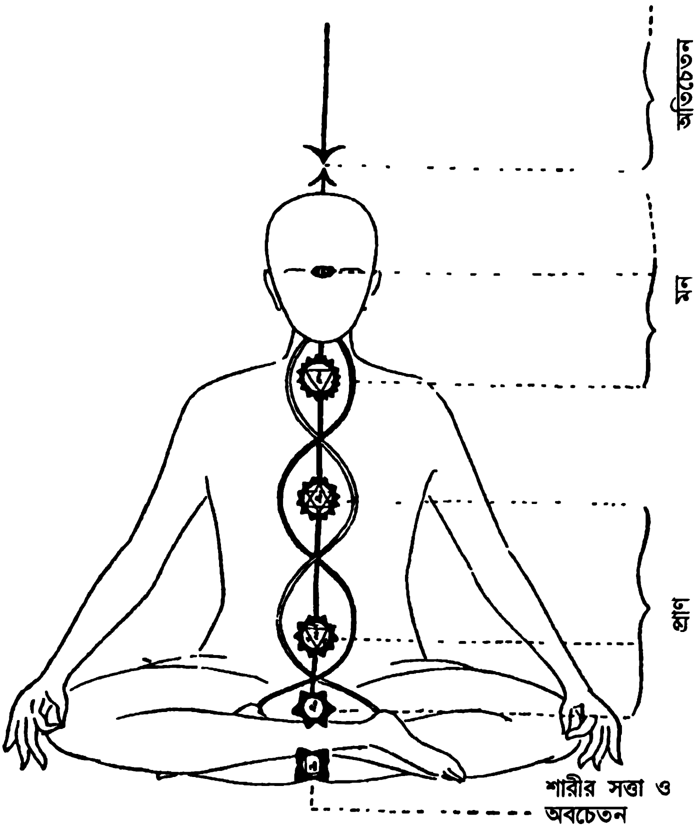
* ম্যাগ্‌মা (magma) : ভূগর্ভস্থ গলিত শিলা যা আগ্নেয়গিরির মুখে লাভা-রূপে নিঃসৃত হয়।

কম্পনময়·বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ স্পন্দন : উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো আবরণ সহসা ছিন্ন হওয়া প্রতীয়মান হয়, তখন হয় দিব্যপ্রকাশনের এক বিরাট স্পন্দন, এবং আমাদের দেখানো হয় সত্যের এক সমগ্র ক্ষেত্র, নিঃশব্দে, এমন-কি, সেই প্রকাশন কীভাবে রচিত তা ঠিক ভাবে না জেনেই— শুধু কিছু-একটা স্পন্দিত হয় যা জগৎকে করে অনির্বচনীয়ভাবে আরও প্রসারিত, আরও হালকা, আরও পরিষ্কার ; অথবা আমরা অনুভব করি দুর্বহতর স্পন্দন— ক্রোধের বা ভয়ের, কামনার, সহানুভূতির। এবং আমরা লক্ষ করেছি যে এইসব স্পন্দন অনুরণিত হয় বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন তীব্রতা নিয়ে। সুতরাং, আমাদের মধ্যে আছে স্পন্দনশীল গ্রন্থিসমূহের বা *চেতনার কেন্দ্রসমূহের* এক সমগ্র ব্যাপ্তি ; তাদের প্রত্যেকের আছে এক বিশেষ ধরনের স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য, যা আমরা চিনতে পারব ও সোজাসুজি উপলব্ধি করতে পারব, আমাদের নীরবতার মাত্রা ও প্রত্যক্ষকরণের তীব্রতার উপর নির্ভর ক'রে। মন শুধু এই কেন্দ্রদের মধ্যে একটি, স্পন্দনের একটি ধরন, চেতনার বিভিন্ন রূপের একটি, যদি তা প্রথম স্থানটি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

এইসব কেন্দ্রের যে বিবরণী আমরা ঐতিহ্যে প্রাপ্ত হয়েছি, তার উপর আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব না— স্বয়ং প্রত্যক্ষ করা তার চেয়ে ভালো— কিংবা তাদের যথাযথ অবস্থানের বিষয়েও না ; সাধক সেসব নিজেই অনুভব করবেন অনায়াসে, তিনি স্বল্প স্বচ্ছ হয়ে উঠলেই। এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, এ-সকল কেন্দ্র (ভারতে যাদের *চক্র* বলা হয়) আমাদের স্থূল শরীরে অবস্থিত নয়, অবস্থিত অন্য এক পরিসরে যদিও তাদের একাগ্রতা সময়ে সময়ে এত তীব্র হয় যে আমরা অনুভব করি এক গভীর সীমিত শারীরিক সংবেদন। তাদের মধ্যে কয়েকটি যথেষ্ট গভীর ভাবে আমাদের পরিচিত বিভিন্ন স্নায়ুজালের অনুরূপ, যদিও সবগুলি নয়। মোটামুটি সাতটি কেন্দ্র চারটি অঞ্চলের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে :

(১) *অতিচেতন*— মাথার শীর্ষভাগের কিছু উপরে*, একটি কেন্দ্রে স্থিত, এবং আমাদের চিন্তনশীল মনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ঊর্ধ্বতর মনের এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার সুযোগ প্রদান করে : জ্যোতির্মানস, বোধিমানস, অধিমানস ইত্যাদি। (২) *মন*— দুটি কেন্দ্র নিয়ে, একটি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থিত, যা আমাদের মানসিক কার্যকলাপের সংকল্প ও সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করে, যখন

* ভারতীয় পরম্পরায়, এই কেন্দ্রটি "সহস্রদল পদ্ম" নামে অভিহিত কারণ এর উন্মীলনে উজ্জ্বল পূর্ণতা অনুভূত হয়। মস্তকের ঊর্ধ্বে এর অবস্থিতি। শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্যদের অনুভূতি অনুযায়ী মস্তকের ঊর্ধ্বে যা অনুভূত হয়, তা এক কেন্দ্র নয়, বরং মস্তকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক সৌর উৎসের জ্যোতির্ময় প্রতিফলন।



ভাবতীয় তান্ত্রিক পরম্পরা অনুযায়ী
চেতনার কেন্দ্রসমূহ

কেন্দ্রীয় নাড়ীটি এবং দুপাশের পরস্পর-বিজড়িত নাড়ীদ্বয় সুষুম্নাপথ ও সম্ভবত সর্ববেদী স্নায়ুতন্ত্রের অনুরূপ। এই পথেই আরোহিণী শক্তি, কুণ্ডলিনী উত্থিতা হন যখন তিনি জাগ্রতা হন নিম্নতম কেন্দ্রে এবং ঊর্ধ্বায়িতা হন কেন্দ্র হতে কেন্দ্রে, "সর্পের মতো" এবং মস্তকের ঊর্ধ্বে অতিচেতনায় প্রস্ফুটিতা হন। (ফারাও-দের শিরস্ত্রাণে সৌরজ্যোতির্মণ্ডলের সঙ্গে শোভাবর্ধন করত যে মিশরীয় নাগ য়ুরিয়াস্, এবং মেক্সিকোর বহুফেনাযুক্ত সাপ কোয়েট্‌জা কোট্‌ল্, তথা বোধহয় বুদ্ধদেবের মস্তক হতে দোদুল্যমান নাগসর্পও একই তাৎপর্য বোঝায়।) প্রধানত এ-সকল কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যই আকর্ষক, তথাপি আমরা পরে সাধারণ প্রয়োজনীয়তার জন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। এ সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়নের জন্য স্যার্ জন্ উড্‌রোফ্ (আর্থার অ্যাভালন)·

আমরা চিন্তনের মাধ্যমে কাজ করতে চাই— তাছাড়া, এ হল সূক্ষ্মদর্শনেরও কেন্দ্র, কিছু ঐতিহ্যের কথিত "তৃতীয় নয়ন" ; অন্যটি কণ্ঠের সমস্তরে, যা মানসিক প্রকাশের সকল রূপকে নিয়ন্ত্রিত করে। (৩) *প্রাণ*— তিনটি কেন্দ্র :

একটি হৃদয়ের কেন্দ্রে যা আমাদের সত্তাটিকে নিয়ন্ত্রিত করে (ভালোবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি), দ্বিতীয়টি নাভির সমস্তরে যা আধিপত্য, অধিকার ও বিজয়ের জন্য আমাদের প্রেরণা, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ করে ; তৃতীয়টি, নিম্নপ্রাণ : নাভি ও কামকেন্দ্রের অন্তর্বর্তী, মধ্যান্ত্রিক স্নায়ুজালের সমস্তরে অবস্থিত, যা নিম্নতম স্পন্দনসমূহের অবস্থানস্থল—ঈর্ষা, অসূয়া, কামনা, লোভও ক্রোধের। (৪) *শরীর ও অবচেতন**, মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে স্থিত কেন্দ্র, যা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের শরীর-সত্তা ও কামপ্রবৃত্তি ; তাছাড়া এই কেন্দ্র উন্মোচিত করে অধঃস্থিত অবচেতন অঞ্চলগুলোকেও।

সাধারণত স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে এই কেন্দ্রগুলো সুপ্ত বা মুদ্রিত, কিংবা তার অগভীর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অতি অল্প স্রোতই তারা ছাড়ে। প্রকৃতই নিজের মধ্যে সে প্রাচীরে আবদ্ধ, এবং বাইরের জগতের সঙ্গে সে শুধু পরোক্ষভাবেই যোগাযোগ করে, অতি সীমিত পরিধির মধ্যে— বস্তুত অন্যান্য লোক বা বস্তুকে সে দেখে না, কিন্তু দেখে নিজেকেই অন্যান্যদের মধ্যে, নিজেকেই বস্তুসকলের মধ্যে, ও সর্বত্র, বাইরে না বেরিয়েই। যোগের দ্বারা কেন্দ্রগুলো উন্মীলিত হয়। তাদের উন্মীলন হতে পারে দুটো পথে, নিম্ন হতে ঊর্ধ্বে, অথবা ঊর্ধ্ব হতে নিম্নে, এবং তা নির্ভর করে আমরা যে যোগের অভ্যাস করি, তার উপর : প্রাচীন যৌগিক ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতিসমূহ কিংবা শ্রীঅরবিন্দের যোগ। পূর্বের উল্লেখ অনুযায়ী, ধ্যান ও অনুশীলনের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, আমরা কোনো একদিন অনুভব করতে পারি, এক শক্তি জাগ্রত হচ্ছে মেরুদণ্ডের নিম্নে, ও আরোহণ করছে, স্তর হতে স্তরে, মস্তকের শীর্ষভাগ পর্যন্ত, এক তরঙ্গায়িত গতি-ভঙ্গিমায়, ঠিক এক ভুজঙ্গের মতো ; প্রত্যেক স্তরে, সম্পৃক্ত কেন্দ্রটির মধ্য দিয়ে এই শক্তি ভেদ করে যায় (কিছুটা তীব্রভাবেই), এবং কেন্দ্রটি উন্মীলিত হয় ও যুগপৎভাবে আমাদের নিকট উন্মুক্ত করে দেয় সকল বিশ্বময় স্পন্দন বা শক্তি-প্রবাহ যা সেই বিশেষ কেন্দ্রের কম্পনের অনুরূপ। শ্রীঅরবিন্দের যোগে অবরোহী শক্তি সেই একই কেন্দ্রগুলো উন্মুক্ত করে দেয়, ধীরে ও শান্তভাবে, ঊর্ধ্ব হতে নিম্নে। কখনও কখনও নিম্নতর কেন্দ্রগুলো পূর্ণভাবেও উন্মীলিত হয় না বহুদিন পর্যন্ত। এই প্রক্রিয়ায় নিজস্ব কয়েকটি সুবিধা আছে— যদি আমরা হৃদয়ংগম করি

* এই গ্রন্থের সর্বাংশে আমরা শ্রীঅরবিন্দের ব্যবহৃত শব্দাবলী— অতিচেতন, অবচেতন, নিশ্চেতন— ব্যবহার করেছি, যা আধুনিক মনস্তত্ত্বের শব্দাবলী হতে পৃথক ও বিশিষ্ট অর্থ বহন করে।

যে, প্রত্যেক কেন্দ্রের সম্পর্ক আছে এক বিশ্বময় চেতনা বা শক্তির সঙ্গে : নিম্নস্থ প্রাণিক ও অবচেতন কেন্দ্রগুলির উন্মীলন শুরুতেই করে দেওয়ার অর্থ এক ঝুঁকি নেওয়া, নিমগ্ন হওয়ার, এখন আর আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সমস্যাগুলির মধ্যে নয়, বিশ্বব্যাপী কর্দমের প্রবল স্রোতে : আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুর বেঁধে ফেলেছি জগতের বিশৃঙ্খলা ও কর্দমের সঙ্গে। তাছাড়া, সেই কারণেই প্রাচীন যোগে চূড়ান্তভাবে জোর দেওয়া হয়েছে একজন গুরুর রক্ষামূলক উপস্থিতিতে। শক্তির অবরোহণে এই গুপ্ত বিপদটি এড়িয়ে দেওয়া যায়। কারণ ঊর্ধ্বতর, অতিচেতন আলোকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই আমরা নিম্নতর কেন্দ্রগুলোর মুখোমুখি হই। সাধক, তাঁর কেন্দ্রগুলোকে একবার নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন করবার পর, জানতে আরম্ভ করেন বিভিন্ন সত্তাকে, বিভিন্ন বস্তুকে, এই জগৎকে এবং নিজেকে, সকলের নিজের প্রকৃত রূপে, কারণ তিনি আর বাছাই করেন না বাইরের চিহ্ন, সন্দেহজনক শব্দ বা ভাবভঙ্গি, প্রাচীর-ঘেরা মানুষের সকল অঙ্গভঙ্গি, কিংবা, বস্তুসমূহের অবরুদ্ধ মুখমণ্ডল, বাছাই করেন প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক সত্তার অবিমিশ্র স্পন্দন, যাকে কিছু ছদ্মবেশে রাখতে পারবে না।

কিন্তু আমাদের সর্বপ্রধান আবিষ্কার আমরা নিজেরাই। মনকে নীরব করবার জন্য বর্ণিত প্রক্রিয়ার মতো কিছু যদি আমরা অনুসরণ করি, এবং সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ থাকি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বে, শুধু যে মানসিক স্পন্দনগুলো বাইরে থেকে আসে তা নয়, বরং সব-কিছুই আসে বাইরে থেকে : আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন, আনন্দের স্পন্দন, সংকল্পের স্পন্দন এবং আরও অনেক কিছু। ঊর্ধ্ব হতে নিম্ন পর্যন্ত, আমাদের সত্তা এক গ্রাহক যন্ত্র : *প্রকৃত পক্ষে আমরা চিন্তা বা সংকল্প বা কর্ম করি না, কিন্তু চিন্তা আমাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, সংকল্প আমাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, প্রেরণা এবং কর্ম আমাদের মধ্যে সংঘটিত হয়।*[৩] "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি," অথবা "আমি অনুভব করি, সুতরাং আমি আছি," অথবা "আমি আকাঙ্ক্ষা করি, সুতরাং আমি আছি"— এ কথা মনে করা হল কিছুটা সেই শিশুর মতো হওয়া, যে মনে করে যে ঘোষক বা ঐকতান-বাদকবৃন্দ টেলিভিজন যন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে, এবং টেলিভিজন এক চিন্তাশীল যন্ত্র। কারণ, এই "আমি"-গুলোর মধ্যে কোনোটিই আমরা নই বা আমাদের নয়, এবং তাদের সংগীত বিশ্বজনীন।

সম্মুখ সত্তা

আমরা প্রলুব্ধ হতে পারি প্রতিবাদ জানাবার জন্য যে, মোটের উপর এসব *আমাদের* অনুভব, *আমাদের* আকাঙ্ক্ষা, এ হল *আমাদের* ব্যথা, *আমাদের*

সংবেদনশীলতা— স্বয়ং আমরা, এবং কোনো প্রকারের টেলিগ্রাফের যন্ত্র নয়! এক অর্থে, এসব প্রকৃতই আমরা স্বয়ং : তা এই অর্থে যে আমরা অভ্যাস করে ফেলেছি অন্যান্য স্পন্দন অপেক্ষা কোনো কোনো স্পন্দনের উত্তর দেওয়ার, অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা কোনো কোনো বস্তু দ্বারা বিচলিত বা ব্যথিত হওয়ার, এবং অবশেষে অভ্যাসের এই পুঞ্জ আপাতদৃষ্টিতে দানা বেঁধে ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়, যাকে আমরা বলি আমরা স্বয়ং। কিন্তু আমরা যদি আরও গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা এ কথাও বলতে পারব না যে "আমরাই" এসব অভ্যাস অর্জন করেছি : আমাদের পরিবেশ, আমাদের শিক্ষা, আমাদের পূর্বপুরুষদের চরিত্র ও আমাদের ঐতিহ্য আমাদের জন্য নির্বাচিত করেছে ও প্রত্যেক মুহূর্তে নির্বাচিত করছে আমরা কী চাই বা আকাঙ্ক্ষা করি, আমরা কী পছন্দ বা অপছন্দ করি। খুবই মনে হয়, জীবন সঞ্চালিত হয় আমাদের ছাড়াই। এসবের মধ্যে আসল "আমি" কখন বিস্ফোরিত হয়? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : *বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে স্থাপিত করে গতিবিধি, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, কর্মদক্ষতা, স্বভাব ও প্রবণতার কিছু অভ্যাস, এবং তাই হল যাকে আমরা বলি 'আমরা স্বয়ং'।*[৪] আমরা এ কথাও বলতে পারি না যে, এই "আমরা স্বয়ং"-এর কোনো সত্যকারের স্থায়িত্ব আছে : *একই স্পন্দন ও রূপায়ণের অবিরত পুনরাবৃত্তি ও পুনরুদয়ের দ্বারা এক স্থায়িত্ব প্রতীয়মান হয়।*[৪] কারণ একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে আমরা বারংবার সংযোগ স্থাপন করি, বা বরং তাই আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, আমাদের পরিবেশ ও শিক্ষার নিয়ম অনুযায়ী, সব সময় সেই একই মানসিক, প্রাণিক ও অন্যান্য স্পন্দন আমাদের কেন্দ্রগুলোর মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয়, ও আমরা তাদের স্বীকৃতি দিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অজ্ঞাতসারে, সীমাহীনভাবে। বাস্তবে সব-কিছুই আছে এক *শাশ্বত প্রবহণের* অবস্থায়, সব-কিছুই আমাদের কাছে আসে একটি মন হতে, যা আমাদের মনের অপেক্ষা বিশালতর, এক বিশ্বমানস, একটি প্রাণ হতে যা আমাদের প্রাণ অপেক্ষা বিশালতর এক বিশ্বপ্রাণ, কিংবা আরও নিম্নস্থিত, অবচেতন অঞ্চল হতে, কিংবা ঊর্ধ্বতর, অতিচেতন অঞ্চল হতে। এই ক্ষুদ্র *সম্মুখ সত্তা*[৫]-কে "জগৎসমূহের" এক সমগ্র ক্রমবিন্যাস ঘিরে আছে, তার উপরে প্রসারিত হচ্ছে, তার অবলম্বন হয়েছে, তাকে পরিব্যাপ্ত করছে, প্রেরিত করছে, যা আমাদের প্রাচীন প্রজ্ঞার জ্ঞাত ছিল—"বিনা প্রয়াসে, একটি জগৎ হতে অন্য এক জগতে প্রবেশ করে" ঋগ্‌বেদের বাণী (২, ২৪, ৫)— অথবা, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় *চেতনার ভূমিসমূহের* এক স্তরক্রম, যা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয় বিশুদ্ধ আত্মা হতে জড় পর্যন্ত, এবং প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত আমাদের কেন্দ্রগুলোর প্রত্যেকটির সঙ্গে। কিন্তু *আমরা শুধু উপরিভাগে কিছু বুদ্‌বুদের সম্বন্ধেই সচেতন।*[৬]

এসব-কিছুর মধ্যে আমাদের নিজেদের কী অবশিষ্ট থাকে? সত্যি কথা

বলতে বেশি কিছু নয়, অথবা, সব-কিছু নির্ভর করে আমরা কোন্ স্তরের উপর চেতনার আলোকপাত করছি, তার উপর।

চেতনার ব্যষ্টীকরণ

আমরা আরম্ভ করেছি চেতনা কী তার আভাস পেতে এবং উপলব্ধি লাভ করতে যে, তা আছে বিশ্বের সর্বত্র, প্রত্যেক স্তরে, এবং আমাদের মধ্যে আছে অনুরূপ কেন্দ্রগুলো, কিন্তু এখনও আমরা "সন্ধান" পাইনি আমাদের চেতনার। কারণ, বোধহয়, চেতনা এমন কিছু নয় যা তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু এ এমন কিছু, যা প্রজ্বলিত হয় অগ্নির মতো। আমাদের জীবনের কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে, আমাদের সত্তার মধ্যে আমরা সকলেই অনুভব করেছি উষ্ণতর মতো কিছু একটা। একপ্রকারের আন্তরিক উদ্দীপনা বা জীবন্ত শক্তি, যার ব্যাখ্যা ভাষায় করা যায় না। যার স্থিতির কোনো যুক্তিও নেই, কারণ সে আবির্ভূত হয় শূন্য হতে, নিমিত্তবিহীন, নিরাবরণ, এক প্রয়োজনের মতো, বা এক অগ্নিশিখার মতো। আমাদের সমগ্র শৈশব সাক্ষ্য বহন করে এই অনাবিল উৎসাহের, এই ব্যাখ্যাতীত ব্যাকুলতার। কিন্তু অতি শীঘ্রই আমরা কৈশোর হতে বয়োবৃদ্ধি লাভ করি, এবং মন এই শক্তিকে বন্দী করে দেয়, যেমন সে বন্দী করে দেয় সব-কিছুকেই এবং একে আবৃত করে দেয় উচ্চ আদর্শবাদী শব্দ দিয়ে ও প্রচালিত করে দেয় একে এক দায়িত্বে, এক কর্মে, এক ধর্মসংস্থায়। না হলে, প্রাণ তাকে আয়ত্তাধীন করে ও ন্যূনাধিক উত্তুঙ্গ আবেগে তাকে রঙ মাখিয়ে দেয়, যদি-না তাকে প্রচালিত করে নেয় কোনো অভিযানে অথবা তাকে ব্যবহার করে আধিপত্য, বিজয় ও অধিকারের জন্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শক্তিটি আরও নিম্নে পঙ্কে নিমগ্ন হয়ে যায়। এবং কখনও কখনও এ সম্পূর্ণ ডুবে যায়, অবশিষ্ট থাকে শুধু ছোটো এক ছায়া, এক বোঝার তলায়। কিন্তু যে সাধক তাঁর মনকে নীরব করেছেন, ও ভাবনার ফাঁদে আর পড়তে পারবেন না, যিনি তাঁর প্রাণসত্তাকে প্রশান্ত করেছেন ও প্রত্যেক মুহূর্তে আবেগ ও কামনার বিশাল বিকিরণে আর আত্মহারা হন না, তিনি তাঁর বর্তমানের বিশোধিত সত্তায় পুনরাবিষ্কার করেন নব তারুণ্যের অবস্থার মতো কিছু-একটার, এক নতুন ও মুক্ত *প্রেরণার*। যতই তাঁর একাগ্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাঁর "সক্রিয় *ধ্যানের*" মাধ্যমে, তাঁর আস্পৃহা, তাঁর প্রয়োজনের মাধ্যমে, ততই তিনি অনুভব করেন এই অন্তর্নিহিত প্রেরণা *জীবন্ত* হতে শুরু করেছে— ঋগ্‌বেদের বাণী, "প্রসারিত হয় এ, জীবন্তকে ব্যক্ত করে, একজনকে জাগরিত করে যে ছিল মৃত।" (১. ১১৩. ৮)— তিনি অনুভব করেন, এই প্রেরণা গ্রহণ করেছে এক ক্রমবর্ধমানরূপে-সুনির্দিষ্ট সুসংগতি, এক শক্তি যা হচ্ছে ক্রমশ নিবিড়তর, সর্বোপরি, এক *স্বাধীনতা*, যেন মনে হয় একই সঙ্গে

এক শক্তি ও এক সত্তা, যা তাঁর সত্তায় অন্তর্নিহিত। প্রথমে, তাঁর নিষ্ক্রিয় ধ্যানের মাধ্যমে (যখন তিনি স্বগৃহে, চক্ষু-নিমীলিত অবস্থায়, প্রশান্ত) তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর অন্তর্নিহিত এই শক্তির গতি আছে, ঘনত্ব আছে, বিভিন্ন ক্রমের তীব্রতা আছে, তাঁর মধ্যে ওঠানামা করে, যেন এ স্থির নয়, এক অপম্রিয়মাণ জীবন্ত বস্তুর মতো। এই অভ্যন্তরীণ গতিবিধিগুলো এমন বলশালী হতে পারে যে, তা শরীরকে আনত করতে পারে, যখন শক্তির অবতরণ হয়, বা তাকে ঋজু করতে পারে ও পিছনে টানতে পারে, যখন শক্তির উত্থান হয়। আমাদের সক্রিয় ধ্যানে, অর্থাৎ আমাদের বাইরের দৈনন্দিন জীবনে এই অন্তর্নিহিত শক্তি বেশি মিশ্রিত হয়ে যায়, এবং অনুভূত হয় অন্তরালবর্তী আবরণরুদ্ধ এক ক্ষুদ্র স্পন্দনের মতো, যা আমরা পূর্বেও লক্ষ্য করেছি ; তাছাড়া আমরা অনুভব করি যে, এ শুধু এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি নয়, বরং এ হল এক উপস্থিতি, আমাদের গভীরে নিহিত এক *সত্তা,* যা আমাদের ধারণ করে আছে, আমাদের দিয়েছে দৃঢ়তা, প্রায় এক কবচের মতো, জগতের প্রতি এক প্রশান্ত দৃষ্টিপাতের সহকারে। অন্তর্নিহিত স্পন্দনশীল ক্ষুদ্র এই কিছু-একটার সাহচর্যে, আমরা অজেয়, আর কখনও নিঃসঙ্গ নই। সর্বস্থিতিতে সে বিদ্যমান, সর্বক্ষণে সে বিদ্যমান। সে সস্নেহ, অন্তরঙ্গ ও শক্তিশালী। এবং বিস্ময়জনকভাবে, একবার আমরা এর সন্ধান পেলে, সর্বত্র সেই *একই বস্তু* পাব, সকল সত্তায় ও সকল বস্তুতে : আমরা সোজাসুজিভাবে যোগাযোগ কবতে পারি, যেন বাস্তবিক সব-কিছু একই, প্রাচীরবিহীন। আমাদের মধ্যে এমন একটা কিছু আমরা স্পর্শ করেছি যা বিশ্বশক্তিগুলোর ক্রীড়নক নয়, নয় কিছু অগভীর ও শুষ্ক "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি," কিন্তু যা আমাদের সত্তার মূল সত্য, আমাদের আত্মা, আমাদের প্রকৃত আত্মা, প্রকৃত কেন্দ্র, উদ্দীপনা ও সত্তা, চেতনা ও শক্তি।*

যখন এই অন্তর্নিহিত প্রেরণা বা শক্তি এক স্পষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করে, যখন এ বৃদ্ধিলাভ করে এক শিশুর মতো, সাধক তখন সচেতন হন যে, এ যদৃচ্ছভাবে গতিশীল নয়, যেমন তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন, বরং তাঁর সত্তার বিভিন্ন কেন্দ্রের উপর আলোকপাত করে, তাঁর তৎকালীন কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল হয়ে, এবং এ বস্তুত চেতনার প্রত্যেক কেন্দ্রের অন্তরালবর্তী শক্তি : আমরা যখন চিন্তা করি, যখন আমরা সংকল্প করি বা নিজেদের প্রকাশ করি, তখন এ মানসিক কেন্দ্রগুলির অন্তরালবর্তী; যখন আমরা অনুভব করি, যন্ত্রণাভোগ করি, কামনা করি, তখন এ প্রাণকেন্দ্রগুলির অন্তরালবর্তী; এবং তারপর, আরও নিম্নে, ও আরও ঊর্ধ্বে। এই একই শক্তি বস্তুসমূহের বিষয়ে সত্যই

* আমরা এই কেন্দ্রের বিষয়ে পরে আলোচনা করব। যা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় *চৈত্যকেন্দ্র* বা *চৈত্যসত্তা,* অন্যদের ভাষায় আত্মা।

সচেতন হয়— মন সমেত, সকল কেন্দ্রই শুধু বিশ্বময় অস্তিত্বের বিবিধ স্তরের প্রতি এর উন্মুক্ত পথ, প্রতিলিপি গ্রহণ ও প্রকাশের জন্য এর যন্ত্র। এই শক্তিই হল *বিশ্বসমূহের ভ্রমণকারী*[৭], চেতনার সকল ভূমির আবিষ্কারক ; এই শক্তিই আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সংযোগস্থাপন করে, জাগৃতি হতে সুপ্তি ও মৃত্যু পর্যন্ত যখন এই ক্ষুদ্র বাইরের মনটি উপস্থিত নেই আমাদের সংবাদজ্ঞাপন বা পথনির্দেশের জন্য ; বিশ্বময় অস্তিত্বের সমগ্র স্বরগ্রামের আরোহণ ও অবরোহণ এই শক্তিই সম্পন্ন করে ও সর্বত্রই যোগাযোগ করে। অন্য শব্দে আমরা *চেতনার* আবিষ্কার করেছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে যা তার সহস্রাধিক চিন্তা ও ইন্দ্রিয়গত ক্রিয়াকলাপের জন্য, অবিরত বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল ও পঙ্কনিমগ্ন থাকে, আমরা তা মুক্ত করেছি। নিম্নোদর হতে কপাল পর্যন্ত কোনো একস্থানে সবসময় আমাদের স্থিতি গ্রহণ করবার পরিবর্তে আমরা এখন সমর্থ হয়েছি গভীরতর বা উচ্চতর অঞ্চলে আমাদের চেতনাকে স্থানান্তরিত করতে যেসব মনের ও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের অনধিগম্য। কারণ, চেতনা চিন্তনের বা অনুভবের কোনো পথ নয় (অথবা, অন্তত শুধুমাত্র তাই নয়), বরং অস্তিত্বের দৃশ্য বা অদৃশ্য অসংখ্য ক্রমের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের এক শক্তি। আমাদের চেতনা যত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, ততই বৃহত্তর হয় তার কার্যক্ষেত্র ও ক্রমের সংখ্যা যেখানে সে পৌঁছতে পারে। আমরা আরও দেখতে পাই যে, আমরা যা চিন্তা করি, অনুভব করি ও ইচ্ছা করি, আমাদের ক্ষুদ্র সম্মুখ সত্তার মাধ্যমে, এই চেতনা তার অধীন নয় ; মন, প্রাণ, এমন-কি, শরীরেরও অধীন এ নয়, কারণ, কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায়— যে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব— শরীর ছেড়ে এ ইতস্তত যায় কিছু অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির জন্য। আমাদের শরীর, আমাদের চিন্তা ও আমাদের কামনা, আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের শুধু একটি ক্ষীণ স্তর।

চিৎশক্তি, চিদানন্দ

যখন আমরা চেতনার আবিষ্কার করি, তখন আরও আবিষ্কার করি যে, এ এক শক্তি। যা উল্লেখনীয়, তা এই যে আমরা এক অন্তর্নিহিত প্রবাহ বা শক্তি প্রত্যক্ষ করতে আরম্ভ করি, এ কথা উপলব্ধি করবার পূর্বেই যে এ এক চেতনা। চেতনা এক শক্তি, *চিৎশক্তি,* শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, কারণ শব্দ-দুটি অবিচ্ছেদ্য ও বিনিমেয়। ভারতের প্রাচীন প্রজ্ঞার বিদিত ছিল এই সত্য, এবং কখনও বলা হয় নি চেতনার, *চিৎ*-এর কথা, তার সঙ্গে যোগ না করে *অগ্নি* শব্দটি, যার অর্থ উত্তাপ, শিখা, তেজঃ— *চিদগ্নি* (কখনও কখনও *তপস্*, অগ্নির সমার্থবোধক : *চিৎ-তপস্*)। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বা যৌগিক অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত শব্দটি হল তপস্যা, যা উৎপন্ন করে উত্তাপ বা তেজঃ, বা আরও যথার্থভাবে, চিৎ-তপঃ,

চৈতন্য-উত্তাপ বা চৈতন্য-তেজঃ। এই অগ্নি বা চিদগ্নি সর্বত্রই সমান। অবরোহী বা আরোহী শক্তি, অন্তর্নিহিত শক্তি, মানসিক, প্রাণিক বা জড়তাত্ত্বিক শক্তির কথা আমরা বলি, কিন্তু অসংখ্য বিভিন্ন শক্তি নেই, জগতে একটিই শক্তি আছে, একটি একক প্রবাহ, যা আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয় যেমন তা প্রবাহিত হয় সকল বস্তুর মধ্যে এবং তার ক্রিয়ার স্তরের উপর নির্ভরশীল হয়ে এক বা অন্য উপাদান দ্বারা আবৃত হয়। আমাদের বিদ্যুৎপ্রবাহ আলোকিত করতে পারে কোনো তাঁবুকে, বা মদ্যশালাকে, কোনো স্কুলঘরকে বা ক্যান্‌টিন্‌কে, এবং যদিও তা বিভিন্ন বস্তুকে আলোকিত করতে পারে, তথাপি প্রবাহটি একই। তেমনই আমাদের অন্তর্নিহিত নিভৃতনিবাসকে, আমাদের মনের কারখানাকে, আমাদের প্রাণের রঙ্গমঞ্চকে, কিংবা আমাদের শরীরের গুম্ফাকে প্রাণবন্ত বা আলোকিত করলেও এই শক্তি বা তপঃ, অগ্নি একই থাকে। ভিন্ন ভিন্ন তীব্রতার আলোকে, এক স্তর হতে অন্য স্তরে, গুরুতর বা লঘুতর স্পন্দনে এ পরিবৃত হয়— অতিচেতন, মানসিক, প্রাণিক বা জড়তাত্ত্বিক স্পন্দনে— কিন্তু এই সেই শক্তি যা সব-কিছুকে একত্র সংযুক্ত করে ও সব-কিছুকে প্রাণবন্ত করে। এই হল বিশ্বজগতের মৌলিক উপাদান, *চিৎশক্তি, চিদগ্নি।*

চেতনা যেমন শক্তি, তেমনই তার বিপরীত ও সত্য, এবং শক্তিও চেতনা : *সকল শক্তিই সচেতন।*[৮] বিশ্বময় শক্তিই বিশ্বময় চেতনা। এই কথা সাধক আবিষ্কার করেন। তাঁর অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির এই প্রবাহের সঙ্গে একবার সম্পর্ক স্থাপন করবার পর, বিশ্বসত্যের যে-কোনো স্তরের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, যে-কোনো বিন্দুতে, ও সেখানে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, বুঝতে পারেন চেতনাকে, এমন-কি তার উপর সক্রিয় হতে পারেন, কারণ সেই একই চেতনার প্রবাহ সর্বত্র বিদ্যমান ; বিভিন্ন স্পন্দনের ধরন নিয়ে উদ্ভিদে যেমন, তেমনই এক মানবমনের চিন্তার মধ্যে, যেমন জ্যোতির্ময় অতিচেতনায়, তেমনই এক পশুর সহজাত প্রবৃত্তিতে, ধাতুর মধ্যে এবং আমাদের গভীরতম নিদিধ্যাসনের মধ্যে সমানভাবে। যদি কাষ্ঠখণ্ড অচেতন হয়, তাহলে যোগীর ক্ষমতা থাকবে না তাঁর একাগ্রতার দ্বারা একে সঞ্চালিত করায়, কারণ উভয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। যদি বিশ্বের একটি একক বিন্দুও সম্পূর্ণ নিশ্চেতন হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চেতন হবে, কারণ দুটি ভিন্ন বস্তু *হতে পারে না।* আইন্‌স্টাইন্‌-এর নিকট আমরা জেনেছি— যা সত্যই এক মহান্‌ আবিষ্কার— পদার্থ ও শক্তি বিনিময়যোগ্য : $E = mc^2$। পদার্থ, ঘনীভূত শক্তি। আমাদের এখন ব্যবহারিকভাবে অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে যে, এই শক্তি বা তপঃ এক চেতনা, এবং জড়তত্ত্বও চেতনার এক রূপ। ঠিক যেমন মন চেতনার এক রূপ এবং প্রাণ ও অতিচেতন চেতনার অন্যান্য রূপ। একবার যদি আমরা এই গূঢ়সূত্রটি আবিষ্কার করি, তাহলে আমরা সকল জড়-শক্তির উপরে প্রকৃত

কর্তৃত্ব লাভ করব— এক প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব। কিন্তু আমরা শুধু অতীব প্রাচীন সত্যেরই পুনরাবিষ্কার করছি, চার হাজার বছর পূর্বে উপনিষদ সমূহের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, জড় হচ্ছে ঘনীভূত শক্তি, বা বরং ঘনীভূত চিৎশক্তি : "তপঃ দ্বারা ব্রহ্ম অভিবৃদ্ধ হয়, তা হতে জড় অভিজাত হয়, জড় হতে সকল প্রাণ, মন ও সকল বিশ্ব জাত হয়" (মুণ্ডকোপনিষদ, ১. ১. ৮)।

সকলই এখানে চেতনা, কারণ সকলই অস্তিত্ব বা পরমাত্মা ; সবই *চিৎ*, কারণ সবই *সৎ*— *সৎ-চিৎ*— তাঁর নিজেরই প্রকাশের বিভিন্ন স্তরে। আমাদের পার্থিব বিবর্তনের ইতিহাস, পরিশেষে, শক্তির চেতনায় ধীর পরিবর্তনের ইতিহাস, অথবা, আরও স্পষ্টরূপে, নিজের শক্তির মধ্যে নিমগ্ন চিৎ-এর ধীর আত্মসংস্মরণ। উদাহরণস্বরূপ, বিবর্তনের প্রথম পর্যায়গুলিতে পরমাণুর চেতনা নিজের ঘূর্ণনে নিমগ্ন। যেমন শিল্পীর চেতনা নিমগ্ন তার নির্মীয়মাণ কৃতিটিতে, অবশিষ্ট সব-কিছু বিস্মৃত হয়ে, যেমন উদ্ভিদ নিমগ্ন তার আলোক-সংশ্লেষে, যেমন আমাদের নিজেদের চেতনা, তার স্বীয় অস্তিত্বের অন্য সমস্ত স্তর বিস্মৃত হয়ে নিমগ্ন হতে পারে একটি গ্রন্থে বা একটি কামনায়। অন্তিম বিশ্লেষণে, বিবর্তনের সকল অগ্রগতি পবিমিত হয়, তার শক্তির উপাদান হতে চেতনার উপাদান বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত করবার সামর্থ্যের উপর— এই সেই, যাকে আমরা অভিহিত করেছি "চেতনার ব্যষ্টীকরণ"। আমাদের বিবর্তনের আধ্যাত্মিক বা যৌগিক পর্যায়ে, চেতনা হয়ে যায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, মুক্ত, তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক আবর্তন হতে ; সে তার নিজেরই প্রভু ও চেতনার স্পন্দনের সমগ্র পরিসর ভ্রমণ করতে পারে— পরমাণু হতে পরমাত্মা পর্যন্ত : শক্তি সম্পূর্ণরূপে চেতনা হয়ে গেছে, সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করে, এবং নিজেকে স্মরণ করাই সব-কিছু স্মরণ করা, কারণ আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মা স্মরণ করে সর্বত্র-বিরাজমান আত্মাকে।

যুগপৎভাবে তপঃ যখন চিৎকে ফিরে পায়, তখন তা ফিরে পায় নিজের শক্তির উপর ও সকল শক্তির উপর কর্তৃত্ব, কারণ সচেতন হওয়ার অর্থ শক্তিমান্ হওয়া। কারণ ঘূর্ণনরত পরমাণু, বা প্রাণিতত্ত্বের ধরাবাঁধা পথে চলমান ও স্বীয় মনের কারখানায় শ্রমরত মানুষ তাদের মানসিক, প্রাণিক বা আণবিক শক্তির প্রভু নয় : তারা শুধু ক্রমাগত আবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে, সচেতন পর্যায়ে, আমরা মুক্ত, আমরাই প্রভু ; আমরা বাস্তবিকভাবে প্রতিপাদন করি যে চেতনা এক শক্তি এক *উপাদান*, যা আমরা উপযোগ করতে পারি, যেমন অন্যেরা উপযোগ করে অক্সাইড বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ; শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন : *যদি ব্যক্তি অন্তর্নিহিত চেতনার বিষয়ে সজাগ হয়, তার সাহায্যে সে সব-কিছুই করতে পারে, তাকে এক শক্তির স্রোতরূপে বাইরে পাঠাতে পারে, নিজের চারদিকে চেতনার এক বৃত্ত বা প্রাচীর নির্মাণ করতে পারে, কোনো ধারণাকে নির্দেশ দিতে পারে যেন*

আমেরিকায় কোনো এক ব্যক্তির মস্তিষ্কে তা প্রবেশ করে ইত্যাদি।[৯] তিনি আরও ব্যাখ্যা করলেন : *উভয় ভিতরে ও বাইরে অদৃশ্য শক্তির বাস্তব পরিণতি সৃষ্টি করাই হল যৌগিক চেতনার সম্পূর্ণ অর্থ। এ বিষয়ে আমরা যা বলছি তা বলতাম না, যদি না হাজার হাজার অনুভূতি আমাদের দেখিয়ে দিত যে, অন্তর্নিহিত শক্তি মনকে পরিবর্তিত করতে পারে, এর সামর্থ্যের উন্নতিবিধান করতে পারে, নতুন ক্ষমতা যোগ করতে পারে, জ্ঞানের নতুন পরিসর সৃষ্টি করতে পারে, প্রাণের গতিবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করতে পারে, স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারে, সকল মানুষ ও বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, শরীরের অবস্থা ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, অন্য সকল শক্তির উপর এক বাস্তব ক্রিয়াশীল শক্তিরূপে কাজ করতে পারে ইত্যাদি। তাছাড়া, শুধু এর পরিণতিতেই নয়, এর গতিবিধিতেও এই শক্তি স্পর্শযোগ্য ও বাস্তব। যখন আমি শক্তি বা বলের অনুভূতির কথা বলি, তখন শুধু এর এক অস্পষ্ট বোধ প্রাপ্ত হওয়া আমার অভিপ্রেত নয়, আমার অভিপ্রেত এর বাস্তব অনুভূতি লাভ করা, এবং ফলত সমর্থ হওয়া এর পরিচালনায়, এর উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারে, এর গতিবিধির পর্যবেক্ষণে, এর পরিমাণ ও তীব্রতার বিষয়ে সচেতন হওয়ায়— অন্যান্য বিরোধী শক্তিদের মতো একই উপায়ে।*[১০] এক পরবর্তী পর্যায়ে, আমরা দেখব যে, চেতনা জড়ের উপর ক্রিয়াশীল হতে পারে এবং এর রূপান্তর করতে পারে। জড়ের চেতনে চূড়ান্ত পরিবর্তন, এবং একদিন চেতনেরও জড়ে পরিবর্তন— এই হল *অতিমানস যোগের* লক্ষ্য, যা আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু অনেক ক্রম রয়েছে চিৎশক্তির বিকাশের, সাধক বা অভীপ্সুর অন্তরের প্রেরণা জাগরিত হওয়ার স্তর হতে যোগীর স্তর পর্যন্ত : এমন-কি, যোগীদের মধ্যেও অনেক ক্রম আছে— এখানেই শুরু হয় সত্যকারের ক্রমবিন্যাস।

অবশিষ্ট আছে এক শেষ সমতুল্যতা। চেতনা শুধু শক্তি নয়, চেতনা শুধু সৎ নয়, চেতনা হর্ষ, *আনন্দ— চিদানন্দ।* সচেতন হওয়া আনন্দ। যখন চেতনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, হাজার হাজার মানসিক, প্রাণিক বা শারীরিক স্পন্দন হতে, যার মধ্যে এ নিমজ্জিত ছিল, তখন আমরা আবিষ্কার করি আনন্দ। সমগ্র সত্তা *যেন পরিপূর্ণ হয়ে যায় এক পুঞ্জীভূত জীবন্ত শক্তিতে ("এক সুগঠিত স্তম্ভসদৃশ",* ঋগ্বেদ বলছেন, ৫. ৪৫. ২) স্ফটিকতুল্য, নিঃস্পন্দ, উদ্দেশ্যবিহীন এক শক্তি —বিশুদ্ধ চেতনা, বিশুদ্ধ শক্তি, বিশুদ্ধ আনন্দ, কারণ সকলই এক বস্তু— এক *ঘনীভূত* আনন্দ, এক বিশাল প্রশান্তিময় আনন্দঘন উপাদান, যা মনে হয় অনাদি, অনন্ত, অহেতুক, এবং যা আরও মনে হয় সর্বত্র বিদ্যমান সকল বস্তুতে, সকল সত্তায়, যা তাদের গোপন ভিত্তি ও গোপন প্রয়োজনবোধ তাদের অভিবৃদ্ধির জন্য —যদি জীবনত্যাগ করতে কেউ না চায়, তার কারণ সেখানে সর্বত্র আনন্দ। এর অস্তিত্বের জন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এ *বিদ্যমান* অখণ্ডনীয়ভাবে, সকল

সময় ও সকল স্থানে এক পর্বতের ন্যায়, একটি হাসির মতো যা অন্তরালবর্তী, যা সর্বত্র বিদ্যমান। মহাবিশ্বের সমগ্র প্রহেলিকা সেখানেই আছে। অন্য কিছু নেই। একটি হাসি যা প্রত্যক্ষ করা যায় না, এক শূন্য যা সব-কিছু, এবং যা এইসকল আনন্দ, কারণ সব-কিছুই পরমাত্মন্, যা আনন্দ, *সচ্চিদানন্দ,* সৎ-চিৎ-আনন্দ, শাশ্বত ত্রয়ী, যা এই মহাবিশ্ব, যা আমরা, যে রহস্য আমরা নিশ্চয় আবিষ্কার করব ও জীবনে গ্রহণ করব, দীর্ঘ বিবর্তন-যাত্রার মধ্যে। "আনন্দ হতেই এ সকল প্রাণী জাত হয়, জাত হয়ে আনন্দেই জীবনধারণ করে, আনন্দেই তারা প্রয়াণ করে" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩. ৬)।

৬

প্রাণের প্রশান্তি

নৈতিকতাব সীমা

আমাদের সত্তার এক অঞ্চল আছে, যা এক বৃহৎ অসুবিধা ও এক প্রবল শক্তি, উভয়েরই উৎস। অসুবিধার উৎস, কারণ বাইরের বা ঊর্ধ্বের সকল সূচনাকেই এ বিশৃঙ্খল করে দেয়, মনকে নীরব করবার জন্য আমাদের সকল প্রয়াসকে প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করে ; কারণ এ চেতনাকে পঙ্কে নিমজ্জিত করে দেয়, নিম্নে তার তুচ্ছ সকল কর্মে ও অভিনিবেশে, অন্যান্য ক্ষেত্রের অভিমুখে তার মুক্ত গতিবিধিকে বাধা প্রদান ক'রে। শক্তির উৎস, কারণ এ হল আমাদের মধ্যে, প্রবল প্রাণশক্তি হতে উদ্‌ভূত এক অঙ্গ। হৃদয় ও কামকেন্দ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল এ, যাকে শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেছেন *প্রাণ*।

সকল সম্ভাব্য মিশ্রণের স্থান এ ; সুখদুঃখের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন, ব্যথা হর্ষের সঙ্গে, মন্দ ভালোর সঙ্গে ও ছলনা সত্যের সঙ্গে। জগতের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পরম্পরা একে এত অসুবিধাজনক বিচার করেছে যে, এই বিপজ্জনক এলাকাকে একটা দুর্ভাগ্যপূর্ণ ব্যাপার মনে করে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর ভেবেছে, শুধু তথাকথিত ধার্মিক আবেগগুলোকেই অনুমতি দিয়ে ও নবদীক্ষিতদের অবশিষ্ট সব-কিছু পরিত্যাগ করবার জন্য উপদেশ দিয়ে। মনে হয়, সকলেই এতে

সহমত : মানবপ্রকৃতি অপরিবর্তনীয়। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় যা *নৈতিক অস্ত্রোপচার*[১] তাতে দ্বিবিধ অসুবিধা আছে : প্রথমে, কোনো প্রকৃত বিশুদ্ধতা এ আনয়ন করে না, কারণ, যত পরিমার্জিতই হোক-না-কেন, ঊর্ধ্বতর আবেগগুলি নিম্নতর আবেগগুলির মতোই মিশ্রিত, শুধু এই কারণের জন্য যে, সেগুলি ভাবপ্রবণ ও তজ্জন্য আংশিক ; দ্বিতীয়ত, এ বাস্তবিক কিছুই প্রত্যাখ্যান করে না। শুধু দমন করে। প্রাণ নিজেই এক শক্তি, আমাদের যৌক্তিক বা নৈতিক তর্ক হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যদি আমরা এর উপর কোনো পীড়ন-মূলক বা পাশবিক প্রয়াস করি, কোনো আমূল কঠোর তপশ্চর্যার মাধ্যমে, তাহলে আমরা এই বিপদাশঙ্কার সম্মুখীন হই যে, একদিন সামান্যতম ছিদ্রপথেই এ বিদ্রোহ করবে —এবং প্রাণ জানে কীভাবে সুধের সঙ্গে প্রতিশোধ নিতে হয়। কিংবা আমাদের যদি যথেষ্ট সংকল্পশক্তি থাকে, তার উপর আমাদের মানসিক ও নৈতিক অনুশাসন দৃঢ়ভাবে আরোপিত করবার জন্য, তাহলে আমার জয়লাভ করতে পারি, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তি শুকিয়ে যাওয়ার মূল্য দিয়ে, কারণ অসন্তুষ্ট প্রাণ ধর্মঘট করবে এবং আমরা নিজেদের পাব বিশুদ্ধ, শুধু মন্দ হতে নয়, প্রাণের যা ভালো আছে তা হতেও, আমরা তখন বর্ণবিহীন, গন্ধবিহীন। এর চেয়েও গুরুতর, নৈতিকতা শুধু মানসিক প্রক্রিয়ার সীমার মধ্যেই ক্রিয়াশীল হয় ; অবচেতন বা অতিচেতন ক্ষেত্রসমূহে এর প্রবেশ নেই, এবং নেই মৃত্যুতে ও নিদ্রায় (যা, মোটের উপর, আমাদের অস্তিত্বের প্রত্যেক তিন দিনে একদিন অতিবাহিত করে, যার ফলে ষাট বছরের দীর্ঘ এক জীবনে আমরা চল্লিশ বছরের জাগ্রত নৈতিক জীবনের ও বিশ বছরের নীতিহীনতার অধিকার প্রাপ্ত হব— এক কৌতূহলোদ্দীপক গণিত)। অন্য শব্দে, আমাদের ক্ষুদ্র সম্মুখ ব্যক্তিত্বের সীমার বাইরে নৈতিকতা যায় না। সুতরাং আমাদের সত্তার উপর এক নৈতিক ও মৌলিক অনুশাসন আরোপিত করবার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি না, বরং এক আধ্যাত্মিক ও পূর্ণাঙ্গ অনুশাসনের প্রয়োজন অনুভব করি, যা আমাদের প্রকৃতির সকল অঙ্গকে সম্মান দেবে ও মুক্ত করে দেবে তাকে তার নির্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থা থেকে, কারণ প্রকৃত-পক্ষে, কোথাও চূড়ান্তভাবে কোনো মন্দ নেই, শুধু বিভিন্ন মিশ্রিতাবস্থাই আছে।

তাছাড়া, সাধক ভালো ও মন্দের পরিভাষায় চিন্তা করেন না (যদি মনে করা হয় যে তিনি এখনও "চিন্তা করেন"), চিন্তা করেন যথার্থ ও অযথার্থের পরিভাষায়। নাবিক তাঁর আপেক্ষিক স্থিতি নির্ণয় করবার জন্য সমুদ্রের প্রতি তাঁর ভালোবাসার ব্যবহার করেন না। ব্যবহার করেন sextant * ও নিশ্চিত হন যে যন্ত্রটির আয়নাটি পরিষ্কার। যদি আমাদের আয়না পরিষ্কার নেই, তাহলে আমরা

---

* sextant : কৌণিক ব্যবধান মাপার জন্য বৃত্তের ষষ্ঠাংশ চাপযুক্ত যন্ত্রবিশেষ।

দেখতে পাব না কিছুই, বস্তুসকলের ও মানুষদের বাস্তবতার, কারণ আমরা সর্বত্র পাব আমাদের নিজেদের কামনার বা ভয়ের প্রতিফলন, সর্বত্র আমাদের নিজেদের কোলাহলের প্রতিধ্বনি শুধু এই জগতে নয়, অন্য সকল জগতে, জাগরণে, নিদ্রায়, মরণে। ছবি *দেখবার* জন্য, তার মাঝখানে অবস্থান করা আমাদের বন্ধ করতেই হবে, এটা স্পষ্ট। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিকে যেসব বস্তু ঝাপসা করে দেয় ও যা-কিছু দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে তাদের মধ্যে সাধক পার্থক্যের বিচার করবেন, এই হবে তাঁর "নৈতিকতার" সারতত্ত্ব।

উত্তরের অভ্যাস

প্রাণের আবিষ্কারের অভিযানে সাধক প্রথমে যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন তা হল মনের এক অংশ যার কাজ মনে হয় শুধু রূপ দেওয়া (এবং যথার্থ বলে প্রতিপাদন করা) আমাদের প্রেরণাগুলিকে, আমাদের আবেগগুলিকে, আমাদের কামনাগুলিকে। একে শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেছেন *প্রাণিক মন*। আমরা কিন্তু মনের নীরবতার প্রয়োজনীয়তা দেখেছি এবং আমাদের নীরবতার অনুশাসন আমরা বিস্তৃত করে দেব এই নিম্নতর মনের স্তরের দিকে। একবার তা হয়ে গেলে, সেখানেও আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই : আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্পন্দন আবির্ভূত হয় তাদের সত্যকার আলোকে, তাদের সত্যকার স্তরে, তাদের সকল মানসিক অলংকরণ ছাড়াই, এবং সর্বোপরি, আমরা দেখতে পারি তাদের আগমন। নীরবতার এই এলাকার মধ্যে যা আমরা এখন হয়ে উঠেছি, *যে-কোনো উপাদানের— মানসিক, প্রাণিক বা অন্যপ্রকার— ন্যূনতম গতিবিধিও* আমাদের উপর কাজ করে সংকেতের মতো ; আমরা তৎক্ষণাৎ জানি যে, কিছু একটা স্পর্শ করেছে বাতাবরণকে। এইভাবে আমরা স্বতঃস্ফূর্তরূপে হই সচেতন অসংখ্য স্পন্দনের বিষয়ে, যা লোকেরা অনবরত নির্গত করে সে-বিষয়ে কিছু অনুভব না করেই এবং আমরা জানি কী ঘটছে বা কীরকম লোক আমাদের সম্মুখে —কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বাইরের অগভীর আবরণের সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র স্পন্দনশীল বাস্তবতাটির কোনো সম্পর্ক নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে যায় : আমরা আমাদের পছন্দ বা অপছন্দের উদ্‌বেগ বা অস্বস্তির কারণ বুঝতে পারি, আমরা সব-কিছু শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে সক্ষম হই। আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলোর সংশোধন করতে পারি, সাহায্যকারী স্পন্দনগুলো গ্রহণ করতে পারি, যা-কিছু আমাদের উপর অন্ধকার নিয়ে আসে, সে-সব প্রত্যাখ্যান করতে পারি, যা-কিছু আমাদের ক্ষতি করতে চায়, সে-সব ব্যর্থ করতে পারি। কারণ, আমরা এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার লক্ষ্য করি : আমাদের আন্তর নীরবতা শক্তিশালী। যদি অনুপ্রবেশকামী স্পন্দনের প্রতি উত্তর না দিয়ে আমরা

চরম আন্তরিক নিশ্চলতা অবলম্বন করি, তাহলে আমরা দেখি এই নিশ্চলতা স্পন্দনের *বিলয়সাধন করে।* আমাদের চারধারে এ এক বরফের মাঠের মতো, যেখানে সকলপ্রভাব জমাট বেঁধে যায়, শক্তিহীন হয়ে যায়, আমরা একটি সরল উদাহরণ নিতে পারি, ক্রোধের : আমাদের সম্মুখের ব্যক্তির সঙ্গে এক হয়ে ভিতরে ভিতরে স্পন্দিত হওয়ার পরিবর্তে আমরা যদি অন্তরে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল থাকি, তাহলে আমরা দেখি, সেই ব্যক্তির ক্রোধ ধীরে ধীরে ধোঁয়ার মতো বিলীন হয়ে যায়। শ্রীমা একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, এই আন্তরিক নিশ্চলতা, উত্তর না দেওয়ার এই শক্তি স্তব্ধ করে দিতে পারে হত্যাকারীর হস্ত, বা সর্পের লম্ফপ্রদান। যাই হোক, আমরা যখন ভিতরে উত্তপ্ত হয়ে ফুটতে থাকি, তখন একটা অনুভূতিহীন মুখোশ পরিধানে কোনো কাজ হবে না : স্পন্দনগুলোকে আমরা প্রতারিত করতে পারব না (যা পশুরা ভালোভাবেই জানে) ; প্রশ্ন তথাকথিত আত্মসংযমের নয়, যা শুধু প্রতীয়মানেরই নিয়ন্ত্রণ, বরং প্রশ্ন হল প্রকৃত অভ্যন্তরীণ কর্তৃত্বের। এই নীরবতা যে-কোনো স্পন্দনকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। এই সহজ কারণের জন্য যে, সকল স্পন্দনই *সংক্রামক*, তাদের প্রকৃতি যেমনই হোক (উচ্চতম স্পন্দন নিম্নতমের মতোই সংক্রামক, তা আমাদেরই লক্ষ্য করা উচিত : এইভাবেই একজন গুরু একজন শিষ্যকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা শক্তি সঞ্চারিত করেন), এবং সংক্রমণটি আমরা গ্রহণ করি কি না তা আমাদের উপর নির্ভর করে ; আমরা যদি ভয় পেয়ে যাই, তার অর্থ হল আমরা ইতিমধ্যে স্বীকার করে ফেলেছি সংক্রমণটিকে, এবং ফলত স্বীকার করে ফেলেছি ক্রুদ্ধ মানুষের প্রহার বা সর্পের দংশন। (কেউ কেউ ভালোবেসেও প্রহার স্বীকার করতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো, গোরুর গাড়ির চালক তার বলদকে উৎপীড়ন করবার দৃশ্যেই যিনি হঠাৎ ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন ও নিজেকে পেয়েছিলেন কশাঘাতে জর্জরিত ও রক্তাক্ত, তাঁর পিঠ ছিল কশাঘাত-চিহ্নে পূর্ণ।) শারীরিক যন্ত্রণার বিষয়ে একই কথা প্রযোজ্য : একটি যন্ত্রণাপূর্ণ স্পন্দনের সংক্রমণ আমাদের অভিভূত করবার জন্য আমরা সম্মতিপ্রদান করতে পারি, কিংবা আমরা সীমিত করতে পারি যন্ত্রণাযুক্ত স্থানটিকে এবং পরিণামস্বরূপ আমাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অনুযায়ী আমরা পীড়িত স্থান হতে চেতনার সংযোগ অপসারিত করে যন্ত্রণাকে বিলুপ্ত করতে পারি। নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অর্জনের মূলসূত্রটি হল নীরবতা সবসময় প্রত্যেক স্তরে, কারণ নীরবতায় আমরা স্পন্দনগুলোকে বিবেচনায় আনতে পারি, এবং বিবচেনায় আনবার অর্থ তাদের ধরতে সক্ষম হওয়া। অসংখ্য ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে, এবং এ কথা আরও গুরুত্বপূর্ণ, অসংখ্য সুযোগ আছে প্রগতির, সাধারণ বাইরের জীবন (যা শুধু তাদেরই জন্য সাধারণ, যারা সাধারণভাবে জীবনযাপন করে), স্পন্দনগুলোর পরিচালনায় এক বিশাল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়, যেজন্য শ্রীঅরবিন্দ সবসময় চাইতেন তাঁর যোগ জীবনের সঙ্গে জড়িত অবস্থায়

সাধিত হোক। একাকী, আমরা খুব সহজেই আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ভ্রান্তির মধ্যে বাস করতে পারব।

নীরবতার বা আন্তর নিশ্চলতার এই শক্তির কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগও আছে, যখন আমরা আমাদের নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক জীবনের দিকে ফিরি। আমরা জানি, প্রাণ অনেক দুঃখদুর্দশা ও বিশৃঙ্খলার স্থান, কিন্তু এ এক প্রবল শক্তিরও উৎস ; এবং কিছুটা ভারতীয় প্রবাদের হাঁসের মতো, যা জল থেকে দুধ আলাদা করতে পারত, আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত প্রাণশক্তিকে তার জটিলতা হতে বিচ্ছিন্ন করা, আমাদের নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করে, জীবন হতে। বলা বাহুল্য, আসল জটিলতাগুলো জীবনে নেই, আছে আমাদের মধ্যে এবং বাইরের সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আমরা যা তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি। এখন, প্রধান অসুবিধা হল, যা-কিছু এ থেকে নির্গত হয় বলে প্রতীয়মান হয় ভ্রান্তিবশত তার সঙ্গেই এ নিজেকে একীভূত করে দেয় : এ বলে, "আমার" ব্যথা, "আমার" বিষাদ, "আমার" ব্যক্তিত্ব, "আমার" আকাঙ্ক্ষা এবং মনে করে সে সকল প্রকারের ছোটো ছোটো 'আমি', যা সে নয়। কিন্তু যদি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এ সমস্ত ব্যাপার আমাদেরই, তাহলে স্পষ্টত আমাদের করণীয় কিছুই নেই, শুধু এই ক্ষুদ্র সমষ্টিকে সহ্য করা ব্যতীত হিস্টিরিয়া-জনিত অঙ্গ-আক্ষেপের সমাপ্তি পর্যন্ত। কিন্তু আমরা যদি অন্তরে নীরব হয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখব, এসব কিছুই আমাদের নয়। এবং আবারও দেখব, সব-কিছুই বাইরে থেকে আসে। আমরা সেই একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে সংযোগস্থাপন করি, প্রত্যেক সংক্রমণকেই আমরা অনুমতি দিই আমাদের পরাভূত করতে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আছি কারও সান্নিধ্যে, অন্তরে সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চল হয়ে (যা আমাদের সাধারণভাবে বাইরে কথাবার্তা বলতে বা কাজ করতে বাধা দেয় না) ; এই স্বচ্ছতায় আমরা অনুভব করতে পারি হঠাৎ, কিছু-একটা আমাদের আকর্ষণ করছে বা আমাদের ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, আমাদের চারধারে একটা চাপের মতো বা স্পন্দনের মতো, যা অনুভূত হতে পারে একটা সংজ্ঞাতীত অস্বস্তির মতো ; আমরা যদি স্পন্দনটির কবলিত হই, তাহলে কয়েক মিনিট পরে নিজেদের পাব বিষাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, কোনো বিশেষ কামনায় বা অস্থিরতায় পূর্ণ— আমরা সংক্রমণটি স্পর্শ করেছি। কখনও কখনও এমনও হয় যে, কোনো স্পন্দন নয়, বরং সমগ্র তরঙ্গমালা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমন ঘটবার জন্য কারও সান্নিধ্য যে প্রয়োজন তা নয় : হিমালয়ে একাকী অবস্থান করেও আমরা ঠিক একই ভাবে জগতের স্পন্দন পেতে পারি। এসবের মধ্যে, "আমার" অস্থিরতা, "আমার" কামনা কোথায়, শুধু অবিরতভাবে একই প্রেরণার সঙ্গে সংযোগস্থাপনের এক অভ্যাস ছাড়া? কিন্তু যে অন্বেষী নীরবতার অনুশীলন

করেন, তিনি পুনর্বার এই *মিথ্যা অভিন্নতায়*[২] ধরা পড়বার জন্য নিজেকে ছাড়বেন না ; নিজের চারধারে তিনি আবিষ্কার করেছেন যা শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষায় *পরিচেতন, পারিপার্শ্বিক চেতনা*[৩] চারধারে বরফের এই মাঠ, যা হতে পারে অনেক জ্যোতির্ময়, শক্তিশালী ও দৃঢ়, অথবা হতে পারে অন্ধকার, কলুষিত এবং কখনও কখনও সম্পূর্ণরূপে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে পারে, আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভর করে। এ একপ্রকার ব্যক্তিগত বাতাবরণ, এক *সুরক্ষামূলক আবরণ,* যা যথেষ্ট সংবেদনশীল, উদাহরণস্বরূপ, নিকটে কোনো ব্যক্তির আসন্ন হওয়ার সন্ধানলাভের জন্য আমাদের সামর্থ্যপ্রদানে কিংবা আমাদের আঘাত করবার উদ্দেশ্যে উদ্যত কোনো দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়ায়। ঠিক সেইখানেই মনস্তাত্ত্বিক স্পন্দনগুলোকে অনুভব ক'রে আমরা অধিকারে আনতে পারি, তারা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবার *পূর্বে।* সাধারণত আন্তরিক নৈকট্যের দরুন, তাদের ইচ্ছানুযায়ী তারা স্বচ্ছন্দগতিতে ভিতরে প্রবেশ করতে এত অভ্যস্ত যে, আমরা তাদের আসাটাও অনুভব করতে পারি না : অধিকারগ্রহণ ও অভিন্নতাবোধের প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিক হয়। কিন্তু আমাদের নীরবতার অনুশীলন আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছে এক স্বচ্ছতা, যা যথেষ্ট তাদের আগমন দেখবার জন্য, তাদের রাস্তায় প্রতিরোধ করে তাদের প্রত্যাখ্যান করবার জন্য। আমরা তাদের প্রত্যাখ্যান করবার পর কখনও কখনও তারা পারিপার্শ্বিক চেতনার আশে-পাশে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় থাকে*, প্রবেশ করবার জন্য সামান্যতম সুযোগের অপেক্ষায়— আমরা খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা অথবা বিষাদ আমাদের চারধারে *শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে-*
–কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে (হস্তক্ষেপ না করে) এই স্পন্দনগুলো তাদের বল হারায়, এবং, ফলত আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছি, এবং একদিন আমরা সানন্দে লক্ষ্য করি যে, কোনো কোনো স্পন্দন, যা অদম্য মনে হতো, আমাদের আর প্রভাবিত করছে না, যেন তাদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে, এবং চলচ্চিত্রের পরদার মতো ক্ষণিকের মধ্যেই চলে যায় তারা ; এমন-কি, সময়ের পূর্বেই আমরা দেখতে পারি, কিছুটা ঔৎসুক্যের সঙ্গেই, আরও একবার তার তুচ্ছ খেলাটি খেলবার জন্য দৌরাত্ম্যটি উদ্যত। অন্যথা, আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা নির্ধারিত সময়ে আমাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, কিংবা পুনরাবৃত্ত হয় চক্রাকারে— একেই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা অভিহিত করেন *রূপায়ণ*** অর্থাৎ

* যদি না তারা অবচেতনে নিমগ্ন হয়ে যায়। আমরা সে সম্ভাবনার কথা পরে আলোচনা করব, যখন আমরা সে অঞ্চলের বিষয়ে অধ্যয়ন করব।

** Formation : মনের সৃষ্টি, মানস-সৃজন, রূপায়ণ।

স্পন্দনগুলোর এক সংমিশ্রণ যা অভ্যাসগত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পরিশেষে একপ্রকার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে। এবং আমরা দেখি আমরা যখন এই রূপায়ণগুলির সঙ্গে সংযোগস্থাপন করি, তখন *গ্রামোফোনের রেকর্ডের*[৪] মতো আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত না ঘুরে তারা আর বন্ধ হয় না। আমাদেরই নিষ্পত্তি নিতে হবে যে, আমরা 'এগিয়ে যেতে' রাজি কিনা। অনুভূতির হাজার হাজার সম্ভাবনা আছে, পর্যবেক্ষণের জন্য এ এক সম্পূর্ণ জগৎ। কিন্তু আমরা এক অপরিহার্য আবিষ্কার করেছি যে, এসবের মধ্যে "আমাদের" খুব কম অংশই আছে, শুধু *উত্তরের এক অভ্যাস*[৫] ছাড়া। অজ্ঞতাবশত যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রাণিক স্পন্দনগুলোর সঙ্গে নিজেদের একীভূত করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রকৃতিতে কোনো কিছুর পরিবর্তন করা অসম্ভব, অঙ্গচ্ছেদ ব্যতীত, কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা দেখি এসব কী করে সংঘটিত হয়, সেই মুহূর্ত হতেই সব-কিছুর পরিবর্তন সম্ভব, কারণ, আমরা বেছে নিতে পারি উত্তর না দেওয়া, আমরা নীরবতার ব্যবহার করতে পারি বিদীর্ণকারী স্পন্দনগুলোকে বিলীন করে দেওয়ার জন্য, এবং অন্য কোথাও সংযোগস্থাপন করতে পারি, যদি আমরা তা চাই। অনেক পুরোনো প্রবাদ সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন করা যেতে পারে। চিরকালের জন্য কোনো কিছুই নির্ধারিত নেই, আমাদের চেতনায় বা প্রকৃতিতে সব-কিছুই শুধু শক্তিগুলোর বা স্পন্দনগুলোর এক খেলা, যা তাদের নিয়মিত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এক "প্রাকৃতিক" প্রয়োজন হওয়ার এক ভ্রম সৃষ্টি করে। সেজন্য শ্রীঅরবিন্দের যোগে *প্রতিক্রিয়াশীল চেতনার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা*[৬]র বিষয় বিবেচিত হয়েছে।

কার্যপ্রণালীটি আবিষ্কার করবার পর, আমরা সেই সময়ই দেখতে পাই প্রাণের নিয়ন্ত্রণের আসল পদ্ধতি, এক পদ্ধতি যা অস্ত্র-চিকিৎসামূলক নয়, বরং প্রশান্তিময়। প্রাণের অসুবিধাকে আমরা পরাভূত করতে পারব না, প্রাণশক্তি দিয়ে সংগ্রাম ক'রে, যা আমাদের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়, তার বিশ্বময় অস্তিত্বকে নিঃশেষ না করেই; আমরা অন্য এক অবস্থান গ্রহণ করে নীরব প্রশান্তি দ্বারা তাকে ব্যর্থ করে পরাভূত করতে পারব। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক শিষ্যকে লিখেছিলেন, *তুমি যদি শান্তি লাভ কর, তাহলে প্রাণের বিশোধন সহজ হয়। তুমি যদি শুধুই বারবার পরিষ্কার করতে থাকো, ও অন্য কিছুই না করো, তাহলে তোমার গতি হয় অনেক ধীর— কারণ প্রাণ পুনর্বার অপরিষ্কার হয়ে যায় ও তাকে শতবার বিশোধিত করবার প্রয়োজন হয়। শান্তি এমন কিছু যা নিজেই বিশুদ্ধ, সুতরাং তার প্রাপ্তি, তোমার লক্ষ্যসাধনের জন্য এক নিশ্চয়াত্মক পথ। মলিনতার সন্ধান করে তাকে পরিষ্কার করা এক বিয়োগাত্মক পথ।*[৭]

বিরোধী শক্তি

আরও একটি অসুবিধা আছে, কারণ, মানুষদের নিকট হতে বা বিশ্বপ্রাণ হতে যে স্পন্দনগুলো আসে, তারাই শুধু যে অন্বেষীর জন্য উপদ্রবের সৃষ্টি করে তাই নয়— তা ছাড়া, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব, কারণ কোনো ব্যক্তি, বিশ্বপ্রাণ বা বিশ্বমনের জন্য শুধু এক *ভূমিগত অবস্থানস্থল*[৮], যেখানে স্পন্দনগুলো অবিরত ইতস্তত যাওয়া-আসা করে এক সীমাবদ্ধ গতিপথের মধ্যে। কিন্তু আরও এক প্রকারের স্পন্দন আছে, যাদের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যারা তাদের আকস্মিকতা ও হিংস্রতার জন্য লক্ষণীয় : অন্বেষী আক্ষরিকভাবে অনুভব করবেন যে, তাঁর উপর তারা পুঞ্জীভূতভাবে আকস্মিকরূপে সবেগে আক্রমণ করবে ; কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি আর তাঁর "পুরোনো নিজত্বের" মধ্যে থাকেন না, এবং সম্পূর্ণভাবে ভুলে যান তাঁর অস্তিত্বের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রচেষ্টা, তাঁর লক্ষ্য, যেন সব-কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে সাফ হয়ে গেছে, সব তাৎপর্য হারিয়ে গেছে, হয়ে গেছে অসংলগ্ন। এসবকেই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা অভিহিত করেন *বিরোধী শক্তিরাজি*। তারা প্রচণ্ডভাবে সচেতন শক্তি, আপাতদৃষ্টিতে যাদের একমাত্র লক্ষ্য হল অন্বেষীকে হতোৎসাহ ক'রে যে পথ তিনি নিজের জন্য নির্বাচিত করেছেন তা হতে ভিন্নমুখী করা। তাদের উপস্থিতির প্রথম চিহ্ন সহজেই লক্ষ্য করা যেতে পারে : আনন্দ মেঘাচ্ছন্ন, চেতনা মেঘাচ্ছন্ন, সব-কিছু এক নাটকীয় বাতাবরণে আবৃত হয়ে যায়। এই শত্রুর উপস্থিতিব এক সুনিশ্চিত চিহ্ন হল দুঃখ। এসব শক্তি বারংবার নাটক সৃষ্টি করতে ভালোবাসে : সেটাই তাদের পথ, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ব্যাপকতম ধ্বংসসাধন করা, কারণ তারা আমাদেরই অন্তর্নিহিত এক প্রাচীন দলীয় সহচরের সঙ্গে খেলে, যে সহচর নাটক ভালো না বেসে থাকতে পারে না অথচ পরিত্রাণের জন্য চিৎকার করে। সাধারণত তাদের প্রথম প্রয়াস হল আমাদের প্রেরিত করা এমন সব সিদ্ধান্তগ্রহণে, যা আকস্মিক, চরম, যা প্রত্যাহার করা যায় না, যা আমাদের নির্বাচিত পথ হতে যতদূর সম্ভব দূরে নিয়ে যাবে— এ ক্রমবর্ধমানভাবে চাপদায়ক, এক তীব্র স্পন্দন যা দাবি করে এক *অবিলম্ব* প্রতিপালন ; অন্যথা, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে আমাদের অন্বেষণের সমগ্র প্রণালীটিকে তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়, আমাদের নিকট এ কথা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে যে আমরা নিজেদের ভ্রান্তপথে চালিত করছি, এবং আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হবে। অনেক সময়, তারা নিয়ে আসে এক বিপদময় অবস্থা, আমাদের অন্তর্নিহিত অন্য এক সুবিদিত দলীয় সহচরের সঙ্গে খেলায় রত হয়ে, যাকে শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেছেন, *দুঃখের মানবীয় বিগ্রহ : এক ব্যক্তি, যে নিজেকে বিষাদ ও দুঃখের পূর্ণাঙ্গ আবরণে সাতবার আবৃত করেছে, এবং যে নিজের অস্তিত্বের যাথার্থ্য অনুভব করতে পারে না,*

যদি না সে বিশালভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়।[৯] বিশৃঙ্খলার এসব স্পন্দন যাদের আমরা বলি "আমাদের" দুঃখ, "আমাদের" কষ্ট তাদের অব্যবহিত ফল হল আমাদের রক্ষাকারী বরফের মাঠকে দুর্বল করে দেওয়া বা খণ্ডবিখণ্ড করে দেওয়া, এবং বিরোধী শক্তিদের জন্য প্রসারিতভাবে দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া। আমাদের আক্রমণ করবার জন্য তাদের সহস্রাধিক পথ আছে— কারণ, এ সত্যিই এক আক্রমণ— এবং আমরা যতই দৃঢ়সংকল্প হই, তারা ততই কঠোর হয়। এটা শোনা যেতে পারে অতিশয়োক্তির মতো, কিন্তু যে কখনও অগ্রগতির জন্য প্রচেষ্টা করেনি, সেই শুধু এ কথায় সন্দেহ করতে পারবে ; সাধারণ দলের সঙ্গে যতক্ষণ আমরা ঘুরে বেড়াই ততক্ষণ জীবন অপেক্ষাকৃত সহজ, তার উত্থান-পতনের সঙ্গে —অনেক বেশি পতন নয়, কিন্তু অনেক বেশি উত্থানও নয়। যখনই আমরা এই ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট পথের মধ্য হতে বেরিয়ে যেতে চাই, তখনই হাজার শক্তি উঠে পড়ে, খুবই ব্যগ্র তারা এই দেখতে যে, আমরা "অন্য সকলের মতো" আচরণ করি : আমরা আবিষ্কার করি, কারা-অবরোধটি কত সুসংগঠিত। আমরা আরও আবিষ্কার করি, যত ঊর্ধ্বে আমরা উঠতে পারি, ততই নিম্নে আমরা নামতে পারি, এবং আমাদের নিম্নাবরোহণ আমাদের ঊর্ধ্বারোহণের শক্তির ঠিক অনুপাতেই হয়ে থাকে— আমাদের দৃষ্টি হতে অনেক আবরণই অপসৃত হয়। আমরা যদি কিছুটা আন্তরিক হই, তাহলে দেখি যে আমরা সব-কিছুই করতে সমর্থ, এবং সকল দিক্ বিচার করলে, আমাদের *পুণ্য এক ছলনাপূর্ণ অপবিত্রতা*[১০] শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়। যে কখনও সম্মুখ-ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করে নি, সেই শুধু এ বিষয়ে কোনো বিভ্রান্তি এখনও পোষণ করে।

বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে সকল প্রকারের দানবীয় ও "অন্ধকারময়" আখ্যা দেওয়া হয়েছে এই বিরোধী শক্তিদের, যেন তাদের একমাত্র কাজ হল সাধকের ক্ষতিসাধন করা ও ভালো লোকদের কষ্ট দেওয়া, শুধু কষ্ট দেওয়ার জন্যই। কিন্তু বাস্তবিকতা কিছুটা ভিন্ন, কারণ শয়তান কোথায় আছে, যদি না থাকে ভগবানের মধ্যে? যদি সে ভগবানের মধ্যে নেই, তাহলে ভগবানের কিছুই নেই বলা যেতে পারে, কারণ এই জগৎ যথেষ্ট মন্দ (এবং অন্য কয়েকটি জগৎও মন্দ), এবং প্রায় কিছুই নেই যা বিশুদ্ধ, শুধু এক পরিসরবিহীন নিষ্কলঙ্ক গাণিতিক বিন্দু ব্যতীত। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের দেখায়, এই ধ্বংসকারক শক্তিগুলির স্থান রয়েছে বিশ্বের পরিচালনায়, এবং তারা ধ্বংসাত্মক শুধু আমাদের ক্ষুদ্র চেতনার সাময়িক মানদণ্ডে— তা হলেও তাদের ধ্বংসসাধনের এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। প্রথমে, আমাদের বর্মের যেখানে ছিদ্র আছে, সেখানেই তারা আমাদের ধরে : যদি আমরা দৃঢ় ও অখণ্ডিত হয়ে থাকি, তাহলে তারা এক মুহূর্তও আমাদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না। তাছাড়া, শয়তানের বিরুদ্ধে বা জগতের মন্দত্বের বিরুদ্ধে নালিশ না করে, দোষারোপ না করে যদি আমরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিপাত

করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এই আক্রমণগুলো আমাদের অসংখ্য সাধুম্মন্য আত্মপ্রবঞ্চনার কোনো একটিকে অনাবৃত করেছে, অথবা শ্রীমার ভাষায়, *না দেখবার জন্য বস্তুগুলোর উপর আমরা যে সামান্য আচ্ছাদন নিক্ষেপ করি,* তাদেরই কোনো একটি টেনে তুলেছে। এই সামান্য আচ্ছাদনগুলি, এবং বৃহৎ আচ্ছাদনগুলিও শুধু আমাদের নিজেদেরই ক্ষত আবৃত করে, তা নয়, তারা জগতের সর্বত্র আছে, তার সামান্য প্রবঞ্চনাগুলোর উপরেও, এবং বৃহৎ আত্মাভিমানের উপরেও। যদি কখনও কখনও এই ধ্বংসকারী শক্তিরাজি আচ্ছাদনগুলোকে একটু তীব্রভাবে টেনে দেয়, তা শুধু খামখেয়ালিভাবে নয়, বা উচ্ছৃঙ্খল অশুভ কামনাবশত নয়, বরং আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য, ও আমাদের বাধ্য করবার জন্য এক পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যা আমরা উপেক্ষা করেছি ; কারণ, যখনই সত্যের একটি কণা বা আদর্শের একটি তৃণ আমরা হাতে পেয়েছি, তখনই তাকে তালাচাবি দিয়ে এক বায়ুরুদ্ধ ত্রুটিহীন অট্টালিকায় বন্ধ করে, সেখান থেকে আর না নড়বার এক দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা আমাদের হয়েছে। অন্যশব্দে, ব্যক্তির জন্য তথা বিশ্বের জন্য, কিছু মাত্রায় অশিষ্ট এই শক্তিরাজি অগ্রগতিরই যন্ত্র। কুলার্ণব তন্ত্রে প্রজ্ঞা সহকারে বলা হয়েছে, "যা দিয়ে তোমার পতন হয়, তাই দিয়ে তোমার উত্থানও হবে।" আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফল ও খামখেয়ালি "বিপর্যয়গুলো" যখন আসে ও আমাদের হৃদয়ে বা আমাদের শরীরে আঘাত করে, আমরা তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, "শত্রুকে" দোষ দিই, কিন্তু *এটা কি সম্ভব নয় যে, আত্মা স্বয়ং— বাইরের মন নয়, অন্তরের পুরুষ —এসব-কিছু গ্রহণ করেছে, নির্বাচিত করেছে, তার অভিবৃদ্ধির অংশরূপে, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা দ্রুতবেগে অর্জনের জন্য, পথ কেটে চলবার জন্য, এমন-কি বাইরের জীবন ও শরীরের প্রভূত ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও বা মূল্য দিয়েও? অভিবৃদ্ধিশীল আত্মার জন্য, আমাদের অন্তঃস্থ পুরুষের জন্য, অসুবিধা, বাধাবিঘ্ন, আক্রমণ হতে পারে না কি অভিবৃদ্ধি, অতিরিক্ত বল, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক বিজয়ের অনুশীলনীর এক উপায়?*[১১] আমরা অশুভের বিরুদ্ধে চিৎকার করি, কিন্তু যদি তা না থাকত আমাদের অবরোধ করবার জন্য, আমাদের প্রতিরোধ করবার জন্য, তাহলে অনেকদিন পূর্বেই আমরা শাশ্বত সত্যকে পরিণত করতাম এক অজেয় সুবিন্যস্ত সামান্য মূল্যহীন বক্তব্যে। সত্য এগিয়ে চলে, সে পদযুক্ত, এবং অন্ধকারের রাজপুত্রেরা বিরাজমান, কিছুটা নিষ্ঠুরভাবেই সুনিশ্চিত করবার জন্য যে, সে যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। *ভগবানের অস্বীকৃতি তার সমর্থনের মতোই আমাদের নিকট উপযোগী*[১২], শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন। *শয়তান তখনই লুপ্ত হবে, যখন তার প্রয়োজন আর থাকবে না জগতে ; এবং আমরা ভালোভাবেই জানি যে তার প্রয়োজন আছে, যেমন সোনার জন্য প্রয়োজন পরশ পাথরের, সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য যে আমরা খাঁটি,* মন্তব্য করেছেন শ্রীমা।

কারণ, মোটের উপর ভগবান বোধহয় এই জগতের বাইরে অবস্থিত একটি বিশুদ্ধ গাণিতিক বিন্দু নন : বোধহয় তিনিই এই সমগ্র জগৎ, এবং এই সমস্ত অশুদ্ধতা, যা প্রয়াস করে, কষ্ট স্বীকার করে পূর্ণ হওয়ার জন্য, এবং পৃথিবীতে স্বয়ংকেই স্মরণ করবার জন্য।

এ সকল বিরোধী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার পদ্ধতি অন্যান্য স্পন্দনের নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সঙ্গে সমান : নীরবতা, অন্তরের প্রশান্তি, যা ঝড়টিকে উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতে দেয়। তাদের আক্রমণ বিলীন করায় আমরা প্রথমবার হয়তো সফল হতে নাও পারি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আক্রমণগুলো সম্মুখসত্তায় আরও সংঘটিত হয় বলে মনে হবে ; আমরা বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত হতে পারি, তথাপি গভীর তলদেশে আমরা অনুভব করব আমাদের অন্তর্নিহিত "সাক্ষীস্বরূপ"কে, যিনি অবিচলিত— তিনি কখনোই বিচলিত নন, দুঃখিত নন। আমরা পড়ে যাই ও আবার উঠে দাঁড়াই আমাদের পায়ে, প্রত্যেকবার বলবত্তর। একমাত্র অপরাধ হল নিরুৎসাহ হওয়া। কার্যত পূর্ণযোগের সাধক অন্যদের অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবাধীন হন (শ্রীঅরবিন্দ অনেক সময় বলতেন তাঁর যোগ এক *যুদ্ধ* [১৩]), কারণ সাধক চান তাঁর চেতনায় *সব-কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে,* কিছুই বিচ্ছিন্ন না করে, কারণ শুধুমাত্র একটিই পথ নেই, ঊর্ধ্বস্থ আনন্দের অভিমুখে বলপূর্বক উন্মোচনের জন্য ঐশ্বর্যের শুধুমাত্র একটি প্রহরীকেই অতিক্রম করতে হবে না, বরং অনেক পথ রয়েছে, ডান দিকে, বাঁ দিকে, নিম্নে, এবং আমাদের সত্তার প্রত্যেক স্তরে, এবং অনেক ঐশ্বর্য আবিষ্কার করতে হবে।

যথার্থ প্রাণ

মানুষের সম্মুখ-সত্তার অশান্তিপূর্ণ জীবনের অন্তরালে স্থিত যথার্থ প্রাণশক্তিকে যদি আমরা আবিষ্কার করতে চাই, তাহলে একটি পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে। আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য-সমূহের অনুসারে, এই অতিক্রমণের সঙ্গে বিজড়িত সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগ (প্রসঙ্গক্রমে যা প্রধানত তপস্বীর নিজের বিষয়ে উচ্চ ধারণা বৃদ্ধির জন্য উপযোগী), কিন্তু আমরা অন্যকিছুর সন্ধানে আছি : আমরা জীবনকে পরিত্যাগ করতে চাই না, বরং তাকে প্রসারিত করতে চাই ; আমরা হাইড্রোজেনের জন্য অক্সিজেন পরিত্যাগ করতে চাই না, কিংবা তার বিপরীতও চাই না, বরং চাই চেতনার গঠন অধ্যয়ন করতে, এবং দেখতে কোন্ অবস্থায় এ প্রদান করবে আরও পরিষ্কার স্বচ্ছতা ও উত্তম কার্যকারিতা। যোগ *জীবনের মহত্তর প্রয়োগনৈপুণ্য* [১৪] বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীমা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন : *যে তপস্বীর উক্তি 'আমি কিছু চাই না', তাঁর মনোভাব ও যে সংসারী মানুষের উক্তি 'আমি এই বস্তু চাই', তাঁর মনোভাব অভিন্ন। একজন ত্যাগের*

প্রতি আসক্ত, অন্যজন আসক্ত তাঁর বৈষয়িক অধিকারে। প্রকৃতপক্ষে যে পর্যন্ত আমরা কিছু একটা ত্যাগ করবার প্রয়োজন বোধ করি, সে পর্যন্ত আমরা প্রস্তুত নই, সে পর্যন্ত আমরা দ্বৈতভাবের মধ্যে রয়েছি আকণ্ঠনিমগ্ন হয়ে। বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন মত ব্যক্ত করতে পারে। প্রথমত, যদি প্রাণকে বলা হয়, তুমি নিশ্চয় এটা ত্যাগ করবে, সেটা পরিহার করবে, তাই যথেষ্ট হবে তার পক্ষে ঠিক সেই উগ্রকামনায় তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য ; কিন্তু যদি সে ত্যাগের জন্য স্বীকৃতি দেয়, আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি যে, সে আশা করে দশগুণ ফিরে পাওয়ার জন্য, এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে যেমন হয়, শীঘ্রই সে স্বল্পের পরিবর্তে বৃহৎকে অধিকার করবে, কারণ উভয় ব্যাপারেই সে হল অভিনেতা, নকারাত্মকভাবেই হোক বা সকারাত্মকভাবে— কারণ উভয় দিক্‌ই সমানভাবে তার জন্য পুষ্টিসাধক। আমরা যদি এই সহজ কথাটির আবরণ উন্মোচন কবি, আমরা তাহলে বুঝতে পারব প্রাণের সম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি, ঊর্ধ্ব হতে মূল পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের মানবিক ভাবপ্রবণতার প্রতি এর চরম উদাসীনতা— দুঃখ তাকে ততই স্পর্শ করে যত স্পর্শ করে হর্ষ, অভাব তাকে ততই স্পর্শ করে যত করে প্রাচুর্য, ঘৃণা তাকে ততই স্পর্শ করে যত করে প্রেম, যন্ত্রণা তত স্পর্শ যত করে পরমানন্দ : সকল ক্ষেত্রেই এ সফল হয়ে থাকে। কাবণ একটিই শক্তি আছে, একই শক্তি দুঃখে ও সুখে। আমাদের সম্মুখ ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতারাজির প্রস্তুতকারী সকল অনুভূতির কোনো ব্যতিক্রম বিনা, এক চরম দ্বৈতবোধ আছে, যা এইভাবে এক রূঢ় আলোকে প্রকাশিত হয়। আমাদের প্রত্যেক অনুভূতিই অন্য এক অনুভূতির বিপরীত এবং যে-কোনো মুহূর্তে তার পরিবর্তন হতে পারে তার "বিপরীতে"— এক ভগ্নস্বপ্ন মানবপ্রেমী (অথবা বরং মানবপ্রেমীর অন্তর্নিহিত ভগ্নস্বপ্ন প্রাণ) হয়ে যান এক নৈরাশ্যবাদী, দিব্যবাণীর উৎসাহী প্রচারক মরুপ্রান্তরে অপসৃত হয়ে যান, একনিষ্ঠ নাস্তিক হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক, এবং নিষ্পাপ মানুষ নিন্দিত এমন সব কারণে যা তিনি করতেও সাহস পান না। এখানে আমরা প্রাণসত্তার উপরিভাগের অন্য এক ত্রুটি স্পর্শ করি : এ *এক অসংশোধনীয় ভণ্ড* [১৫], সকল ভূমিকাই এর মানানসই হয়— আমাদের নিজেদের মায়ের মৃত্যুও এর সুখানুভব এড়াতে পারে কি না তাও আমরা ঠিক জানি না। যতবার আমরা চিৎকার করে উঠি অস্বীকৃতিতে, বা ব্যথায় বা অন্য কোনো কারণে— আমরা শুনতে পাই আমাদের মধ্যে বানরের চাপা হাসি। আমরা সবাই এ কথা জানি, তথাপি আমরা চিরকালের মতো ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। এর সহজাত দক্ষতার পরাকাষ্ঠার জন্য, সব-কিছুকেই কুয়াশায় আচ্ছাদিত করায় প্রাণের শ্রেষ্ঠতা আছে —এ কুয়াশার অবতার— নিজের অনুভূতির শক্তিকে এ সত্যের শক্তি মনে করে ভ্রমবশত— এ *সকল উচ্চতার পরিবর্তে অতল গহ্বরের মধ্যে উপস্থাপিত করে এক ধূম্রোদ্‌গীরণকারী আগ্নেয় গিরির গহ্বর।* [১৬]

শীঘ্রই অন্য একটি পর্যবেক্ষিত বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা প্রথমটিরই অনুসারী : তা হল, অন্যদের সাহায্য করায় প্রাণের চরম শক্তিহীনতা, এমন-কি শুধু অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনে ; ব্যতিক্রম শুধু যখন অহংকারগুলোর সমাবেশ হয। আমাদের দ্বারা পাঠানো বা আমাদের দ্বারা প্রসারিত কোনো একটি প্রাণিক স্পন্দন নেই যা অন্য ব্যক্তির মধ্যে তৎক্ষণাৎ তার বিপরীতে পরিণত না হতে পারে ; আমাদের প্রয়োজন কারও জন্যে শুধু শুভেচ্ছা রাখা, তার যথাযথ প্রতিকূল মনোভাবের বা যথাযথ প্রতিরোধের স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণের জন্য, যেন একটি অন্যটিব সঙ্গে বিজড়িত— প্রণালীটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য। কিন্তু বস্তুত প্রাণ চায় না সাহায্য করতে, সে চায় শুধু গ্রহণ করতে, সব সময়ে ও সব রকমের সম্ভাব্য উপায়ে। আমাদের সকল অনুভূতিই লিপ্সায় কলঙ্কিত। উদাহরণস্বরূপ কোনো বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় আমাদের দুঃখ— যে-কোনোপ্রকার দুঃখ— নিজেই আমাদের অহং-এর চিহ্ন, কারণ আমরা যদি সত্যই মানুষদের ভালোবাসি, তাদের নিজেদের জন্যই, এবং আমাদের নিজেদের জন্য নয়, তাহলে যে-কোনো পরিস্থিতিতে আমরা তাদের ভালোবাসব, বিরোধীভাবেও ; সকলক্ষেত্রেই তাদের অস্তিত্বের জন্যই আমরা আনন্দ অনুভব করব। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দুঃখকষ্টগুলি সবসময় একটা মিশ্রণের চিহ্ন, এবং সেজন্য সবসময় প্রতারণাপূর্ণ। আনন্দই একমাত্র সত্য। কারণ, আমাদের মধ্যে সেই 'আমি' শুধু সত্য, যে সকল অস্তিত্বকে, এবং অস্তিত্বের সকল বিপরীত সম্ভাবনাকে সাদরে গ্রহণ করে। আমরা দুঃখ পাই, কারণ আমরা সব-কিছু আমাদের বাইরে স্থাপিত করি। যখন সকলই অন্তরে, সকলই তখন আনন্দময়, কারণ কোথাও কোনো ব্যবধান নেই।

"কিন্তু কী বলা যায় হৃদয়ের সম্বন্ধে (যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ)?" আমরা এই প্রতিবাদ জানাতে পারি আমাদের ভাবপ্রবণতার সপক্ষে। বেশ, হৃদয় কি সত্যই সবচেয়ে বেশি মিশ্রিত স্থান নয়? তাছাড়া, সে অতি শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে যায়— এবং এই হল আমাদেব তৃতীয় পর্যবেক্ষণ। আনন্দের জন্য আমাদের সামর্থ্য অল্প, দুঃখের জন্য আমাদেব সামর্থ্য অল্প, অপকৃষ্টতম বিপর্যয়গুলিও আমাদের ক্লান্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয় : আমাদের গভীরতম দুঃখরাজির উপরেও কতই জলধারা প্রবাহিত হয়ে গেছে, তাই নয় কি? মহতী প্রাণশক্তির অতি সামান্যই আমরা ধারণ করতে পারি— শ্রীমা বলেছেন, *শক্তির সঞ্চার আমরা ধারণ করতে পারি না*— সামান্যতম সঞ্চারও অনেক বেশি, এবং আমরা চিৎকার করে উঠি আনন্দে, না হলে ব্যথায়, আমরা কাঁদি, আমরা নাচি, আমরা অচেতন হয়ে যাই। কারণ সবসময়ই এ সেই একই দ্ব্যর্থবোধক শক্তি যা প্রবাহিত হয় এবং অল্পক্ষণেই পরিপ্লাবিত করে। প্রাণশক্তি দুঃখ পায় না, এ বিঘ্নিত হয় না, আবেগপ্রবণ হয় না। হয় না ভালো কিংবা মন্দ— এ বিদ্যমান, প্রবহমান, বিশাল ও প্রশান্ত। যে-

সব বিপরীত রূপ এ গ্রহণ করে আমাদের মধ্যে তা শুধু আমাদের অতীত বিবর্তনের পদচিহ্ন, যখন আমরা ছিলাম ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও পৃথক, এবং আমাদের ক্ষুদ্রতার অন্য কোনো পথই ছিল না, অতীব তীব্র এই জীবন্ত বিশালতা হতে নিজেদের রক্ষা করা ব্যতীত, "উপযোগী" ও "ক্ষতিকর" স্পন্দনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা ব্যতীত ; প্রথমটি লাভ করত সুখ বা সহানুভূতি বা শুভত্বের এক নিশ্চয়াত্মক গুণক, এবং পরবর্তীটি লাভ করত দুঃখ বা বিকর্ষণ বা অশুভত্বের এক বিয়োগাত্মক গুণক। কিন্তু দুঃখ অন্য কিছুই নয়, শুধু একই শক্তির অতি বিরাট এক তীব্রতা, এবং অতি তীব্র এক সুখ পরিণত হয় তার যন্ত্রণাদায়ক বিপরীতে ; শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তারা *আমাদের ইন্দ্রিয়রাজির প্রচলিত রীতি।*[১৭] শ্রীমা বলেছেন, *প্রয়োজন শুধু চেতনার সূচিকার সামান্য পরিবর্তন।* শ্রীঅরবিন্দ আরও বলছেন : *বিশ্বচেতনার নিকটে, তার পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণানুভূতির অবস্থায়, সকল স্পর্শ আসে আনন্দরূপে, হর্ষরূপে।*[১৮] আমাদের সকল নৈতিক, এমনকি, শারীরিক অস্বাস্থ্যের একমাত্র কারণ, আমাদের শক্তিহীনতার ও আমাদের অস্তিত্বের চিরন্তন সুখদুঃখময়তার কারণ হল আমাদের সংকীর্ণতা ও অপূর্ণতা। কিন্তু নৈতিকবাদীরা আমাদের যেভাবে আচরণ করতে বলেন, সেইভাবে প্রাণকে উপবাসে রাখা প্রতিকারের উপায় নয়, উপায় হল তাকে বিস্তৃত করা ; ত্যাগ নয়, বরং স্বীকৃতি, আরও আরও বেশি এবং চেতনার প্রসার। সেই হল বিবর্তনের যথার্থ অর্থ। পরিশেষে শুধু একটি বস্তু যা আমাদের ত্যাগ করতে হবে, তা হল আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের ক্ষুদ্রতা। যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সম্মুখ ব্যক্তিত্বের প্রতি, তার নাট্যাভিনয় ও নাছোড়বান্দা ভাবপ্রবণতার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকি, তখন আমরা প্রকৃত 'মানবিক' হই না, তখন আমরা প্লিস্টোসিন্[†]-এর পিছিয়ে-পড়া অবশেষ হয়ে যাই, আমরা তখন সংরক্ষিত করি আমাদের *দুঃখ-দুর্দশার অধিকার।*[১৯]

সাধক, তাঁর বহিঃপ্রাণে যে দ্ব্যর্থক খেলা চলছে তার দ্বারা আর প্রতারিত হন না, কিন্তু বহুদিন ধরে তাঁর অভ্যাস থাকবে হাজার হাজার ছোটো ছোটো জৈবিক ও ভাবপ্রবণ স্পন্দনের উত্তর দেওয়ার যে-সব স্পন্দন তাঁর চারধারে ঘূর্ণায়মান। এ বেশ এক দীর্ঘ পথ, যেমন অবিরত চূর্ণনরত মন হতে নীরব মন পর্যন্ত পরিবর্তনের পথ, এবং এই পরিবর্তনে কখনও কখনও আসে তীব্র ক্লান্তির পালা, কারণ আমাদের দেহযন্ত্রটি বাইরের সাধারণ উৎস হতে তার শক্তির পুনরুজ্জীবনের অভ্যাস হারিয়ে ফেলে (যে উৎস অতি শীঘ্রই মনে হয় অশোধিত ও দুর্বহ, যখন আমরা অন্যপ্রকার শক্তি একবার আস্বাদন করি), তথাপি এ অবস্থাতেও প্রকৃত উৎসের সঙ্গে অবিরত সংযোগ রক্ষা করবার সামর্থ্যের অভাব

[†] প্লিস্টোসিন্ = ভূতাত্ত্বিক যুগ বিশেষ।

এখনও তার আছে ; সেজন্য কিছু "বিচ্ছিন্নতা"। কিন্তু এখানেও সাধক আবার অবরোহণকারী শক্তির সহায়তা পান, যা প্রবলভাবে সাহায্য করে তাঁর মধ্যে এক নতুন ছন্দের প্রতিষ্ঠার জন্য— নিত্য নতুন বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি এ কথাও লক্ষ্য করেন যে, তিনি একটি মাত্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপে অগ্রসর হলে ঊর্ধ্বের সহায়তা তাঁর দিকে দশটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেন সাধক প্রতীক্ষিত ছিলেন। এ কথা ভাবলে সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, কাজটি শুধুই বিয়োগাত্মক : প্রাণ বলতে চায় যে নিজের বিরোধে সংগ্রাম করবার জন্য প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করে সে, যা এক বা অন্য ক্ষেত্রে সম্মুখ স্থান সংরক্ষণ জন্য এর চতুর উপায় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক কঠোর ও নকারাত্মক আচরণবিধি সাধক মেনে চলেন না. তিনি অনুসরণ করেন তাঁর সত্তার এক নিশ্চয়াত্মক প্রেরণা। তিনি প্রকৃতই অগ্রগতি লাভ করেন, এবং গত কালের আদর্শ বা তার পূর্বের দিনের সুখরাজি তাঁর কাছে শিশুর পথ্যের মতোই স্বাদবিহীন —এসবে তিনি আর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না। আরও ভালো কাজ তাঁকে করতে হবে, আরও ভালো বিষয় তাঁকে জীবনে উপলব্ধি করতে হবে। সেজন্য, যে কোনো চেষ্টা করে নি, তার কাছে পথটি ব্যাখ্যা করা অতি দুরূহ : সে শুধু তার প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে, বা দেখবে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরাজয়। তথাপি, যদি আমরা জানতাম, কীভাবে দৃষ্টিব প্রত্যেক পরাজয় হয় এক এক অগ্রগামী পদক্ষেপ, কীভাবে জীবনের পরিবর্তন হয় যখন ব্যক্তি আবদ্ধ সত্যের স্তর হতে মুক্ত সত্যের স্তরে উপনীত হয়— ঠিক জীবনের মতোই এক সত্য, যা এত বিরাট যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর জালে আবদ্ধ হবে না, কারণ সে তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োজনীয়তা দেখে এক অসীম অভিবৃদ্ধির প্রত্যেক স্তরে ; এক সত্য, যা এত মহান্ যে নিজেকে অস্বীকার করে এগিয়ে যেতে পাবে এক উচ্চতর সত্যের অভিমুখে অনন্তভাবে।

এই শিশুসুলভ, উদ্‌বিগ্ন, আশু পরিশ্রান্ত প্রাণের পশ্চাতে আমরা আবিষ্কার করি এক প্রশান্ত ও শক্তিশালী প্রাণ— যাকে শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেন যথার্থ প্রাণ— এক প্রাণ যাতে নিহিত আছে জীবনীশক্তির সারতত্ত্ব, তার সকল ভাবপ্রবণ ও বেদনাপূর্ণ উপবৃদ্ধি হতে মুক্ত। আমরা প্রবেশ করি এক প্রশান্তিময় স্বতঃস্ফূর্ত ধ্যানের অবস্থায়, যেমন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের নিম্নে সমুদ্র। যেমন মনের নীরবতা মস্তিষ্কের অসাড়তা নয়, তেমনই এই মৌলিক স্থিরতা স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তা নয় —কর্মের এ এক আধার। এ এক সংকেন্দ্রিত শক্তি, যা সক্ষম যে-কোনো কর্মের প্রবর্তনে, যে-কোনো আঘাতের প্রতিরোধে, এমন-কি হিংস্রতম ও দীর্ঘতম আঘাতের প্রতিরোধেও, নিজের ভারসাম্য না হারিয়েই। এই প্রাণিক স্থিরতা হতে অনেক নতুন প্রকার সামর্থ্য উদ্‌ভূত হতে পারে আমাদের উন্নতির ক্রমের উপর নির্ভর ক'রে, কিন্তু সর্বপ্রথমেই আসে শক্তির এক অসীম উৎস— কোনো ক্লান্তিই হল এর এক নিশ্চিত চিহ্ন যে আমরা আবার বাইরের আলোড়নে পড়ে গেছি।

কর্মের বা দৈহিক প্রয়াসের ক্ষমতা দশগুণ বেড়ে যায়। আমাদের শক্তির পুনরুজ্জীবনের একমাত্র ও সর্বগ্রাসী উৎস আর নয় আহার-নিদ্রা : নিদ্রার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়, যা আমরা পরে দেখব, এবং আহার্য কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে স্বাস্থ্যসম্মত ন্যূনতম পর্যন্ত, এ যে স্থূলতা ও রোগ আনে, তা ছাড়াই। অন্যান্য শক্তিও আবির্ভূত হতে পারে। যাদের মনে করা হয় "অলৌকিক ঘটনা", কিন্তু তারা অলৌকিক শুধু *এক নির্দিষ্ট পদ্ধতির জন্য ;* সেসব উল্লেখ করবার প্রয়োজন আমাদের নেই, নিজেই সেসব অনুভূতি লাভ করা শ্রেয়স্কর। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে যদি আমাদের মধ্যে একটি প্রাণিক স্পন্দনের নিয়ন্ত্রণকারী আমরা হই, তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, জগতেব যেখানেই আমরা তার সংস্পর্শে আসব, সেই স্পন্দন আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তারপব, এই স্থিরতার মধ্যে আরও একটি লক্ষণ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় : দুঃখের অভাব ও একপ্রকারের অপরিবর্তনীয় আনন্দ। যখন একজন সাধারণ মানুষ আঘাত পায়, শারীরিক হোক বা নৈতিক, তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রিয়া দ্বিগুণিত হয়ে যায় ; সে উত্তেজিত হয়ে যায়, ভিতরে ভিতরে ফুটন্ত হতে আরম্ভ করে এবং ব্যথা দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে, সাধক যে নিজের মধ্যে কিছু স্থিরতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি দেখতে পান যে, এই স্থিরতা সকল আঘাতকেই বিলীন করে দেয়, কারণ এ অনেক *বিস্তৃত,* কারণ তিনি এখন আর কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, যার দৃষ্টি নিবদ্ধ নিজের উপর, যেন উদরযন্ত্রণায় পীড়িত, বরং তিনি এক চেতনা, যা নিজের শরীরের সীমা অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়— প্রশান্ত প্রাণ, নীরব মনের মতো, বিশ্বভাবাপন্ন হয়ে যায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে : *যোগানুভূতিতে চেতনা প্রসারিত হয় প্রত্যেক দিকে, চারধারে, নিম্নে, ঊর্ধ্বে, আনন্ত্য পর্যন্ত দীর্ঘায়িত প্রত্যেক দিকে। যোগীর চেতনা যখন মুক্তিলাভ করে, তখন তিনি জীবনধারণ করেন সর্বদা এই অসীম উচ্চতায়, গভীরতায় ও বিস্তৃতিতে শরীরের মধ্যে নয়। তার আধার এক অনন্ত শূন্যতা বা নীরবতা কিন্তু তাতে অভিব্যক্ত হতে পারে সব-কিছু— প্রশান্তি, স্বাধীনতা, শক্তি-জ্যোতিঃ, জ্ঞান, আনন্দ।*[২০] কোনোপ্রকার দুঃখই তৎক্ষণাৎ সূচিত করে সত্তার সংকোচন বা চেতনার হ্রাস।

সত্তার এই বিস্তৃতির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত আছে, যা আমাদের বুঝিয়ে দেবে প্রাণিক স্থিরতার চরম প্রয়োজনীয়তা, শুধু যোগাযোগেব পরিচ্ছন্নতার জন্য নয়, কর্মের শক্তির জন্য নয় বা জীবনে আমাদের আনন্দের জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পুরোনো সামান্য সম্মুখ-মানবের মধ্যে বাস করি, আঘাতগুলি ততক্ষণ ক্ষুদ্র, আনন্দও ক্ষুদ্র, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্রতা দ্বারাই আমরা সুরক্ষিত থাকি। কিন্তু যখন আমরা বিশ্বপ্রাণে প্রবেশ করি, আমরা তখন একই স্পন্দনের, বা বরং শক্তির সম্মুখীন হই, এক বিরাট বিশ্বময় পরিমাপে, কারণ সেসব শক্তিই জগৎকে আবর্তিত করে,

যেমন আমাদেরও আবর্তিত করে ; আমরা যদি পূর্ণ *সমতা* বা অন্তরের নিশ্চলতা অর্জন না করে থাকি, তাহলে আমরা প্রবাহিত হয়ে যাই। এ কথা শুধু বিশ্বপ্রাণের ক্ষেত্রেই নয়, বরং চেতনার সকল স্তরের ক্ষেত্রেই সত্য : অতিচেতন স্তরে, মনে, প্রাণে এমন-কি শরীরের প্রত্যেক স্তরেই আমরা বিশ্বচেতনার উপলব্ধি করতে পারি, বস্তুত আমাদের তাই করতে হবে (ন্যূনপক্ষে, পূর্ণযোগের সাধককে করতেই হবে)। যখন তিনি অতিচেতনে উন্নীত হন, সাধক বুঝতে পারবেন যে, পরমাত্মার তীব্রতা তাঁকে বজ্রের মতোই আঘাত করতে পারে (প্রকৃতপক্ষে একই দিব্যশক্তি, একই চিৎশক্তি যা ঊর্ধ্বে আছে তা নিম্নেও আছে, জড়ে আছে, যেমন প্রাণেও আছে, যেমন মনেও আছে বা উচ্চতর স্তরেও আছে, কিন্তু যতই তা অবরোহণ করে, ততই তার ব্যবহৃত মাধ্যম তাকে তমসাচ্ছন্ন করে দেয়, বিকৃত করে দেয়, খণ্ডবিখণ্ড করে দেয়) এবং যদি সাধক এক গুরুভার নিবিড়তা হতে সদ্যোত্থিত হয়ে অতি দ্রুতভাবে উপরে উঠতে চেষ্টা করেন, প্রথমে এক সুস্পষ্ট ও দৃঢ় ভিত্তিভূমি স্থাপনের জন্য যত্নবান না হয়েই স্তরসমূহ লঙ্ঘন করে যেতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি এক বয়লারের মতো হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারেন। সুতরাং প্রাণিক স্বচ্ছতা এক নৈতিক বিষয় নয়, বরং এক প্রয়োগাত্মক বা জৈবিক প্রয়োজনীয়তা, যদি আমরা তা বলতে পারি। কার্যত পরম-করুণা সবসময়ই বিদ্যমান, অপরিপক্ক অনুভূতি হতে আমাদের সযত্নে রক্ষা করবার জন্য : আমরা সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র সে পর্যন্ত যে-পর্যন্ত আমরা প্রয়োজনবোধ করি সংকীর্ণ হয়ে থাকবার জন্য।

অবশেষে, যখন আমরা প্রাণের নিশ্চলতার উপর বিজয় লাভ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে আমরা অন্যদের কিঞ্চিৎ ফলপ্রদভাবে সাহায্য করতে পারি। কারণ অন্যদের সাহায্য করা কোনো অনুভূতি বা বদান্যতার বিষয় নয়, তা হল শক্তির বিষয়, অন্তর্দর্শনের বিষয়, আনন্দের বিষয়। এই প্রশান্তির মধ্যে আমরা শুধু উজ্জ্বল আনন্দেরই অধিকারী হই তা নয়, বরং এক অন্তর্দৃষ্টিরও অধিকারী হই, যা দূর করে দেয় সব ছায়া ; স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আমরা সকল স্পন্দনই প্রত্যক্ষ করি, এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবার ক্ষমতা আমাদের দেয় শক্তি, তাদের প্রয়োগে আনবার জন্য, শান্ত করবার জন্য, ব্যাহত এমন-কি, পরিবর্তিত করবার জন্যও। শ্রীমা বলেছেন, *প্রশান্তি এক অত্যন্ত* নিশ্চয়াত্মক *অবস্থা ; এক নিশ্চয়াত্মক শান্তি বিদ্যমান যা সংঘর্ষের বিপরীত নয়— এক সক্রিয়, সংক্রামক ও শক্তিশালী শান্তি, যা প্রশমিত করে, স্থির করে ও সকল বস্তুকে সুবিন্যস্ত করে এবং যথাস্থানে রাখে।* এই সংক্রামক প্রশান্তির শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, যদিও শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এই ঘটনাটি যথাসময়ের কিছু পূর্বেই বর্ণিত হচ্ছে। ঘটনাটি পণ্ডিচেরীর, অনেক বছর পূর্বে, যে সময়ে উষ্ণমণ্ডলীয় বর্ষা, এবং কখনও কখনও ঘূর্ণিবাত্যা হঠাৎ তীব্রবেগে নেমে আসত ও ধ্বংসলীলার

সৃষ্টি করত। তখন দরজা-জানালাগুলোকে মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে বন্ধ করা হত। ঘটনার রাত্রে, ঘূর্ণিবাত্যা হয়েছিল প্রবল বর্ষার সঙ্গে। শ্রীমা দ্রুতবেগে শ্রীঅরবিন্দের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁর জানালা বন্ধ করায় সাহায্য করবার জন্য। তিনি তাঁর টেবিলের সম্মুখে বসেছিলেন, লেখায় রত (অনেক বছর যাবৎ শ্রীঅরবিন্দ দিনে বারো ঘণ্টা লিখতেন, সন্ধ্যা ছটা হতে সকাল ছটা পর্যন্ত, তারপর "যোগের জন্য" ওঠানামা করে পদচারণ করতেন আট ঘণ্টা)। জানালাগুলো সম্পূর্ণ খোলা ছিল, এবং ভিতরে একবিন্দুও বৃষ্টিপাত হয়নি। শ্রীমা স্মরণ করেছেন, কক্ষের মধ্যে যে শান্তির রাজত্ব ছিল, তা ছিল এতই কঠিন ও ঘন যে ঘূর্ণিবাত্যা *প্রবেশ করতে পারে নি।*

৭

চৈত্য কেন্দ্র

আমরা মন নই, কারণ আমাদের সকল চিন্তন আসে আমাদের মনের চেয়ে বিশালতর এক মন হতে, এক বিশ্বময় মন হতে ; আমরা প্রাণ নই, কিংবা নই আমাদের যত অনুভূতি বা কর্ম, কারণ আমাদের সকল প্রেরণা আসে আমাদের প্রাণের চেয়ে বিশালতর এক প্রাণ হতে, এক বিশ্বময় প্রাণ হতে ; কিংবা আমরা এই শরীরও নই, কারণ এর গঠনকারী উপাদানগুলো জড় হতে প্রস্তুত এবং তারা আমাদের বিধান অপেক্ষা মহত্তর বিধান, বিশ্বময় বিধান, মেনে চলে। তাহলে, আমাদের মধ্যে কী এমন বস্তু আছে, যা আমাদের পরিবেশ নয়, আমাদের পরিবার নয়, নয় আমাদের প্রথা বা বিবাহ বা কর্ম যা নয় বিশ্বপ্রকৃতির বা ঘটনাচক্রের খেলা, অথচ যা আমাদের দেয় "আমিত্বের" এক বোধ যদি অন্য সব-কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও? বস্তুত সেই বস্তু "আমিই", যখন অন্য সব-কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়, সে পরিস্থিতিতেও, কারণ সেই হল *আমাদের* সত্যের মুহূর্ত।

আমাদের অন্বেষণের গতিপথে, চেতনার বিভিন্ন কেন্দ্র বা স্তর আমরা লক্ষ্য করেছি ও দেখেছি যে এই সব কেন্দ্রের পশ্চাতে এক সচল চিৎশক্তি আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সংযোগস্থাপন করছে— মনের নীরবতা ও প্রাণের প্রশান্তির প্রথম পরিণামগুলির একটি হল মানসিক ও প্রাণিক কার্যকলাপে

সাধারণত যে চিৎশক্তি সংলগ্ন থাকে, তাকে পৃথক করা। আমরা অনুভব করেছি এই শক্তির বা চেতনার স্রোত আমাদের সকল অবস্থার অন্তরালে স্থিত আমাদের সত্তার মৌলিক বাস্তব সত্য। কিন্তু এই চিৎশক্তি *কারও* চেতনা তো নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে। আমাদের মধ্যে কে বা কী সচেতন? কোথায় কেন্দ্রবিন্দু, কোথায় নিয়ন্ত্রণকর্তা? কিংবা শুধুই কি আমরা কোনো বিশ্বময় পুরুষের ক্রীড়নক, যে পুরুষ হয়তো আমাদের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু, কারণ এসব মানসিক প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়াগুলো বস্তুত বিশ্বগত? সত্যটি দ্বিবিধ, এবং কোনো প্রকারেই আমরা ক্রীড়নক নই, শুধু যে-সময় আমরা সম্মুখ ব্যক্তিত্বটিকে নিজেরা বলে গ্রহণ করবার জন্য গুরুত্ব প্রদান করি, সে-সময় ছাড়া, কারণ তা সত্যই ক্রীড়নক। আমাদের এক ব্যষ্টিগত কেন্দ্র আছে শ্রীঅরবিন্দ যাকে অভিহিত করেছেন *চৈত্যসত্তা* *, এবং একটি বিশ্বগত কেন্দ্র বা *কেন্দ্রীয় সত্তা* **। ক্রমশ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে একটিকে, তারপর অন্যটিকে, এবং আমাদের সকল অবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী হতে পারব আমরা। এখনকার মতো, আমরা শুধু অন্বেষণ করব আমাদের ব্যষ্টিগত কেন্দ্রটিকে চৈত্যপুরুষটিকে, অন্যদের ভাষায় যা আত্মা।

যুগপৎ, তা হল জগতের সরলতম ও কঠিনতম বস্তু। সরলতম, কারণ একটি শিশুও তাকে বুঝতে পারে, বা *জীবনে অনুভব করে,* স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার চৈত্যসত্তায় বাস করে***—রাজা সে, ও হাস্যময়! এবং কঠিনতম, কারণ এই স্বতঃস্ফূর্তি শীঘ্র আবৃত হয়ে যায় সকল প্রকারের ধারণায় ও ভাবপ্রবণতায়। তখনই আমরা বলা আরম্ভ করি "আত্মার" কথা যার অর্থ আমরা সে বিষয়ে আর কিছুই বুঝি না। কৈশোরের সকল যন্ত্রণা শুধুই চৈত্যপুরুষের ধীরে ধীরে কারাবরুদ্ধ হওয়ার কাহিনী : আমরা তাকে বলি "বাড়ন্ত বয়সের যন্ত্রণা", কিন্তু সে-সব বোধহয় শুধুই শ্বাসরোধের যন্ত্রণা ; যখন শ্বাসরোধ এক স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে যায়, তখনই পরিপক্বতা আসে। অন্বেষীর সকল কঠিনতা হল বিভিন্ন মানসিক ও প্রাণিক মিশ্রণের বিশৃঙ্খলা হতে এক ধীর মুক্তির কাহিনী। তথাপি আমরা দেখব, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, বাস্তবিক, সেখানেই ফিরে যাওয়া নয় এ ; কারণ, প্রথমত প্রকৃতই আমরা কখনোই ফিরে যেতে পারি না ; এবং তারপর কারণ, যাত্রার সমাপ্তিতে (যে সমাপ্তি সবসময়ই একটি আরম্ভ) আমরা যে চৈত্যশিশুটিকে পাই সে এক ক্ষণিকে খেয়াল নয়, বরং এক *সচেতন* রাজকীয়তা ; কারণ চৈত্য এক সত্তা, সে বৃদ্ধিশীল— এক শাশ্বত বিশালতর রাজ্যে শাশ্বত শিশুত্বের অলৌকিক বিস্ময় এ। এ "অন্তর্নিহিত, সম্ভাবী শিশুরূপে" ঋগ্‌বেদের বাণী (৯. ৮৩ ৩)।

---

* চৈত্যপুরুষ। ** জীবাত্মা। *** এতে ব্যতিক্রম ও বিবিধক্রম আছে, যা খালি চোখেও দেখা যায়।

চৈত্য আবির্ভাব

চৈত্যের প্রাথমিক অভিব্যক্তি হল আনন্দ ও প্রেম। এক আনন্দ যা অপরিমিতভাবে তীব্র ও শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু তাতে উত্তেজনা নেই, সমুদ্রের মতো প্রশান্ত ও গভীর— কিন্তু তার অভিপ্রায় কিছু নেই। চৈত্য আনন্দ কোনো কিছুর প্রয়োজনবোধ করে না নিজের স্থিতির জন্য : সে *বিদ্যমান ;* এমন-কি, কারাগারের গভীরেও এর অস্তিত্ব দুর্নিবার, কারণ এ এক অনুভূতি নয়, এক অবস্থা, এক আনন্দময় নদীর মতো, যেখানেই সে প্রবাহিত হোক, কর্দমের মধ্যে কিংবা প্রস্তরের মধ্যে, সমতলভূমিতে বা পর্বতের মধ্য দিয়ে। এ এক প্রেম যা দ্বেষের বিপরীত নয়, এবং কোনো কিছুর প্রয়োজনবোধ করে না নিজের স্থিতির জন্য : সে *বিদ্যমান ;* সে শান্ত হয়ে প্রজ্বলিত হয় যা-কিছুর সম্মুখীন হয় তার মধ্যে, যা-কিছু দেখে তার মধ্যে, যা-কিছু স্পর্শ করে তার মধ্যে, কারণ এর ভালোবাসা দুর্নিবার, এমনই এর অবস্থা। এর কাছে কিছুই নীচ নয়, কিছুই উচ্চ নয়, কিছুই পবিত্র বা অপবিত্র নয়। এর অগ্নিশিখা কখনও ম্লান হয় না, ম্লান হয় না কখনও এর আনন্দ। অন্যান্য কিছু লক্ষণও এর উপস্থিতির সূচক : এ অনেক হালকা, কোনো কিছুই এর কাছে ভারী নয়, জগৎ এর কাছে এক খেলা ; এ অজেয়, কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না, যেন চিরদিনই দুঃখের অতীত, সকল দুর্ঘটনার কবল হতে সুরক্ষিত ; এ প্রজ্ঞাময়, দ্রষ্টা ; এ প্রশান্ত, এত প্রশান্ত যেন সত্তার গভীরে এক ছোটো নিশ্বাস ; এবং বিরাট সমুদ্রের মতো, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। কারণ, এ শাশ্বত। এবং এ মুক্ত : কিছুই ধরতে পারে না একে, না জীবন, না মানুষ, না ধারণা বা মতবাদ, না কোনো দেশ— এ সর্বাতীত, সর্বদা সর্বাতীত, অথচ অসংখ্য হয়ে সব-কিছুর হৃদয়ে যেন এ সকল কিছুর সঙ্গে সমান। কারণ, আমাদের মধ্যে নিহিত এই ভগবান।

ঈক্ষণশীল দৃষ্টির নিকট চৈত্যপুরুষ যেমন প্রতীয়মান হয় তা এই : শ্রীমা বলছেন, *যে-ব্যক্তি তার আত্মার সম্বন্ধে সচেতন, তার আত্মায় বাস করে, তার প্রতি যদি তুমি দৃষ্টিপাত করো, তুমি তখন অনুভব করো যেন তুমি অবতরণ করছ, সেই ব্যক্তির মধ্যে গভীরে, অতি গভীরে, প্রবেশ করছ, অভ্যন্তরে দূরে বহুদূরে। সাধারণত তুমি যখন বিভিন্ন লোকের চোখে দৃষ্টিপাত করো— কোনো কোনো চোখে তুমি প্রবেশ করতে পারো না, সেগুলো যেন রুদ্ধ দ্বার, কিন্তু কোনো কোনো চোখ উন্মীলিত, তুমি প্রবেশ করতে পারো, এবং তারপর সম্মুখভাগের কিছু অন্তরালেই, তোমার সাক্ষাৎকার হয় এমনকিছুর সঙ্গে, যা স্পন্দনশীল, এবং কখনও কখনও যা উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে, আলোক বিকীর্ণ করে। ভ্রমবশত তুমি বলতে পারো, "তার এক জীবন্ত আত্মা আছে"— কিন্তু তা নয়, এটা তার প্রাণ। আত্মার আবিষ্কারের জন্য তোমাকে সম্মুখভাগ হতে অন্তরালে চলে আসতে হবে,*

প্রত্যাহৃত হতে হবে গভীর অন্তরে, অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে, আরও অভ্যন্তরে, অবতরণ করতে হবে নিম্নে, আরও নিম্নে এক অতি গভীর, নীরব স্থির গর্তের মধ্যে ; সেখানে তুমি পাবে কিছু-একটা যা উষ্ণ, প্রশান্ত, সারসমৃদ্ধ, অতি স্থির, অতি পূর্ণ, একপ্রকার কোমলতা— সেই হল আত্মা। তুমি যদি অধ্যবসায়ী হও, নিজেই সচেতন হও, তাহলে আসবে পূর্ণতার এক বোধ, এমন কিছুর বোধ যা সমগ্র, এবং ধারণ করে অমেয় গভীরতা। তুমি অনুভব করো যে যদি সেখানে প্রবেশ কর তাহলে অনেক রহস্যই উদঘাটিত হবে ; এ ঠিক যেন অতি শান্ত জলপৃষ্ঠের উপব শাশ্বত কোনো কিছুর প্রতিফলন। এবং সময়ের সীমা আর নেই। তোমার মধ্যে ধারণা হয় যে তুমি সবসময়ই আছ, এবং তোমার অস্তিত্ব শাশ্বত কালের।

কিন্তু এসব শুধুই চিহ্ন ; যা আত্মাস্থিত, যা আমরা চাই সোজাসুজি অনুভব করতে, এমন কিছুবই বাইরের এক প্রতিরূপ। চৈত্যপুরুষের দ্বার কীভাবে উন্মীলিত হয়? কেননা, এ উত্তমরূপে সংগুপ্ত। প্রথমত এ সংগুপ্ত আমাদের সকল ধারণা ও অনুভূতির দ্বারা যা একে নির্মমভাবে লুণ্ঠিত করে অনুকরণ করে ; আমাদের অনেক ধারণাই আছে, উচ্চ-নীচ, পবিত্র-অপবিত্র, দিব্য-অদিব্য এসব বিষয়ে ; আমরা সামান্য ভাবপ্রবণতার তালা অনেকই দিয়ে রেখেছি কী ভালোবাসা যায় বা যায় না সেসব বিষয়ে : এসব হট্টগোল এতই স্থান অধিকার করে রেখেছে যে চৈত্যপুরুষ বেচারা কোনো সুযোগই পায় না নিজেকে দেখাবার জন্য ; যখনই এ প্রকাশিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে, তখনই তাকে জোর করে নিয়ে যায় প্রাণ, ব্যবহার করবার জন্য তার সুদক্ষ সু-উচ্চ উড্ডয়নে তার দিব্য ও রোমাঞ্চকর আবেগে, তার তন্ময় প্রেমে, তার অধিকারভিত্তিক উদারতায়, তার চাকচিক্যময় সৌন্দর্যশাস্ত্রে ; মনের দ্বারা খাঁচায় বন্দী সে, মন তাকে ব্যবহার করে তার একান্ত নিজস্ব আদর্শের জন্য, তার অভ্রান্ত মানব-হিতৈষী মতবাদগুলোর জন্য, এর কঠোর আচরণের নৈতিকশাস্ত্রগুলোর জন্য, এবং উপাসনালয়গুলোর জন্য— অসংখ্য উপাসনালয়, যা একে স্থাপিত করে বিশ্বাস ও অন্ধ মতবাদগুলোর সকল বিধিবিধানের মধ্যে— সে-সকলের মধ্যে চৈত্যপুরুষ কোথায়? সে আছে, এসব সত্ত্বেও, দিব্য, ধৃতিশীল, প্রত্যেক কঠিন আবরণ ভেদ করবার জন্য প্রয়াসরত ; একে যা-কিছু দেওয়া হয় বা এর উপর যা-কিছু আরোপিত হয়, তা প্রকৃতই সে ব্যবহারে আনে— বলা হয়, "যা-কিছু এর আছে সবই এ কাজে ব্যবহৃত করে।" এবং তাই হল সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক : এর নিভৃত স্থান হতে যখন এক মুহূর্তের জন্যও এ বাইরে আসে তখনই যা-কিছু এ স্পর্শ করে তার উপর এমনই মহিমার ছটা এ নিক্ষেপ করে যে, এর আবির্ভাবের পরিবেশকেই আমরা এর জ্যোতির্ময় সত্য বলে ভুল করি। বিথোফেন্‌কে শুনে যাঁর একদিন চৈত্যের আবির্ভাব হবে, তিনি বলবেন, "অন্য কিছু নয়, সংগীত, শুধু সংগীতই ·এই

পৃথিবীতে সত্য ও দিব্য" ; অন্যজন মহাসাগরের বিশালতায় অনুভব করবেন তাঁর আত্মাকে, এবং মুক্ত সমুদ্রেরই এক ধর্ম সৃষ্টি করবেন তিনি ; অন্য একজন শপথ নেবেন তাঁর গুরু, বা তাঁর সম্প্রদায় বা তাঁর শাস্ত্রের নামে। প্রত্যেকেই তাঁর অনুভূতির উপাদানপুঞ্জের উপরই তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। চৈত্যসত্তা কিন্তু মুক্ত, বিস্ময়করভাবে মুক্ত, সব-কিছু হতে! অস্তিত্বের জন্য এ *কোনো কিছুরই প্রয়োজন বোধ করে না*। মুক্তির যথার্থ সারতত্ত্ব এ। আমাদের মহৎ বা সামান্য সংগীতের কৃতি, আমাদের দীপ্তিমান্ বা কম দীপ্তিমান শাস্ত্রগ্রন্থ— সব-কিছুই এ ব্যবহার করে। শুধু মানুষের বর্মের মধ্যে এক ছিদ্র প্রস্তুত করবার জন্য, যেন সে বাইরে আসতে পারে। আমাদের সকল ধারণা, অনুভূতি, মতবাদকে সে প্রদান করে তার শক্তি, তার ভালোবাসা, তার আনন্দ, তার আলোক, তার দুর্নিবার মুক্ত সত্য, কারণ সেই একমাত্র সুযোগ তাকে দেওয়া হয়েছে আবির্ভাবের জন্য, একমাত্র উপায় যা আছে তার প্রকাশের জন্য। কিন্তু সেই একই ভাবে, এসব আবেগ, ধারণা ও মতবাদ চৈত্যসত্তা হতে পায় আত্মনিশ্চয়তা ; তারা একে অধিকার করে, এর চারধারে আবরণ দিয়ে দেয়, এর বিশুদ্ধ সত্যের উপাদান হতে আহরণ করে তাদের বিবাদাতীত নিশ্চয়তা, তাদের একান্ত গভীরতা, তাদের একদেশীয় বিশ্বজনীনতা, এবং *সত্যের উপাদানের শক্তিই ভুলের উপাদানের শক্তিবৃদ্ধি করে*[১]। অবশেষে চৈত্যসত্তা এত সম্পূর্ণভাবে ডুবে যায়, অন্য সব-কিছুর সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, আমরা আর পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি না এবং কৃত্রিমকে আর পৃথক করতে পারি না, সত্যেরই গঠনকে বিনষ্ট না করে —এবং এইভাবে জগৎ চলে, অর্ধসত্যের বোঝা বয়ে, যা মিথ্যার চেয়েও আরও গুরুভার। বোধহয় আসল অসুবিধা নেই মন্দ হতে আমাদের নিজেদের মুক্তি লাভে, কারণ আমরা পরিচিত এর চেহারার সঙ্গে— এবং এ ন্যূনতম প্রচেষ্টাও প্রতিহত করতে পারে না— কিন্তু আসল অসুবিধা আছে আমাদের নিজেদের কোনো এক ভালো হতে মুক্তিপ্রদান করায়। যে-ভালো শুধু মন্দেরই বিপরীত এবং যা সত্যের কোনো এক কণিকাকে তালাচাবি দিয়ে রেখেছে সব সময়ের জন্য।

যদি আমরা চৈত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করতে চাই, তার স্ফটিকতুল্য বিশুদ্ধতায়, যা এত বিস্ময়জনকভাবে সতেজ— কারণ এ দুর্নিবারভাবে বিদ্যমান আমাদের সকল ফাঁদের বাইরে, আমাদের ধারণা, অনুভব ও এ-বিষয়ে ব্যক্ত সকল মতের বাইরে— তাহলে আমাদের সংসিদ্ধ করতে হবে আমাদের অন্তরে এক স্বচ্ছতা— *এই স্বচ্ছতা সংসাধনের জন্য বিঠোফেন*, সমুদ্র ও উপাসনালয় শুধু যন্ত্র মাত্র। কারণ অনুভূতিটি সব সময়ই এক : যখন আমরা স্বচ্ছ হয়ে উঠি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত হয় সত্য, এবং অন্তর্দৃষ্টি, ও আনন্দ, ও সব-কিছু— সবই বিদ্যমান ন্যূনতম প্রয়াস বিনাই, কারণ সত্য বিশ্বে সবচেয়ে অধিক স্বাভাবিক বিষয় ; অবশিষ্ট সব-কিছুই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে : মন ও প্রাণ তাদের বিভ্রান্তিকর

স্পন্দন ও সুনিপুণ জটিলতা সহ। উল্লেখযোগ্য সকল আধ্যাত্মিক অনুশীলন, সকল *তপস্যা* অবশেষে সেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লক্ষ্যের অভিমুখে প্রচালিত হবেই, যেখানে আর কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না— প্রয়াসও বিশৃঙ্খলার অন্য একটি উৎস, সত্তার আরও একটি ঘনীভবন। সুতরাং চৈত্য উন্মীলনের জন্য সাধক নৈতিক মনের বিশৃঙ্খলায় প্রবেশের প্রয়াস করবেন না, কিংবা মন্দ হতে ভালো চয়ন করবার অসম্ভব কাজের প্রয়াস করবেন না, কারণ, যাই হোক-না-কেন, ভালো ও মন্দের ব্যবহার তাদের পারস্পরিক ক্ষতিসাধনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত— *প্রেমিক আমার নিয়ে গেল আমার পাপের বসন, এবং সানন্দে আমি তা পতিত হতে দিলাম ; তারপর সে আকর্ষণ করল আমার পুণ্যের বসন, কিন্তু আমি লজ্জিত ভীত হয়ে তাকে বাধা দিলাম। যখন সে জোর করে তা ছিনিয়ে নিল আমার কাছ থেকে তখনই আমি দেখলাম, আমার আত্মা কেমন করে লুকিয়ে ছিল আমারই দৃষ্টি হতে।*[২] সাধক শুধু চেষ্টা করবেন যেন সব-কিছু নীরবতার মধ্যে স্থির ও স্বচ্ছ হয়ে যায় ; কারণ নীরবতা স্বয়ং অনাবিল, তাই হল বিশুদ্ধির জল। প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়ার এক প্রবাদবাণী : "বস্ত্রের কলঙ্কগুলো একে একে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা কোরো না। তাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করো।" একেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন *চেতনার পরিবর্তন।* এই স্বচ্ছতায় সত্তার পুরোনো ভাঁজগুলো মসৃণ হয়ে যায় নিঃশব্দে, এবং আমরা অনুভব করি চেতনার এক নতুন অবস্থিতি—কোনো বৌদ্ধিক অবস্থিতি নয়, বরং আমাদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের এক শক্তি। হৃদয়ের স্তরে, হৃদয়ের প্রাণকেন্দ্র হতে গভীরে (যে কেন্দ্র চৈত্যকে আচ্ছাদিত করে ও তার অনুকরণ করে) আমরা অনুভব করি চেতনার এক অঞ্চল যা অন্য অঞ্চলের চেয়ে তীব্রতর, যেন সব-কিছুই সেখানে সম্মিলিত হয়েছে— এই হল *চৈত্যকেন্দ্র।* ইতিমধ্যে আমরা অনুভব করেছি আমাদের চিৎশক্তির এক প্রবাহ রূপায়িত হচ্ছে, নিজের এক জীবন শুরু করেছে শরীরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ ও ক্রমবর্ধমানরূপে তীব্র, যখন এর মানসিক ও প্রাণিক কার্যকলাপ হতে এ মুক্ত হয় ধীরে ধীরে ; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে, সেই কেন্দ্রে কিছু-একটা প্রজ্বলিত হয় বহ্নির মতো —*অগ্নি।* আমাদের মধ্যে এই হল প্রকৃত 'আমি'। আমরা বলি, "আমি জানতে চাই", "আমি ভালোবাসতে চাই" কিন্তু আমাদের মধ্যে কে এই যে প্রকৃতপক্ষে চায়? সুনিশ্চিতভাবে, এই ক্ষুদ্র অহং নয়, যে নিজেকে নিয়ে এত সন্তুষ্ট, এই পুরোনো মানসিক মানুষ নয় যে বৃত্তের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান, এই পুরোনো প্রাণিক মানুষও নয় যে শুধুই সব-কিছু গ্রাস করতে চায়। অন্তরালে এই অদম্য অগ্নি বিদ্যমান, এবং যে চায় সে এই, কারণ এ স্মরণে রেখেছে অন্য কিছু। আমরা বলি "উপস্থিতির" কথা, কিন্তু এ অধিকতরভাবে এক তীব্র অনুপস্থিতির মতো এক জীবন্ত ছিদ্র যা আমরা আমাদের মধ্যে বহন করি, যা উত্তপ্ত জ্বলন্ত হয়ে এগিয়ে চলে, যে পর্যন্ত না সে বাস্তব হয়ে ওঠে, একমাত্র বাস্তব সত্য এই জগতে

যেখানে মানুষের জীবন্ত থাকা বা জীবন্ত থাকবার ছলনা করাও বিস্ময়কর। এই হল অগ্নিময় আত্মা, জগতে একমাত্র সত্য আত্মা, একমাত্র সদ্‌বস্তু যার বিনাশ নেই!" আত্মার মধ্যে বাস করেন এক পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর ভূত-ভবিষ্যতের, তিনিই ধূম্রহীন জ্যোতিঃ,...স্বীয় শরীর হতে তাকে ধৈর্যের সঙ্গে মুক্ত করতে হবে।"— উপনিষদের বাণী (কঠোপনিষদ্ : ৪-১২, ১৩, ৫-১৭)। এই হল ঋগ্‌বেদোক্ত "গোপন গুহায় সংগুপ্ত বালক" (৫.২.১), "স্বর্গের সন্তান, পৃথিবীর শরীরে জাত" (৩,২৫,১), "সে-ই জাগ্রত সুপ্তদের মধ্যে" (কঠোপনিষদ্: ৫-৮), "ভবনের মধ্যস্থলে তিনি অবস্থিত" (ঋগ্‌বেদ ১.৭০.২), "তিনি যেন আমাদের অস্তিত্বের জীবন ও নিশ্বাস, যেন আমাদের শাশ্বত শিশু" (১.৬৬.১), তিনিই হলেন "সেই জ্যোতির্ময় সম্রাট্ যিনি ছিলেন সংগুপ্ত আমাদের কাছ থেকে" (১.২৩.১৪) : এই হল পরম কেন্দ্র, অধীশ্বর, সেই স্থল যেখানে সকল বস্তু সম্মিলিত হয় :

...সূর্যস্নাত সে স্থান যেথা সবই চির-পরিচিত।[৩]

যদি জীবনকালের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও আমরা অনুভব করি অন্তরের এই সূর্য, এই অগ্নিশিখা, এই জীবন্ত জীবন— মৃত জীবন অবশ্যই আছে— তাহলে সব-কিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায় ; সেই স্মৃতির কাছে সব-কিছুই ম্লান হয়ে যায়। এ-ই হল *স্মৃতি*। আমরা যদি এই জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে থাকি, তাহলে এ আমাদের শরীরের মধ্যে এক জীবন্ত সত্তার মতো ক্রমাগত অভিবৃদ্ধ হবে, এক অবিশ্রান্ত প্রয়োজনের মতো, ক্রমবর্ধমানভাবে আত্মসমাহিত, সীমাবদ্ধ, তীব্র এমন কিছুর মতো যা বিস্ফোরিত হয়ে উম্মুক্ত হতে পারে না : *এক ভয়ংকর বোধ যেন কিছু-একটা তোমাকে বাধা দিচ্ছে তোমার অবাধ দৃষ্টি ও গতিতে ; তুমি অতিক্রম করে যেতে চাও, কিন্তু দেখতে পাও তোমার সমুখে এক প্রাচীর। সেজন্য তুমি তার উপর আঘাতের পর আঘাত করে চলো, অথচ তুমি তার মধ্য দিয়ে যেতে পারো না,* শ্রীমা বলছেন। তারপর শুধু এই একান্ত প্রয়োজনবোধ, এই অবিমিশ্র সংকল্প, এই কারাবাসের অবিমিশ্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চৈত্যের প্রবল উদ্‌বেগপূর্ণ চাপ বিদীর্ণ হওয়ার সীমায় উপনীত হয়। এবং তখনই হল আমাদের অনুভূতি : *চাপ এত প্রবল হয়, জিজ্ঞাসার তীব্রতা এত শক্তিশালী হয় যে, চেতনার মধ্যে কিছু-একটা ওলট-পালট হয়ে যায়। বাইরে অবস্থিত হয়ে ভিতরে দেখবার জন্য প্রয়াস করবার পরিবর্তে তুমি ভিতরেই উপস্থিত হও ; যে-মুহূর্তে তুমি ভিতরে উপস্থিত হও, তখন সব-কিছু পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। যা-কিছু তোমার কাছে প্রতীয়মান হতো সত্য, স্বাভাবিক, সাধারণ, প্রকৃত, অধিগম্য, তৎক্ষণাৎ তা মনে হয় অদ্ভুত, হাস্যকর, অবাস্তব ও অলীক। তুমি স্পর্শ করেছ কিছু-একটা যা পরম সত্য ও শাশ্বতভাবে সুন্দর। এবং একে আর কখনও তুমি হারাবে না।* "হে অগ্নি, আমাদের দ্বারা বাহিত হয়ে তুমি হয়ে

ওঠ আমাদের সত্তার পরম অভিবৃদ্ধি ও প্রসার, সকল মহিমা ও সৌন্দর্য তোমার কাম্য বর্ণ ও তোমার দিব্য দৃশ্যে আছে। হে বিশালতা, তুমিই সেই পূর্ণতা যা আমাদের নিয়ে যায় পথের শেষ পর্যন্ত ; সর্বদিকে বিচ্ছুরিত ঐশ্বর্যের বহুলতা তুমি" (ঋগ্‌বেদ ২.১.১২)। প্রকৃত জীবন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় যেন তার পূর্বে আমরা কখনও দিবালোক দেখিনি। শ্রীমা বলছেন, *প্রিজমটিকে যদি একপাশে রাখো, আলোক তখন হয় শুভ্র; তাকে ঘুরিয়ে দাও, আলোক বিভক্ত হয়ে যাবে। তাহলে, যা হয়, তা ঠিক এমনই : শুভ্র আলোক তুমি আবার ফিরিয়ে আনো। সাধারণ চেতনায় সব-কিছুই বিভক্ত, এবং শুভ্র আলোক তুমি আবার ফিরিয়ে আনো।* শ্রীমা অনুভূতিটিকে এইভাবে আরও বর্ণনা করেছেন : *তুমি যেন বসে আছ এক রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে, যা ব্রঞ্জ-এর এক গুরুভার দ্বারের মতো, এবং সেখানে তুমি এই সংকল্প নিয়ে আছ যে তা মুক্ত হয়ে যাবে তোমাকে অপর পার্শ্বে যেতে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমার সকল একাগ্রতা, তোমার সকল অভীপ্সা একটি একক আলোকরশ্মিতে একত্রিত হয়ে সেই দ্বারেব উপর অবিরত ধাক্কা দিয়ে চলে, ক্রমাগতভাবে অধিক হতে অধিকতর দৃঢ়ভাবে, ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে, যে-পর্যন্ত না দ্বারপথ সহসা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এবং তুমি প্রবেশ করো, যেন আলোকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছ।*

তখনই আমরা সত্যকারের জন্মলাভ করি।

চৈত্য অভিবৃদ্ধি

চৈত্য যখন উন্মীলিত হয়, তখন আমাদের অনেক অনুভূতিই হতে পারে ; তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অব্যবহিত ও অনিবার্য হল এই যে, আমরা শাশ্বতভাবে বিদ্যমান ও আমাদের অস্তিত্ব চিরন্তন। আমরা অন্য এক পরিসরে আবির্ভূত হই, যেখানে আমরা দেখি যে আমরা এই বিশ্বের মতোই প্রাচীন ; এবং চিরন্তনভাবে তরুণ ; আমরা দেখি যে এই জীবন একটি অনুভূতি, একটি সংযোজন অনুভূতির এক অবিচ্ছিন্ন মালায় যা আমাদের অতীতে সুদুরপ্রসারী ও ভবিষ্যতে বিলীন। সব-কিছুই প্রসারিত হয় পৃথিবীর মানদণ্ডে। কেমন মানুষ না হয়েছি আমরা? কোন্ পাপ আমরা বহন না করেছি? সকল মূল্যই বিপরীত হয়ে যায় : এ সকল নীচত্ব ও মহত্ত্বের কোন্‌টা আমাদের নয়? কোথায় অপরিচিত, কোথায় বিশ্বাসঘাতক, কোথায় শত্রু? হে দিব্যপ্রজ্ঞা, পরম করুণা! এবং তারপর সব-কিছুই জীবন্ত হতে আরম্ভ করে যেন আমরা গুহার জীবন হতে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে চলে গেছি, সব-কিছুই সম্বদ্ধ হয়ে যায়, সংযুক্ত হয়ে যায়, যেন আলোকময় এক নিশ্বাসে প্রাচীন প্রহেলিকাটি বিদীর্ণ হয়ে যায়— মৃত্যু নেই আর, শুধু অজ্ঞানের মৃত্যু সম্ভব : যা চৈতন্যময়, তার মৃত্যু কীভাবে সম্ভব? *আমি সর্বদাই আছি, জীবন্ত*

হই বা মৃত।[৪] "বৃদ্ধ জরাজীর্ণ, তিনি বারংবার তারুণ্যলাভ করেন।" (ঋগ্‌বেদ, ২.৪.৫)। গীতার বাণী : "এ জাত হয় না, মৃতও হয় না ; এও নয় যে একবার সম্ভূত পুনর্বার হবে না। মানুষ যেমন তার জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে অন্য নববস্ত্র পরিধান করে, তেমনই দেহী তার শরীর ত্যাগ করে নব্য শরীর ধারণ করে। যে জাত হয় তার মৃত্যু ধ্রুব, তেমনই যে মৃত, তার জন্মও ধ্রুব।" (২ : ১৮, ২০, ২২, ২৭)।

পুনর্জন্মের নামে যা-কিছু বিদিত আছে, তা শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য নয় ; সকল প্রাচীন প্রজ্ঞাই এর উল্লেখ করেছেন, সুদুর প্রাচ্য হতে মিশর ও নব্য-প্লেটোবাদিগণ পর্যন্ত, * কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একে এক নতুন অর্থ দিয়েছেন। কারণ, যখনই আমরা মৃত্যু-সীমিত একটি একক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যাই, দুটো মনোভাব তখন সম্ভব হয় : হয় আমরা একমত হই বর্জননিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদীদের সঙ্গে যে, এই সমস্ত জীবনই এক বেদনাপূর্ণ ব্যর্থ শৃঙ্খল, যা হতে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের নিজেদের মুক্ত করা উচিত ভগবানের মধ্যে, ব্রহ্মে বা কোনো একপ্রকার নির্বাণে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ; না-হয়, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি— অনুভূতির উপর স্থাপিত এক বিশ্বাস— এই সমস্ত জীবন চেতনার এক অভিবৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে, যার সর্বোচ্চ পরিণতি এক পার্থিব *পরিপূর্ণতা ;* অন্য শব্দে, বিবর্তনের এক ধারা আছে, প্রজাতির বিবর্তনের অন্তরালে এক চেতনার বিবর্তন, এবং এই আধ্যাত্মিক বিবর্তনের পরিণতি নিশ্চয় হবে পৃথিবীতে এক ব্যক্তিগত ও সামূহিক সংসিদ্ধি। আমরা বিস্মিত হতে পারি, পুরাতনপন্থী অধ্যাত্মবাদীরা কীজন্য এই পার্থিব সংসিদ্ধির দূরদৃষ্টি প্রাপ্ত হন নি, যদিও তাঁরা প্রবুদ্ধ ঋষি ছিলেন? প্রথমত দৃষ্টির এই বিচ্যুতি প্রযোজ্য যাঁরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক অধ্যাত্মবাদী তাদেরই প্রতি, কারণ বেদ (যার রহস্য শ্রীঅরবিন্দ পুনরাবিষ্কার করেছেন) ও বোধহয় অন্য সকল পরম্পরা— যাদের রহস্য এখনও পর্যন্ত সামান্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে— এর বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে ; এ বিষয়ে মনে হয় আমাদের আধুনিক আধ্যাত্মিকতা চিহ্নিত হয়ে আছে চেতনার এক অস্পষ্টতা দ্বারা, যা তার মানসিক উন্নতির সঙ্গে সমানুপাতিক। তাছাড়া এই অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে তাঁদের প্রারম্ভিক সূত্র হতে ভিন্ন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর ; যখন তাঁরা আরম্ভ করেছেন এই ধারণা নিয়ে যে পার্থিব জগৎ এক মরীচিকা, অথবা এক অন্তর্বর্তী অঞ্চল যা কমবেশি আসক্ত শরীর ও পাপশক্তির প্রতি। তাঁরা উপনীত হয়েছেন সেখানেই যেখানে তাঁদের মূলসূত্রগুলি নিয়ে গেছে : স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা চেয়েছিলেন মুক্তি ও মোক্ষ জগতের বাইরে।

* কৌতূহলোদ্দীপকভাবে, আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মসভায় খৃস্টান ধর্মযাজকগণ পুনর্জন্মকে গ্রহণ করবার সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক ও চৈত্যিক— সকল মানবিক সাধনকে তাদের আবরণ হতে মুক্ত করবার জন্য ও তাদের বিস্তৃত করবার জন্য, এক কথায়, তাদের দিব্যতত্ত্বে পরিণত করবার জন্য, বৈদিক ঋষিদের মতো (এবং শ্রীঅরবিন্দের কথা বলা বাহুল্য, বোধহয় সকল প্রাচীন পরম্পরার ঋষিদের মতোও) ধৈর্য সহকারে তাদের উপর অন্বেষণ চালানোর পরিবর্তে, তাঁরা সব-কিছু প্রত্যাখ্যান করে চেয়েছিলেন *তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ মন হতে বিশুদ্ধ আত্মায় তীব্র বেগে ছুটে চলে যেতে।*[৫] স্বাভাবিক ভাবেই, তাঁরা যা দেখতে চান নি তা দেখতে পান নি। জড়বাদীরাও আমাদের মানবিক উপায়সমূহকে পরিবর্জন করেছেন, কিন্তু বিপরীতভাবে : তাঁরা অন্বেষণ করেছেন জড়তত্ত্বের এক অতি ক্ষুদ্র কণিকার উপর, এবং অবশিষ্ট সব-কিছুকেই অস্বীকার করেছেন। জড়ই একমাত্র সত্য, এবং অন্য সব-কিছু ভ্রম মাত্র— এই ধারণা নিয়ে যাত্রারম্ভ করে তাঁরা শেষে সেখানেই উপনীত হন, যেখানে তাঁদের প্রারম্ভিক সূত্রগুলি তাঁদের নিয়ে যায়। মানুষের পূর্ণাঙ্গ সম্ভাবনাসমূহের উপর পূর্ণ আস্থা তথা এক উন্মুক্ত সত্যের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, কোনো পক্ষপাত ব্যতীত, শ্রীঅরবিন্দের মতো আমরা যদি যাত্রারম্ভ করি, তাহলে হয়তো আমরা সুযোগ পেতে পারি এক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানে উপনীত হওয়ার জন্য এবং ফলত এক পূর্ণাঙ্গ জীবনে উপনীত হওয়ার জন্য।

চেতনার বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে, পুনর্জন্ম আর এক ব্যর্থ আবর্তন হয়ে থাকে না, যেমন তা হয়েছে কিছু লোকের দৃষ্টিতে, কিংবা হয় না এক লাগামছাড়া কল্পনা, যেমন অন্যেরা তাকে পরিণত করেছেন। পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বচ্ছতা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কাছ থেকে দূর করেছেন, যা শ্রীমার ভাষায় *আধ্যাত্মিক কাল্পনিকতা,* যার মধ্যে কত গুরুগম্ভীর জ্ঞান অধঃপতিত হয়েছে রহস্যযুগের শেষ হতে ; এবং তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন পরীক্ষার জন্য, অলৌকিকতার পরিবর্তে এক সরল মনের স্বচ্ছতা নিয়ে। বিষয়টি নয় পুনর্জন্মে বিশ্বাস করবার, বরং তা হল সে বিষয়ে অনুভব করবার, এবং প্রথমত সেইসব প্রয়োজনীয় পরিবেশের বিষয়ে জানবার, যার মধ্যে এই অনুভূতি সম্ভব। আমরা এখানে আলোচনা করছি, সময়ের সাথে আমাদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সম্পর্কে এক ব্যবহারিক প্রশ্ন নিয়ে। ক্ষুদ্র সম্মুখ-ব্যক্তিত্বটি কিন্তু পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না যদিও এই কথাটি তাদের কাছে নৈরাশ্যজনক যারা নিজেদের অমরভাবে চিত্রিত করেন এক অভিন্ন মিঃ স্মিথ্ রূপে স্যাক্সনদের ট্যুনিক-পরিহিত, তারপর মখমলের জার্কিন্ ও ব্রীচেস্-এ এবং পুনর্বার এক ধূসর ফ্লানেল্ স্যুটে সজ্জিত— তাছাড়া, এটা খুবই ক্লান্তিকর হতো। পুনর্জন্মের তাৎপর্য উভয় গভীরতর ও বিশালতর। মৃত্যুর সময়ে, সম্পূর্ণ বহির্ব্যক্তিত্বটিই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হয়ে যায় : মানসিক স্পন্দনের সমষ্টি, যা আমাদের চারধারে ভিড় করে থাকে অভ্যাসগত পুনরাবৃত্তির দ্বারা ও প্রস্তুত করে আমাদের মানসিক অহং বা মানসশরীর, তা বিখণ্ডিত হয়ে

যায় ও ফিরে যায় বিশ্বময় মানসে; সেইভাবে প্রাণিক স্পন্দনগুলো যা প্রস্তুত করে আমাদের প্রাণিক অহং বা প্রাণিক শরীর, তাও বিখণ্ডিত হয়ে বিলীন হয় বিশ্বময় প্রাণে। ঠিক যেমন ভৌতিক শরীরটি বিনষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায় তার প্রাকৃতিক উপাদানে বিশ্বময় জড়তত্ত্বে। শুধু চৈত্যসত্তাই অবশিষ্ট থাকে— শাশ্বত সে, যা আলোচনা করেছি আমরা। সুতরাং পুনর্জন্মে আমাদের অনুভূতি নির্ভর করবে আমাদের চৈত্যকেন্দ্র ও নিয়ন্তার উন্মীলনের উপর, যা এর স্মৃতি এক জীবন হতে জীবনান্তরে বহন করে এবং নির্ভর করবে আমাদের চৈত্যপুরুষের বিকাশের উপর। যদি আমাদের মানসিক-প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়ার নিচে আমাদের চৈত্যসত্তা সমাধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে আমাদের সারা জীবন ধরে, তাহলে এর কোনো স্মৃতিই নেই সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য— বারংবার ফিরে আসে সে আমাদের সত্তার সম্মুখভাগে প্রকাশিত হওয়ার জন্য। মনে রাখবার জন্য স্পষ্টত আমাদের প্রথমে বন্ধ করতে হবে স্মৃতিশক্তিহীনতায় গ্রস্ত হওয়া। সেজন্য একটা নির্দিষ্ট স্তরের নিচে পুনর্জন্মের কথা বলাই সম্ভব নয়, কাবণ চৈত্যপুরুষের পুনর্জন্ম হয় একথা বলবার অর্থই বা কী, যদি তা সচেতন না হয়? চেতনার অভিবৃদ্ধিই বিবর্তনের যথার্থ অর্থ।

জীবনের পর জীবন, সম্মুখ ব্যক্তিত্বের অন্তরালে, নীরবে চৈত্যপুরুষের অভিবৃদ্ধি হয়, এর বিকাশ হয় আমাদের শরীরে সহস্র স্পন্দনের মধ্য দিয়ে, আমাদের আবেগসমূহের সহস্র উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে, আমাদের মধ্যে আলোড়নরত সংখ্যাতীত চিন্তারাজির মধ্য দিয়ে, এর বিকাশ হয় আমাদের উত্থানে ও আমাদের পতনে, আমাদের দুঃখকষ্ট ও আমাদের আনন্দের মধ্য দিয়ে, আমাদের ভালো ও আমাদের মন্দের মধ্য দিয়ে— জগৎকে অনুভব করবার জন্য এসবই হল তার সংকেত গ্রহণের অ্যান্টেনা। যখন এই বাইরের সমষ্টি বিলীন হয়ে যায়, তখন চৈত্যসত্তা শুধু ধরে রাখে তার সকল অনুভবের সারমর্ম, কিছু প্রশস্ত প্রবণতা যা অধিকতর লক্ষণীয়, এবং গঠন করে *চৈত্য ব্যক্তিত্বের* প্রথম ভ্রূণ, সম্মুখ-ব্যক্তিত্বের অন্তরালে * এবং যে জীবন সদ্য যাপিত হয়েছে তা হতে কিছু

* চৈত্য ব্যক্তিত্ব বা প্রকৃত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে প্রত্যেক সত্তার বিশিষ্ট নিয়তি (বোধহয় আমাদের বলা উচিত, তার *বিশিষ্ট* ভঙ্গিমা), তার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধার্মিক স্তরসমূহের অন্তরালে। এইভাবে, কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি হতে পারেন যথাক্রমে একজন নাবিক, একজন সংগীতজ্ঞ অথবা একজন বিপ্লবী, খৃস্টান, মুসলিম বা নাস্তিক, তথাপি তিনি প্রত্যেক জন্মে একই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভালোবাসায়, কিংবা বিজয়শক্তিতে অথবা আনন্দে বা পবিত্রতায়, যা দেবে এক বিশিষ্ট বর্ণাঢ্যতা তিনি যে-কার্যই গ্রহণ করেন তাতে। এবং প্রত্যেকবার সেই বিশিষ্ট ভঙ্গিমাটি হয়ে উঠবে ক্রমশ আরও নিখুঁত, বিশুদ্ধ ও প্রশস্ত।

পরিণতি এ নিজের সঙ্গে গ্রহণ করে, কারণ আমাদের প্রত্যেক কার্যে নিহিত আছে এক গতিশক্তি, যার প্রবণতা আছে নিজেকে অবিরামভাবে বজায় রাখবার (একেই ভারতবর্ষে বলা হয় কর্ম)। কোনো কোনো ছাপ অন্যজীবনে রূপান্তরিত হয় বিশেষ পূর্বপ্রবণতায়, নির্দিষ্ট অসুবিধায় সহজাত রুচিতে, ব্যাখ্যাহীন ভয়ে, দুর্নিবার আকর্ষণে, এমন-কি কখনো কখনো কোনো বিশেষ বিশেষ ঘটনাচক্রে, যেসব প্রায় যান্ত্রিকভাবে নিজেদের পুনরাবৃত্ত করে, যেন একই সমস্যার সম্মুখে তারা আমাদের নিয়ে আসে তার সমাধানের জন্য। তাহলে, প্রত্যেক জীবন একই প্রকার অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করে (আমরা মনে করি, আমরা জীবনে অনেক অনুভূতি লাভ করি, কিন্তু তা সর্বদা একই), এবং অসংখ্য প্রকারের অনুভূতি-সংগ্রহের মধ্য দিয়ে চৈত্যপুরুষ ধীরে ধীরে লাভ করে ক্রমবর্ধমানভাবে শক্তিশালী এক ব্যক্তিত্ব, ক্রমবর্ধমানভাবে সচেতন ও বিশাল, যেন এ আরম্ভ করেছে তার প্রকৃত অস্তিত্ব, মানবিক অনুভূতির সমগ্র পরিসরের মধ্যে দিয়ে চলার পর। যতই এর অভিবৃদ্ধি হয়, আমাদের অন্তর্নিহিত চিৎশক্তি ততই অধিকতর ব্যষ্টিভাবাপন্ন হয়, এবং চৈত্যপুরুষের চাপ ততই গুরুতর, ততই অধিকতর হয় সেদিন পর্যন্ত যেদিন এর আর প্রয়োজন থাকে না সম্মুখ-কোষাবরণের, এবং সহসা অভিব্যক্ত হয় প্রকাশ্যে। তখন চৈত্যপুরুষ চারদিকে জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে সজাগ হয়; এ হয় আমাদের প্রকৃতির নিয়ন্তা, এর নিদ্রামগ্ন বন্দী হওয়ার পরিবর্তে। চেতনা তার শক্তির প্রভু হয়, তার পঙ্কে নিমগ্ন হওয়ার পরিবর্তে। যোগ আমাদের বিকাশের সেই অবস্থাটি, যখন প্রাকৃতিক বিবর্তনের সীমাহীন গোলকধাঁধা হতে মুক্ত হয়ে আমরা উপনীত হই এক সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত বিবর্তনে : যোগ এক প্রক্রিয়া *ঘনীভূত বিবর্তনের।*[৬]

তাহলে, একথা স্পষ্ট যে সাধারণ মানুষ, যার মধ্যে চৈত্যপুরুষ এক সুপ্ত সম্ভাবনা, এবং এক প্রবুদ্ধ পুরুষের মধ্যে ব্যবধানের অনেক মাত্রা আছে। পুনর্জন্ম ব্যতীত, ব্যাখ্যা করা অনেক দুষ্কর এই বিরাট পার্থক্য অন্তরাত্মাদের মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ একজন দেহপণ্যাদের দালালের অন্তরাত্মা এবং একজন দান্তে* বা একজন ফ্রান্সিস্ অফ অ্যাসিসির** অন্তরাত্মার মধ্যে, কিংবা শ্রীঅরবিন্দ-কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ অনুযায়ী, একজন অর্থলিপ্সু বিষয়ী ব্যক্তির অন্তরাত্মা ও একজন সাধকের অন্তরাত্মার মধ্যে, যদি না আমরা মনে করি যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হল শিক্ষা, পরিবেশ ও বংশ-পরম্পরার কথা, যদিও স্পষ্টত তা নয় : আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদেরই শুধু অন্তরাত্মা আছে,

* Dante (১২৬৫-১৩২১) : ইতালীয় কবি।

** St. Francis of Assissi (১১৮২-১২৬৬) : ইতালীয় নগরী Assissi-র সাধুপুরুষ, Fransiscan Order-এর প্রতিষ্ঠাতা।

এবং মানবজাতির তমসাচ্ছন্ন তিন-চতুর্থাংশ শাশ্বতকাল অভিশপ্ত হয়ে থাকবে? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : *আমাদের মানবজাতির প্রকৃতি হতেই অনুমান করা যায় অন্তরাত্মার গঠনকারী বিভিন্ন প্রকারের অতীত এবং তারই পরিণতিস্বরূপ এক পার্থিব ভবিষ্যৎ।*[৭] এবং প্রমাণ সত্ত্বেও যদি আমরা জিদ্ ধরে ধারণা করি যে মানুষের আয়ত্তে শুধু একটিই জীবন আছে, তাহলে আমরা পড়ে যাই অসামঞ্জস্যের মধ্যে : *প্লেটো এবং একজন হটেন্‌টট্, মহাত্মাদের বা ঋষিদের* ভাগ্যবান্ সন্তান ও কোনো এক বিশাল মহানগরীর নিম্নতম পূতিগন্ধময় দুর্নীতির মধ্যে আরম্ভ-হতে-শেষ-পর্যন্ত নিমগ্ন আজন্ম তালিমপ্রাপ্ত অপরাধী— সকলকেই সমানভাবে সৃষ্টি করতে হবে তাদের শাশ্বত ভবিষ্যৎ এই এক অসমান জীবনের কর্ম বা বিশ্বাসের দ্বারা। এ এক বিরোধাভাস যা অন্তরাত্মা ও বুদ্ধি, নৈতিক বোধ ও আধ্যাত্মিক সম্বোধি, উভয়কেই অপমান করে।*[৮] কিন্তু প্রবুদ্ধ পুরুষদের মধ্যেও মাত্রার অনেক বিরাট তারতম্য বিদ্যমান; কোনো কোনো *অন্তরাত্মা, কোনো কোনো চিৎশক্তি সদ্য নবজাত, যখন অন্যেরা ইতিমধ্যে* হয়েছেন দৃঢ়-সংগঠিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ; কোনো কোনো অন্তরাত্মা আত্মোপলব্ধির প্রথম জ্যোতিঃস্ফূরণে আলোকিত, কিন্তু তাঁরা তাঁদের নিজেদের দীপ্তিশীল আনন্দের বাইরে খুব কমই জানেন, নিজেদের অতীতের কোনো নির্দিষ্ট স্মৃতিও তাঁদের নেই ; কিংবা নেই তাঁদের সচেতনতা, তাঁরা তাঁদের অন্তরে যে-সব জগৎ বহন করে চলেছেন সে-সবের সম্বন্ধে ; সেই সময়েই কিছু সুদুর্লভ ব্যক্তি আছেন যাঁদের সম্বন্ধে মনে হয়, যেন তাঁরা পৃথিবীর মতো বিশাল এক চেতনায় পরিপূর্ণ। কারণ এক জন জ্যোতির্ময় যোগী বা একজন মহাত্মা, যিনি অন্তরাত্মায় বাস করেন, হতে পারেন অধিকারী এক অমার্জিত মনের, এক অবদমিত প্রাণের, এক শরীরের যা তিনি ঘৃণা করে উটের মতো ব্যবহার করেন, তাঁর অতিচৈতন্য সম্পূর্ণ শূন্য হতে পারে ; তাঁর মোক্ষপ্রাপ্তি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এক পূর্ণাঙ্গজীবনের পূর্ণতা হয়তো তিনি পান নি।

সুতরাং চৈত্যপুরুষের আবিষ্কার অনুসৃত হতে হবে, যাকে আমরা আলংকারিকভাবে বলতে পারি "চৈত্য ঔপনিবেশিকতা" বা আরও গম্ভীরভাবে, *চৈত্য সমন্বয়* তারই দ্বারা। সমসাময়িক মনস্তত্ত্বও এই সমন্বয়ের কথা বলে, কিন্তু এই "সমন্বয়" যাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে, কী সে? সমন্বয়ের জন্য এক কেন্দ্রের প্রয়োজন। কিংবা আমরা কি মানসিক বা প্রাণিক অহং-এর আলোড়নকে কেন্দ্র করে একীকরণ করব? তাহলে, বান মাছের লেজেও আমরা নৌকার নঙ্গর বাঁধতে পারি। ধৈর্যসহকারে, ধীরে ধীরে, অন্তর্নিহিত চৈত্য সাম্রাজ্য আবিষ্কারের পর, বাইরে সকল সাম্রাজ্যেও উপনিবেশ স্থাপন করে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে

* বৈদিক ঋষিগণ একাধারে কবি ও দ্রষ্টা ছিলেন।

হবে ; যদি, আমরা যা চাই তা পৃথিবীতে এক সংসিদ্ধি, তবে আমাদের সকল মানসিক ও প্রাণিক কার্যকলাপকে, এমন-কি আমাদের সমগ্র দৈহিক প্রকৃতিকে (আমরা যে-বিষয়ে পরে আলোচনা করব) এই নতুন কেন্দ্রের চারদিকে সমন্বিত করতেই হবে। শুধুমাত্র এই স্থিতিতেই তারা বিদ্যমান থাকবে : বলা যেতে পারে, সেই সকল ক্রিয়াকলাপই চৈত্যের অমরত্বে অংশগ্রহণ করবে যারা "চৈত্য-প্রভাবাপন্ন" হবে। যা-কিছু চৈত্যের বাইরে সংঘটিত হয়, তা ফলত, আমাদের বাইরেই সংঘটিত হয়, এবং শরীরের পর সে-সব থাকবে না। কোনো কোনো জীবন এমনও আছে যেখানে কেউ নেই। বাইরের বস্তু মনে রাখতে হলে চৈত্যপুরুষের প্রযোজন সেই সব বাইরের ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে ; নতুবা এ শুধু এক অন্ধ রাজা। তখনই, এবং শুধুই তখন, আমরা পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরসমূহের বিষয়ে বলা শুরু করতে পাবি— এর কোনো আবশ্যকতা নেই যে সেই স্মৃতিগুলো শুধু অধিকতর আকর্ষণীয় ও মহিমান্বিত কার্যেরই হবে (আমরা যদি পুনর্জন্মের শস্তা অলীক কাহিনীগুলিতে বিশ্বাস করি, তাহলে দেখি কত নেপোলিয়ন, কতই না সিজার!) কিন্তু সেগুলো হবে *অন্তরাত্মার মুহূর্তগুলির*[১] স্মৃতি, কারণ চৈত্যপুরুষের কাছে কিছুই নয় মহিমামণ্ডিত বা মহিমাবিহীন, কিছুই নয় উচ্চ বা নীচ, এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ প্রতিদিনের মতো ভূতলপথে অবতরণের চেয়ে মহত্তর নয়, যদি তা করা সচেতন হয়। চৈত্যপুরুষ স্বয়ং মহিমা।

এই "অন্তরাত্মার মুহূর্তগুলি" তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বাস্তব পরিস্থিতিগুলোর ছাপ রাখতে পারে ; আমরা মনে রাখতে পারি সে-সময়ের কোনো এক পরিবেশ, কোনো বিশেষ স্থান, কোনো পোশাক যা আমরা পরিধান করেছিলাম, যেন এক অতি তুচ্ছ বস্তুও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শাশ্বতের সঙ্গে মুদ্রাঙ্কিত হয়ে যেতে পারে যে-সময়ে অন্তঃপ্রকাশ সংঘটিত হয়। এই জীবনেই, আমরা পরিচিত হই বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা বা আকস্মিক প্রস্ফুটনের কিছুক্ষণের সঙ্গে, এবং বিশ বা চল্লিশ বছর পরে সেই আলোকচিত্র আমরা অক্ষত অবস্থায় পাই, আকাশের অবিকল রঙ সমেত, এমন-কি, পথের ক্ষুদ্র উপলখণ্ড কিংবা সেদিনের প্রকাশমান অর্থহীন কার্যক্রম সমেত, যেন সব-কিছু চিরদিনই বিদ্যমান—"যেন" নয়, প্রকৃতই এ চিরদিন *বিদ্যমান।* সহস্র সহস্র অস্তিত্ববিহীন ঘটিকার মধ্যে এসবই হল একমাত্র মুহূর্ত যখন আমরা জীবন্ত, যখন আমাদের মধ্যে এক প্রকৃত 'আমি' উদ্‌ভূত হয়। দুঃখদ পরিস্থিতিতেও চৈত্যপুরুষ আবির্ভূত হতে পারে, যখন সমগ্র সত্তা সহসা একত্রিত হয় এক চরম কটু তীব্রতার সঙ্গে, এবং কিছু একটা বিদীর্ণ হয়ে যায় : আমরা তখন অনুভব করি অন্তরালে এক প্রকারের উপস্থিতি, যা আমাদের মাধ্যমে এসব কাজ করিয়ে নেয়, যা করবার জন্য সাধারণত আমরা অসমর্থ। এই হল চৈত্যপুরুষের অন্য এক মুখমণ্ডল, শুধু আনন্দ ও মাধুর্যের মুখমণ্ডলই নয়, বরং তা ছাড়া প্রশান্ত শক্তিরও মুখমণ্ডল, যেন এ চিরদিনই সকল সম্ভব দুঃখদ ঘটনার

উর্ধ্বে, এক অজেয় প্রভু। এখানেও দৃশ্যটি বিশদভাবে মুদ্রাঙ্কিত হয়ে যেতে পারে অনপনেয়ভাবে। কিন্তু পরবর্তী জীবনে যা সঞ্চারিত হয়, তা ততটা বিশদভাবে হয় না, যতটা হয় দৃশ্যের সারমর্মের রূপে ; আমরা আবার পাব ঘটনাক্রমের কিছু যোগাযোগ বা কিছু অচল পরিস্থিতি যা আমাদের আঘাত করবে এমন এক ভাব নিয়ে যেন তা *পূর্ব-দৃষ্ট* এবং প্রতীত হবে যেন নিয়তির নির্দেশের দীপ্তিতে শোভিত : যা আমবা অতীতে জয়লাভ করি নি, তা বার বার ফিরে আসে, প্রত্যেকবার সামান্য পরিবর্তন নিয়ে চেহাবায়, কিন্তু মূলত সবসময়ই এক, যে পর্যন্ত না আমরা তার মুখোমুখি হয়ে পুরোনো জটটিকে বন্ধনমুক্ত করি। আন্তর প্রগতির এই হল বিধান।

কিন্তু সাধারণত বাস্তব পরিস্থিতির নিখুঁত স্মৃতি উদ্দিষ্ট নয় চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য, কারণ মোটের উপর তাদের গুরুত্ব খুবই কম, যদিও আমাদের ক্ষুদ্র সম্মুখচেতনা তাদের অনেক গুরুত্ব প্রদান করে। এমন-কি, এক স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা আছে যা অতীতের স্মৃতির নিষ্প্রয়োজন প্রাচুর্য মুছে ফেলে, ঠিক যেমন আমাদের বর্তমান জীবনের স্মৃতিগুলো মিলিয়ে যায়। যদি আমরা পিছন ফিরে তাকাই এই জীবনের উপর এক সর্বগ্রাহী দৃষ্টিপাত ক'রে, কিছুই চিন্তা না ক'রে, তাহলে বাস্তবিক কী আর অবশিষ্ট থাকে? এক ঘনীভূত ধূসরিমা, যেখানে দু-তিনটে ছবিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অবশিষ্ট সব-কিছু মুছে গেছে। অন্তরাত্মা ও তার জন্মান্তরগুলোর কথাও তাই। ব্যাপকভাবে বাছাই চলে।

এবং দীর্ঘকালের জন্য এই বিস্মৃতির ব্যবস্থা খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ, কারণ যদি আমরা অপরিপক্বভাবে পূর্বজীবনগুলোকে স্মরণ করি, তাহলে আমাদের বিপৎপূর্ণ সম্ভাবনা থাকে সবসময় ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার : কত নিষ্প্রয়োজন স্মৃতি এর মধ্যে আমাদের বর্তমানের জীবনে হট্টগোল সৃষ্টি করেছে ও আমাদের প্রগতির বাধাস্বরূপ নির্মাণ করেছে এক প্রকার প্রাচীর, কারণ তারা আমাদের নিশ্চল করে রাখে অন্তরের একই দৃষ্টিভঙ্গিতে, একই সংকোচনে, একই অস্বীকার বা বিদ্রোহে, একই স্বাভাবিক প্রবণতায়। অভিবৃদ্ধির জন্য, আমাদের প্রয়োজন বিস্মৃতির। নৈরাশ্যপূর্ণভাবে অপরিণত আমাদের বহিশ্চেতনা নিয়ে আমরা যদি স্মরণ করতে পারি যে, উদাহরণস্বরূপ, আমরা একসময় এক পুণ্যবান্ ব্যাংকার ছিলাম কিন্তু এখন নিজেদের দেখি এক উদ্যোগী প্রতারকের শরীরে তাহলে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে যাব! বোধহয় এখনও আমরা এত বেশি অপরিপক্ব যে, আমরা বুঝতে পারি না, আমাদের অন্তরাত্মা চেয়েছিল পুণ্যের বিপরীতের জ্ঞান অর্জন করতে অথবা হয়তো অন্তরাত্মা অনুমতি দিয়েছে এর পুণ্য তার মধ্যে যে ব্রণ লুকিয়ে রেখেছিল তার বিস্ফোরণের জন্য। অধিকতর সাধুজনোচিত বা বুদ্ধিমান্ হওয়া নয়, বরং অধিকতর সচেতন হওয়াই বিবর্তনের তাৎপর্য। পূর্বজীবনগুলোর সত্য সফলভাবে বহনে সক্ষম হওয়ার জন্য বহু যুগের প্রয়োজন।

তাহলে, সব-কিছু নির্ভর করে আমাদের অভিবৃদ্ধির মাত্রার উপর, এবং আমাদের চৈত্যসত্তা আমাদের বাইরের জীবনে যতটা অংশগ্রহণ করেছে তার উপর ; যত বেশি আমরা "উপনিবেশ স্থাপন" করি, ততই বেশি স্মৃতি আমরা আমাদের সঙ্গে নেব। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ সময়ই, আমরা এক তথাকথিত আন্তর জীবনযাপনে সন্তুষ্ট থাকি, যখন বাইরে আমরা সেই পুরোনো পথেই জীবনযাপন করি শুধু অভ্যাস অনুযায়ী। এ পূর্ণযোগের বিপরীত। জাগতিক কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র আত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়ার পরিবর্তে, যদি পক্ষান্তরে, শুরু হতেই আমাদের অন্বেষণে আমরা সব-কিছু গ্রহণ করি, আমাদের সত্তার সকল স্তরে, সমগ্র জীবন, তাহলে আমরা পাব এক পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণীকৃত জীবন, যেখানে আমরা বাইরে ততই বিদ্যমান, যত অন্তরে। তথাকথিত আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা যদি সব-কিছু বর্জন করি, তাহলে পরবর্তী সময়ে আমাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে, মনকে বন্ধনমুক্ত করে তাকে বিশ্বভাবাপন্ন করবার উদ্দেশ্যে, প্রাণকে মুক্ত করে তাকে বিশ্বভাবাপন্ন করবার উদ্দেশ্যে, অবচেতনকে বিশোধিত করবার উদ্দেশ্যে, তথা অবশেষে দৈহিক মলিনতার মধ্যে প্রয়াস করে তাকে দিব্যভাবময় করবার উদ্দেশ্যে, আমাদের ভঙ্গুর উচ্চতা হতে নিম্নে অবরোহণ করা অত্যন্ত দুরূহ হবে ; ঊর্ধ্বে আমাদেব অবস্থান অত্যন্ত আরামপ্রদ, যা এই কর্দমখননের জন্য সহায়ক নয় ; এবং এ-কথা সত্য যে, এ অবস্থায় আমরা তা *আর* করতে পারব না। প্রকৃতপক্ষে, এজন্য আমরা চিন্তাই করি না, কারণ এই বিশাল কার্যভার গ্রহণ করবার কথা আমরা কীভাবে ধারণায় আনতে পারি যদি শুরু হতেই মন, প্রাণ ও শরীরকে নশ্বর ভেবে আমাদের মোক্ষ ও পলায়নকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে বিবেচনা করি?

সুতরাং সাধকের জন্য চৈত্য উপলব্ধি বা অন্তরাত্মার আবিষ্কার শেষ নয়, এ শুধু যথার্থ আরম্ভ অন্য এক যাত্রার, যেখানে ভ্রমণ অজ্ঞানভাবে না করে সচেতনভাবে করা হয়, অবিরতভাবে ক্রমশ বিশালতর এক চেতনার সাহায্যে, কারণ চৈত্যপুরুষ আমাদের জাগতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণপূর্বক যতই অভিবৃদ্ধি লাভ করে, জীবন হতে অন্য জীবনে ততই বেশি স্বচ্ছ, নির্ভুল ও অবিচ্ছিন্ন হয় এর মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক স্মৃতি— তখনই আমরা ঠিকভাবে বুঝতে শুরু করি অমরত্ব কী— এর জন্মসমূহও তখন হয় আরও সুসংগত, সুবিবেচিত ও ফলপ্রদ। আমরা মুক্ত, আমরা জাগ্রত শাশ্বতভাবে। মৃত্যু আর নয় বিদ্রূপের-হাস্যে-ভরা এক মুখোশ, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা আবিষ্কার করি নি নিজেদের ; বরং তা হল অনুভূতির এক ধরন হতে অন্য এক ধরনে এক প্রশান্তিময় পরিবর্তন। চিরদিনের জন্য আমরা আয়ত্তে এনেছি চেতনার সূত্র, এবং আমরা উভয় জগতে যাই, যেন আমরা এক দেশ হতে অন্যদেশে

ভ্রমণ করি, এবং পুনর্বার সেই পুরোনো পৃথিবীতে ফিরে আসি। এইভাবে, একদিন আসবে, যখন বোধহয় শ্রীঅরবিন্দের ঘোষণা অনুযায়ী আমরা যথেষ্ট অভিবৃদ্ধি লাভ করব, শুধু আমাদের মানসিক ও প্রাণিক অস্তিত্বের অবিচ্ছিন্নতাই সুনিশ্চিত করবার জন্য নয়, বরং এই শরীরে চেতনা যথেষ্টভাবে পরিপূর্ণ করবার জন্য। যার ফলে তা চৈত্য অমরতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কারণ, সবসময় সব-কিছুই চেতনার বিষয় এবং তা সত্য আমাদের মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক জীবন সম্বন্ধে, যেমন তা সত্য আমাদের নিদ্রায়, আমাদের মৃত্যুতে, আমাদের অমৃতত্বে। চেতনাই সাধন, চেতনাই মূলমন্ত্র, চেতনাই লক্ষ্য।

৮

শারীরসত্তা হতে মুক্তি

মন ও প্রাণের পর, আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মার তৃতীয় সাধন শরীর শ্রীঅরবিন্দের যোগে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করে, কারণ এ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো দিব্যজীবন সম্ভব নয়। এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখব অনুভূতির কয়েকটি প্রস্তুতিমূলক বিষয়, যা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগসাধনার প্রারম্ভিক সময়ে আবিষ্কার করেছিলেন। বস্তুত এ পর্যন্ত যা আমরা বিবেচনা করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি চেতনার অভিবৃদ্ধি শরীরের যোগের জন্য প্রয়োজন : জড়তত্ত্বের অভিমুখে যত আমরা অবতরণ করি, ততই চেতনার উচ্চতর শক্তির অধিকারী আমাদের অবশ্যই হওয়া উচিত, কারণ বাধাবিঘ্ন ততই বৃদ্ধিলাভ করে। জড়তত্ত্ব সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক কঠিনতার ক্ষেত্র, কিন্তু তা ছাড়াও, তা *বিজয়ের ক্ষেত্র*। সুতরাং শরীরের যোগ আমাদের প্রাণের বা মনের শক্তির পরিধি অতিক্রম করে, এ হচ্ছে *অতিমানস যোগের* এক অংশ, যে-বিষয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব।

ইন্দ্রিয় হতে মুক্তি

জড়তত্ত্ব আমাদের বিবর্তনের আরম্ভ বিন্দু। এর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে চেতনা

ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে, এবং চেতনার অভ্যুদয় যতই ঘটে, ততই একে পুনরুদ্ধার করতে হবে এর সার্বভৌমিকত্ব, এবং এর স্বাধীনতা দৃঢ়নিশ্চিত করতে হবে। এই হল প্রথম পদক্ষেপ (শেষ নয়, আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি)। তথাপি, জীবিত থাকবার জন্য শরীরের প্রয়োজনগুলির প্রতি, এবং জগৎকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য শরীরের ইন্দ্রিয়গুলির প্রতি, আমরা প্রায় সম্পূর্ণ দাসতুল্য : আমাদের যন্ত্রগুলোর জন্য আমরা খুবই গর্বিত, এবং তা যথার্থ, কিন্তু যখন আমাদের নিজেদের যন্ত্রে সামান্য একটু মাথাব্যথা হয়, তখনই সব-কিছু বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, এবং যদি রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিজন্ ইত্যাদির জটিল সাজ-সরঞ্জাম আমাদের নিষেধ করা হয়, তাহলে পাশের বাড়িতে কী চলছে তা জানবার জন্য, এমন-কি, রাস্তার শেষ যেখানে তার পর কী হচ্ছে তা দেখতেও আমরা অসমর্থ হব। অতি-সভ্য জীব আমরা, যারা শারীরিকভাবে অসভ্য মানুষদের স্তরও অতিক্রম করে নি। বোধ হয় আমাদের যন্ত্রগুলো এক প্রভুত্বের প্রতীক ততটা নয়, যতটা এক ভয়ংকর অসামর্থ্যের প্রতীক। এর জন্য দায়ী জড়বাদীরা, যাঁরা অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিতে অবিশ্বাস করেছেন, কিন্তু সমভাবে দায়ী অধ্যাত্মবাদীরাও যাঁরা জড়তত্ত্বের সত্যে অবিশ্বাস করেছেন। যাই হোক, এই অসামর্থ্য সংশোধনের অসাধ্য নয় : আমরা অসমর্থ আমাদের এই বিশ্বাস হতেই তা উদ্‌ভূত হয় ; আমরা কিছুটা সেই মানুষটির মতো, যে উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষের এক জোড়া খঞ্জের যষ্টি পেয়ে নিজের পায়ে বিশ্বাস করাই বন্ধ করে দিয়েছিল। কথাটি হল, আমাদের নিজেদের পায়ে বিশ্বাস করা, আমাদের নিজেদের চেতনায় বিশ্বাস করা— এর শুধু যে পা আছে তাই নয়, আছে অসংখ্য চোখ, অসংখ্য বাহু, এমন-কি পাখাও।

জড়তত্ত্বে নিমগ্ন চেতনা আমাদের বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কিছু-সংখ্যক বহিরিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে জগৎকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য, এবং যেহেতু আমরা অ্যান্টেনার আবির্ভাব দেখি, অ্যান্টেনার নিয়ন্ত্রকের পূর্বে, আমরা সেজন্য শিশুদের মতো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, অ্যান্টেনাই তার নিয়ন্ত্রকের স্রষ্টা, এবং অ্যান্টেনা ছাড়া কোনো নিয়ন্ত্রক নেই, জগতের প্রত্যক্ষদর্শনও হয় না। কিন্তু তা এক ভ্রম। ইন্দ্রিয়গুলোর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা *শুধু এক অভ্যাস*, হাজার হাজার বছরের পুরোনো অভ্যাস, সত্যই, কিন্তু তা প্রাচীন-প্রস্তর-যুগের মানুষের চকমকি পাথরের তৈরি সাধনের চেয়ে অধিকতর অপরিহার্য নয়। *মনের পক্ষে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর প্রত্যক্ষ অবগতি সম্ভব— এবং তা এর পক্ষে স্বাভাবিক হবে, যদি জড়তত্ত্বের অধীন হওয়ার জন্য এর স্বীকৃতি হতে নিজেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে একে প্ররোচিত করা যেতে পারে।*[১] আমরা দেখতে পারি, অনুভব করতে পারি, মহাদেশগুলোকে অতিক্রম করেও, যেন কোনো দূরত্বই নেই, কারণ দূরত্ব এক

বাধা শুধু শরীরের ও তার ইন্দ্রিয়ের জন্যই, চেতনার জন্য নয়, যা তার ইচ্ছানুসারে এক মুহূর্তের মধ্যে যে-কোনো স্থানে যেতে পারে, যদি সে প্রসারিত হওয়ার দক্ষতা অর্জন করে থাকে— অন্য এক অধিকতর লঘুভার স্থান আছে, যেখানে সব-কিছুই একসঙ্গে অবস্থিত হতে পারে ঝলকময় এক বিন্দুতে। হয়তো আমরা এখানে আশা করতে পারি অতীন্দ্রিয় দর্শন ও সর্বব্যাপিত্বের বিষয়ে কোনো প্রকারের "নির্দেশাবলী", কিন্তু নির্দেশাবলী তবুও দ্বিতীয়স্তরের এক ব্যবস্থা, এবং তাছাড়াও সেই কারণেই আমরা সেসব পছন্দ করি। সকল প্রকার যৌগিক পদ্ধতির মতো, হঠযোগ নিঃসন্দেহে ফলপ্রদ— যেমন প্রদীপশিখার উপর একাগ্রতা *(ত্রাটক)*, অভ্রান্ত আহার-নিয়ন্ত্রণ, নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম ও বিজ্ঞানসম্মত কুম্ভক *(প্রাণায়াম)*। সবই উপযোগী, সব-কিছুকেই ব্যবহারে আনা যেতে পারে। কিন্তু এসব পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, তারা দীর্ঘসময় গ্রহণ করে ও তাদের পরিধিও সীমাবদ্ধ। তাছাড়া তারা সবসময় অনিশ্চিত এবং কখনো কখনো বিপৎসংকুল, যখন যথেষ্ট প্রস্তুতি বা বিশুদ্ধতা ব্যতীতই লোকেরা তাদের অনুসরণ করে— শক্তি চাওয়া যথেষ্ট নয়, যখন শক্তি আসবে তখন যেন যন্ত্রটি বিদীর্ণ না হয়ে যায় ; "দেখা"ই যথেষ্ট নয়, যা দেখি তা বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। ব্যবহারিকভাবে আমাদের কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে, যদি আমরা শুধু বুঝতে পারি যে *চেতনাই* সকল পদ্ধতির ব্যবহার করে ও তাদের মাধ্যমে কাজ করে, এবং আমরা যদি সোজাসুজি চেতনায় উপনীত হই, তাহলে আমরা হাত দিই কেন্দ্রস্থ উত্তোলকে। তাছাড়া, অতিরিক্ত সুযোগ এই যে, চেতনা প্রতারিত করে না। এমন-কি, চেতনাকে যদি আমরা একখণ্ড কাঠ দিই তার একমাত্র পদ্ধতিরূপে, তাহলে তাকে সে ঘটনাক্রমে পরিবর্তিত করে দেবে এক জাদুদণ্ডে —কিন্তু তা মোটেই কাঠের খণ্ডটির বা কোনো পদ্ধতির কৃতিত্ব হবে না। যদি আমরা তাকে বন্দী করে নিই কোনো গুহার অন্তরালে, তাহলেও চেতনা ঘটনাক্রমে বহির্জগৎকে দেখবার পথ অন্বেষণ করে নেবে— বস্তুত এই হল সমগ্র কাহিনী —জড়তত্ত্বে চেতনার বিবর্তনের।

পূর্ণাঙ্গযোগের সাধকের জন্য শারীরিক সাধনা স্বাভাবিকভাবেই সম্মিলিত হয়েছে তার মনের ও প্রাণের সাধনার সঙ্গে। সুবিধার জন্য, আমরা সত্তার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা করেছি একের পর এক, কিন্তু সব-কিছুই অগ্রসর হয় পাশাপাশি, এবং যে-কোনো স্তরের প্রত্যেক বিজয়, প্রত্যেক আবিষ্কার অন্যসকল স্তরের উপর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। যখন আমরা মনের নীরবতার জন্য প্রয়াস করেছি, তখন ক্রমশ মনের অনেক স্তর আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি যাদের নীরব করতে হয়েছিল : *বৌদ্ধিক মন*, যা আমাদের সাধারণ বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া সংসিদ্ধ করে ; *প্রাণিক মন*, যা আমাদের কামনা-বাসনা, আমাদের আবেগ ও প্রেরণাকে যথার্থ বলে প্রতিপাদন করে ; *শারীরিক মনও* আছে যা আমাদের অনেক অসুবিধা প্রদান করে, কিন্তু

তার উপর বিজয়লাভ করা দৈহিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ততই প্রয়োজনীয় যত প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক ও প্রাণিক মনের বিজয় মনের ও প্রাণের নিয়ন্ত্রণের জন্য। প্রকৃতই মনে হবে যে এই মনই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ যোগের সেই পশু যা সকল দোষের ভারবাহী, কারণ আমরা এর শিকার করি সর্বত্র ; একথা পৃথকভাবে বলা যেতে পারে যে আমাদের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এ ছিল এক অতি মূল্যবান সাহায্য ; এবং অনেকের জন্য এখনও তা আছে এক অপরিহার্য সাধন হয়ে, কিন্তু সকল সহায়ক বস্তুই যতই উচ্চ বা দিব্য হোক-না-কেন, একদিন পরিণত হয় বাধায়, কারণ তারা উদ্দিষ্ট আমাদের সাহায্যপ্রদানে শুধু একটি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য, এবং অনেক পদক্ষেপই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, এবং একাধিক সত্যের উপর বিজয়লাভ করতে হবে। যে বিশেষ আদর্শটি আমরা বর্তমানে পোষণ করি তা পরিত্যাগ না করে যদি আমরা এই সরল মতটি গ্রহণ করি, ঊর্ধ্ব হতে নিম্ন পর্যন্ত আমাদের সমগ্র মূল্যবোধের ক্রমের জন্য, তাহলে আমরা বিবর্তনের পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হব। এই শারীরিক মনটি সবচেয়ে বেশি নির্বোধ, জড়তত্ত্বে মনের প্রথম আবির্ভাবের এই হল পদচিহ্ন। এ এক আণুবীক্ষণিক, অনমনীয় তথা ভীরু মন, সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল (বিবর্তনের জন্য এর উপযোগিতা ছিল), যা প্রয়োজন হলে আমাদের দশবার যাচাই করায় আমরা দরজায় তালা দিয়েছি কি না, যখন আমরা ভালোভাবেই জানি যে আমরা তালা দিয়েছি ; সামান্যতম আঁচড়েও এ আতঙ্কিত হয়, এর সবচেয়ে ভয়ংকর সব রোগের কল্পনা করে, যখনই কোনো ব্যতিক্রম হয় ; যা-কিছু নতুন তাকেই এ অবিশ্বাস করে, তাতে কোনো অস্থিরতা না এনে ; এবং এর কর্মসূচীতে কোনো ন্যূনতম পরিবর্তন করতে হলে পর্বতসমান অসুবিধার সৃষ্টি করে— আমাদের অভ্যন্তরে একই বিষয় ক্রমাগত ক্লান্তিকরভাবে চিন্তা করে অস্ফুটভাবে কথনরত এক বর্ষীয়সী অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের মতো। কোনো-না-কোনো সময়ে এর সঙ্গে আমাদের সবার পরিচয় হয়েছে, এবং একথা বলতেও আমরা যথেষ্ট লজ্জা অনুভব করেছি; কিন্তু এখনও এ অন্তরালে বিদ্যমান, এখনও কথনরত, শুধু আমাদের সাংসারিক অভ্যাসগত সকল কলরবের মধ্যে শুনতে পারি না একে। একবার যদি বৌদ্ধিক ও প্রাণিক মন নীরব হয়ে যায়, তখন আমরা এর স্থিতি উপলব্ধি করি, অত্যধিকভাবেই, এবং এ ভয়ংকরভাবে নাছোড়বান্দা। এর কাছে বিচারশক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে না, অত্যন্ত মূঢ় এ। তবুও একে বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে, কারণ বৌদ্ধিক মন যেমন আমাদের মানসচেতনার প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে, ও প্রাণিক মন আমাদের প্রাণিক চেতনার বিশ্বভাবাপন্ন হওয়াতে বাধা সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনই শারীরিক মন এক প্রাচীর নির্মাণ করে এই শরীর-চেতনার বিস্তৃতির সম্মুখে। শুধু তাই নয়, পক্ষান্তরে এ সকল যোগাযোগকে বিশৃঙ্খল করে দেয়, ও আহ্বান করে প্রত্যেক দুর্ভাগ্যকে : একটি ঘটনা যার উপর জোর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, তা এই যে আমরা

যে মুহূর্তে কোনো কিছুর বা কোনো ব্যক্তির চিন্তা করি, *তৎক্ষণাৎ* সেই বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল স্পন্দনের সঙ্গে ও সেসব স্পন্দনের পরিণতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সংঘটিত হয়ে যায় (অধিকাংশ সময়, অচেতনভাবে)। এখন, ঠিক এর বামনসুলভ ভয়ের জন্য, শারীরিক মন অবিরতভাবে আমাদের এনে দেয় সবচেয়ে অমঙ্গলপূর্ণ সম্ভাবনাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ। এ সব সময় অশুভতম পরিণামেরই কল্পনা করে। সাধারণ জীবনে এই বাতুলতার অপেক্ষাকৃতভাবে খুবই কম গুরুত্ব আছে : এখানে শারীরিক মনের কার্যকলাপ সাধারণ হৈ চৈ-এর মধ্যে হারিয়ে যায়, এবং আমরা ঠিক রক্ষা পেয়ে যাই আমাদের গ্রহণশীলতার অভাবে, কিন্তু যখন আমরা বিধিসম্মতভাবে সাধনা করি আমাদের মধ্যে স্বচ্ছতা সৃষ্টি করবার জন্য এবং আমাদের গ্রহণশীলতা বৃদ্ধি করবার জন্য, তখন শারীরিক মনে বিশৃঙ্খলাও হতে পারে এক গম্ভীর, এমন-কি, বিপজ্জনক বিভ্রান্তকারী প্রতিবন্ধক।

এই মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক স্বচ্ছতা দ্বিবিধ মুক্তির সূত্র। সংবেদন হতে মুক্তি, কারণ আমাদের মধ্যে চিৎশক্তি আর সত্তার বিভিন্ন স্তরে অসংখ্যভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে নেই, বরং একত্রীভূত হয়েছে এক আলোকরশ্মিতে যার কুশল প্রয়োগ করা যেতে পারে, এবং তাকে ইচ্ছানুযায়ী যে-কোনো নির্দিষ্ট বিষয় হতে, শৈত্য, ক্ষুধা, যন্ত্রণা ইত্যাদি হতে, বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। এবং ইন্দ্রিয়সমূহ হতে মুক্তি, কারণ এই একই চিৎশক্তি আমাদের মন প্রাণ শরীরের কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ নিমগ্নতা হতে মুক্ত হয়ে এখন নিজেকে প্রসারিত করতে পারে শারীরিক কাঠামোর বাইরে এবং এক প্রকার আন্তর প্রক্ষেপ দ্বারা স্পর্শ করতে পারে দূরবর্তী বস্তুরাজি সত্তাসমূহ ও ঘটনাবলীকে। সাধারণত স্থান ও কালের মধ্যে কোনো দূরত্বের প্রত্যক্ষদর্শনের জন্য এবং অব্যবহিত সংবেদনরাজি হতে নিজেদের অসংলগ্ন করবার জন্য আমাদের নিদ্রিত বা সম্মোহিত অবস্থায় যেতে হয়। এ-সকল আদিম ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে অনাবশ্যক হয়ে ওঠে, যখন মনের বিক্ষোভ নীরব হয়ে যায় এবং আমরা হয়ে যাই আমাদের চেতনার অধীশ্বর। চেতনাই *একমাত্র ইন্দ্রিয়।*[২] চেতনাই অনুভব করে, চেতনাই দেখে, চেতনাই শোনে। নিদ্রা বা সম্মোহন শুধুই বহির্মনের যবনিকা উত্তোলনের স্বল্প-বিকশিত প্রারম্ভিক উপায়। এবং এর এক তাৎপর্য আছে। যদি আমাদের সকল কামনার ও ভয়ের হট্টগোলে আমরা পরিপূর্ণ তাহলে আমাদের কামনা ও ভয়ের অসংখ্য প্রতিফলিত প্রতিকৃতি ছাড়া সত্যই আমরা আর কী দেখতে পাব? ঠিক যেমন প্রশান্তিময় মন ও প্রাণ বিশ্বভাবাপন্ন হয়, বিশোধিত শরীরও বিশ্বভাবাপন্ন হয়। আমরা শুধু আমাদেরই বন্দী ; বিরাট্ বিশ্ব আমাদের দ্বারপথে অপেক্ষমাণ, যদি শুধু আমাদের ক্ষুদ্র নির্মাণসমূহের যবনিকা আমরা টেনে নামাতে রাজি হই। চেতনাকে প্রসারিত করবার এই ক্ষমতার সঙ্গে একাগ্রতাসাধনের এক ক্ষমতা

অবশ্যই যুক্ত হতে হবে স্বাভাবিকভাবে, যার ফলে বিস্তৃত এই চেতনা স্থির ও নীরব হয়ে আলোকপাত করবে অভীষ্ট লক্ষ্যের উপর এবং *হয়ে উঠবে সেই লক্ষ্য*। কিন্তু একাগ্রতা বা বিস্তৃতি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি। অন্তরের নীরবতায় চেতনা দর্শন করে।

রোগ হতে মুক্তি

চিন্তনশীল মনের চাপা উত্তেজনা ও অবিরত গুঞ্জন হতে, প্রাণিক মনের অত্যাচার ও অস্থিরতা এবং তার অতৃপ্ত সব দাবি হতে, শারীরিক মনের স্থূলতা ও ভয় হতে একবার আমরা মুক্ত হয়ে গেলে বুঝতে আরম্ভ করি এইসব ক্লান্তিকর অত্যধিক বোঝা ছাড়া এই শরীর কী, এবং আমরা আবিষ্কার করি এ এক বিস্ময়কর যন্ত্র— বাধ্য, সহনশীল, অশেষ শুভেচ্ছায় পরিপূর্ণ। সবচেয়ে বেশি ত্রুটিপূর্ণভাবে জানা যন্ত্র এ, এবং সবচেয়ে বেশি অনাদৃত। আমাদের সত্তার এই সর্বাঙ্গীণ বিশোধনে আমরা পর্যবেক্ষণ করি যে শরীর কখনো অসুস্থ হয় না, এ শুধু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষয়প্রাপ্তিও বোধহয় অপূরণীয় নয়, যা আমরা লক্ষ্য করব অতিমানস যোগে। শরীর অসুস্থ হয় না, চেতনারই অভাব হয়। যোগে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি, প্রত্যেকবার আমরা যখন অসুস্থ হই, কিংবা বাইরের কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই, *সবসময়* তা হয় চেতনার এক অভাবের, কোনো এক ভুল মনোভাবের, কিংবা কোনো এক মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলার পরিণতি। অনুধ্যানটি আরও আরও আকর্ষণীয় হয়, কারণ যে মুহূর্তে আমরা যোগের পথে পদার্পণ করি তখনই আমাদের মধ্যে কিছু একটা *জাগ্রত* হয়ে যায়, এবং প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টি-নিক্ষেপ করায় ও আমাদেরই অঙ্গুলিসহকারে নির্দেশপ্রদান করায় আমাদের ভুলগুলোর প্রতি আমাদের, সম্পৃক্ত ক'রে যা-কিছু সংঘটিত হয় তাদের আসল কারণের প্রতি, যেন "কেউ একজন" আমাদের অন্বেষণের ভার গ্রহণ করেছে যথার্থভাবে— অন্ধকারে কিছুই আর নেই। এবং বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা আরও আরও আবিষ্কার করি আমাদের অন্তরের অবস্থা ও বাইরের ঘটনাচক্রের মধ্যে এক কঠোর নিয়মানুগ সম্পর্ক (উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থতা বা "দুর্ঘটনা"), যেন জীবন আর বাইরে থেকে ভিতরে বিকশিত হচ্ছে না, বরং ভিতর থেকে বাইরে বিকশিত হচ্ছে, অন্তর্জগৎ বহির্জগৎকে রূপায়িত করছে, একেবারে সবচেয়ে সাধারণ ঘটনাবলী পর্যন্ত— সত্যই কিছু আর সাধারণ থাকে না, এবং মনে হয় দৈনন্দিন জীবন এক ব্যাপক জালের মতো সংগঠন, যা পরিপূর্ণ স্বীকৃতির অপেক্ষায় রত সংকেতাবলীতে। সব-কিছুই সম্পৃক্ত, এ জগৎ এক অলৌকিক ঘটনা। বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় দৃশ্য বা রূপের দর্শন এবং "অতিপ্রাকৃতিক" বিষয়ের উপর নিদিধ্যাসন নিয়েই আধ্যাত্মিকতা— এই কল্পনা আমাদের এক শিশুসুলভ

ভ্রান্তি— আমাদের ধারণা অপেক্ষা ভগবান্ আরও নিকটতর ; এসব "অলৌকিক" বাঁধাধরা কল্পনা অপেক্ষা ন্যূনতরভাবে প্রদর্শন-প্রিয় ও অধিকতর গভীর ভগবান্। আমাদের পথ-কেটে-যাওয়া এসব ছোটো ছোটো সংকেতের মধ্যে একটিরও অর্থোদ্ধার যদি আমরা একবারও করতে পারি, সকল বস্তুর সংযোগকারী অনির্ণেয় সংযোজক তত্ত্বটিকে একবারও যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি, তাহলে আমরা সেই পরম অলৌকিকের নিকটবর্তী হয়ে যাব অধিকতরভাবে, স্বর্গের সুধা স্পর্শ করে থাকলে যতটা নিকটবর্তী হতাম, সেই তুলনায়। বোধহয়, এটাই এক অলৌকিক ঘটনা যে ভগবান্ও স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা কর্ণপাত করি না।

অন্তর হতে বাইরে, জীবনস্রোতের এই বিপরীত গতি সম্বন্ধে সাধক এই ভাবে সচেতন হন (যথেষ্ট স্বাভাবিকভাবে, কারণ চৈত্য-নিয়ন্তা নির্গত হয়েছেন তাঁর কারাগার হতে) ; এই প্রাত্যহিক নিদর্শনগুলির উপরে থাকা শীলমোহর তিনি ভেঙে ফেলেন ও দেখেন যে, তাঁর আন্তর দৃষ্টিভঙ্গির সামর্থ্য আছে বাইরের ঘটনাগুলিকে রূপায়িত করবার জন্য, ভালোর জন্য হোক বা মন্দের জন্য : যখন আমরা সমন্বয়পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান হই এবং আমাদের কর্ম আমাদের সত্তার গভীরতর সত্যের অনুরূপ হয়, তখন কোনো কিছুই আর বাধা দেওয়ার জন্য *সমর্থ হয় না*, এমন-কি "অসম্ভবগুলোও" বিলীন হয়ে যায়। যেন "প্রাকৃতিক" বিধানের উপর অন্য এক বিধান আরোপিত হয়েছে। বস্তুত এই হল সত্যকার প্রাকৃতিক অবস্থা যা মানসিক ও প্রাণিক জটিলতার মধ্য হতে মুক্ত হয়েছে), এবং আমরা এক রাজকীয় মুক্তি আস্বাদন করতে আরম্ভ করি ; কিন্তু যখন কোনো অভ্যন্তরীণ মানসিক বা প্রাণিক বিশৃঙ্খলা হয়, আমরা দেখতে পাই যে এই বিশৃঙ্খলা অনিবার্যরূপে *আহ্বান করে* বাইরের দুর্যোগময় পরিস্থিতি কোনো এক অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার অনধিকার প্রবেশ। এর কারণ অতি সরল ; যখন আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা খারাপ, আমরা তখন একপ্রকার স্পন্দন নির্গত করি, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই প্রকারের অন্য সকল স্পন্দনকে আহ্বান করে, স্পর্শ করে, আমাদের সত্তার সকল স্তরে, এবং এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে— বাইরের ঘটনাবলীতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়, এবং সব-কিছু হয়ে যায় বিশৃঙ্খল। অন্তরের এই মন্দ অবস্থা শুধু বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে, তা নয়, পরিচেতন-সংরক্ষী আবরণকেও দুর্বল করে দেয়, যে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি ; এর অর্থ হল, কোনো স্পন্দনের তীব্রতা দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ার পরিবর্তে আমরা হয়ে যাই উন্মুক্ত, সুভেদ্য— আমাদের সংরক্ষী আবরণটিতে *ছিদ্র* করবার জন্য, অথবা বরং তাকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য, বিশৃঙ্খলার স্পন্দনের মতো কিছুই নেই— এবং সব-কিছুই প্রবেশ করতে পারে। আমাদের সাবধান হয়ে লক্ষ্য করবার কথা যে, এক মন্দ আন্তর অবস্থা সংক্রামক : এক নির্দিষ্ট প্রকারের সংসর্গ দুর্ঘটনা বা অসুবিধা আকর্ষণ করে। সাধারণ সর্দি

বা সামান্য পতন হতে আরম্ভ করে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা পর্যন্ত আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভর করে—একই অনুভূতি দশবার, শতবার লাভ করবার পর, আমরা সব সময়ের জন্য এই শিক্ষালাভ করি যে, এই সব-কিছুর জন্য আমাদের শরীরের বা তথাকথিত ভাগ্যের কিছুই করবার নেই, এবং একই কারণে এর সমাধান নেই বাইরের কোনো ঔষধে, বরং আছে যথার্থ মনোভাবের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধারে, এক কথায়, চেতনায়। যদি সাধক সচেতন হন, তাহলে তিনি যে-কোনো মহামারীর মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারবেন, গঙ্গার সকল মলিনতা পান করতে পারবেন তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী : কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না, কারণ, কে স্পর্শ করতে পারবে জাগ্রত অধীশ্বরকে? আমবা আলাদা করেছি ব্যাক্‌টিরিয়া*, ভাইরাস্**, কিন্তু আমরা বুঝি নি যে, তারা শুধুই নিমিত্ত মাত্র, এবং ভাইরাস রোগ নয়, কিন্তু যে শক্তি তার ব্যবহার করে তাই রোগ। যদি আমরা বিশুদ্ধ, তাহলে জগতের সকল ভাইরাস্‌ও কিছু করতে পারবে না, কারণ আমাদের অন্তরের শক্তি সেই শক্তির চেয়ে বলবত্তর, বা অন্যভাষায় বলতে হয়, আমাদের সত্তা যে তীব্রতার সঙ্গে স্পন্দনশীল, তা সেই নিম্ন স্পন্দনের তুলনায় অনেক বেশি। সদৃশই সদৃশের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই কারণেই উদাহরণত যদিও আমরা কর্কটরোগের উন্মূলনে সক্ষম হই, যেমন অন্যান্য মধ্যযুগীয় রোগ উন্মূলিত হয়েছে, তবুও অসুস্থতার *শক্তিসমূহকে* আমরা উন্মূলিত করব না, এবং তা অন্য কিছু ব্যবহার করবে, অন্য মাধ্যম, অন্য রোগবীজ, একবার যখন তাদের বর্তমানের যন্ত্রটিকে খুঁজে বের করা হয়েছে। আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান শুধু বস্তুসমূহের উপরিভাগকেই স্পর্শ করে, উৎসকে না। একটিই রোগ আছে : চেতনার অভাব। এর পরবর্তী স্তরে, যখন অন্তরের নীরবতা যথেষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং আমাদের পরিচেতনের সীমায় আমরা মানসিক ও প্রাণিক স্পন্দনগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছি, তখন একইভাবে অসুস্থতার স্পন্দনগুলিকে আমরা অনুভব করতে সমর্থ হব, এবং প্রবেশ করবার পূর্বেই বিতাড়িত করতে পারব ; শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক শিষ্যকে লিখেছিলেন : *তোমার এই পরিচেতন সত্তার সম্বন্ধে তুমি যদি সচেতন হও, তাহলে অসুস্থতার চিন্তা, আবেগ, সূচনা বা শক্তিকে তুমি ধরতে পারবে, এবং তোমার মধ্যে তার প্রবেশ তুমি বন্ধ করতে পারবে।*[৩]

আরও দু প্রকার অসুস্থতার বিষয় আমাদের উল্লেখ করা উচিত, যাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আমাদের ভুলের সঙ্গে নেই : কিছু অবচেতন প্রতিরোধ হতে উদ্‌ভূত হয় (তাদের বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, অবচেতনের বিশুদ্ধীকরণের সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে) এবং কিছু যাদের বলা যেতে পারে "যৌগিক অসুস্থতা", যাদের সৃষ্টি হয় আমাদের চেতনার উচ্চতর স্তরের বিকাশের

---

* Bacteria : জীবাণু। ** Virus : সংক্রামক রোগের বীজ।

অবস্থা ও আমাদের শারীরিক চেতনার বিকাশের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের মানসিক ও প্রাণিক চেতনা হয়তো যথেষ্টভাবে প্রসারলাভ করেছে ও নতুন তীব্রতা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের শারীরিক চেতনা এখনও পিছনে পড়ে আছে, পুরোনো স্পন্দনের গতিতে, এবং সহন করতে পারছে না বর্ধিত তীব্রতা। এর ফল ভারসাম্যে এক ব্যাঘাত যা আনতে পারে অসুস্থতা, কোনো বাইরে মাধ্যমের, কোনো ব্যাক্‌টিরিয়ার, কোনো ভাইরাসের সাহায্যে নয়, কিন্তু অন্তঃস্থ উপাদানগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ফলে : অ্যালার্জি বা শারীরিক প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্তের উপাদানে বিশৃঙ্খলা, স্নায়বিক বা মানসিক বিশৃঙ্খলা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়, চেতনার উচ্চতর শক্তিসমূহের প্রতি জড়তত্ত্বের গ্রহণশীলতা, যা অতিমানস যোগের প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম। যাই হোক-না-কেন, এ হচ্ছে অনেক কারণের মধ্যে একটি, যার জন্য শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা এত গুরুত্ব দেন আমাদের শারীরিক আধারের বিকাশের উপর ; তাছাড়া, আমরা হয়তো চরমানন্দে উপনীত হতে পারব, এবং পরমের মধ্যে সোজাসুজি ছুটে যেতে সমর্থ হব, কিন্তু এখানে দিব্যজীবন সৃষ্টি করবার জন্য আমাদের "নিম্ন" মনঃপ্রাণশরীরের রাজ্যে পরমাত্মার সকল তীব্রতা ও পূর্ণতা অবতরণ করিয়ে আনতে সমর্থ হব না।

শরীর হতে মুক্তি

বিশাল জীবনীশক্তির অসীম উৎস একবার আবিষ্কার করবার পর চেতনা মুক্ত হতে পারে ইন্দ্রিয়সমূহ হতে, মুক্ত হতে পারে অসুস্থতা হতে, এবং অনেকাংশে মুক্ত হতে পারে আহার ও নিদ্রা হতেও। এমন-কি শরীর হতেও তা মুক্ত হতে পারে। যখন চিৎশক্তি প্রবাহ আমাদের মধ্যে ব্যষ্টিগত হয়ে যায়, আমরা লক্ষ্য করি, ইন্দ্রিয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল হতেই আমরা শুধু একে প্রত্যাহৃত করে নিতে পারব, তা নয়, বরং শরীর হতেও প্রত্যাহৃত করতে পারব। স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ সংসিদ্ধ হওয়ার পূর্বে ধ্যানই আমাদের প্রাথমিক অনুশীলনের ভূমি ; প্রথমে আমাদের ধ্যানে আমরা লক্ষ্য করি যে, চিৎশক্তি হয়ে যায় অসাধারণভাবে সমপ্রকৃতি ও ঘনবিন্যস্ত, এবং নিজেকে মন ও প্রাণ হতে মুক্ত করবার পর, এ ধীরে ধীরে নিজেকে শরীরের সকল ব্যস্ততা হতে মুক্ত করে নেয়, ও শরীর হয়ে যায় পূর্ণরূপে স্থির, এক স্বচ্ছ ঘনীভূত বস্তু, যা স্থানে ব্যাপ্ত হয় না, হয়ে যায় ভারশূন্য, প্রায় অস্তিত্ববিহীন ; তারপর নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশ প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে যায়। হৃৎস্পন্দন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়। তারপর সহসা এক আকস্মিক মুক্তির উপলব্ধি হয়, এবং আমরা আমাদের পাই "অন্যত্র", শরীরের বাইরে। একেই পারিভাষিক শব্দে বলা হয় "বহিরভিব্যক্তি"।

অনেক প্রকার "অন্যত্র" আছে, চেতনার বিভিন্ন ভূমির মতো। আমাদের চেতনা আমরা যে স্তরের উপর নিবদ্ধ করি, তার উপর নির্ভর করে যেতে পারি বিভিন্ন স্থানে (বিশ্বমন ও বিশ্বপ্রাণের বিষয় ইতিমধ্যে আমরা জানি), কিন্তু নিকটতম 'অন্যত্র' হল শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় যাকে বলা হয় সূক্ষ্ম ভৌতিক, যা আমাদের প্রাকৃতিক বা ভৌতিক জগতের সীমাবর্তী ও তার সদৃশ, ব্যতিক্রম শুধু এর গুরুতর তীব্রতা। এই জ্ঞান ততই পুরোনো, যত পুরোনো এই জগৎ, এবং শুধু শ্রীঅরবিন্দের যোগেই সীমাবদ্ধ নয় এ। পূর্ণাঙ্গ বিকাশের এ এক অংশ যা আমাদের প্রস্তুত করে সেদিনের জন্য যখন আমরা দীর্ঘতর সময়ের জন্য শরীর ত্যাগ করি, লোকেরা যাকে অজ্ঞতাবশত বলে "মৃত্যু"। আরও বোধগম্য করবার জন্য, অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে শোনা যাক এক তরুণ শিষ্যের বর্ণনা তাঁর অভিজ্ঞতার, যখন প্রথমবার তিনি শরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্ম ভৌতিকে প্রবেশ করলেন : "আমি আমার আরামচেয়ারে শায়িত অবস্থায় ধ্যানমগ্ন ছিলাম, যখন সহসা আমি নিজেকে দেখলাম এক বন্ধুর ঘরে ; সে সময় তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে সংগীতে রত ছিলেন। আমি বেশ পরিষ্কারভাবে সব-কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, ভৌতিক জগতের চেয়েও আরও পরিষ্কারভাবে এবং আমি চলাফেরা করছিলাম অতি দ্রুতবেগে, বিনা বাধায়, এবং বেশ কিছুক্ষণ সেখানে ছিলাম, সব নিরীক্ষণ ক'রে ; আমি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ওরা সচেতন ছিল না। তারপর কিছু-একটা আকর্ষণ করল আমাকে, এক সহজাত প্রবৃত্তির মতো : 'এখন আমায় যেতেই হবে'। আমার গলায় যন্ত্রণার মতো বোধ হল। আমার মনে আছে, সেই প্রকোষ্ঠটি বন্ধ ছিল, ছাদের কাছে একটি ছোটো রাস্তা ছাড়া, এবং সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য আমার আকৃতিটা যেন বাষ্পীয় হয়ে গেল (সে অবস্থায়ও আমার একটা আকৃতি ছিল, কিন্তু তা পদার্থের মতো ছিল না, ছিল বেশি উজ্জ্বল, কম অন্ধকারাচ্ছন্ন) এবং আমি খোলা জানালা দিয়ে ধোঁয়ার এক লম্বা সারির মতো বের হয়ে গেলাম। তারপর আমি নিজেকে আবার দেখলাম আমার কক্ষে, আমার শরীরের কাছে, আরও দেখলাম আমার মাথা রয়েছে তির্যগ্‌ভাবে, শক্ত হয়ে বালিশের উপর, ও অনেক কষ্টে আমি শ্বাসগ্রহণ করছিলাম। আমি আমার শরীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলাম— অসম্ভব। তখন আমি ভয় পেলাম। পায়ের মধ্য দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলাম, কিন্তু জানু পর্যন্ত এসে ফিরে গেলাম পিছলে। দু-তিনবার এরকম হল। চেতনা এসে আবার চলে যায় পিছলে একটা স্প্রিং-এর মতো। আমি ভাবলাম, যদি আমি শুধু ধাক্কা দিই এই টুলে (একটা ছোটো টুল ছিল সেখানে আমার পায়ের তলে), তাহলে একটা শব্দ হবে, ও আমি জেগে যাব! কিন্তু কিছু হল না। এবং নিশ্বাস নিতে বেশি, আরও বেশি কষ্ট হল। আমি ভীষণ ভয় পেলাম। হঠাৎ আমি স্মরণে আনলাম শ্রীমাকে এবং জোরে ডাকলাম, 'মা! মা!' তারপর আবার আমি নিজেকে পেলাম

শরীরের মধ্যে জাগ্রত কিন্তু গ্রীবাদেশ ব্যথায় অনড়।" *

এইভাবে, নিমজ্জন ও পুনর্জাগরণের অনেক আবর্তনের পর, অগণিত আঘাতের পর, যা চেতনাকে বাধ্য করে নিজেকে মনে রাখবার জন্য ও অধিকার করবার জন্য এবং তারপর অন্তরালে অভিবৃদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখবার জন্য, চেতনা পরিণত হয় এক সুগঠিত ব্যক্তিত্বে, ভেঙে দেয় তার বহিরাবরণ, ও নিজের স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন : *এই স্বাধীনতা সমগ্র সত্তার এমন এক স্বাভাবিক ভঙ্গিমা হবে শারীরিক আধারের জন্য যে তাকে আমাদের মনে হবে যেন বাইরের কিছু-একটা যাকে অসংলগ্ন করা যায় আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের মতো বা আমাদের হস্তধৃত কোনো উপকরণের মতো। আমরা এমনও অনুভব করতে পারি যে এই শরীর এক বিশেষ অর্থে, অস্তিত্ববিহীন, শুধু আমাদের প্রাণিক শক্তি ও আমাদের মানসিকতার এক আংশিক পরিপ্রকাশ হওয়া ব্যতীত। শরীরের সম্পর্কে মন তার যথার্থ স্থিরতায় উপনীত হচ্ছে, এবং শারীরিক সংবেদন দ্বারা আবিষ্ট ও অধিকৃত মনোবৃত্তির মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করছে বস্তুসমূহের প্রকৃত সত্যের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা— তারই চিহ্ন এইসব অনুভব।*[৪] কারণ, সত্য দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় আমাদের অন্তর্নিহিত অধীশ্বরের, চৈত্যপুরুষের, আত্মার। প্রত্যেকবার, যখন আমরা অনুভব করি কোনো অসম্ভবত্ব, কোনো অসামর্থ্য বা কোনো বাধা, আমরা তখন সুনিশ্চিত হতে পারি যে, তা হবে আগামী কালের বিজয়। কারণ বিঘ্নের অনুভূতি না হলে আমরা তা জয় করতে যাব না। আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি যে, আমরা উদ্দিষ্ট সব-

---

* এ সম্বন্ধে তিনটে মন্তব্য করা যেতে পারে। প্রথমে লক্ষ্য করা যাক যে, অভিজ্ঞতার এক কৌতুকপ্রদ অভাবের জন্য তরুণ শিষ্যটি "পায়ের মধ্য দিয়ে" শরীরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন— এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে তিনি বিপদে পড়েছিলেন। সাধাবণত হৃৎকেন্দ্র দিয়েই ব্যক্তি বহির্গত হয় ও পুনঃপ্রবেশ করে। মস্তকের শীর্ষদেশ দিয়েও যাওয়া যায়, কিন্তু তা খুবই কম পরামর্শযোগ্য। যখন যোগিগণ চিরদিনের জন্য শরীর ত্যাগ করতে চান (যাকে ভারতে বলা হয় *ইচ্ছামৃত্যু*), তখনই তাঁরা মস্তকদেশ দিয়ে বহির্গত হন। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, বহির্গমনের সময় শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও রক্তসঞ্চালন ন্যূনতম হয় ; তা এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, শারীরিক চেতনার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি পর্যন্ত তা পৌঁছে যায়, মৃত্যুর সব বহির্লক্ষণ সঙ্গে নিয়ে চেতনা শরীর হতে "কতদূর" গেছে তার উপব নির্ভর করে। এ হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করবার সুযোগ যে, যখন চেতনা প্রত্যাহৃত হয়, শক্তিও প্রত্যাহৃত হয়, কারণ উভয় এক ও অভিন্ন। যখন আমরা অজ্ঞান হয়ে যাই, চেতনা তখনও প্রত্যাহৃত হয়, কারণ আমরা কোনো কোনো তীব্রতা সহ্য করতে পারি না, কিন্তু যেহেতু সত্তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোনো সচেতন সেতু নির্মাণ করতে আমরা শিখি নি, সেজন্য এই অনিচ্ছাপ্রসূত প্রত্যাহারের পরিণতি হয় শূন্যতা। এবং অবশেষে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, এই ভয়ের

কিছুর উপর বিজয়লাভের জন্য, আমাদের সকল স্বপ্ন জীবনে উপলব্ধ করবার জন্য, আত্মাই আমাদের মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টা। এই জগতে যেখানে বাধানিষেধগুলো ক্রমশ নিকটতর হয়ে আসছে একটি লোহার খাঁচার মতো, এইসব স্বপ্নের প্রথমটি বোধ হয় বাধাহীনের মধ্যে ভেসে যাওয়ার জন্য সমর্থ হওয়া, শরীর হতে মুক্ত হয়ে, সীমা হতে মুক্ত হয়ে। তখন আমাদের প্রয়োজন হবে না পাস্‌পোর্ট-এর, আমরা রাষ্ট্রহীন, বিশ্বের সকল দেশের উত্তরাধিকারী, আর প্রয়োজন নেই আমাদের রাবারস্ট্যাম্প-এর। জীবন ও মুক্তির এক আনন্দময় বিস্তৃতি আমরা উপভোগ করি। ঋগ্‌বেদের সম্বোধন : "হে বিরাট্‌..."।

বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য ও যথাযথ গতিবিধির মাধ্যমে শরীরে পুনঃপ্রবেশের উদ্দেশ্যে তরুণ শিষ্যটিকে সক্ষম করবার জন্য, গুরুকে, এক্ষেত্রে শ্রীমাকে, স্মরণে আনাই যথেষ্ট ছিল ; মায়ের কথা চিন্তা করে শিষ্যটি তৎক্ষণাৎ যথার্থ স্পন্দনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সব-কিছু ঠিক হয়ে গেল। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, শিষ্যকে রক্ষা বা সাহায্য করবার জন্য এ হল গুরুর কার্যসাধনের উপায়গুলির অন্যতম।

৯

নিদ্রা ও মৃত্যু

চেতনার বিভিন্ন ভূমি

প্রত্যেকেই সমর্থ হয় না, সচেতনভাবে তার শরীব ছেড়ে যাওয়ার জন্য, বা সচেতনভাবে তার মন ও প্রাণের বিস্তারসাধনের জন্য কিন্তু অনেকেই তা করে অচেতনভাবে, নিদ্রায়, ঠিক যখন সম্মুখ-সত্তার ছোটো ছোটো 'আমি'-গুলো বাধা কম সৃষ্টি করে ও তাদের অগভীর কার্যকলাপগুলিতে কম নিমগ্ন হয়। নগ্ন দৃষ্টিতে দেখা বাস্তবসত্যের এক ভগ্নাংশ-মাত্র এই বিভিন্ন আমিগুলো প্রকাশ করে, কিন্তু তাদের পশ্চাতে বিস্তৃত হয়ে আছে বিশাল এক-একটি রাজ্য— আমরা এর পূর্বে উল্লেখ করেছি বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ ও সূক্ষ্ম ভৌতিকের বিষয়ে, যারা দৈহিক কঠিনাবরণের অন্তরালে আছে। তাহলে, আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের বিশ্বজনীন বাস্তবসত্যের পুনরুদ্ধার। এই সংসিদ্ধির জন্য তিনটি পদ্ধতি বা স্তর বিদ্যমান : প্রথমটি নিদ্রা যা প্রত্যেকেরই উপলব্ধ ; দ্বিতীয়টি বিরলতর, তা হল সচেতন '*বহিরভিব্যক্তি*' বা *গভীর নিদিধ্যাসন* ; তৃতীয়টি বিকাশের অধিকতর মাত্রার সূচনা প্রদান করে, যার ফলে সব-কিছু হয়ে যায় সরল : আমরা নিদ্রা বা ধ্যান পরিহার করতে পারি, সবদিকে দৃষ্টিপাত করতেও পারি, আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত ও উন্মুক্ত

রেখে, *ঠিক অন্যসমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে, যেন বিশ্বময় অস্তিত্বের সকল স্তরই* একেবারে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে, চেতনার সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা উপলভ্য, কিছুটা যেমন নিকটের বস্তু হতে আমাদের দৃষ্টি অপসারণ করে দূরের বস্তুর উপর নিবদ্ধ করবার সময় নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। নিদ্রা, তাহলে, প্রথম সাধন ; এ হতে পারে সচেতন, ক্রমবর্ধমানভাবে সচেতন, আমরা যথেষ্ট বিকশিত হয়ে অবিরত সচেতন হওয়া পর্যন্ত, এ জগতের সম্পর্কে ও অন্য জগতের সম্পর্কেও, যখন নিদ্রা ও মৃত্যুও আর হয়ে থাকে না উদ্ভিদ্‌বৎ এক নিষ্ক্রিয়তায় প্রত্যাবর্তন, অথবা আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিকিরণ, বরং শুধু হয়ে *ওঠে* চেতনার অতিক্রমণ, এক ভঙ্গিমা হতে অন্য ভঙ্গিমায়। নিদ্রা ও জাগরণেব মধ্যে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে, যে রেখা আমরা অঙ্কিত কর্বোছ, তা বাইরে যা প্রতীয়মান হয় তার সঙ্গে খাপ খেলেও তার কোনো অপরিহার্য বাস্তবতা নেই, যেমন আমাদের জাতীয় সীমারেখাগুলির কোনো বাস্তবতা নেই প্রাকৃতিক ভূগোল অনুযায়ী, কিংবা কোনো জিনিসেব বাইরের রঙ ও নির্দিষ্ট রূপের কোনো বাস্তবতা নেই, তার আণবিক গঠন অনুযায়ী। বাস্তবিক কোনো পার্থক্যই নেই, *শুধু আমাদেব চেতনার অভাব ব্যতীত ;* এই দুই জগৎ (অথবা, বরং এই জগৎ ও অসংখ্য অন্যান্য জগৎ) শাশ্বতভাবে সহাবস্থিত, ও শাশ্বতভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত। *একই বস্তুকে* শুধু বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষীভূত করবার ফলেই আমরা এক ক্ষেত্রে বলি, "আমি জীবিত", ও অন্য ক্ষেত্রে বলি, "আমি নিদ্রিত" বা "আমি মৃত" (যদি অবশ্য আমরা একথা অনুভব করবার জন্য যথেষ্টভাবে সচেতন হয়ে থাকি), *ঠিক যেমন* একই বস্তুকে বিভিন্নভাবে অনুভব করা সম্ভব, পর্যবেক্ষণের স্তরের উপর নির্ভর করে— পারমাণবিক, আণবিক, কিংবা সম্পূর্ণ বহির্জাগতিক। এখানে "অন্যত্র" সর্বত্রই অবস্থিত। *যে-সব বিভিন্ন প্রতীক আমাদের বাইরের ব্যবহারিক জীবন গঠন করে, তাদের আমরা এক অনন্য ও বিশেষ মূল্য প্রদান করেছি, কারণ সে-সব আমাদের চোখের সামনে আছে, কিন্তু তারা সে-সব প্রতীকের চেয়ে কম বা বেশি নয়, যারা আমাদের অতিপ্রাকৃতিক জীবন গঠন করে।* কোনো বস্তুর পারমাণবিক সত্য তার বাইরের সত্যকে বাতিল করে না, বা বিরোধ করে না, কিংবা এ তা থেকে পৃথক নয়, কিংবা এর বিপরীতও নয়। আমাদের ভৌতিক প্রতীকগুলো যতটা প্রমাণসিদ্ধ, অন্যান্য প্রতীকগুলোও যে ততটাই প্রমাণসিদ্ধ শুধু তাই নয়, আমরা কিন্তু বাস্তবিকই আমাদের নিজেদের প্রতীকগুলোকে বুঝতে পারব না, যদি না অন্যান্য *সব* প্রতীককেই বুঝতে পারি। অস্তিত্বের অন্যান্য স্তরের জ্ঞান ব্যতীত সাধারণ মানবিক জগতের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ততটাই অসম্পূর্ণ ও মিথ্যা, যতটা অসম্পূর্ণ ও মিথ্যা এই ভৌতিক* জগতের এক অধ্যয়ন অণু, পরমাণু

* ভৌতিক : physical, material। এ গ্রন্থের সর্বত্রই এই একই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ও পদার্থকণিকার জ্ঞান ব্যতীত। কিছুই বোঝা যায় না, যে-পর্যন্ত না সব-কিছুই বোঝা যায়।

সহবর্তী যুগপৎস্থিত বাস্তব সত্যসমূহের অসংখ্য স্তরক্রম বিদ্যমান ; নিদ্রা তাদের জন্য এক প্রাকৃতিক বাতায়ন উন্মুক্ত করে। কারণ একবার যদি আমরা জীবন-মৃত্যু-নিদ্রার অগভীর শ্রেণীবিভাগকে বর্জন করি, এই বিশ্বের আরও বেশি আবশ্যক এক শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করে, তাহলে আমরা দেখি শীর্ষ হতে মূল পর্যন্ত (যদি শীর্ষ ও মূল থেকেই থাকে) এই বিশ্ব কিছুই নয় অবশেষে, শুধু চিৎশক্তির এক অনবচ্ছিন্ন ধারা, অথবা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, *চেতনার এক স্তরক্রম,* যা বিশুদ্ধ জড়তত্ত্ব হতে বিশুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন— সূক্ষ্ম ভৌতিক, প্রাণিক, মানসিক, অতিমানসিক (আমরা যদি চাই অন্য শব্দও ব্যবহার করতে পারব, অন্য এক পরিভাষা, কিন্তু বাস্তব তথ্য একই থাকে)। সব-কিছু সংঘটিত হয় এইসব ভূমির মধ্যেই, আমাদের জীবন, আমাদের নিদ্রা, আমাদের মৃত্যু ; তার বাইরে কোথাও আমাদের যেতে হবে না, এবং শুধু যে সব-কিছু সেখানে সংঘটিত হয়, তা নয়, সব-কিছু একসঙ্গেই অবস্থিত সেখানে, কোনো বিচ্ছিন্নতা ব্যতীতই। জীবন, নিদ্রা বা মৃত্যু শুধুই চেতনার ভিন্ন ভিন্ন *স্থিতি* এই একই স্তরক্রমে। যখন আমরা জাগরিত, আমরা তখন মানসিক ও প্রাণিক স্পন্দন প্রাপ্ত হই, যারা নিজেদের প্রকাশ করে কিছু প্রতীকরূপে, দৃষ্টির বিচারের বা জীবনে উপলব্ধির কিছু পথরূপে ; যখন আমরা নিদ্রিত বা "মৃত" তখন আমরা *সেই একই* মানসিক ও প্রাণিক স্পন্দন প্রাপ্ত হই, যারা নিজেদের প্রকাশ করে সেই *একই বাস্তব সত্যের* অন্য প্রতীকরূপে, দৃষ্টির বিচারের বা জীবনে উপলব্ধির অন্য পথরূপে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে, এখানে বা অন্যখানে, আমাদের অস্তিত্বের গঢ়সূত্র সবসময়ই আমাদের চেতনার সামর্থ্য : যদি আমাদের জীবনে আমরা নিশ্চেতন হই, তাহলে আমরা অন্য সব দিকেও নিশ্চেতন হয়ে যাব ; মৃত্যু সত্যই মৃত্যু হবে ও নিদ্রা হবে জড়ত্ব। বাস্তব সত্যের এই বিভিন্ন ক্রমের বিষয়ে সচেতন হওয়াই তাহলে আমাদের মৌলিক কর্তব্য। একবার এই কাজ পূর্ণাঙ্গরূপে সংসিদ্ধ করলে, যেসব কৃত্রিম সীমারেখা আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন ভঙ্গিমাকে পৃথক করে, সেসব ভেঙে পড়বে, এবং আমরা বাধাহীনভাবে, চেতনার কোনো বিচ্ছেদ ছাড়াই জীবন হতে নিদ্রায় বা মৃত্যুতে অতিক্রম করতে পারব ; বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, আমরা এখন যা বুঝি সেই অর্থে মৃত্যু বা নিদ্রা আর থাকবে না, থাকবে সমগ্র সত্যকে অবিরত প্রত্যক্ষ করবার জন্য বিভিন্ন পথ, এবং বোধহয় থাকবে পরিশেষে এক পূর্ণাঙ্গ চেতনা যা যুগপৎভাবে সব-কিছুই প্রত্যক্ষ করবে। আমাদের বিবর্তন সমাপ্ত হয় নি। *মৃত্যু জীবনের অস্বীকৃতি নয়, বরং জীবনের এক প্রক্রিয়া।*[১]

সুতরাং জড়শরীরে এই জড়জীবন আমাদের অস্তিত্বের সকল অবস্থার মধ্যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, কারণ এখানেই আমরা সচেতন হতে

পারব— এখানেই কার্যটি সংসিদ্ধ হয়, শ্রীমা বলছেন, এই হল একই শরীরে সকল ভূমির মিলনবিন্দু। এখানেই কার্যটি সংসিদ্ধ হয়, কারণ এই হল বিবর্তনের আরম্ভবিন্দু বা প্রায় আরম্ভবিন্দু ; এই শরীর হতেই একটি "আমি" বৈশিষ্ট্যবিহীন অবস্থায় প্রথমে স্থিত হয়ে ধীরে ধীরে অসংখ্য জন্মের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বতর হতে আরও ঊর্ধ্বতর ভূমির সংস্পর্শে এসে, এবং প্রত্যেক ভূমিতে বিশালতর হতে আরও বিশালতর বিস্তৃতির সংস্পর্শে এসে, ব্যক্তিত্বে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু বা নিদ্রা বিভিন্ন প্রকারের আছে, যেমন আছে জীবন, কারণ সবই সেই একই বস্তু ; সবই নির্ভর করে আমাদের বিকাশের মাত্রার উপর— জীবনে যেমন আছে, তেমনই সম্ভবপর বিভিন্ন ক্রম রয়েছে সম্পূর্ণ জড়ত্ব হতে সর্বাঙ্গীণভাবে জাগরিত ব্যক্তিভাবাপন্ন চেতনা পর্যন্ত। সেজন্য, নিদ্রা ও মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো সাধারণ নিয়মাবলী করা যেতে পারে না, কারণ সব ঘটনাই সম্ভব, যেমন এই জীবনে সম্ভব। খুব বেশি হলে, বিকাশের কয়েকটি প্রধান ধারাই আমরা সূচিত করতে পারব।

যে-বিষয় আমরা বলেছি, চেতনার কয়েকটি কেন্দ্র নিয়ে আমরা গঠিত ; সেগুলি শীর্ষদেশ হতে নিম্নদেশ পর্যন্ত নেমে এসেছে ; এসব কেন্দ্রের প্রত্যেকটি রেডিওর প্রাপকযন্ত্রের মতো বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য উদ্দিষ্ট, এবং চেতনার বিভিন্ন ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেসব ভূমি হতে আমরা অবিরত প্রাপ্ত হই সকল প্রকার স্পন্দন, অধিকাংশ সময় অজ্ঞাতসারে— সূক্ষ্ম ভৌতিক, প্রাণিক, মানসিক, বা উচ্চ অথবা নিম্ন— যা আমাদের চিন্তন, অনুভূতি ও জীবনকে নির্ধারিত কবে ; এতে আমাদের ব্যক্তিগত চেতনা বিশোধন যন্ত্রের কাজ করে ও কিছু নির্দিষ্ট স্পন্দন নির্বাচিত করে নেয়, অন্য স্পন্দনগুলোকে ছেড়ে, তার পরিবেশ, ঐতিহ্য ও শিক্ষা অনুযায়ী। সাধারণত নিদ্রায় বা মৃত্যুতে আমরা সেইসব স্থানে বা ভূমিতে যাই, যে-সবের সঙ্গে আমরা পূর্ব হতেই সম্পর্কস্থাপন করে থাকি। কিন্তু চেতনা, মানসিকভাবে অত্যন্ত পরিমার্জিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন হলেও এই প্রাথমিক স্তরে তা ঘ্যষ্টিভাবাপন্ন হয় না, অন্য সকলে যা চিন্তা করে এ কম-বেশি তাই চিন্তা করে, অন্য সকলে যা অনুভব করে এ তাই অনুভব করে, অন্য সকলে জীবনে যা উপলব্ধি করে এ তাই উপলব্ধি করে ; এ এক সাময়িক সমষ্টি যার একমাত্র অনবচ্ছিন্নতা হল শরীর, কারণ তাকে কেন্দ্র করেই সব-কিছু আবর্তিত হয়। যখন এই শরীরগত কেন্দ্র মত্যুবরণ করে, সব-কিছুই বিকীর্ণ হয়ে যায় ছোটো ছোটো প্রাণিক, মানসিক ও অন্যান্য ভগ্নাংশে, যারা তাদের নিজস্ব জগতে ফিরে যায়, কারণ তাদের তখন আর কোনো কেন্দ্র থাকে না। কিংবা যখন এই শারীরিক কেন্দ্র নিদ্রিত হয়ে যায় সব-কিছুই তখন কম-বেশি নিদ্রিত হয়ে যায়, কারণ অশরীরী মানসিক ও প্রাণিক উপাদানগুলো শুধু শারীরিক জীবনের সঙ্গে সম্বদ্ধ ও সেই উদ্দেশ্যেই বিদ্যমান থাকে। তাহলে, এই অবিকশিত অবস্থায় চেতনা যখন

নিদ্রিত হয়, তখন তা নিমগ্ন হয়ে যায় অবচেতনে (শ্রীঅরবিন্দকে অনুসরণ করে আমরা *অবচেতন* কথাটি ব্যবহার করি শব্দপ্রকরণ অনুযায়ী তার অর্থে, যা সূচিত করে যা-কিছু ঐতিহাসিকভাবে অবচেতন, আমাদের জাগ্রত চেতনার নিম্নবর্তী নয়, বরং বিবর্তনের জাগরিত স্তরের নিম্নবর্তী, যেমন পশুর বা পাদপের মধ্যে। ২) অন্য শব্দে, চেতনা ফিরে যায় তার বিবর্তনীয় অতীতে যা তাকে পরিপূর্ণ করতে পারে স্মৃতি ও সংস্কারের অগণিত ভগ্নাংশের কাল্পনিক সংযোগে উদ্‌ভূত সকলপ্রকার বিশৃঙ্খল প্রতিচ্ছবি দিয়ে, যে পর্যন্ত তা আরম্ভ না করে কম-বেশি অসংলগ্নভাবে তার অভ্যাসগত জাগ্রত কার্যকলাপ। তারপর চেতনা আরও নিমগ্ন হয়ে যায় এক উদ্ভিদ্‌সুলভ বা শূককীটসুলভ অতীতে, যা যথার্থরূপে তার নিজের নিদ্রা, যেমন পাদপের বা পশুর নিদ্রা। সত্যকারের কেন্দ্র চৈত্যপুরুষ ও তাঁর চিৎশক্তি সংগঠিত হয় এই পরিবর্তনশীল সংমিশ্রণটিকে কিছু সামঞ্জস্য ও অবিচ্ছিন্নতা প্রদান করবার পূর্বে, আমাদের যেতে হবে অনেক স্তরের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যে মুহূর্তে শরীর আর প্রধান কেন্দ্র হয়ে থাকে না, ও আমরা বাস্তব পরিবেশ ও জীবন হতে মুক্ত এক অন্তর্জীবন আরম্ভ করি— বিশেষ করে, যখন আমরা যোগাভ্যাস করি যা এক ত্বরান্বিত বিবর্তনের প্রক্রিয়া— জীবন তখন সত্যই পরিবর্তিত হয়, এবং মৃত্যুও, এবং নিদ্রাও। আমাদের অস্তিত্বের আরম্ভ হয়। এটাও আমাদের এক প্রাথমিক নিরীক্ষণ, দৃশ্য বাহ্য পরিবর্তনের পূর্বে যেন এক সূক্ষ্মতর ধরনের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যা এক বিশেষ প্রকারের স্বপ্নের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। আমরা পাশব নিদ্রা হতে সচেতন নিদ্রায় উপনীত হই, অথবা এক অনুভূতিময় নিদ্রায়, উপনীত হই এক জীবন্ত মৃত্যুতে, এক পচনশীল মৃত্যু হতে। আমাদের সমগ্র জীবনকে যেসব বিভাজন রেখা বিভক্ত করছিল, সেসব ভেঙে যায়। কেন্দ্রের অভাবে বিকীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে, আমরা সন্ধান পেয়েছি এক অধীশ্বরের, ও ধরেছি চিৎশক্তির সূত্রকে যা সকল ভূমির বিশ্বজনীন সত্যকে একত্র সম্মিলিত করেছে।

অনুভূতিময় নিদ্রা

আমাদের চেতনার বিকাশ অনুসারে, এই নতুন নিদ্রায় বিভিন্ন ক্রম বিদ্যমান : কোনো এক ভূমিতে আমাদের দ্বারা সম্ভাব্যরূপে পাওয়া দুর্লভ আকস্মিক ঝলক হতে শুরু করে, অবিরাম এক আত্মনিয়ন্ত্রণশীল অন্তর্দৃষ্টি পর্যন্ত, স্বেচ্ছায় যাতায়াতে যা সমর্থ, নিম্ন হতে ঊর্ধ্বে ও ঊর্ধ্ব হতে নিম্নে, খেয়ালমতো।* এক্ষেত্রেও সব-

* আমরা এখানে এক ত্রিমাত্রিক ভাষা ব্যবহার করছি যার কোনো প্রকৃত অর্থ নেই, কারণ অন্তর্দেশও নেই, বহির্দেশও নেই, ঊর্ধ্বও নেই, নিম্নও নেই, আমাদের মানসিক ভাষা সমতল

কিছু নির্ভর করে আমাদের জাগ্রত চেতনার উপর। যে-সব ভূমির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়ে থাকে, সাধারণত সেখানেই যাই আমরা, আন্তরিক নিকটতার জন্য। যে-সব প্রাণিক, মানসিক ও অন্যান্য স্পন্দন আমরা স্বীকার করি ও যে-সব স্পন্দন আমাদের মধ্যে নিজেদের প্রকাশ করে আদর্শ, অভীপ্সা, আকাঙ্ক্ষা, নীচত্ব বা মহত্ত্বের রূপে, সেসবই এই যোগাযোগ গঠন করে, এবং যখন আমরা শরীব ছেড়ে যাই, আমরা যাই তাদেরই উৎসে— এক অসাধারণভাবে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় উৎস যার তুলনায় এই জড়জগতে আমাদের মানসিক ও প্রাণিক অভিব্যক্তিগুলোকে মনে হয় নিষ্প্রভ ও প্রায় অবাস্তব। তখন আমরা অবগত হই অসংখ্য বিরাট্ জগৎসমূহের সম্বন্ধে, যারা আমাদের এই ছোটো পার্থিব গ্রহটিকে পরিব্যাপ্ত করে, আচ্ছাদিত করে, ও তার উপর দোদুল্যমান হয় এবং তার নিয়তি নির্ধাবণ করে, এবং আমাদেরও। কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে অথবা এমন-কি কয়েকটি বৃহদায়তন গ্রন্থের মধ্যেও এই জগৎসমূহের বর্ণনা দেওয়া স্পষ্টভাবে অসম্ভব— নরম্যানডি*-র এক ঝলক দর্শনের পর আমরা পৃথিবীর বর্ণনা করলে যেমন হবে। তাছাড়া আমরা তাদের বর্ণনাও করতে চাই না, বরং দিতে চাই শুধু কয়েকটি সূত্র সাধকের নিজের অনুভূতির সঙ্গে তুলনাত্মক পরীক্ষায় সাহায্যের জন্য।

শ্রীঅরবিন্দ যা বারংবার জোর দিয়ে বলেছেন, সেই অনুসারে এই অন্বেষণের জন্য যে বিশেষত্ব আবশ্যক তা হচ্ছে এক বিশুদ্ধ তপশ্চর্যা, কামনার অনুপস্থিতি ও এক নীরব মন— অন্যথা আমরা সমস্ত প্রকার বিভ্রান্তির ক্রীড়াপুত্তলিকা হব। ধৈর্য সহকারে, পৌনঃপুনিক অনুভূতির মাধ্যমে, আমরা প্রথমে চিনতে শিখি, যে ভূমিতে আমাদের অনুভূতি হচ্ছে তাকে, এবং পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক ভূমির যে সোপানে অনুভূতি হচ্ছে তাকে। আমাদের অন্বেষণে এই স্থানের নিরূপণ ততই গুরুত্বপূর্ণ, যত এই পৃথিবীতে যে পরিবেশে আমরা বাস করি বা যে দেশ দিয়ে আমরা ভ্রমণ করছি তার বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়ে সমর্থ হওয়া। তারপর, আমরা আমাদের অনুভূতিগুলোর তাৎপর্য বুঝতে আরম্ভ করি, কারণ, এ এক অপরিচিত ভাষা, বরং, বহু ভাষা, যা আমাদের নিশ্চয় গ্রহণ করতে হবে, আমাদের নিজস্ব মানসিক ভাষার কোনো হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রধান বাধাবিঘ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম এই যে, মনই একমাত্র ভাষা যা আমরা পৃথিবীতে জানি, এবং যখন আমরা জাগ্রত হই, মানস প্রতিলিপিগুলো অনুভূতির বিশুদ্ধতাকে বিশৃঙ্খল বা বিকৃত করবার জন্য অজ্ঞাতসারে প্রবণতা প্রাপ্ত হয়। কোনো এক প্রবুদ্ধ পথপ্রদর্শকের অভাবে, এই রহস্য উন্মোচন করতে হলে, জেগে ওঠার পর, যতদূর

ও আলোকচিত্রসম, জগতের বাস্তব সত্য খুবই কম প্রকাশ করে, কিন্তু আমাদের কোনো বিকল্প নেই।

* নরম্যানডি : উত্তর ফ্রান্সের এক জেলা।

সম্ভব, মানসিকভাবে নীরব হওয়া আমাদের নিশ্চয় শিখতে হবে, এবং বোধি বা অন্তঃস্ফূর্তির দ্বারা এই অন্যান্য ভাষার তাৎপর্য বুঝতে হবে : চেতনার বিকাশে ও অনুভূতির বহুলতায় যথেষ্ট শীঘ্রই তা সম্ভব হয়। প্রথমে, এ হল এক অব্যবহৃত অরণ্যের মতো, বা চীনদেশীয় এক বাজারের মতো : সব-কিছু একরকম দেখা যায় ; তারপর যখন কিছু মাস ও বছর অতিক্রান্ত হয়, আমরা ঘটনাক্রমে খুঁজে পাই বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মুখ, বিভিন্ন স্থান ও চিহ্ন, এবং খুঁজে পাই পৃথিবীপৃষ্ঠের চেয়েও বেশি ভিড়-করা এক বৈচিত্র্য।

কিন্তু আমাদের নিদ্রাকে আমরা কীভাবে মনে রাখব? অধিকাংশ লোকের পক্ষেই নিদ্রা এক সম্পূর্ণ শূন্যতা— একটি সংযোজক তত্ত্ব হারিয়ে গেছে। বস্তুত, বহু সংযোজক তত্ত্ব আছে, যাদের শ্রীমা বলেছেন *সেতু*। আমরা যেন গঠিত হয়েছি অনেকগুলি দেশের ক্রমবিন্যাসে, যে দেশগুলো সেতুর সাহায্যে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত। সেজন্য আমাদের সত্তার কোনো কোনো অংশ ও তাদের ভ্রমণের কথা আমরা মনে বাখতে পারি, কিন্তু অন্যান্য অংশ বিস্মৃতির মধ্যে রয়ে যায় তাদের ও আমাদের চেতনার অবশিষ্ট অংশের মধ্যে সেতুর অভাবে। যখন আমরা এই শূন্যটি বা চেতনার এই অপর্যাপ্তভাবে অনুশীলন-প্রাপ্ত অংশটি অতিক্রম করি, তখনই আমরা বিস্মৃতি-কবলিত হই (যাঁরা "সমাধিতে" উন্নীত হন সাধারণত তাঁদের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটে, যে-কথা আমরা পরে আলোচনা করব)। মূলত যথেষ্টভাবে বিকশিত এক সত্তা তাঁর নিদ্রার মধ্যে, চেতনার সকল স্তরের সমগ্র পরিসর অতিক্রম করে, সোজাসুজি পরমাত্মার—*সচ্চিদানন্দের*— পরমজ্যোতি-র সান্নিধ্যে উপনীত হন, অধিকাংশ সময়ই অচেতনভাবে ; এবং সেই কয়েকটি মিনিটই প্রকৃত নিদ্রা, প্রকৃত বিশ্রাম, আনন্দময় আলোকময় এক সম্পূর্ণ শিথিলতা। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, নিদ্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরম উৎসে প্রত্যাবর্তন ও তার মধ্যে নিজের পুনর্নিমজ্জন। সেখান থেকে আমরা আবার ধীরে ধীরে অবতরণ করে আসি সকল স্তরের মধ্য দিয়ে— মন, প্রাণ, সূক্ষ্মশরীর ও অবচেতন ; শেষেরটি আমরা খুব সহজেই স্মরণে রাখি— এবং প্রত্যেক স্তরে আমাদের সত্তার প্রত্যেক অংশ যথাযথ অনুভূতি লাভ করে। প্রত্যেক স্তরের মধ্যে অনেক অঞ্চলও আছে, ও প্রত্যেকের আছে এক-একটি বিশেষ সেতু। প্রধান অসুবিধাটি হল বাইরের জাগ্রৎ চেতনার জন্য প্রথম সেতুটির নির্মাণ, এবং একমাত্র উপায়, *জেগে ওঠবার পর সম্পূর্ণ স্থির ও নীরব থাকা*। যদি তখন পাশ ফিরি বা নড়াচড়া করি সব-কিছু মিলিয়ে যায়, বা বরং নিদ্রার বিশাল হ্রদটি ছোটো ছোটো তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হয়ে যায় এবং আর কিছুই খুঁজে পাই না। এবং আমরা যদি চিন্তা করতে আরম্ভ করি তাহলে তরঙ্গ নয়, কর্দমাক্ত ঘূর্ণি সব-কিছু আবৃত করে দেয় : *এ ব্যাপারে চিন্তার কোনো স্থান নেই*। আমরা স্মরণে রাখবার চেষ্টা মন দিয়ে করব না। এই বিশাল প্রশান্ত সরোবরটির প্রতি আমাদের স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে

হবে, যেমন হয় উদ্দেশ্যবিহীন গভীর ধ্যানে, যেন আমাদের সূচ্যগ্র দৃষ্টি দ্বারাই ভেদ করতে হবে এই ঘন নীলের গভীরতা। আমরা যদি যথেষ্ট দীর্ঘসময় ধরে অধ্যবসায় করি, তাহলে হঠাৎ আমরা দেখব আমাদের সামনে ভেসে উঠছে এক ছবি, বা হতে পারে শুধু এক অস্পষ্ট রূপরেখা, সুরভি-পূর্ণ এক বহু দূর দেশের সুবাসের আভাস, সুপরিচিত অথচ এড়িয়ে যায়। এই মুহূর্তে আমাদের লাফিয়ে পড়া উচিত নয় এর জন্য কারণ এ তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে, বরং এ নিজেই ধীবে ধীরে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠুক, সাকার হয়ে উঠুক, যে পর্যন্ত সমগ্র দৃশ্যটি আমরা আবার আয়ত্তে না আনি। মূলত, একবার আমরা সূত্রটি শক্তভাবে আনলে, আমাদের শুধু ধীরে ধীরে একে টানতে হবে, চিন্তা করবার বা বোঝাবার জন্য কোনো চেষ্টা না করে (বোধগম্যতা পরে আসবে, কার্য-সম্পাদনের পূর্বেই যদি ব্যাখ্যা আরম্ভ করি তাহলে আমরা যোগাযোগ হারিয়ে ফেলব), এবং যোগসূত্রটি আমাদের নিয়ে যাবে এক দেশ হতে অন্য দেশে, এক স্মৃতি হতে অন্য স্মৃতিতে। কখনো কখনো আমরা পথের মাঝে একই স্থানে আটকে যাই অনেক বছর ধরে, যেন কোনো এক স্মৃতির ব্যবধান আমাদের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে। হারানো যোগাযোগটি নির্মাণ করবার জন্য, ধৈর্যশীল হওয়া ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এর পিছনে লেগে থাকা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারব না; আমরা যদি অধ্যবসায়ী হই, পথ ক্রমশ উন্মুক্ত হয়ে যাবে, যেমন হয়ে থাকে এক অব্যবহৃত অরণ্যে। কিন্তু যখন আমরা জেগে উঠি তখন স্বপ্নগুলোকে আবার আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে আমরা একাগ্র হতে পারি, স্মরণে রাখবার ও নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে রাত্রির মধ্যে একবার বা দুবার জাগরিত হওয়ার সংকল্প নিয়ে, সূত্রটিকে বিভিন্ন স্তরে ধরবার জন্য। এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ। আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জাগরিত হওয়ার জন্য ইচ্ছা করতে হবে। যেন অন্তর্নিহিত ঘড়িটি নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারে, প্রায় নির্দিষ্ট মিনিট পর্যন্ত; একে বলা হয় "রূপায়ণের প্রস্তুতি"। সংকল্পপ্রসূত এই 'রূপায়ণেরা' স্পন্দনময় গ্রন্থির মতো। এরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্জন করে। *শক্তি ও স্থায়িত্বের বিভিন্ন মাত্রার রূপায়ণ আমরা সৃষ্টি করতে

* আমরা সকলেই অনিচ্ছাকৃতভাবে রূপায়ণসমূহের সৃষ্টি করি আমাদের কামনা ও আমাদের চিন্তার (ভালো বা মন্দ) মাধ্যমে, ও তারপর ভুলে যাই। রূপায়ণেরা কিন্তু বিস্মৃত হয় না। তারা ফিরে আসে দুবছর বা দশ বছর পর, তাদের কাজ সেরে, কামনার বা চিন্তার পূর্তির মাধ্যমে— নির্দিষ্ট পরিবেশের সৃষ্টির মাধ্যমে, তাদের বিষয় চিন্তা করবার দীর্ঘকাল পরে— আমরা চিনতেও পারি না আমাদের চিন্তার বা কামনার ফলরূপে। আমরা এইভাবে অবরুদ্ধ হই সকল প্রকার ছোটো ছোটো জীবন্ত সত্তার দ্বারা, যারা বাস্তব সংসিদ্ধির অন্বেষণে রত, যদিও আমরা তাদের আর চাই না।

পারি (এবং আমরা পর্যায়ক্রমে তাদের মধ্যে পুনঃশক্তি সঞ্চারও করতে পারি), সকল প্রকার উদ্দেশ্যের জন্য, এবং বিশেষভাবে মনে বেখে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠবার জন্য। আমরা যদি কিছু মাসের জন্য, বা প্রয়োজন হলে, কিছু বছরের জন্য অধ্যবসায় করি, তাহলে যখনই আমাদের ঘুমের মধ্যে কোনো এক স্তরে কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়, আমবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সতর্ক হয়ে যাই। তখন ঘুমের মধ্যেই আমরা গতি বন্ধ করে দু-তিনবার স্মৃতিটির পুনরাবৃত্তি করি তাকে স্মৃতির মধ্যে ভালোভাবে আবদ্ধ কবে রাখবাব জন্য, এবং তারপর আবার নিদ্রামগ্ন হই।

অনুভূতির এই বিশাল ক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি সাধাবণ কার্যকরী বিষয়ের প্রতি আমরা জোর দিতে পারি, যা অন্বেষীর অন্বেষণের প্রারম্ভে তার মনে উদিত হয়। সর্বপ্রথমে অবচেতন স্বপ্নগুলোকে আমাদের পৃথক করতে হবে *সকল অনুভূতি* হতে। অনুভূতিগুলো স্বপ্ন নয়, যদিও সব-কিছু বিভ্রান্ত করে দেওয়ার অভ্যাস আমাদের আছে ; সে-সব সত্যকাবের ঘটনা, যে-সবে আমবা অংশগ্রহণ কবেছি কোনো-না-কোনো এক স্তরে। তাদের বিশেষ তীব্রতার জন্যই তারা সাধারণ হতে পৃথক : বাইরের জড়জগতের সকল ঘটনা তুলনায় ম্লান মনে হয়, সেগুলো যতই অসাধারণ হোক-না-কেন : তারা রেখে যায় এক গভীর ছাপ ও এক স্মৃতি যা পৃথিবীর উপর আমাদের যে-কোনো স্মৃতির চেয়ে *আরও জীবন্ত*— যেন আমরা হঠাৎ পেয়েছি জীবনযাপনের সমৃদ্ধতর এক প্রণালীর সন্ধান— বাইরের দৃশ্যে বা বর্ণালীতে সমৃদ্ধতর হওয়া আবশ্যক নয়, যদিও তাদের থাকতে পাবে বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য (বিশেষত প্রাণস্তরে), কিন্তু তারা সমৃদ্ধতর তাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বে। অন্বেষী যখন জাগরিত হন, প্রতীকরাজিতে পরিপূর্ণ কোনো এক জগতে স্নাত হওয়ার গভীর ছাপ নিয়ে, যে-সব প্রতীক একই সময়ে একাধিক-তাৎপর্যময় (আমাদের জড়জগতের ঘটনাগুলি খুবই কম একাধিক তাৎপর্য বহন করে), এবং প্রতীয়মান হয় যেন তারা অদৃশ্য শাখাপ্রশাখার গুরুভারযুক্ত, ও গভীরতার উপর গভীরতায় পূর্ণ, এবং দীর্ঘসময়ের ধ্যানেও যাদের মর্মার্থ সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না, কিংবা যখন তিনি এমন কোনো দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন বা তাতে অংশগ্রহণ করেন, যা অশেষভাবে অধিকতর বাস্তব মনে হয় জড়জগতের দৃশ্য অপেক্ষা (যে-সব দৃশ্য সর্বদাই বৈচিত্র্যহীনভাবে অগভীর যেন তখনই তারা সংঘৃষ্ট হয়েছে এক কঠিন ও আলোকচিত্রবৎ পটভূমিতে), তখন তিনি জানবেন তাঁর এক সত্য অনুভূতি হয়েছে, এবং তা স্বপ্ন নয়।

যেন অপ্রকৃত, তবুও জীবন হতে বাস্তবতর,
...সত্যতর সত্য হতে,
স্বপ্ন এসব যদি হয়, বা অবরুদ্ধ প্রতিরূপ,
স্বপ্নসত্য মিথ্যা করে, ধরার বৃথা বাস্তবে।[৩]

আরও একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্য আছে : যতই আমরা চেতনার ক্রমে আরোহণ করি, আলোকের উৎকর্ষ ততই পরিবর্তিত হয়—ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য *খুবই সুনিশ্চিতভাবে* সূচিত করে কোথায় আমরা আছি, এবং সূচিত করে বস্তুসমূহের তাৎপর্যও। সম্পূর্ণ এক বর্ণালী বিদ্যমান, অবচেতনের মলিন বর্ণরাজি— ধূসর, বাদামি ও কালো হতে শুরু কবে সূক্ষ্ম ভৌতিকের স্পন্দনশীল বর্ণবৈচিত্র্য পর্যন্ত, প্রাণের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা পর্যন্ত (যার মধ্যে সবসময়ই আছে কৃত্রিমতা ও চাকচিক্যের স্পর্শ, এক বিশেষ কঠিনতা— এই অঞ্চলটি সবচেয়ে বেশি প্রতারণাপূর্ণ) এবং মনের আলোকসম্ভার পর্যন্ত, যা হয়ে যায় ক্রমবর্ধমানভাবে শক্তিশালী ও পবিত্র, যখন আমরা অভ্যুত্থিত হই পরমোৎসের অভিমুখে। অধিমানস হতে ঊর্ধ্বাভিমুখে, দৃষ্টিতে এক মৌলিক পার্থক্য আছে : দৃষ্ট বিষয়, সত্তা ও বস্তু আর মনে হয় না বাইরে থেকে আলোকিত, বৈশিষ্ট্যহীনভাবে, যেমন আমরা সূর্যের দ্বাবা আলোকিত, কিন্তু তাবা আলোকিত *নিজের* আলোকে ; পরিশেষে, এ আর ততটা “বহিরভিব্যক্তি” নয়, যতটা এক স্থির ও প্রখর পরমালোকের মধ্যে চরম হর্ষ, নিম্নতর ভূমিসকলের ক্রমাগত হৈচৈ ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী হতে মুক্ত। আমরা যদি সেই পরমজ্যোতি-র সংস্পর্শে আসতে পারি, তাহলে আমরা কয়েক মিনিট পরেই ততই বিশ্রামলাভ করব, যত আট ঘণ্টা নিদ্রার পর লাভ করতে পারি। এইভাবেই যোগিগণ নিদ্রা পরিহার করতে পারেন ; এইভাবে দৈনিক কয়েক মিনিটের ধ্যান ততই বিশ্রামপ্রদ, যত খোলা হাওয়ায় পদচারণা। শরীরের অবিশ্বাস্য সহন শক্তি আছে ; মনস্তাত্ত্বিক বিশ্রামহীনতাই আমাদের ক্লান্ত করে।

বিশ্বশৃঙ্খলার যে-সব ঘটনায় আমরা সম্পৃক্ত হতে পারি, তা ছাড়াও আমরা দেখি যে আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থার বিষয়ে নিদ্রা তথ্যের এক আকর : আমাদের সত্তার সকল স্তরের উপর এক নির্ভুল আলোকপাত করা হয়, যেন বাইরে, আমাদের জাগ্রৎ সময়ে, আমরা হয়ে থাকি বধির ও মূক, কিংবা খড়ি* দিয়ে তৈরি মানুষ, এবং হঠাৎ সব-কিছু জেগে ওঠে এক জীবনে যা জীবনের চেয়ে আরও বেশি সত্য। এইসব বিভিন্ন অন্তর্নিহিত স্তরগুলি ঘুমের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারে বিভিন্ন কক্ষ বা গৃহের আকারে, যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম পুঙ্খানুপুঙ্খ স্থিতিও অর্থদ্যোতক : শ্রীমা বলেছেন : *যখন তুমি তোমার আন্তরসত্তা ও তার গঠনকারী বিভিন্ন অংশের আবিষ্কারের জন্য যাত্রারম্ভ কর, তখন প্রায়ই তোমার মধ্যে ধারণা হয় কোনো এক হলঘরে বা কক্ষে প্রবেশ করবার, এবং সেখানকার বর্ণ, পরিবেশ ও সেখানে-থাকা সকল বস্তু অনুযায়ী তুমি খুবই পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ কর তোমার সত্তার কোন্ অংশ তুমি পরিদর্শন করছ। তারপর তুমি যেতে পারো আরও*

* খড়ি = Chalk

ভিতরের কক্ষে, যে-সবের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কখনো কখনো কক্ষের পরিবর্তে, আমরা সকল প্রকারের সত্তার সম্মুখীন হই— এক সমগ্র ক্ষুদ্র পরিবার, যদি তা না হয়ে থাকে বিভিন্ন সত্তার এক সংগ্রহালয়— যারা বিভিন্ন শক্তি বা স্পন্দনের প্রকাশ, আমরা আমাদের অভ্যন্তরে যাদের স্বাগত করতে অভ্যস্ত, ও যারা রচনা করে "আমাদের" স্বভাব। তারা "স্বপ্নের" সত্তা নয়, বরং তারা বাস্তব সত্তা যাদের আমরা আশ্রয় প্রদান করি : শক্তিসমূহ সচেতন, স্পন্দনসমূহও সচেতন— সত্তাসমূহ বা শক্তিসমূহ, চেতনা বা তপঃ একই বাস্তব সত্যের যুগপৎ স্থিত দুই পার্শ্ব। এইভাবে, এক অনন্য সুস্পষ্টতার সঙ্গে আমরা দেখতে পাব আমাদের মধ্যকার কী কী আমরা প্রশ্রয় দিতে চাই বা চাই না।

অন্য একটি পর্যবেক্ষিত সত্য তার প্রায়-দৈনিক পুনরাবৃত্তি দ্বারা অন্বেষীকে প্রভাবিত করে। প্রকৃত ঘটনার পর, তিনি লক্ষ্য করেন যে নির্দিষ্ট দিনটির সকল গুরুত্বপূর্ণ *মনস্তাত্ত্বিক* ঘটনাবলীর যথাযথ পূর্বজ্ঞান তাঁর লাভ হয়েছিল পূর্বরাত্রেই। প্রথমে তাঁর মনে হয় এ এক সামান্য আকস্মিক যুগপৎ সংঘটন, বা তিনি যোগাযোগটি লক্ষ্যই করেন না ; তারপর ঘটনাটি শত শতবার পুনরাবৃত্ত হওয়ার পর, তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতে আরম্ভ করেন ; অবশেষে, যখন তিনি সম্পূর্ণভাবে সচেতন, তখন সক্ষম হন কী আসছে তার পূর্বানুমান করবার জন্য এবং পূর্ব হতেই আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেদিন আমরা হয়তো অনুভব করতে পারি অবসাদের কিছু সময়, কিংবা ক্রোধের আকস্মিক প্রকোপ, বিদ্রোহের এক জাগরণ, কামাবেগের আবেশ ইত্যাদি, অথবা, আপাতদৃষ্টিতে অন্যপ্রকারের এক দৃষ্টান্তে, আমরা হয়তো দু-তিনবার পদস্খলিত হতে পারি, পা প্রায় ভেঙে যেতে পারে, কিংবা আমরা হয়তো এক দফা জ্বরে আক্রান্ত হতে পারি— এবং আমরা লক্ষ্য করি যে এ-সব ছোটো ছোটো সাধারণ ঘটনার প্রত্যেকটি সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীকাত্মক, এবং যা আমরা পূর্বরাত্রে অনুভব করেছি (প্রতীকাত্মক এজন্য যে, যখন আমরা জেগে উঠি, তখন তা এক মানসিক রূপান্তর মাত্র, কোনো সুস্পষ্ট ঘটনা নয়) : কোনো "স্বপ্নে" আমরা কোনো শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয়েছি কিংবা আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি কোনো দুঃখজনক ঘটনায়, কিংবা হয়তো আমরা দেখি, কখনো কখনো সুস্পষ্টরূপে, পরবর্তী দিনের মনস্তাত্ত্বিক দৃশ্যের সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ স্থিতি। প্রকৃতই এমন মনে হবে, যেন আমাদের মধ্যে "কেউ একজন" অবস্থিত, পূর্ণ জাগরিত অবস্থায়, এবং খুবই সংশ্লিষ্ট, আমাদের মনস্তাত্ত্বিক জীবনের সকল কেন ও গুপ্ত কার্যধারার প্রতি ও আমাদের পতন ও প্রগতির সকল কারণের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আমাদের সাহায্য করায়। কারণ, বিপরীতভাবে, সকল হর্ষদায়ক মনস্তাত্ত্বিক গতিবিধির পূর্ববোধ আমরা পেতে পারি, যা পরবর্তী দিনে রূপান্তরিত হয় এক অগ্রগতিতে, চেতনার এক উন্মীলনে, হালকা হওয়ার এক

বোধে, অন্তরের এক বিস্তৃতিতে, এবং আমরা স্মরণ করি আমরা পূর্বরাত্রে দেখেছিলাম এক আলোক, বা এক ঊর্ধ্বারোহণ, অথবা কোনো এক প্রাচীরের বা গৃহের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া (যা হল আমাদের প্রতিরোধ-সমূহের বা আমাদের অবরোধকারী কিছু মানসিক নির্মাণের প্রতীক)। আমরা এ-সব পূর্ববোধগুলির দ্বারা আরও বেশি প্রভাবিত হই, কারণ তারা সাধারণত সম্পৃক্ত নয় সেইসব ঘটনার সঙ্গে যাদের আমরা জড়স্তরে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, যেমন কোনো আত্মীয়ের মৃত্যু, বা কোনো জাগতিক সাফল্যলাভ (যদিও সে-সব পূর্ববোধও আসতে পারে), বরং তারা সম্পৃক্ত সম্পূর্ণ নগণ্য, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, বিশদ বিবরণীর সঙ্গে, যে-সব বাইরের দিক থেকে গুরুত্বহীন, অথচ সব সময় সহায়ক আমাদের প্রগতির জন্য। এই হল তার চিহ্ন যে, আমাদের চেতনার বিকাশ হচ্ছে : যে-সব মানসিক, প্রাণিক বা অন্যান্য স্পন্দন আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনকে গঠন করে ও যাদের আমরা সরলভাবে নিজের বলে ভাবি (আমরা উক্তি করে থাকি, এ হল *আমার* ক্রোধ, *আমার* অবসাদ, *আমার* কামগ্রস্ততা, *আমার* জ্বর), তাদের অচেতনভাবে গ্রহণ করবার পরিবর্তে আমরা দেখতে শুরু করি যে তারা আমাদের নিকট আসে— রাতের পর রাত শত শত অনুভূতির দ্বারা সমর্থিত এ এক দৃশ্যমান প্রমাণ যে, আমাদের সম্মুখপ্রকৃতি আমাদের বাইরেই সৃষ্টি হয় এক বিশ্বমানসে, এক বিশ্বপ্রাণে, এমন-কি, ঊর্ধ্বতর অঞ্চলেও যদি আমরা তাদের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা হতে পারি। এবং এই হল নিয়ন্ত্রণের শুরু, কারণ একবার যখন আমরা দৃষ্টিলাভ করেছি, এবং দূরদৃষ্টিও লাভ করেছি, আমরা তখন ঘটনাক্রমের গতিপথও পরিবর্তিত করতে পারব। একই সময়ে কঠিনতম ও অন্ধতম নিয়তিবাদ, এবং অধিকৃত স্বাতন্ত্র্যের স্থান এই পৃথিবী— সবই নির্ভর করে আমাদের চেতনার উপর। এক শিষ্য একবার শ্রীঅরবিন্দের নিকট তাঁর "স্বপ্ন" এবং রাত্রি ও দিবসের ঘটনাবলীর মধ্যে এক প্রকার অদ্ভুত যোগাযোগের বিষয়ে লিখেছিলেন ; তিনি যে উত্তর পেয়েছিলেন তা এই : *হৃদয়ঙ্গম করো যে, এই অনুভূতিগুলো শুধুই কল্পনা বা স্বপ্ন নয়, বরং প্রকৃত ঘটনা।... আমাদের বাইরের মন ও প্রাণ নিয়ে আমরা শুধু শারীরিকভাবেই জীবনযাপন করি, একথা চিন্তা করা একটি ভুল। সবসময়ই আমরা চেতনার অন্যান্য ভূমিতে জীবনযাপন করি, ক্রিয়াশীল হই, অন্যদের সেখানে সাক্ষাৎ করি ও তাদের উপরও প্রভাবশীল হই, এবং সেখানে আমরা যা-কিছু করি, অনুভব করি ও চিন্তা করি, যে-সব শক্তি আমরা সংগ্রহ করি, যেসব পরিণাম আমরা প্রস্তুত করি, সে-সবের এক অননুমেয় গুরুত্ব ও প্রভাব আছে, আমাদের বহির্জীবনের উপর, যা আমরা জানি না। এর সব-কিছুই শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় না, এবং যা-কিছু পৌঁছায় তা জড়জগতে অন্য এক রূপ গ্রহণ করে— যদিও কখনো কখনো এক অবিকল অনুরূপতা থাকে ; কিন্তু এই সামান্য যা-কিছু তা অবস্থিত আমাদের বাইরের অস্তিত্বের মূলভিত্তিতে।*

যা-কিছু আমরা হয়ে উঠি, এবং করি, এবং সহন করি জড়জীবনে, সে-সব আমাদের অভ্যন্তরে প্রস্তুত হয় যবনিকার অন্তরালে। সুতরাং যে যোগের লক্ষ্য জীবনের রূপান্তর, তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তরে এ-সব ক্ষেত্রে কী হচ্ছে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কবা, সেখানে নিয়ন্ত্রণশীল হয়ে ওঠা, এবং যে গুপ্ত শক্তিরাজি নির্ধারিত করে আমাদের নিয়তি ও আমাদের অন্তরের ও বাইরের বিকাশ বা পতন, তাদের অনুভব করতে, জানতে ও তাদের নিয়ে কাজ করতে সমর্থ হওয়া। [৪]

কর্মময় নিদ্রা

পাশব নিদ্রা হতে সচেতন নিদ্রা বা অনুভূতিময় নিদ্রা পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হয়েছি ; এখন আমবা অগ্রসর হতে পারি তৃতীয় পর্যায়ে, কর্মময় নিদ্রার পর্যায়ে। দীর্ঘসময় ধরে আমাদের নিদ্রা প্রকৃতপক্ষে এক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, তা যতই সচেতন হোক-না-কেন। আমরা শুধু হয়ে থাকি ঘটনাবলীর এক সাক্ষী, এক অসহায় দর্শক, আমাদের সত্তার ভিন্ন ভিন্ন অংশে কী হয় তার— অনুভূতি সবসময় হয় সত্তার *একটি অংশেই*, আমরা জোর দিয়ে সেকথা বলতে পারি, যদি অনুভূতি হওয়ার সময় আমাদের ধারণা হয় যে, যা কষ্টস্বীকার কবে, সংঘর্ষ করে, ভ্রমণ করে এবং অন্যান্য কাজ করে, তা আমাদের সমগ্র সত্তা, ঠিক যেমন, কোনো বন্ধুর সঙ্গে যখন আমরা রাজনীতি বা দর্শন আলোচনা করি, তখন আমাদের এই ধারণা হতে পারে যে, যা আলোচনা করছে তা আমাদের সমগ্র সত্তা, যদিও তা শুধুই তার এক মানসিক বা প্রাণিক ভগ্নাংশ মাত্র। নিদ্রা যখন আরও সচেতন হয়, আমরা তখন অগ্রসর হই ধারণা থেকে আকর্ষণীয় বাস্তব সত্যে (বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, কোথায় আছে "স্থূল বাস্তব", এবং কোন্ দিকে আছে যা "বিষয়নিষ্ঠ"?) এবং দেখি যে আমরা গঠিত হয়েছি মানসিক, প্রাণিক ও অন্যান্য ভগ্নাংশের এক মিশ্রণ হতে, যাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে এক এক স্বাধীন অস্তিত্ব, এবং স্বাধীন অনুভূতিরাজি নিজের বিশেষ ভূমিতে। রাত্রিকালে, যখন শরীরের বন্ধন ও মানসিক উপদেষ্টার অত্যাচার আর নেই, তখন এই স্বাধীনতা বিশেষভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে : যে-সব ছোটো ছোটো স্পন্দন আমরা চার ধারে সংগ্রহ করেছি ও যারা "আমাদের" প্রকৃতির রচয়িতা, তারা আমাদের সত্তারই ছোটো ছোটো অস্তিত্বে বিভক্ত হয়ে যায় ও ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দেয়, এবং আমরা আমাদের মধ্যে আবিষ্কার করি অনেক প্রকারের অপরিচিতদের, যাদের অস্তিত্বের বিষয় আমরা কখনো ধারণায় আনি না। অন্য কথায়, এই ভগ্নাংশগুলি প্রকৃত কেন্দ্র চৈত্যপুরুষের চতুর্দিকে সমন্বিত হয়ে নেই, এবং যেহেতু তারা সমন্বিত হয়ে নেই, তাদের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং

ঘটনাচক্রের গতিপথের পরিবর্তন আনয়নে আমরা অসমর্থ। আমরা নিষ্ক্রিয়, কারণ প্রকৃত "আমরা" হচ্ছি চৈত্যপুরুষ, এবং এই-সব অধিকাংশ ভগ্নাংশের কোনো যোগসূত্র নেই চৈত্যপুরুষের সঙ্গে।

সমন্বয়ের প্রযোজনীয়তা অতি শীঘ্রই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, যদি আমরা নিয়ন্তা হতে চাই, শুধু এখানে নয়, সেখানেও এবং সব দিকেই। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা শরীর ছেড়ে যাই এবং নিম্নপ্রাণের অঞ্চলে (নাভিকেন্দ্র কামকেন্দ্রের ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত) প্রবেশ করি, আমাদের সত্তার যে অংশটি এ অঞ্চলে 'বহিরভিব্যক্ত' হয়েছে, তা অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত নিরানন্দ অনুভূতি প্রাপ্ত হয় ; সকল রকমের আগ্রাসী শক্তি দ্বারা এ আক্রান্ত হয়, ও আমরা অনুভব করি, যাকে প্রচলিত কথায় বলা হয়, "রাত্রির দুঃস্বপ্ন", যা থেকে রক্ষা পাওযার জন্য আমরা যতদূর সম্ভব তীব্রবেগে ছুটে ফিরে যাই আমাদের আশ্রয় শরীরের মধ্যে। এখন, যদি আমাদের সত্তার এই নির্দিষ্ট অংশটি চৈত্যকেন্দ্রের চতুর্দিকে সমন্বিত হতে রাজি হয়, তাহলে এ নিরাপদে যেতে পারবে এ-সব অঞ্চলে যা বাস্তবিকই নাবকীয়, কারণ এ চৈত্যালোকের অস্ত্রদ্বারা ভূষিত— চৈত্যসত্তা এক আলোক, মহান্ আদি পরমজ্যোতির এক অংশ— এবং আক্রমণের সম্মুখীন হলে শুধু স্মরণ কবতে হবে এই আলোককে (অথবা, অধীশ্বরকে, যা একই কথা) সকল বিবোধী শক্তিকে দূরীভূত করবার জন্য। স্মরণ করবার মাধ্যমে, এ আহ্বান করে সত্য স্পন্দনকে, যার শক্তি আছে ন্যূনতর তীব্রতার সকল স্পন্দনকে বিলীন কববাব জন্য, বা দূরীভূত করবার জন্য। এমন-কি, এক মধ্যবর্তীকালীন শিক্ষাপ্রদ স্তরও আছে, যেখানে উদাহরণস্বরূপ, আমরা অসহায় দর্শক ভয়ংকর পশ্চাদ্ধাবনের, যে পর্যন্ত না আমাদের সত্তার এই ভগ্নাংশটি হঠাৎ স্মরণ করে এই আলোককে (অথবা অধীশ্বরকে), এবং অবস্থা হয়ে যায় বিপরীত। এ-সব ভূমিতে আমাদের দেখা হতে পারে সকল প্রকার লোকের সঙ্গে। জানা বা অজানা, নিকটবর্তী বা দূরবর্তী, জীবিত বা মৃত— *সেই চিরজীবন্ত যাদের আমরা নাম দিই মৃত*[৫], শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ; ও আমরা তাদের দুর্ঘটনার সাক্ষী কিংবা অসহায় সাথী হতে পারি (পৃথিবীর উপর, জীবিতদের জন্য যা হতে পারে দুঃখজনক ঘটনা, যে-কথা আমরা জানি— সেখানে দেওয়া প্রত্যেক আঘাত হয়ে ওঠে এখানে দেওয়া এক-একটি আঘাত, সেখানকার প্রত্যেক ঘটনা প্রস্তুত করে এখানকার এক-একটি ঘটনা) ; কিন্তু যদি অনুভূতির সময়ে আমাদের এই ভগ্নাংশটি, যা কোনো বন্ধুজনের, কোনো অপরিচিতের বা "মৃত" ব্যক্তির অনুরূপ ভগ্নাংশের সঙ্গে আছে, যদি স্মরণ করে পরমজ্যোতিকে অর্থাৎ যদি এ চৈত্যপুরুষের চতুর্দিকে সমন্বিত হয়ে থাকে তাহলে সে ঘটনার গতিপথ বিপরীত করতে পারবে, বিপদে বন্ধুকে বা অপরিচিত জনকে সাহায্য করতে পারবে, বা নিজেকে মুক্ত করতে পারবে কোনো অস্বাস্থ্যকর সংসর্গ হতে (অনেক স্থান রয়েছে যেখানে আমরা বাস্তবিকই বন্দী)। আমরা শুধু একটাই

দৃষ্টান্ত দেব, যতদূর নেতিমূলক ও সাধারণ সম্ভব হতে পারে, তাই বেছে নিয়ে: একজন মহিলা "স্বপ্ন" দেখলেন যে, তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এক পুকুরের ধারে তিনি পায়চারি করছেন, ও পুকুরটির জল ছিল বিস্ময়জনকভাবে পরিষ্কার; পুকুরের তলা থেকে হঠাৎ একটি সাপ লাফ দিয়ে উপরে উঠে এসে তাঁর বন্ধুর গলায় কামড়ে দিল। তাঁর বন্ধুকে রক্ষা করবার জন্য অনেক চেষ্টাই তিনি করলেন, কিন্তু নিজেই ভয়ভীত হয়ে গেলেন, এবং তারপর যখন সাপটি তাঁকে তাড়া করল, তিনি দৌড়ে ঘরে ফিরে এলেন (তাঁর শরীরের মধ্যে)। পরদিন তিনি জানলেন, তাঁর বন্ধু অসুস্থ ও তাঁর বাক্‌শক্তি হারিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে; এবং তিনি নিজে সারাদিন অন্তরের ও বাইরের ছোটো ছোটো ব্যর্থ দুর্ঘটনার এক ক্রমের শিকার হলেন। যদি তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে সচেতন ও কেন্দ্রীভূত হতেন, তাহলে কিছুই হত না। এবং বিরোধী শক্তি পালিয়ে যেত। অন্যপক্ষে, কিছু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে দুর্ঘটনাগুলো "অলৌকিকভাবে" প্রতিহত হয়েছে, কারণ, বিগত রাত্রিতে তারা পরাজিত হয়েছিল কোনো বন্ধুর দ্বারা, যদি নিজের দ্বারা না হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা সকল প্রকার কাজেই ফলপ্রদভাবে অংশগ্রহণ করতে পারব। যা প্রস্তুত করবে আমাদের ব্যক্তিগত আগামী দিনগুলিকে, বা বিশালতর আগামী দিনগুলিকে, যা নির্ভর করে আমাদের সামর্থ্যের উপর: "অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ নয় এমন পুরুষ আমাদের আত্মার মধ্যে স্থিত; তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর, তিনিই আজ ও তিনিই আগামীকাল," কঠোপনিষদের বাণী (৪.১২.১৩)। এই স্বপ্নগুলো কতদূর পর্যন্ত স্বপ্ন নয়, তা বোঝবার পূর্বে আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন প্রচুর অনুভূতি, ও যখনই সম্ভব, তাদের যাচাই। কোনো কোনো কারাবরোধ হতে মুক্তি এখানে সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত সেই মুক্তি সেখানে হয় নি। কর্মের সমস্যার সঙ্গে সমন্বয়ের সমস্যা সম্পৃক্ত।

এই সমন্বয় আরও বেশি অপরিহার্য, যখন আমাদের শরীর আর থাকবে না, যখন অনুমান করা হয় আমরা মৃত; তখন শরীরের মধ্যে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়ার জন্য সেই ভগ্নাংশগুলোর আর কোনো উপায় থাকে না। যদি তারা সমন্বিত না হয়ে থাকে, তাহলে বিশেষভাবেই অপ্রীতিকর অবস্থা ভোগ করে। নরকের বিষয়ে আমাদের গল্পগুলোর এই বোধ হয় উৎপত্তিস্থল, যার সম্পর্ক রয়েছে শুধু আমাদের প্রকৃতির কিছু নিম্নতর *ভগ্নাংশের সঙ্গে*— একথার বার বার পুনরাবৃত্তি যত করলেও তা যথেষ্ট নয়। কারণ, নিম্নতর ভূমিগুলি (বিশেষত নিম্নপ্রাণ, যা সম্পৃক্ত নাভিকেন্দ্র ও কামকেন্দ্রের মধ্যস্থ অঞ্চলের সঙ্গে, ও স্বাভাবিকভাবেই সমন্বয়ের জন্য দুরূহতম) বিধ্বংসকারী শক্তিদের দ্বারা জনাকীর্ণ হয়ে গেছে। পণ্ডিচেরীর একজন তরুণ শিষ্য, যিনি অকালমৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাঁর এক বন্ধুর নিদ্রার মধ্যে তাঁর যাত্রার বিষয় বলতে এসে প্রকাশ করলেন, "তোমাদের জগতের ঠিক পিছনে, কোনো নিয়মশৃঙ্খলাই নেই"— এক যথার্থ

ব্রিটিশসুলভ সংক্ষিপ্ত অর্থপূর্ণ শৈলীতে নরকের অভিব্যঞ্জনা। তারপর তিনি বললেন, "আমার নিজের সঙ্গে ছিল শ্রীমার আলোক", (অর্থাৎ অধীশ্বর), "এবং আমি পার হয়ে গেলাম।" যেহেতু এই অনুভূতি অনেক মৃত্যুরই প্রকারাত্মক বৈশিষ্ট্য, সেজন্য বোধ হয় আমাদের বলা উচিত যে, দুই বন্ধুর সাক্ষাৎকার হয়েছিল উচ্চ প্রাণের ক্ষেত্রে (হৃৎকেন্দ্রের সমীপবর্তী অঞ্চলে), সুন্দর সুন্দর বর্ণাঢ্য উদ্যানের মধ্যে, যা প্রায়ই দেখা যায় সেখানে ও রচনা করে পরলোকের অগণিত তথাকথিত স্বর্গের কোনো একটিকে— প্রকৃতপক্ষে, নিম্নস্তরের সব স্বর্গ। সাধারণত বিদেহ সত্তা সেখানে অবস্থান করে, যত দীর্ঘসময় তার ইচ্ছা ; তারপর যখন পর্যাপ্ত মনে হয়, তখন তার আত্মার সঙ্গেই যায় প্রকৃত বিশ্রামস্থলে ; মূল জ্যোতি-র মধ্যে এবং সেখানেই অপেক্ষা করে প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত। "শাশ্বত নরকে" কেউ যায়, একথা বলা এক নিষ্ঠুর অযৌক্তিকতা, কীভাবে আত্মা, এই জ্যোতিঃ কখনো হতে পারে সে-সব নিম্ন স্পন্দনের বন্দী? একই ভাবে, আমরা বলতে পারি যে, ইন্‌ফ্রারেড় বা লালরঙের পরবর্তী রঙ আলট্র্যাভায়োলেট বা বেগুনি রঙের পূর্ববর্তী রঙেব * নিয়ামক। কোনো কিছু সদৃশ কিছুরই অনুষঙ্গী হয়, সবসময়, সবখানে, এখানে বা অন্যত্র। এবং সত্যই আত্মা ব্যতীত, আনন্দ ব্যতীত, আর কীই বা হতে পারে "শাশ্বত"? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : *যদি কোনো অনন্ত নরক থাকে, তাহলে তা হবে অসীম আনন্দাবেশের পীঠস্থল, কারণ ভগবান্‌ই আনন্দ, এবং তাঁর আনন্দের চিরন্তনতার অতিরিক্ত অন্য কোনো চিরন্তনতা নেই।* [৬]

সুতরাং যখন আমাদের সত্তা চৈত্যপুরুষের চারধারে সমন্বিত হয়ে যায়, তখন তার নিদ্রা জড় নিদ্রা না হয়ে ক্রিয়াশীল নিদ্রা হয়, যদি তখনও আমরা নিদ্রার উল্লেখ করতে পারি, এবং তখন তার মৃত্যু এক কষ্টকর মৃত্যু না হয়ে হয়ে ওঠে এক আকর্ষক যাত্রা বা অন্য এক প্রকারের কর্ম, কিন্তু এখনও আছে বিভিন্ন সব ক্রম, যা নির্ভর করে চেতনার প্রসারের উপর ; আমাদের কর্ম হতে পারে আমাদের জীবিত বা মৃত পরিচিতদের মধ্যে সীমিত পরিধিতে আবদ্ধ স্বল্প কর্ম, অথবা আমাদের জগৎসমূহ হতে শুরু করে কয়েকজন মহান্ সত্তার বিশ্বময় কর্ম পর্যন্ত, যাঁদের চৈত্যসত্তা, মনে হয় যেন, চেতনার বিশাল অঞ্চলসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, এবং যাঁরা তাঁদের নীরব আলোক দিয়ে জগৎকে রক্ষা করছেন।

এইসব সংক্ষিপ্ত সাধারণ বক্তব্য, খুব বেশি হলে, সাধকের জন্য পথ অনুসরণের চিহ্ন ; এ-সবের উপসংহারে আসা যাক, এক চূড়ান্ত মন্তব্যের সঙ্গে। কথাটি সম্পৃক্ত পূর্বাভাসের সঙ্গে। বোধহয় আমরা যথেষ্টভাবে জোর দিই নি এই কথার উপর যে, পূর্বাভাস পাওয়ার সম্ভাবনাটিই সংকেত দেয় যে, ঘটনাগুলো

*** লাল ও বেগুনি বর্ণালীর যথাক্রমে সপ্তম ও প্রথম রঙ।**

এখানে সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই *কোনো একস্থানে বিদ্যমান থাকে*— তারা শূন্যে থাকে না। জড়তাত্ত্বিক বাস্তব সত্যসমূহের বিষয়ে আমরা খুঁটিনাটি ব্যাপারে খুবই সতর্ক, কিন্তু স্থূলতায় ন্যূনতর জগৎসমূহের ঘটনাবলীর উপর আমরা অকারণ উদারতার সঙ্গে আবোপ কবি অবান্তরতা বা অস্পষ্টতা যা শুধু আমাদের নিজেদের মনেই দেখতে পাওয়া যায়। যা হোক, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করি যে, সব-কিছু সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসম্মত, যদি না হয ব্যবহারিকভাবে বিচক্ষণ, তথাপি : আমরা যখন চেতনার ক্রমে আরোহণ করি, তখন শুধু যে জ্যোতির্ময়তাই তীব্রতর হয় তা নয়, সময় তখন দ্রুততর হয়, এবং বিস্তীর্ণ হতে বিস্তীর্ণতর স্থানও তা অতিক্রম করে, যদি আমরা সে-কথা বলতে পারি, বা দূর হতে আরো দূরের ঘটনাও পরিমাপ করতে পারে (ভবিষ্যতের মধ্যে বা অতীতের মধ্যে), যে পর্যন্ত না আমরা আবির্ভূত হই সেই পরমজ্যোতিব মধ্যে যেখানে সব-কিছু পূর্ব হতেই *বিদ্যমান*। সেইসঙ্গে, বা তার ফলস্বরূপ, আমরা পর্যবেক্ষণ করি যে, চেতনার যে ভূমিতে আমাদের পূর্বাভাসময় অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধ হয়, তারই উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে তার পবিপূর্ণতা, সময়েব মধ্যে, দূরে বা নিকটে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা কোনো এক ঘটনা দেখি সূক্ষ্ম শরীরের স্তরে, যা আমাদের পৃথিবীর সীমাবর্তী, তার পার্থিব রূপগ্রহণ প্রায় তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হয়— কয়েক ঘণ্টা পরে বা একদিন পরে ; আমরা একটি দুর্ঘটনা দেখি, ও তার পরদিন সেই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই ; এবং অন্তর্দৃশ্যটি খুবই সুস্পষ্ট হয়, সূক্ষ্মতর বিষয় পর্যন্ত। চেতনার স্তরক্রমে আমরা যতই ঊর্ধ্বে আরোহণ করি, অন্তর্দৃশ্যের সংসিদ্ধি ততই দূরবর্তী হয়, ও তার পরিসর হয় ততই বিশ্বজনীন, কিন্তু তার কার্য-সম্পাদনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় ততই কম সুনিশ্চিত হয়, *যেন যে সত্য দৃষ্ট হয়েছিল*, তা সত্যই অবশ্যম্ভাবী (তা হয়, যদি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি সকল অহমিকা হতে বিমুক্ত হয়ে থাকে), কিন্তু এর সংসাধনের প্রণালীতে অনিশ্চয়তার এক সীমিত অংশ থাকে— এক অর্থে, অনিশ্চয়তার এই সীমিত অংশ প্রকাশ করে সেই বিকৃতি ও পথচ্যুতি, যা উচ্চতর সত্য সহন করে যখন সে পৃথিবীতে সংসিদ্ধ হওয়ার জন্য ভূমি হতে ভূমিতে অবতরণ করে। এই পর্যবেক্ষণ হতে সকলপ্রকারের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে, বিশেষত এই সত্যে যে, পৃথিবীতে আমরা যতই সচেতন হই, অর্থাৎ যতই আমরা চেতনার ক্রমে ঊর্ধ্বারোহণ করতে পারি ও পরমোৎসের নিকটতর হতে পারি, ততই পরমোৎসের নিকটতর করতে পারি পৃথিবীকে, অন্তর্বর্তী ভূমিসমূহের বিকৃতিময় নির্ধারণগুলির বিলোপসাধন ক'রে। ব্যষ্টিগত অর্থে নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরের জন্যই যে শুধু এর গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম রয়েছে তাই নয়, তাছাড়াও বিশ্বজনীন অর্থে বিশ্বরূপান্তরের জন্য এর গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম রয়েছে। স্বাতন্ত্র্য ও নিয়তিবাদের সমস্যা অনেক আলোচনার সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভুল পরিপ্রেক্ষিতে। স্বাতন্ত্র্য বনাম নিয়তিবাদ বলে কিছু নেই, কিন্তু আছে স্বাতন্ত্র্য

এবং অনেক নিয়তি। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, আমরা অনেকগুলি *অধ্যারোপিত নিয়তির* এক ক্রমের নিয়ন্ত্রণাধীন— শারীরিক, প্রাণিক, মানসিক ও ঊর্ধ্বতর-ভূমিগত— এবং প্রত্যেক ভূমির নিয়তি তার অব্যবহিত নিম্নে অবস্থিত ভূমির নিয়তির পরিবর্তনে বা বিলোপসাধনে সমর্থ। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের অণুবিশ্বে (অর্থাৎ মানুষের মধ্যে) ভালো শারীরিক স্বাস্থ্য ও এক নির্দিষ্ট দীর্ঘায়ু পরিবর্তিত হতে পারে "আমাদের" সকল আবেগ ও "আমাদের" বিশৃঙ্খল জীবনের প্রাণিক নিয়তি দ্বারা, যা আবার পরিবর্তিত হতে পারে আমাদের সংকল্প ও আদর্শের মানসিক নিয়তি দ্বারা, এবং তাও পরিবর্তিত হতে পারে চৈত্যপুরুষের মহত্তর বিধান দ্বারা, এবং এইভাবে এগিয়ে চলবে। স্বাতন্ত্র্যের অর্থ ঊর্ধ্বতর ভূমিতে যাওয়া। একই কথা প্রযোজ্য পৃথিবীর নিয়তির বিষয়ে, অণুবিশ্ব ও মহাবিশ্ব উভয়কেই একই শক্তিরাজি প্রচালিত করে, একই ভাবে। অন্য কিছু হওয়ার অপেক্ষা, অধিকতরভাবে আমরা হলাম জড়তত্ত্বের মধ্যে এই-সকল নিয়তির প্রবেশের বিন্দু; এবং যদি আমরা চেতনার কোনো এক উচ্চতর ভূমিতে আরোহণে সমর্থ হই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আমরা সকল নিম্নতর নিয়তির পরিবর্তনে ও বৃহত্তর স্বাতন্ত্র্যে পৃথিবীর প্রবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করি— সেদিন পর্যন্ত, যেদিন বিবর্তনের অগ্রদূতদের মাধ্যমে আমরা সমর্থ হব এক *অতিমানস* ভূমিতে আরোহণ করতে, যা পরিবর্তিত করে দেবে জগতের বর্তমান নিয়তিকে, যেমন মন করেছিল ত্রেতাযুগের শেষের দিকে; এবং শেষে— শেষ যদি আদৌ থাকে —*পৃথিবী বোধহয় উপনীত হবে পরম নিয়তিতে, যা হল পরম স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণ* সংসিদ্ধি। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আমাদের চেতনা-সম্বন্ধীয় কর্মের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করি প্রতিরোধ-প্রদানে নিয়তিগত অবশ্যম্ভাবিতাকে যা জগতের উপর এক গুরুভার, এবং আমাদের প্রত্যেকেই হয়ে *ওঠে* পৃথিবীর মুক্তির জন্য, ও তার দিব্যভাবাপন্ন হওয়ার জন্য, আলোড়নসদৃশ। কারণ, চেতনার বিবর্তনের একটি পার্থিব উদ্দেশ্য আছে।

১০

বিপ্লবী যোগী

এই ছিল যে-সব মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক এবং চৈত্য-সম্বন্ধীয় আবিষ্কারে শ্রীঅরবিন্দ উপনীত হয়েছিলেন, একাকী, ক্রমে ক্রমে, বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে, চেতনার সূত্র অনুসরণ ক'রে। এ-কথা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, তাঁর যোগ সে-সব স্থানেই বিকশিত হয়েছিল, যেখানে সাধারণত যোগসাধনা হয় না : বরোদা স্টেট কলেজে ফরাসি বা ইংরেজি শিক্ষাদানের সময়ে, মহারাজার প্রাসাদে কর্মরত অবস্থায়, এবং ক্রমবর্ধমানভাবে, তাঁর গুপ্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মধ্যে। রাত্রির যে সময় বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যয়নে বা রাজনৈতিক কার্যে উৎসর্গীকৃত হত না, তা ব্যয়িত হত কবিতা-রচনায় : "গভীর রাত্রি পর্যন্ত কবিতা-রচনায় রত থাকতেন শ্রীঅরবিন্দ, সেজন্য খুব ভোরে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হত না।... লেখার পূর্বে তিনি কিছুক্ষণ ভাবতেন, তারপর তাঁর লেখনী হতে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হত," স্মৃতিচারণ করছেন তাঁর বাংলা-শিক্ষক। কবিতা-রচনা হতে শ্রীঅরবিন্দ চলে যেতেন তাঁর পরীক্ষামূলক নিদ্রায়। ১৯০১-এ আঠাশ বছর বয়সে তিনি মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁকে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গিনী করবার জন্য প্রয়াস করেন ; ব্রিটিশ পুলিশের সংরক্ষণাগারে প্রাপ্ত এক পত্রে তিনি তাঁকে লিখেছিলেন : *সেই-সব চিহ্ন উপলব্ধি করছি, আমার ইচ্ছা*

তোমাকেও সেই পথে নিয়ে যাই। কিন্তু মৃণালিনী তাঁকে বুঝতে পারলেন না ; শ্রীঅরবিন্দ রয়ে গেলেন একাকী। মহান্ সাধু-সন্ন্যাসী এবং রহস্যবাদীদের জীবনকে যে-সব মর্মস্পর্শী বা অলৌকিক কাহিনী অলংকৃত করে, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সে-সবের জন্য আমাদের সকল অনুসন্ধানই বৃথা হয়, বৃথা হয় রোমাঞ্চকর যৌগিক পদ্ধতির জন্য অনুসন্ধান ; সব-কিছুই এত সাধারণ মনে হয় যে, আমরা সে-সব কিছুই দেখব না ; ঠিক যেমন জীবনে ঘটে। বোধহয়, অসাধারণ অপেক্ষা সাধারণেই তিনি বেশি অলৌকিকের সন্ধান পেয়েছিলেন ; মৃণালিনীকে তিনি লিখলেন এক পত্রে : *"আমার সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ।" / যেথা / দৃষ্টিশীল নয়ন-সম্মুখে গহন, অজানা সবই।*[১] এবং বোধহয় তিনি চান আমরা সে-কথাই আবিষ্কার করি তাঁর জীবনে, তাঁর কর্মে, তাঁর যোগে— সাধারণ ত্বকের নিচে অজ্ঞাত সম্পদ্ : *জীবন মোদের স্বপ্নের চেয়ে রহস্য নিগূঢ়তর।*[২] যদি শুধু আমরা জানতাম কত শূন্যগর্ভ ও নিষ্ফল আমাদের তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাবলী, বয়স্কদের জন্য একপ্রকার ঐন্দ্রজালিক চাতুর্য— যখনই দুই-শতাংশ পরিমাণেরও জ্ঞানলাভ হয় আমাদের তখনই সহজভাবে দেখতে পারি আমরা, কীভাবে তারা প্রস্তুত হয়— এবং সত্য কত সরলতর এই অতিপ্রাকৃত আতিশয্যের চেয়ে। যতই তিনি যোগসাধনায় অগ্রগতি করলেন, শ্রীঅরবিন্দ ততই এগিয়ে চললেন এই-সব কাল্পনিক প্রতিরূপকে পিছনে ফেলে, তারই অভিমুখে যার নাম তিনি দিয়েছিলেন *আধ্যাত্মিক যথার্থবাদ*[৩]; এর কারণ এই নয় যে তিনি মনোরম কাল্পনিক রূপে বিশ্বাস করতেন না— তিনি ছিলেন একজন কবি— কিন্তু তিনি দেখলেন যে এই-সব রূপ আরও সুন্দর হবে যদি তারা মূর্ত হয় পৃথিবীর উপর, যদি অতিপ্রাকৃতিক হয়ে ওঠে আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি, আমাদের সম্পূর্ণ উম্মুক্ত দৃষ্টির সামনে। যা প্রকৃতির অতীত তার এই সহজীকরণ ও জীবনের এক প্রশান্ত অধিনিয়ন্ত্রণ, শ্রীঅরবিন্দ যেখানে উপনীত হচ্ছিলেন, তা শুধু এজন্য সম্ভব ছিল যে শ্রীঅরবিন্দ দুটি জগৎকে কখনো পৃথক্ করেন নি ; শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক শিষ্যকে লিখলেন : *ভারতবর্ষে আমার আগমনের সময় হতে আমার নিজের জীবন ও আমার যোগ সবসময় হয়েছে উভয় ইহ-জাগতিক ও অন্য-জাগতিক, কোনো দিকে কোনো বর্জন ব্যতীত। আমার ধারণা, সকল মানবীয় স্পৃহাই ইহ-জাগতিক, এবং তাদের অধিকাংশ আমার মানসিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, ও কিছু আমার জীবনেও প্রবেশ করেছে, যেমন রাজনীতি, কিন্তু সেই একই সময়ে, আমি বোম্বের অ্যাপোলো-বন্দরে পদার্পণ করবার পরই, আমার আধ্যাত্মিক অনুভূতি পাওয়া শুরু হল, কিন্তু সে-সব এই জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন ছিল না, বরং তার উপর তাদের এক অভ্যন্তরীণ ও অশেষ প্রভাব ছিল, যেমন এক অনুভব যে, অসীম হয়ে আছেন প্রাকৃতিক মহাকাশে পরিব্যাপ্ত, ও অন্তর্যামী সকল জড়বস্তুতে ও শরীরে অন্তর্নিহিত। সেই একই সময়ে, অতীন্দ্রিয় জগৎসমূহে ও*

ভূমিসমূহে প্রবেশরত অবস্থায় নিজেকে দেখলাম, যাদের প্রভাব ও এক পরিণামও রয়েছে জড়স্তরের উপর ; সেজন্য আমি কোনো সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা বা সমাধানহীন বিরোধ পেতে পারলাম না উভয়ের মধ্যে— যাদের আমি অস্তিত্বের দুটি সীমা নামে অভিহিত করেছি, ও যা-কিছু বিদ্যমান তাদেব অন্তর্বর্তী স্থানে, উভয়েব মধ্যে। আমার নিকট সকলই ব্রহ্ম ও আমি উপলব্ধি করতে পারি ব্রহ্মকে সর্বত্র।[৪]

কর্মেব সমস্যা

শ্রীঅববিন্দের বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর মধ্যেই আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক যথার্থবাদের প্রথম সন্ধান পাই। যথাশীঘ্র এক চতুঃসূত্রী কার্যক্রম প্রস্তুত হয়েছিল : স্বাধীনতার ধারণার প্রতি ভারতকে জাগরিত কবা, যাব জন্য সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও রাজনৈতিক বক্তৃতাই যথেষ্ট ; জনসাধারণের মন সর্বদা এক বিপ্লবের অবস্থায় বাখা এবং শতাব্দীর পরিবর্তনেব সময়, ভারতের অন্যতম মহানায়ক তিলকের সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রথমদের একজন, যাঁরা বলেছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও অসহযোগের কথা (ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যে গান্ধিজীর আগমন কিন্তু আরও পনেরো বছর পরে) ; ভারতীয় কংগ্রেস পার্টিকে ও তার ভীরু দাবিগুলোকে এক *উগ্রবাদী আন্দোলনে* রূপান্তরিত করা, যা দ্ব্যর্থহীনভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে প্রোৎসাহন দেবে ; এবং অবশেষে এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি করা গুপ্তভাবে। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীনের সঙ্গে তিনি বাংলায় গরিলা দলের সংগঠন আরম্ভ করলেন, খেলাধুলো অথবা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আড়ালে ; এমন-কি, তিনি একজন বিপ্লবীকে য়ুরোপে প্রেরণ করলেন তাঁর নিজের অর্থব্যয়ে কীভাবে বোমা তৈরি করতে হয় তাই শেখার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ যখন বলেছিলেন, তিনি *কোনো শক্তিহীন নীতিবাদী বা দুর্বল শান্তিবাদী নন*[৫], তিনি তখন যা ব্যক্ত করলেন তাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। ফরাসি ইতিহাস এবং ইটালি ও আমেরিকার বিপ্লবের ইতিহাস উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে তিনি জানলেন যে সশস্ত্র বিপ্লবও উচিত হতে পারে ; জোয়ান্ অফ্ আর্ক্, ম্যাজিনি বা ওয়াশিংটন কেউই ছিলেন না "অহিংসার" দূত। যখন গান্ধিজীর পুত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ১৯২০তে, অহিংসার বিষয়ে আলোচনার জন্য, শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিয়েছিলেন এই সরল প্রশ্নের সাহায্যে যা এখনও পূর্ণ প্রাসঙ্গিক* : "তুমি কী করবে, যদি আগামী কাল ভারতের উত্তরসীমান্ত আক্রান্ত হয়?" বিশ বছর পরে, ১৯৪০এ শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা প্রকাশ্যভাবে মিত্রশক্তিদের পক্ষাবলম্বন করলেন,

* ১৯৬৩তে লিখিত, ১৯৬২ অক্টোবরে ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনের আক্রমণের কয়েক মাস পরে। (মূল ফরাসি হতে ইংরেজি অনুবাদকের মন্তব্য।)

এবং গান্ধিজী আবেগময় ও নিঃসন্দেহভাবে প্রশংসনীয় এক উচ্ছ্বাসে এক খোলা চিঠি লিখলেন ব্রিটিশ জাতির উদ্দেশ্যে, হিটলারের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন না করে শুধুই "আধ্যাত্মিক শক্তি" ব্যবহারেব জন্য তাদের অনুপ্রেরিত ক'রে। সেজন্য, সহিংস কর্মের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট করা সমুচিত হবে।

তিনি লিখেছেন, *যুদ্ধ ও ধ্বংস এক বিশ্বজনীন নিয়ম শুধু আমাদের ইহজীবনের স্থূল বস্তুগত দিকেরই নয়, আমাদের মানসিক ও নৈতিক জীবনেরও। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বৌদ্ধিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক মানুষের বাস্তবজীবনে অগ্রগতির জন্য আমরা কোনো প্রকৃত পদক্ষেপ নিতে পারব না, যা বিদ্যমান ও জীবন্ত এবং যা অস্তিত্ব ও জীবনের ঈপ্সু তাদের মধ্যে এবং তাদের পশ্চাতে যা যা আছে তাদের মধ্যে এক সংঘর্ষ বিনা, এক যুদ্ধ বিনা। অন্তত মানুষ ও বিষয়সকলের যা অবস্থা, তাতে কোনো অগ্রগতি অভিবৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা অসম্ভব, যদি আমরা প্রকৃতরূপে ও সম্পূর্ণভাবে অহিংসনীতি অবলম্বন করি যা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে আচরণের উচ্চতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিধানরূপে। আমরা শুধুই কি আত্মশক্তির ব্যবহার করব, এবং কখনো কি যুদ্ধ দ্বারা বা আত্মরক্ষার জন্য কোনোপ্রকার দৈহিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা কোনো ধ্বংসসাধন করব না? ভালো, যদিও আত্মশক্তি ফলপ্রসূ হওয়া পর্যন্ত, মানুষ ও জাতিসমূহের মধ্যে স্থিত আসুরিক শক্তি পদদলন ক'রে চূর্ণবিচূর্ণ করে, হত্যা করে, দহন করে, কলুষিত করে, যেমন আজ আমরা দেখছি তাকে করতে, কিন্তু সে তখন তা করে স্বাচ্ছন্দ্যে ও বিনা বাধায় এবং বোধহয় তোমার হিংসা পরিহার দ্বারা তুমি ততই জীবনে ধ্বংস করেছ, যত অন্যেরা করেছে হিংসা অবলম্বন ক'রে। জগৎ হতে সংঘর্ষ ও ধ্বংসের বিধান লোপ করবার জন্য আমাদের নিজেদের হাত পরিষ্কার রাখলে বা আমাদের আত্মা নিষ্কলুষ রাখলে তা যথেষ্ট নয় :* **সে-জন্য যা তার মূল কারণ, মানবজাতি হতে প্রথমে তাই লুপ্ত হওয়া উচিত।**** *শুধু নিশ্চলতা ও জড়তা, যা মন্দের বিরোধে কোনোপ্রকার প্রতিরোধের জন্য অনিচ্ছুক বা অসমর্থ তা সেই বিধানকে খুবই কম উচ্ছেদ করবে ; জড়তা ও তমঃ, বাস্তবিক, সংঘর্ষের রাজসিক ও সক্রিয় তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকারক, কারণ সংঘর্ষ ন্যূনপক্ষে যত ধ্বংস করে তার চেয়ে বেশি সৃষ্টি করে। সুতরাং যে পর্যন্ত ব্যক্তির কর্মসমস্যা সম্পৃক্ত, সংঘর্ষ হতে ও স্থূলতর তথা বাস্তবতর আকারে তজ্জনিত অনিবার্য আনুষঙ্গিক ধ্বংসলীলা হতে তার বিরতি হয়তো তার নিজের নৈতিক সত্তার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা সকল জীবের সংহর্তাকে অবিলুপ্ত রেখে দেয়।*[৬]

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা ও যুদ্ধের প্রতি তাঁর ব্যবহারিক মনোভাবের সম্পূর্ণ বিবর্তন, বাংলায় তাঁর গুপ্ত কার্যকলাপ হতে শুরু করে ১৯১০এ তাঁর

** গুরুত্ব আমাদের দেওয়া।

পণ্ডিচেরীতে নিভৃতবাস পর্যন্ত, আবর্তিত হয় *পদ্ধতি*-সম্পর্কীয় প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে : কীভাবে সুনিশ্চিতরূপে আঘাত করা যেতে পারে এই "সকল জীবের সংহর্তা"কে বা বৈদিক ঋষিদের অভিহিত "অত্রি"কে। এবং শ্রীঅরবিন্দ এগিয়ে চললেন ভারতের স্বাধীনতা হতে জগতের স্বাধীনতা পর্যন্ত। কারণ, যোগে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভূতির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমানভাবে সচেতন হলেন যে, গুপ্ত শক্তিরাজি শুধুই আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলার পশ্চাতে নেই, বিশ্বের বিশৃঙ্খলার পশ্চাতেও আছে— সব-কিছুরই আগমন হয় অন্য কোনো স্থান হতে, যেমন দেখেছি আমরা— এবং যদি আমাদের যুদ্ধবিরতি সকল জীবের সংহর্তাকে বিলুপ্ত না করে রেখে দেয়, আমাদের যুদ্ধও তার বিনাশ করতে পারে না, যদিও কার্যত, যুদ্ধের জন্য আমাদের হাত কলুষিত করতেই হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক মাঝামাঝি, শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যদ্‌বাণীর গুরুত্ব দিয়ে মত ব্যক্ত করলেন : *জার্‌মানির মধ্যে যে অসুরশক্তি মূর্ত হয়েছিল জার্‌মানির পরাজয় তার বিনাশ করতে পারে নি; খুব ভালোভাবেই তা উপনীত হতে পারে তার এক নতুন অবতারে, বোধহয় অন্য কোনো জাতিতে বা সাম্রাজ্যে এবং আবার নতুন ভাবে সম্পূর্ণ সংগ্রামটিতে অবতীর্ণ হতে হবে। যে পর্যন্ত পূর্বদেবগণ জীবিত, তাদের দ্বারা সঞ্জীবিত শরীরের ধ্বংসসাধন বা অবদমন এক সামান্য ব্যাপার, কারণ তারা ভালোভাবেই জানে কীভাবে দেহান্তরিত হওয়া যায়। জার্‌মানি ১৮১৩তে ফ্রান্‌সে নেপোলিয়ন-সমুদ্ভূত শক্তিকে পরাভূত করেছিল এবং য়ুরোপে তার নেতৃত্বের অবশিষ্টাংশেরও অবসান ঘটিয়েছিল ১৮৭০এ ; সেই জার্‌মানিই যাকে পরাভূত করেছিল তারই অবতার হয়ে উঠল। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সহজেই হতে পারে আরও ভয়ংকর মাত্রায়।*[৭] আজ আমরা প্রকৃতই জানি যে, কীভাবে দেহান্তরিত হতে হয়, তা পূর্বদেবগণের বিদিত ছিল। এত সব বছরের অহিংসার শেষ হল এক ভয়ংকর হিংসায়, যা চিহ্নিত করেছিল ১৯৪৭-এর ভারত-বিভাজনকে, এবং তা দেখে গান্ধিজী তাঁর মহাপ্রয়াণের ঠিক পূর্বেই দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "হিংসার যে মনোভাব আমরা গোপনে পোষণ করেছি তা এখন আমাদের প্রতি প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে আসছে ও আমাদের প্রবর্তিত করছে পরস্পরকে আক্রমণ করবার জন্য ; যখন ক্ষমতা-বিভাজনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এখন যখন দাসত্বশৃঙ্খলের মোচন হয়েছে, সকল মন্দশক্তিই বাইরে আত্মপ্রকাশ করেছে।" কারণ, হিংসা বা অহিংসা, কোনো কিছুই মন্দশক্তির মূলে পৌঁছায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যে মিত্রশক্তির পক্ষ সমর্থন করলেন,* কারণ

* তাঁর স্বদেশবাসীদের বিরক্তিভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই তিনি তা করেছিলেন : এটা মনে রাখা উচিত যে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারত এত যন্ত্রণাভোগ করেছিল যে জার্‌মানির আক্রমণে ব্রিটেনের ভাগ্যের বিষয়ে তার উদাসীন হওয়ার কথা নয়।

তাই ছিল একমাত্র করণীয় *বাস্তবধর্মী* কাজ, এবং তিনি তাঁর এক শিষ্যকে লিখলেন : *একে তুমি কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রদের যুদ্ধ মনে করবে না। এ এক সংঘর্ষ এক আদর্শের জন্য যাকে পৃথিবীর উপর মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এক সত্যের জন্য যা এখনও সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উপলব্ধ করে নি, অন্ধকার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে যা চেষ্টা করছে পৃথিবীকে ও মানবজাতিকে নিকট ভবিষ্যতেই গ্রাস করবাব জন্য। যুদ্ধের পশ্চাতে যে-সকল শক্তি আছে তাদেরই প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, এবং বাইরের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতি নয়।*[৮] *যোগীর দৃষ্টি শুধুই বাইরের ঘটনা, লোকজন ও কারণাবলীকে লক্ষ্য করে না, তদুপরি লক্ষ্য করে বিশাল শক্তিরাজিকেও যা তাদের নিক্ষেপ করে কর্মের মধ্যে। যারা যুদ্ধ করেছিল সে-সব লোকেরা যদি শাসক ও ধনবিনিয়োগকারীদের হাতে যন্ত্র, তাহলে এরাও পর্যায়ক্রমে এই-সব শক্তির হাতের মুঠোয় শুধুই পুতুল। অন্তরালবর্তী বস্তুসকলকে লক্ষ্য করায় যদি কেউ অভ্যস্ত তাহলে তার আর আগ্রহ থাকে না বাইরের দৃষ্টিকোণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার জন্য বা রাজনৈতিক, সাংগঠনিক অথবা সামাজিক পরিবর্তন হতে কোনো প্রতিবিধান প্রত্যাশা করবার জন্য।*[৯] এইসব অন্তরালবর্তী "বিশাল শক্তিসমূহের" বিষয়ে তথা জড়তত্ত্বের মধ্যে জড়াতীতের অবিরত অনুপ্রবেশের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ সচেতন হয়েছিলেন। কোনো নৈতিক সমস্যার উপর তাঁর শক্তি আর কেন্দ্রীভূত ছিল না— যেমন অহিংসা বনাম হিংসা— যা মোটামুটিভাবে কিছু পরিমাণে অগভীর, বরং কার্যকারিতা-সম্বন্ধীয় এক প্রশ্নের উপর তা কেন্দ্রীভূত ছিল। পুনর্বার অনুভবেরই মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবে দেখলেন যে, এই জগতের মন্দশক্তির নিরাময় করতে হলে আমাদের প্রথমে নিরাময় করা উচিত "মানুষের মধ্যে সেই মন্দের মূলে যা-কিছু আছে" তারই, এবং বাইরে কিছুরই আরোগ্যসাধন করতে পারব না, যদি না আমরা অন্তরে তার আরোগ্যসাধন করি, কারণ সে-সব একই বস্তু। বাইরের নিয়ন্ত্রণ আমরা করতে পারব না, যদি না আমরা অন্তরের নিয়ন্ত্রণ করি, কারণ সে-সব একই বস্তু। অন্তরের জড়তত্ত্বকে রূপান্তরিত না করে, বাইরের জড়তত্ত্বকে আমরা রূপান্তরিত করতে পারব না, কারণ সে-সব আবারও এক ও অভিন্ন বস্তু —শুধু একই প্রকৃতি, একই জগৎ ও একই জড়তত্ত্ব রয়েছে, এবং যে পর্যন্ত ভুল দিক্ হতে আমরা প্রশ্নটির অভিমুখে যাই, সে-পর্যন্ত আমরা কোথাও উপনীত হই না। যদি প্রতিবিধান খুবই দুঃসাধ্য দেখি তাহলে মানুষ বা জগতের জন্য কোনো আশা নেই, কারণ আমাদের বাইরের সকল সর্বৌষধ ও বিরক্তিজনকভাবে-ভাবপ্রবণ নৈতিকতা নিয়তি-নির্দিষ্ট, শেষ পর্যন্ত সেই-সব গুপ্তশক্তিদের দ্বারা বিলীন ও বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, *একমাত্র উপায় হল এক চেতনার অবতরণ যা ক্রীড়নক নয় এই শক্তিসমূহের, বরং তাদের চেয়ে বৃহত্তর, এবং তাদের বাধ্য করতে পারে, হয় রূপান্তরিত, নয় বিলুপ্ত হওয়ার জন্য।*[৯] এই

নতুন অতিমানসচেতনার অভিমুখেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের মধ্যেই তাঁর পথ নির্মাণ করছিলেন।

[যদিবা] ব্যর্থ অন্য সকলি, খুঁজে পেতে পারি তবে
পূর্ণরূপান্তরের সূত্র গুপ্ত মোদের মাঝে।[১০]

নির্বাণ

১৯০৬-এ শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করলেন, কলকাতায় রাজনৈতিক আলোড়নের কেন্দ্রস্থলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। বাংলার গবর্নর লর্ড কার্জনের ভুলগুলি ছাত্র আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল ; কাজ করবার জন্য সময় ছিল পরিপক্ক। অন্য এক মহান্ জাতীয়বাদী বিপিন পালের সাহচর্যে শ্রীঅরবিন্দ আরম্ভ করলেন এক ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা *বন্দে মাতরম্* যা ছিল প্রথম সংবাদপত্র, সম্পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সর্বসাধারণের মধ্যে ঘোষণার জন্য, এবং ভারতের জাগরণের জন্য এক শক্তিশালী যন্ত্র ; এক চরমপন্থী দল তিনি স্থাপিত করলেন এবং এক জাতীয় কর্মধারার কার্যক্রমও প্রস্তুত করলেন— ব্রিটিশ দ্রব্যাদির বর্জন, ব্রিটিশ বিচারালয়ের বর্জন, ব্রিটিশ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্জন ; কলকাতায় অবস্থিত প্রথম জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হলেন তিনি, এবং এমনভাবেই আন্দোলনে লিপ্ত হলেন যে, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। ব্রিটিশের জন্য একথা দুঃখজনক ছিল যে, শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধাবলী তথা বক্তৃতাবলী আইনত ছিল আক্রমণের অসাধ্য ; তিনি জাতিবিদ্বেষ প্রচার করেন নি, কিংবা ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর সরকারের উপরও কোনো আক্রমণ চালান নি, কিন্তু শুধু ঘোষণা করেছিলেন জাতিসমূহের স্বাধীনতার অধিকার। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের অভাবে অগ্রাহ্য হয়ে গেল ; শুধু মুদ্রাকরকে ছ-মাসের জন্য জেলদণ্ড দেওয়া হল, যিনি ইংরেজি ভাষার একটিও শব্দ জানতেন না। শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করবার এই ব্যর্থপ্রয়াস তাঁকে খ্যাতিপ্রদান করল। এরপর তিনি জাতীয়তাবাদী দলের নেতারূপে স্বীকৃত হলেন, এবং যবনিকার অন্তরাল হতে বেরিয়ে এলেন, যেখানে থাকতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন। পরে তিনি লিখেছেন : *কোনো সৌভাগ্যপূর্ণ স্থানে আমার নাম হওয়ার জন্য আমি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করি না ; আমার রাজনৈতিক দিনগুলিতেও আমি কখনো ব্যাকুল হই নি যশঃপ্রাপ্তির জন্য ; যবনিকার অন্তরালে থাকতে ও লোকদের অজ্ঞাতসারে তাদের প্রেরণ করে কাজ করিয়ে নিতে আমি পছন্দ করি।*[১১] কিন্তু এটা ভুল হবে, যদি শ্রীঅরবিন্দকে একজন মতান্ধ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করা হয় ; তাঁর সমসাময়িক সকলেই বিমুগ্ধ ছিলেন এই "প্রশান্ত তরুণের প্রভাবে, যাঁর একটিমাত্র শব্দও এক বিক্ষুব্ধ জন-সমাবেশকে নীরব করতে পারত।" বাইরের এই

উত্তেজনার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশ প্রতিদিন সকালের সংবাদপত্র প্রকাশনের অন্তর্বর্তী সময়ে, এবং গুপ্ত পুলিশের অবিরত ভীতিপ্রদর্শনের অবস্থায়, ১৯০৭, ৩০ ডিসেম্বরে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল বিষ্ণু ভাস্কর লেলে নামধেয় একজন যোগীর সঙ্গে, যিনি শ্রীঅরবিন্দের বিরোধাভাসপূর্ণ জীবনে এক বিরোধাভাসপূর্ণ অনুভূতি এনেছিলেন।

পনেরো বছর ভারতে অবস্থানের পর এ ছিল একজন যোগীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার, অন্তত *স্বেচ্ছাকৃতভাবে!* এ থেকে ভালোভাবে সূচিত হয়, তিনি কত অবিশ্বাস করতেন তপশ্চর্যায়, এবং অধ্যাত্মবাদীদের উপর। তাছাড়া, লেলেব প্রতি তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ : *আমি যোগসাধনা করতে চাই শুধু কর্মের জন্য, কিছু করবার জন্য, সংসার-ত্যাগ-পূর্বক সন্ন্যাস ও নির্বাণের জন্য নয়।*[১২] লেলের উত্তর ছিল বিস্ময়কর ও স্মরণযোগ্য : "এটা আপনার পক্ষে সহজই হবে, কারণ আপনি একজন কবি।"[১২] দুজন এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে তিনদিনের জন্য অবসৃত হলেন। সেই সময় হতে শ্রীঅরবিন্দের যোগ এক ভিন্নপথ গ্রহণ করল, যা তাঁকে কর্ম হতে দূরে নিয়ে যাওয়ার মতো প্রতীয়মান হল, কিন্তু তাঁকে তা উপনীত করল কর্মের ও বিশ্বরূপান্তরের গুপ্তরহস্যের নিকট। শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন, *প্রথম পরিণতি হল অতীব শক্তিশালী অনুভূতি ও চেতনার মৌলিক পরিবর্তনের এক ধারা যা কখনো তাঁর (লেলের) অভিপ্রেত ছিল না, এবং যা আমার ধারণারও সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, কারণ সে-সব আমাকে প্রবল তীব্রতার সঙ্গে দেখিয়ে দিল জগৎকে শূন্যগর্ভ রূপসমূহের এক চলচ্চিত্র-সম অভিনয়-লীলারূপে পরমব্রহ্মের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বময়তার মধ্যে।*[১৩]

আত্মার বিস্তীর্ণ সকল ব্যাপ্তিস্থান মাঝে
মনে হয় যেন চলমান এক বহিরাবরণ দেহ।[১৪]

শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র পূর্ণযোগ একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মানসিক, প্রাণিক তথা শারীরিক রূপান্তরের জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টা, এক পরিপূর্ণ পার্থিব জীবনে তাঁর বিশ্বাস, সবই নিরর্থক হয়ে গেল এক বিশাল মায়ার মধ্যে— কিছু শূন্য আকৃতি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। *আমাকে তা সহসা নিক্ষেপ করল এক অবস্থায়, যা চিন্তার ঊর্ধ্বস্থ ও অতীত, কলুষিত নয় কোনো মানসিক বা প্রাণিক চঞ্চলতা দ্বারা ; কোনো অহংভাব সেখানে ছিল না, কোনো বাস্তব জগৎ নয়— শুধু যখন নিশ্চল ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে দৃষ্টিপাত করা হয়, তখন পরিদৃষ্ট হয় কিছু একটা, তার বিশুদ্ধ নীরবতার মধ্যে শূন্যগর্ভ আকৃতির এক জগৎ, সত্য উপাদান না-থাকা কিছু জড়ীভূত ছায়া। কোনো 'এক' ছিলেন না, কিংবা 'বহু'ও ছিল না, শুধুই ছিল পরম 'তৎ', নিরাকার, সম্পর্কবিহীন, বিশুদ্ধ, বর্ণনাতীত, অচিন্ত্য, অসীম, অথচ সর্বোত্তমরূপে বাস্তব, ও একমাত্র বাস্তব। এ কোনো মানসিক উপলব্ধি ছিল না, কিংবা ছিল না কোনো কিছুর এক আভাস ঊর্ধ্বে কোথাও*

—ছিল না কোনো কিছু অমূর্ত— এ ছিল নিশ্চয়াত্মক। একমাত্র নিশ্চিত বাস্তবতা —যদিও এ এক বিস্তৃতিপূর্ণ ভৌতিক জগৎ নয়, তথাপি ভৌতিক জগতের এই বহিরাভাসের উপর এ পরিব্যাপ্ত হয়েছে, অধিষ্ঠিত হয়েছে, বরং তাকে প্লাবিত ও নিমগ্ন করেছে, নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো বাস্তবতার জন্য কোনো স্থান সংরক্ষণ করে নি, এবং অন্য কোনো কিছুকেই প্রকৃত, সুনিশ্চিত অথবা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করে না। এই অনুভূতি যা এনেছে তা হল এক অবর্ণনীয় শান্তি, এক বিস্ময়কর নীরবতা, এক অসীম মুক্তি ও স্বাধীনতা।[১৫] বৌদ্ধেরা যাকে অভিহিত করেন 'নির্বাণ', হিন্দুদের নীরব 'ব্রহ্ম', তৎ, চৈনিকদের 'তাও', পাশ্চাত্যবাসীদের বিশ্বাতীত, পরম নৈর্ব্যক্তিক যা, তার মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ প্রবেশ করলেন সোজাসুজিভাবে। আধ্যাত্মিক জীবনের "শিখর" রূপে বিবেচিত সেই সুবিদিত "মুক্তি" তিনি লাভ করেছিলেন— কারণ, বিশ্বাতীতের পরপারে কী থাকতে পারে? মহান্ ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তিনি এখন পরীক্ষা করে দেখলেন : "যখন আমরা ভগবানের মধ্যে বাস করি জগৎ তখন অদৃশ্য হয়ে যায় ; যখন আমরা এই জগতে বাস করি, তখন ভগবানের অস্তিত্ব আর থাকে না।" জড়তত্ত্ব ও আত্মার মধ্যে যে সেতু নির্মাণের জন্য তিনি প্রচেষ্টা করছিলেন, তাঁর অনাবৃত দৃষ্টির সম্মুখে সেই ব্যবধান পুনর্বার সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয়ে গেল : যেমন এশিয়ায় তেমনই পাশ্চাত্য দেশে অধ্যাত্মবাদীরা যথার্থভাবেই নির্দেশপ্রদান করেন যে, মানবিক প্রয়াসের একমাত্র লক্ষ্য এক বিশ্বাতীত জীবন : স্বর্গ, নির্বাণ বা মুক্তি : *অন্য কোথাও,* কিন্তু এই অশ্রুময় বা মায়াময় উপত্যকায় নয়। এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতি, অখণ্ডনীয়, তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে।

কিন্তু এই অনুভূতি যা চূড়ান্ত বলা হয়, তা ছিল শ্রীঅরবিন্দের জন্য আরম্ভস্থল, নতুন *ঊর্ধ্বতর* অনুভূতির, যা বিশ্বের সত্য ও বিশ্বাতীত সত্যকে একীকৃত করল এক সমগ্র, অবিরাম ও দিব্য সত্যে। আমাদের সম্মুখে আছে এক কেন্দ্রীয় অনুভূতি, যা বুঝে ওঠা আমাদের অস্তিত্বের যথার্থ তাৎপর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কারণ, মাত্র একটিই বিকল্প আছে : সম্ভবত পরম সত্য এই জগতের নয়, যে-কথা এই পৃথিবীর সকল ধর্ম জোর দিয়ে বলেছে, যে-ক্ষেত্রে আমরা সকল ব্যর্থতার মধ্যে আমাদের সময়ের অপচয় করছি, নতুবা, যা-কিছু বলা হয়েছে তাছাড়া অন্য কিছু আছে। প্রশ্নটি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ শুধু এক সিদ্ধান্তের কথা নয়, অনুভূতির কথা। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : *আমি দিনরাত সেই নির্বাণের মধ্যে বাস করেছি, যে পর্যন্ত তা নিজের মধ্যে অন্যান্য বিষয়কে স্বীকার করতে, অথবা নিজেকে পরিবর্তিত করতে আরম্ভ করে নি। এবং শেষে তা ঊর্ধ্ব হতে আগত অতিচেতনার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়া আরম্ভ করল। জগতের মায়াময় দিকটি পরিবর্তিত হয়ে গেল কিছু-একটিতে, যেখানে শুধু এক ক্ষুদ্র বাহ্য ঘটনা এই মায়া, যার পশ্চাতে আছে এক বিরাট দিব্য সত্তা, এবং ঊর্ধ্বে এক পরম দিব্য সত্তা,*

এবং এক তীব্র দিব্য সত্তা প্রত্যেক বস্তুর হৃৎকেন্দ্রে, যা প্রথমে প্রতীয়মান হয়েছিল এক চলচ্চিত্রসম আকৃতি বা ছায়ার মতো। এবং তা ছিল না ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পুনর্বার কোনো কারাবাস, পরম অনুভূতির কোনো হ্রাস বা পতন, তা এসেছিল সত্যের অবিরত উর্ধ্বায়ন ও বিস্তৃতি রূপে। আমার মুক্তচেতনায় নির্বাণ হয়ে উঠল আমার উপলব্ধির প্রারম্ভ পূর্ণতার অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু একমাত্র সম্ভাব্য সত্য উপলব্ধি অবশ্যই নয়, কিংবা চরম পরিণতিও নয়।[১৬]

তাহলে, কী এই বিশ্বাতীত সত্তা যা চরম শিখরে অবস্থিত নয়, বরং এক মাঝামাঝি উচ্চতায় রয়েছে বলে মনে হয়? এক সহজ ও যথার্থ উপমা দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া যেতে পারে। আমরা বলতে পারি, নিদ্রা জাগরণের অতিক্রান্ত এক অবস্থার প্রকাশ, কিন্তু তা উচ্চতর বা সত্যতর নয় ; তা শুধু চেতনার এক অন্যতর অবস্থা। যে মুহূর্তে আমরা মানসিক ও প্রাণিক গতিবৃত্তি হতে প্রত্যাহৃত হই, স্বাভাবিকভাবেই সব-কিছুই অদৃশ্য হয়ে যায় ; যা স্পষ্ট, তদনুযায়ী আমরা আরও বলতে পারি যে, অনুভূতিনাশক ওষুধের সেবনেও আমরা সব বোধ হারিয়ে ফেলি। আমাদের এক স্বাভাবিক প্রবণতার বশে আমরা চিন্তা করি যে, এই নিশ্চল নৈর্ব্যক্তিক প্রশান্তি আমাদের কোলাহল অপেক্ষা উচ্চতর, কিন্তু এই কোলাহল আমাদেরই সৃষ্টি। উচ্চতর বা নিম্নতর হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, সম্পর্ক আছে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে আমাদের চেতনার গুণ ও উচ্চতর সঙ্গে। ঘটনাক্রমে, নির্বাণ সোপানের সর্বোচ্চ সীমায় উপলব্ধ হয় না, যেমন নিদ্রা ও মৃত্যুও হয় না। নির্বাণ উপলব্ধ হতে পারে *আমাদের চেতনার যে-কোনো স্তরে*। তার উপলব্ধি হতে পারে মনে একাগ্রতার মাধ্যমে, প্রাণে একাগ্রতার মাধ্যমে, এমন-কি শারীরিক চেতনায় একাগ্রতার মাধ্যমে : নিজের নাভীর উপর আনত হঠযোগী অথবা স্বীয় প্রতীকের চারধারে নৃত্যরত বাসুটো * হঠাৎ অন্যত্র চলে যেতে পারে, যদি তাই হয়ে থাকে তাদের নিয়তি, অন্য এক বিশ্বাতীত পরিসরে, যেখানে এই সমগ্র জগৎ শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। এমন কিছুই হতে পারে নিজের হৃদয়ে নিমগ্ন রহস্যবাদী বা নিজের মনে ধ্যানমগ্ন যোগীর ক্ষেত্রে। কারণ যখন আমরা নির্বাণ লাভ করি, তখন আমরা কোনো *উচ্চতর* স্তরে যাই না— আমরা শুধু এক রন্ধ্রপথ প্রস্তুত করে বেরিয়ে যাই। যখন শ্রীঅরবিন্দ নির্বাণের উপলব্ধি প্রাপ্ত হলেন, তিনি তখন মানসভূমি অতিক্রম করেন নি : *উর্ধ্বতর আধ্যাত্মিক ভূমিসকলের বিষয়ে জ্ঞানলাভের বহুপূর্বে আমার নির্বাণ নীরব ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়েছিল।*[১৭] নির্বাণ অপেক্ষা উন্নততর অনুভূতি তিনি লাভ করলেন উর্ধ্বতর অতিচেতনার স্তরগুলিতে ওঠার পর, যেখানে মায়াবাদীর নিশ্চল নৈর্ব্যক্তিক দিক্‌সমূহের সংমিশ্রণ হল এক নতুন পরমতত্ত্বে যা এই বিশ্ব এবং

* দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বতন বাসুটোল্যাণ্ড বা অধুনাতন Lesothoর আদিম অধিবাসী।

বিশ্বাতীত উভয়ের যা-কিছু সকলকেই সাদরে গ্রহণ করে। এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের প্রথম আবিষ্কার। নির্বাণ হতে পারে না পথের শেষ, যার পর আর কিছু আবিষ্করণীয় নেই। এ হল নিম্নতর প্রকৃতির মাধ্যমে নিম্নতর পথের শেষ এবং ঊর্ধ্বতর বিবর্তনের আরম্ভ।[১৮]

অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে আমরা বিস্মিত হতে পারি এই প্রশ্ন নিয়ে যে, সত্যই কি বিবর্তনের লক্ষ্য বাইরে চলে যাওয়া, যেমন বিশ্বাস করেন নির্বাণ ও সকল ধর্মের মতানুসারীরা, যাঁরা বিশ্বাতীতকেই আমাদের লক্ষ্য নির্ধারিত করেছেন? কারণ, আমাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যে-সব ভাবালুতা-বিজড়িত কারণের উপর নির্ভর করে, আমরা যদি তাদের ভুলে যাই এবং দৃষ্টিপাত করি বিবর্তনের প্রক্রিয়ার উপর, তখন আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, প্রকৃতি এই "বাইরে চলে যাওয়া"র দিক্‌টিকে সহজসাধ্য করতে পাবত, যখন আমরা প্রারম্ভিক মানসিক স্তরে সহজাত-প্রবৃত্তি-প্রেরিত অন্তর্বোধ নিয়ে এক উন্মুক্ত ও নমনীয় জীবন যাপন করতাম। বৈদিক যুগ, প্রাচীন গ্রীসের রহস্যময় যুগ, এমন-কি আমাদের মধ্যযুগের মানবজাতি এই "বাইরে চলে যাওয়ার" নিকটতর ছিল, আমাদের অপেক্ষা; এবং সত্যই যদি এই লক্ষ্য থাকত বিবর্তনীয় প্রকৃতির —ধরে নেওয়া যাক, বিবর্তন বিশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর না হয়ে যোজনাবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়-- তাহলে, সেইপ্রকার মানুষের জন্যই প্রকৃতি প্রেরণা দিত। তাহলে, তাই সহজ হত, যেমন শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন তাঁর *Human Cycle*এ [*"মানব যুগচক্র"-গ্রন্থে*], *বুদ্ধিকে ডিঙিয়ে*[১৯] সহজ প্রবৃত্তি-প্রেরিত অন্তর্বোধ হতে অন্যজাগতিক আধ্যাত্মিকতায় চলে যাওয়া। যদি বিবর্তনের লক্ষ্য হয় শুধুই নিষ্ক্রমণ, তাহলে বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নিষ্প্রয়োজন এক অতিবৃদ্ধি। অন্যপক্ষে, মনে হয় যেন প্রকৃতি এই আদিম অন্তর্বোধকে নিরুৎসাহিত করেছে, ও তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে মনের এক স্থূল আবরণের সাহায্যে, যা ক্রমবর্ধমানভাবে অনুপযুক্ত। আমরা ভালোভাবেই জানি, ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে উপনিষদীয় ভারতের বা আধুনিক যুগের আরম্ভে নিও-প্ল্যাটোনিক গ্রীসের বিস্ময়কর অন্তর্বোধের প্রস্ফুটন কীভাবে অবনমিত হয়েছিল, পথ মুক্ত করে দিয়ে এক মানবীয় মানসীকরণের জন্য, যা নিঃসন্দেহে ছিল উচ্চতায় ন্যূনতর, বরং কিছুটা বুদ্ধিতেও ন্যূনতর, কিন্তু অধিকতর সর্বজনীন। আমরা শুধু প্রশ্নটি উত্থাপন করতে পারি, সমাধানের জন্য প্রয়াস না ক'রে। বিস্মিত হয়ে আমরা ভাবি, সত্যই বিবর্তনের অর্থ মনের বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পরে তাকে নষ্ট করে দেওয়া এবং প্রত্যাবর্তন করা এক অবমানস বা মনহীন ধার্মিক স্তরে, কিংবা পক্ষান্তরে, এর অর্থ নয় কি মনের বিকাশসাধন করা তার চরম সীমা * পর্যন্ত, বিবর্তন আমাদের

* আমরা নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলব যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগ চায় মনকে অতিক্রম

যেভাবে প্রেরিত করছে সেই ভাবে, যে পর্যন্ত না মন তার ক্ষুদ্রতা ও বাইরের বিশৃঙ্খলা হতে মুক্ত হয়ে অভ্যুদিত হয় তার উচ্চতর ও অতিচেতন ক্ষেত্রসমূহে, এমন এক আধ্যাত্মিক এবং অতিমানসিক স্তরে, যেখানে জড় ও আত্মার বিরোধ মৃগতৃষ্ণার মতো বিলীন হয়ে যাবে, এবং যেখানে বাইরে চলে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না, কারণ আমরা সর্বত্রই অন্তরে বিরাজিত হব।

যাই হোক, একথা চিন্তা করা ভুল হবে যে, নির্বাণের অনুভূতি এক মিথ্যা অনুভূতি, একপ্রকার মায়াময় মায়া। কারণ কোনো মিথ্যা অনুভূতি নেই, আছে শুধু অসম্পূর্ণ অনুভূতি, এবং তারপর নির্বাণ আমাদের মুক্তি দেয় মায়া হতে। জগৎকে দেখার যে অভ্যাসগত প্রণালী তা খণ্ডিত। তা একপ্রকারের দৃষ্টির বিভ্রান্তি যা বাস্তবধর্মী, জলের মধ্যে ঈষৎ নিমগ্ন লাঠি যেমন ভাঙা দেখা যায়, তেমনই বাস্তবিক, কিন্তু ঠিক ততটাই ভ্রান্তিপূর্ণ। উইলিয়াম ব্লেক্ বলেছিলেন, আমাদের "প্রত্যক্ষীকরণের দ্বারগুলি নিশ্চয়ই পরিষ্কার করতে হবে" এবং পরিষ্করণের এই কাজে নির্বাণ আমাদের সাহায্য করে, যদিও কিছুটা আমূলভাবে। আমরা এক সমতল ত্রিপরিসরবিশিষ্ট জগৎ দেখি, যেখানে অগণিত জীব ও বস্তু বিদ্যমান, যারা একে অন্য হতে *পৃথকীকৃত*, যেমন জলে লাঠির দুভাগ দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যায় যখন আমরা আরোহণ করি এক উচ্চতর স্তরে, অতিচেতনায়, ঠিক যেমন বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়, যখন আমরা অবতরণ করি এক নিম্নতর স্তরে, আণবিক স্তরে। ভাঙা লাঠি ও আমাদের অভ্যাসগত জাগতিক দৃষ্টির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, প্রথমটি শুধু এক দৃষ্টি বিভ্রম, কিন্তু পরবর্তীটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা জিদ ধরি লাঠিটিকে ভাঙা দেখবার জন্য, কিন্তু ভাঙা নয় তা। আমাদের বর্তমান সময়ের ব্যবহারিক জীবন তথা অগভীর বহিঃস্তরে আমাদের অস্তিত্বের বিকাশের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি উপযোগী এবং তা হয়তো এই বিভ্রান্তিকে প্রতিপাদিত করে, কিন্তু সেই হল কারণ, যেজন্য আমরা জীবনকে নিয়ন্ত্রণাধীন করতে অসমর্থ, কেননা, ভ্রান্তিময় দৃষ্টির অর্থ ভ্রান্তিময় জীবন। যা আপাত-প্রতীয়মান, তাতে বৈজ্ঞানিক ব্যাহত হন না, সেজন্য তাঁর দৃষ্টি উন্নততর, এবং নিয়ন্ত্রণও উন্নততর। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিও অসম্পূর্ণ, এবং নিয়ন্ত্রণও অসম্পূর্ণ। জীবনকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন নি, এমন-কি প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকেও নিয়ন্ত্রিত করেন নি, কিন্তু শুধুই ব্যবহার করেছেন তাদের কিছু প্রভাবকে যে-সব অব্যবহিতভাবে সুস্পষ্ট। দৃষ্টির প্রশ্ন শুধুই এক ব্যক্তিগত

কবতে, এবং তা আরম্ভ হওয়ার কথা বুদ্ধি তার সকল সম্ভাব্য পথে গতি সমাপ্ত করবার পর, এবং আমরা লক্ষ্য করব যে, সকল মধ্যবর্তী স্তরের মধ্য দিয়ে গতি না করা পর্যন্ত তা সম্ভব হবে না। "মানসিক নীরবতা" স্পষ্টত অর্থহীন, ফিজি দ্বীপপুঞ্জের একজন আদিম অধিবাসীর জন্য, বা *ব্রিটানির একজন কৃষকের জন্যও।*

সন্তোষের প্রশ্ন নয় : লাল নীল বর্ণের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখবার জন্য (যা খুব উচ্চস্তরে ঘটে না) আরও বেশি ভালো করে দেখবার বিষয় নয় এ, এ বিষয় হল এক প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা জগৎ তথা ঘটনাচক্রের উপর এবং আমাদের নিজেদের উপর, যা একই কথা, কারণ কোনো কিছুই ভিন্ন নয়। এ পর্যন্ত যাঁরা এই ঊর্ধ্বতর দৃষ্টিশক্তি (যার অনেক স্তর আছে) উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা তার ব্যবহার করেছেন মুখ্যত নিজেদের জন্যই, কিন্তু তাঁরা যা দেখেছিলেন তার অবতারণে অসমর্থ হয়েছিলেন ; তার প্রধান কারণ এই যে তাঁদের সমগ্র প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল এই জন্ম হতে নিষ্ক্রমণ। কিন্তু এমন এক কুয়াশাচ্ছন্ন মনোভাব অপরিহার্য নয়, তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। এই সমগ্র শাবীরিক, প্রাণিক, মানসিক ও চৈত্ত ভিত্তি বৃথাই প্রস্তুত করেন নি তিনি।

সুতরাং সাধারণ দৃষ্টি হতে অন্যতর দৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়নে নির্বাণ, অপরিহার্য না হলেও, উপযোগী এক অন্তর্বর্তী স্তর। আমরা যে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করি, তা থেকে এ আমাদের মুক্তি দেয়। মৈত্রী উপনিষদের বাণী : "*যেন এক মায়ার আবেশে তারা মিথ্যাকে দেখে সত্যরূপে*", (৭ : ১০)। শ্রীঅরবিন্দ 'মায়া' শব্দটি ব্যবহার করেন নি, তিনি শুধু বলতেন আমরা বাস করি *অজ্ঞানতার* মধ্যে। আমাদের অজ্ঞানতা হতে নির্বাণ আমাদের পরিত্রাণ করে, কিন্তু তা আমাদের নিয়ে যায় অন্য এক অজ্ঞানতায়, কারণ মানুষের চিরকালের সমস্যা এই যে, মানুষ এক চরম প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যায়, এবং একটির সমর্থনের জন্য অন্যটিকে অস্বীকার ক'রে সর্বদা নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। এইভাবে এই অন্তর্বর্তী স্তরটিকে শেষ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেমন হয়েছে অন্যান্য অনেক মহান্ আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে। কিন্তু কোনো শেষ নেই, *শুধু আছে একই সত্যের অবিরাম ঊর্ধ্বায়ন ও বিস্তৃতি।*[২০] দৃষ্টি যখন নিবদ্ধ বিশ্বাতীতে, আমরা বলতে পারি যে নির্বাণের স্তর বা সাধারণত ধার্মিক স্তর বিবর্তনের এক প্রাথমিক স্তরেরই প্রতিনিধিত্ব করে : এর উপযোগিতা মুখ্যত শিক্ষামূলক। জাগ্রত যে মানব, যে প্রকৃত নবজন্ম লাভ করেছে, তার প্রস্তুত হওয়া উচিত পরবর্তী বিবর্তনীয় স্তরের জন্য, অন্য জগতের প্রতি একাগ্র ধার্মিক মানবকে পরিত্যাগ করা উচিত পূর্ণতার প্রতি একাগ্র আধ্যাত্মিক মানবের জন্য। তাহলে কিছুই আর বহিষ্কৃত হয় না, সব-কিছু প্রসারিত হয়ে যায়। সুতরাং পূর্ণযোগের সাধকের সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ সকল আন্তর অনুভূতি আমাদের সত্তার অন্তরতম উপাদানটিকে স্পর্শ করে, এবং যখন তারা তীব্রভাবে সমুজ্জ্বল —স্বামী বিবেকানন্দ নির্বাণের বিষয়ে যা বলেছেন তা স্মরণীয় : অসীম প্রশান্তির এক মহাসমুদ্র, যেখানে কোনো তরঙ্গ নেই, কোনো সঞ্চরণ নেই"— তাকে শেষ পোতাশ্রয় মনে করে সেখানে নঙ্গর ফেলবার জন্য রয়েছে এক বিরাট প্রলোভন। সকল সাধকের জন্য শ্রীমায়ের এই উপদেশ উল্লেখনীয় : *কোনো এক অনুভূতির*

প্রকৃতি, শক্তি অথবা তার চমৎকারিতার বোধ যেমনই হোক-না-কেন, তুমি কখনো তার এত প্রভাবাধীন হবে না যে, তোমার সমগ্র সত্তা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করবে। যখন তুমি কোনোভাবে তোমার অপেক্ষা অধিকতর কোনো এক শক্তি বা চেতনার সংস্পর্শ লাভ করো তাহলে, সম্পূর্ণভাবে সেই চেতনা বা শক্তির অধীনতা স্বীকার করবার পরিবর্তে তোমার সব সময় মনে রাখা উচিত যে, হাজার হাজার অন্যান্য অনুভূতির মধ্যে এ শুধুই একটি, এবং সেজন্য তা চূড়ান্ত নয়। যত সুন্দরই তা হোক-না -কেন, তার চেয়ে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অনুভূতি তুমি পেতে পারো ও নিশ্চয় পাবে ; যত অসাধারণই তা হোক, তার চেয়ে আরও অধিক বিস্ময়জনক অনুভূতি অনেক আছে, এবং তা যতই উচ্চতর হোক-না-কেন, তার চেয়ে আরও অনেক বেশি উর্ধ্বে তুমি ভবিষ্যতে উঠতে পারবে।

অন্য কোথাও নিজেকে প্রকাশ করবার পূর্বে, শ্রী অরবিন্দ মাস মাস ধরে এই নির্বাণের অবস্থায় বাস করেছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই অবস্থার মধ্যেও তিনি ক্রমাগত এক দৈনিক পত্রিকার প্রকাশনায়, গুপ্ত-বৈঠকে যোগদানে, এমন-কি, রাজনৈতিক বক্তৃতাপ্রদানেও সমর্থ ছিলেন। বোম্বেতে, প্রথমবার যখন তাঁকে বক্তৃতা দিতে হল, লেলে-কে তিনি তাঁর অসুবিধা ব্যক্ত করলেন : *তিনি আমাকে প্রার্থনা করতে বললেন, কিন্তু নীরব ব্রহ্মচেতনায় আমি এতোই সমাহিত হয়েছিলাম যে, আমি প্রার্থনা করতে পারলাম না। তিনি বললেন যে, তাতে কিছু যায় আসে না। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে তিনি প্রার্থনা করবেন, এবং শুধু সভায় যাব এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে নারায়ণ মনে করে নমস্কার-পূর্বক অপেক্ষা করব ; তারপর বক্তৃতা আসবে, মন ভিন্ন অন্য এক উৎস হতে।*[২১] যেমন তাঁকে বলা হয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দ তেমনই করলেন, এবং বক্তৃতা নেমে এল শ্রুতলিখনের মতো। *এবং সেই সময় হতে সর্বদা সকল বক্তৃতা, লেখা, চিন্তা ও বাইরের কাজকর্ম আমার আছে এসেছে মস্তিষ্কগত মনে উর্ধ্বস্থ সেই একই উৎস হতে।*[২২] শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কস্থাপন করেছিলেন অতিচেতনার সঙ্গে। তাছাড়া, বোম্বেতে দেওয়া এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু স্মরণযোগ্য ; জাতীয়তাবাদী যোদ্ধৃগণকে তিনি বলেছিলেন : *তোমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করো, যেন যা-কিছু তুমি করছ, তা তোমার নিজের কৃত কর্ম না হয়ে হতে পারে তোমার অন্তর্নিহিত সত্যের কৃত কর্ম। কারণ এ তুমি নও, তোমারই অন্তঃস্থ কিছু। এইসব বিচারসংস্থা, জাগতিক এইসব শক্তি তাঁর কীই বা করতে পারে, যিনি তোমার মধ্যে নিহিত? অমৃতময় তিনি, অজাত, মৃত্যুহীন, তরবারির অচ্ছেদ্য, অগ্নির অদাহ্য। কারাগার তাঁকে বন্দী করতে পারে না, ফাঁসিও তাঁকে সমাপ্ত করতে পারে না। তোমার অন্তরে নিহিত তাঁর সম্বন্ধে তুমি যখন সচেতন, তখন এমন কী আছে, যাকে তুমি ভয় করতে পারো?*[২৩]

১৯০৮, মে ২-এর উষাকালে, ব্রিটিশ পুলিশ বন্দুক হাতে এসে তাঁকে শয্যা হতে জোর করে ওঠাল। শ্রীঅরবিন্দের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। কলকাতার একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের জীবননাশের এক উদ্যম ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যবহৃত বোমা তৈরি হয়েছিল সেই বাগানে, যেখানে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন "শিষ্যদের" প্রশিক্ষণ দিতেন।

১১

একত্ব

শ্রীঅরবিন্দকে সম্পূর্ণ একটি বছর আলিপুর জেলে অতিবাহিত করতে হয়েছিল, রায়ের অপেক্ষায়। ব্যর্থ হত্যা-উদ্যমটিতে তাঁর কোনো হাতই ছিল না ; বৈপ্লবিক সংগঠনের সঙ্গে কোনো স্বতন্ত্র সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক ছিল না। *যখন আমাকে গ্রেপ্তার করে অতি শীঘ্রতার সঙ্গে লালবাজার পুলিশ থানায় নেওয়া হল, তখন কিছু সময়ের জন্য আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়ে গেল, কারণ ভগবানের উদ্দেশ্যের মর্মটি আমি দেখতে পারি নি। সে কারণে, ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হয়ে আমার অন্তরে ব্যাকুল হযে তাঁকে বললাম : "এ আমার কী হল? আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে আমার দেশবাসীর জন্য এক বিধিনির্দিষ্ট কাজই আমার লক্ষ্য, এবং সে কাজ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার সুরক্ষায় থাকব। তাহলে আমাকে এখানে আসতে হল কেন, ও এমন এক অভিযোগে?" একদিন চলে গেল, দ্বিতীয় দিন, ও তারপর তৃতীয় দিনও, তখন অন্তর হতে এক বাণী আমি শুনতে পেলাম, "অপেক্ষা করো, দেখো"। আমি তখন শান্ত হয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপর, আমাকে লালবাজার থেকে আলিপুর নেওয়া হল, এবং সেখানে আমাকে অন্য লোকেদের থেকে আলাদা এক নির্জন কক্ষে রাখা হল। সেখানে আমি দিনরাত অপেক্ষা করলাম অন্তরস্থ ভগবানের বাণীর জন্য, জানবার জন্য*

তাঁর কী নির্দেশ আমার প্রতি, কী কী করতে হবে তা জানবার জন্য। তখন আমার মনে পড়ল যে, আমার গ্রেপ্তারের একমাস বা আরও কিছুদিন পূর্বে, একটি অন্তর্নির্দেশ এসেছিল আমার প্রতি, সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একান্তবাস করে নিজের মধ্যে দৃষ্টিপাত করবার জন্য, যেন আমি ভগবানের সঙ্গে এক অন্তরতম সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারি। আমার দুর্বলতাবশত আমি নির্দেশটিকে গ্রহণ করতে পারি নি। আমার কাজ আমার খুবই প্রিয় ছিল, এবং হৃদয়ের গর্বের সঙ্গে আমি ভাবতাম যে আমার অভাবে কাজটি ব্যাহত হতে পারে, এমন-কি নিষ্ফলও হয়ে যেতে পারে। সেজন্য, আমি কাজটি ছাড়তে পারব না। আমার মনে হল তিনি আবার আমাকে বললেন, যে-সকল বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার নেই, আমি তা ছিন্ন করে দিয়েছি, কারণ আমার সংকল্প নয় এ, বা অভিপ্রায়ও কখনো ছিল না যে তা অব্যাহত থাকবে। তোমার জন্য অন্য এক কাজ আমি নির্দিষ্ট করেছি এবং সেজন্য আমি তোমাকে এখানে এনেছি, যা তুমি নিজে শিখতে পারো নি তাই শেখাবার জন্য, এবং আমার কাজের উপযুক্ত করে তোমাকে প্রস্তুত করবার জন্য।*[১] এই কাজটি হল বিশ্বচেতনা বা একত্বের উপলব্ধি, এবং সাধারণ মনের ঊর্ধ্বে স্থিত চেতনার সকল ভূমির— *অতিচেতনের*— আবিষ্কার, যা শ্রীঅরবিন্দকে উপনীত করবে *মহান্ রহস্যের পথে। সে সময়ে আমার কী কী ঘটল তা বলবার প্রেরণা আমি পাচ্ছি না, শুধু এই কথা বলতে পারি যে, দিনের পর দিন তিনি আমাকে দেখালেন তাঁর সকল বিস্ময়জনক রহস্য। আমার কারাবাসের বারোটি মাসের দিনের পর দিন তিনি সেই জ্ঞান আমাকে প্রদান করলেন।*[২]

বিশ্বচেতনা

মাস মাস ধরে শ্রীঅরবিন্দ বাস করেছিলেন এক স্থাণু, বিশ্বাতীত বাস্তব সত্যের পৃষ্ঠভূমির উপর রচিত একপ্রকার ছায়াময় শূন্যগর্ভ স্বপ্নের মধ্যে। যাই হোক, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই মহাশূন্যের মধ্যে, এবং প্রতীয়মানভাবে এ থেকে উদ্‌ভূত হয়ে, জগৎ পুনর্বার এক নতুন মুখ নিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হল, যেন প্রত্যেকবার সব-কিছুই হারাতে হবে আবার তাকে এ উচ্চতর স্তরে ফিরে পাওয়ার জন্য : *পরাভূত, পরাজিত, নিস্তব্ধ মন নিজের থেকে মুক্ত হয়ে নীরবতাকেই পরম তত্ত্ব বলে গ্রহণ করে। কিন্তু পরে সাধক আবিষ্কার করেন যে, সেই নীরবতার মধ্যে সব-কিছু বিধৃত হয়ে আছে, কিংবা নবনির্মিত হয়ে আছে। তখন সেই শূন্য পূর্ণ হতে আরম্ভ করে, তা থেকে আবির্ভূত হয়, বা তার মধ্যে*

* ভারতের স্বাধীনতার কাজ।

ধাবমান হয় বহুধা ভাগবত সত্য, এক ক্রিয়াশীল অসীমের সকল বিভাব ও অভিব্যক্তি এবং বহুবিধ স্তর।[৩] শুধুমাত্র এক স্থাণু অসীমকে উপলব্ধি করে, আমরা ভগবানের শুধু একটি মুখই দর্শন করেছি, এবং তাঁকে জগৎ হতে পৃথক করে দিয়েছি (যে জগৎকে আমরা ভগবদ্‌বিহীন বলে ঘোষণা করেছি তা বোধ হয় উৎকৃষ্টতর সেই জগৎ হতে, যা পরিপূর্ণ এক গম্ভীর ও শান্তিদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বে), কিন্তু একবার যখন নীরবতা আমাদের ছোটো-বড়ো সকল গাম্ভীর্যকে বিধৌত করে দেয়, এবং সাময়িকভাবে তার শুভ্রতা দিয়ে আশ্চর্যচকিত করে দেয়, আমরা তখন আবার জগৎ ও ভগবান্‌কে একত্র পাই, সকল স্তরে ও সকল বিন্দুতে, যেন তাঁরা কখনও বিচ্ছিন্ন হন নি, শুধু জড়বাদ বা অধ্যাত্মবাদের কিছু আতিশয্যের কারণ ব্যতীত। আলিপুর জেলের প্রাঙ্গণে, ব্যায়ামের সময়ে, চেতনার এই নতুন পরিবর্তন সংঘটিত হল : *যে কারাগার অন্য মানুষদের থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম, দেখলাম আমি আর এর উচ্চ প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ নই ; না, স্বয়ং বাসুদেব* আমাকে পরিবেষ্টিত করেছেন। আমার প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ বৃক্ষের নিম্নে আমি পদচারণা করতাম, কিন্তু আমি জানতাম সে আর বৃক্ষ ছিল না, ছিলেন বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ * সেখানে দাঁড়িয়ে আমার উপর তাঁর ছায়া বিস্তার করে আছেন। আমার প্রকোষ্ঠের গরাদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম সেই লোহার জালকে যা দরজার কাজ করত এবং আবার দেখলাম বাসুদেবকে। স্বয়ং নারায়ণ* প্রহরী রূপে দাঁড়িয়ে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। যে কর্কশ কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শায়িত হয়ে অনুভব করতাম শ্রীকৃষ্ণের বাহু আমাকে আলিঙ্গন করে আছে, আমার বন্ধু ও অনুরাগীর বাহু। জেলে যে-সব কয়েদী ছিল, চোর, খুনী, ঠক, তাদের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করলাম, এবং যখন আমি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম, তখন দেখলাম বাসুদেবকে, দেখলাম নারায়ণকে এই-সব তমোগ্রস্ত আত্মা ও কলুষিত শরীরের মধ্যে।*[৪] এই অনুভূতি শ্রীঅরবিন্দকে কখনও পরিত্যাগ করে নি। যে ছ-মাস ধরে তাঁর বিচার চলেছিল, তার দুশোর বেশি সাক্ষী ও চার হাজার প্রামাণিক তথ্যের সঙ্গে, শ্রীঅরবিন্দ সে-সময় প্রতিদিন বিচার-কক্ষের মধ্যে লোহার খাঁচায় বন্দী থাকতেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে লোকের ভিড় আর ছিল না প্রতিকূল, কিংবা বিচারকেরাও তা ছিলেন না : বিচার যখন আরম্ভ হল, সেই একই অন্তর্দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করল। ভগবান্ আমাকে বললেন, *যখন তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে, তখন কি তোমার হৃদয় ভেঙে পড়ে নি, এবং তুমি কি ব্যাকুল হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করো নি, কোথায় তোমার রক্ষাকারী শক্তি? এখন তাকিয়ে দেখো ম্যাজিস্ট্রেটকে, প্রসিকিউটিং কাউন্সেলরকে। দৃষ্টিপাত করে*

* ভগবানের বহুনামের কয়েকটি, যা অধিকাংশ ভারতীয় জানেন।

যাঁকে দেখলাম, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট নন, তিনি বাসুদেব, তিনি নারায়ণ, যিনি বিচারকের আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রোসিকিউটিং কাউন্সেল্-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে যাঁকে দেখলাম, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আসীন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনও কি তুমি ভয় পাচ্ছ?" তিনি বললেন, "আমি সকল মানুষের মধ্যেই আছি এবং তাদের কর্ম ও বাক্য আমিই অধিনিয়ন্ত্রণ করি।"[৫] কারণ, সত্যই ভগবান্ তাঁর বিশ্বের বহির্ভূত নন, তিনি বিশ্ব "সৃষ্টি" করেন নি— তিনিই বিশ্ব *হয়ে উঠেছেন,* যা উপনিষদে বলা হয়েছে : "তিনিই হয়েছেন বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান। তিনিই হয়েছেন সত্য এবং অনৃত। তিনিই এ সব-কিছু যা বিদ্যমান।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২/৬)। "এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত সকল সত্তার দ্বারা, যারা তাঁরই অবয়ব," বলা হয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪/১০)। *দৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষুর জন্য সকলই সেই এক, দিব্য অনুভূতির জন্য সবই ভগবানের এক ঘনবিন্যস্ত রূপ।*[৬]

হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারি যে, এ হল বিশ্বের এক সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যা বাস্তবতা হতে বহুদূর : প্রত্যেক পদক্ষেপে আমরা কুৎসিততা ও অশুভের সম্মুখীন হই ; এই জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ, অন্ধকারেব মধ্যে ক্রন্দনধ্বনিতে পরিপ্লুত— এ-সবের মধ্যে ভগবান্ কোথায়? ভগবান্ই কি এই বর্বরতা, যা সর্বদাই প্রস্তুত তার যন্ত্রণার শিবির শুরু করবার জন্য? যা এই হীনপ্রবৃত্তি অহংকার, এই দুর্বৃত্তি, সংগুপ্ত অথবা প্রকাশ্য? ভগবান এ-সব অপরাধ হতে বিমুক্ত, বিশুদ্ধ, তিনি পূর্ণ, তিনি এ-সব হতে পারেন না— *নেতি, নেতি* —ভগবান এতই পবিত্র যে তিনি জগতেরই নন ; আমাদের এসব শ্বাসরোধকারী মলিনতায় তাঁর স্থান নেই! *অস্তিত্বকে আমরা অবশ্যই মুখোমুখি দেখব, যদি আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে এক যথার্থ সমাধানে উপনীত হওয়া, সে সমাধান যাই হোক। এবং অস্তিত্বকে মুখোমুখি দেখার অর্থ ভগবান্কে মুখোমুখি দেখা। কারণ উভয়কে পৃথক করা যেতে পারে না। আমাদের সংঘর্ষ ও শ্রমে পূর্ণ এই জগৎ এক হিংস্র বিপদপূর্ণ ধ্বংসাত্মক আগ্রাসী জগৎ, যেখানে জীবনের অস্তিত্ব নিরাপত্তাবিহীন, এবং মানুষের আত্মা ও শরীর অসংখ্য সংকটের মধ্য দিয়ে গতি করে ; এ এমন এক জগৎ, যেখানে সম্মুখে প্রতি পদক্ষেপে, আমরা চাই কি না চাই, কিছু একটা চূর্ণ হয়, ভগ্ন হয়, যেখানে জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস মৃত্যুরও নিশ্বাস। আমাদের কাছে যা-কিছু অশুভ বা ভয়ংকর মনে হয় তার দায়িত্ব কোনো অর্ধ-সর্বশক্তিমান শয়তানের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া, কিংবা বিশ্বপ্রকৃতি ও দিব্যপ্রকৃতির মধ্যে এক অলংঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে তাকে প্রকৃতির এক অংশ মনে করে এক পাশে সরিয়ে রাখা, যেন প্রকৃতি ভগবানের অনধীন, অথবা দায়িত্ব মানুষের ও তার পাপের উপর নিক্ষেপ করা, যেন এই জগতের সৃষ্টিতে তার ছিল এক অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন মতপ্রকাশের অধিকার, বা তার ছিল সামর্থ্য*

ভগবৎসংকল্পের বিরুদ্ধে কোনো কিছু সৃষ্টি করবার— এ-সব হল সান্ত্বনার জন্য অপটু কৌশল। ন্যায়, পুণ্য ও যাথার্থ্যের সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের নৈতিক ধারণা অনুসারে আমরা কল্পনা করি এক প্রেমময় কৃপাময় ভগবানের, এক মঙ্গলময় ভগবানের, এক ন্যায়বান যথার্থবাদী পুণ্যবান ভগবানের এবং তারপর অবশিষ্ট যা-কিছু তা তিনি নন বা তাঁর নয়, বরং তার সৃষ্টি হয়েছিল কোনো নারকীয় শক্তির দ্বারা, যাকে ভগবান কোনো কারণে সহ্য করে তার দুষ্ট সংকল্প-সাধনের অনুমতি দিয়েছেন, কিংবা তার সৃষ্টি হয়েছিল কোনো এক অন্ধকারময় অহ্রিমন্ দ্বারা, যে আমাদের পরমকৃপাময় অর্‌মুজ্‌দ্-এর সমশক্তিসম্পন্ন বিরোধী, অথবা তা এ স্বার্থপর পাপী মানুষের ভুল, যে-মানুষ ভগবানের সর্বাঙ্গসুন্দর মূল সৃষ্টিকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। সাহসের সঙ্গে আমাদের সম্মুখীন হওয়া উচিত বাস্তবের, এবং দেখা উচিত, ভগবানই তাঁর সত্তায় এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন অন্য কেউ নয়, এবং তিনি তাঁকে এমনই সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেখা উচিত যে প্রকৃতি দ্বারা তার সন্তানদের গ্রাস, কাল-দ্বারা প্রাণীদের জীবন-গ্রহণ, বিশ্বময় অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, মানুষের ও প্রকৃতির মধ্যে স্থিত রুদ্রশক্তির হিংস্রলীলা— এ-সকলও পরম ভগবৎসত্তার বিশ্বময় অভিব্যক্তির একটি দিক। আমাদের দেখা উচিত যে ঐশ্বর্যময় ও অমিতব্যয়ী সৃষ্টিকর্তা যে ভগবান, সাহায্যকারী, শক্তিশালী ও উদার পালনকর্তা যে ভগবান, তিনিই সেই ভগবান যে সর্বগ্রাসী ও ধ্বংসকারী। আনন্দ, মাধুর্য ও সুখ যতটুকু তার স্পর্শ, ততটুকুই তাঁর স্পর্শ ব্যথা ও অমঙ্গলের এই আসনের যন্ত্রণা, যে-আসনে আমরা অবস্থাপিত। যখন আমরা সম্পূর্ণ ঐক্যের দৃষ্টিতে এই সত্য দেখতে পারব, তখনই আমরা সেই মুখোশের অন্তরালে আবিষ্কার করব আনন্দময় ভগবানের প্রশান্ত ও সুন্দর মুখমণ্ডল, এবং এই স্পর্শে, যা আমাদের অপূর্ণতার পরীক্ষা নেয়, আমরা আবিষ্কার করতে পারব মানুষের আত্মার নির্মাতা বন্ধুর স্পর্শ। জগতের যত বৈষম্য, তা ভগবানেরই বৈষম্য, এবং তাদের গ্রহণ করে ও তাদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই আমরা উপনীত হতে পারব তাঁর পরম সুষমার বৃহত্তর সমন্বয়ে, তাঁর বিশ্বাতীত শিখরসমূহে ও রোমাঞ্চকর বিস্তৃতিতে, এবং তাঁর বিশ্বময় দিব্য আনন্দে। কারণ, সত্য প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি, এবং সাহস তার অন্তরাত্মা।[৭]

এইভাবে নিরাময় হবে ক্ষতটি যা মনে হয়েছিল চিরদিনই জগৎকে দ্বিধাবিভক্ত রাখবে শয়তান ও স্বর্গের মধ্যে, যেন আর কিছুই নেই আমাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ ছাড়া, এবং মন্দ ও ভালো ছাড়া, *যেন কোনো শিশুকে আদর করা হয় এবং বেত্রাঘাতও করা হয় নৈতিক পথে নেওয়ার জন্য।*[৮] সকল দ্বৈতবোধই অজ্ঞানতাময় দৃষ্টি। সর্বত্র বিদ্যমান শুধু *সেই সংখ্যাতীত এক*[৯] এবং বিদ্যমান "ভগবানের বৈষম্য", যা আমাদের অন্তরে নিহিত ভগবানের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে। এবং তারপরও, পরম পূর্ণতা ও এই অপূর্ণতার মধ্যে,

যদিও দিব্য হতে পারে তা, এক ব্যবধান রয়ে যায়। এই যে বিশ্বময় ঈশ্বর, তিনি কি হ্রাসপ্রাপ্ত নন? আমরা কি অন্যত্র সন্ধান করব না, এক নিষ্কলুষ বিশ্বাতীত ও পূর্ণ ঈশ্বরের জন্য? *যদি আধ্যাত্মিক জীবন ও জাগতিক জীবনের মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকে, এখানে সেতু নির্মাণ করে সেই ব্যবধান দূর করবার জন্যই পূর্ণযোগের সাধকের অস্তিত্ব, এখানে সেই বিরোধ সুসংগতিতে পরিবর্তিত করবার জন্যই তাঁর অস্তিত্ব ; যদি জগৎ শাসিত দৈহিক ক্ষুধা ও শয়তানের দ্বারা, তাই হল বৃহত্তর কারণ যে জন্য অমৃতের সন্তানগণ এখানেই অবস্থিত হয়ে জগৎকে অধিকার করবেন ভগবানের জন্য, পরমাত্মার জন্য। যদি জীবন এক উন্মত্ততা, তাহলে কত শত লক্ষ আত্মা আছে যাদের নিকট ভাগবৎ বিচারশক্তির আলোক নিশ্চয়ই আনতে হবে ; যদি তা স্বপ্ন হয়ে থাকে, তাহলে অসংখ্য স্বপ্নদর্শীর নিকট তা বাস্তব বলেই মনে হয়, যাদের নিশ্চয়ই নিয়ে আসা উচিত হবে মহত্তর স্বপ্ন দেখবার জন্য, না হলে জাগরিত হওয়ার জন্য ; কিংবা যদি এ মিথ্যা, তাহলে যারা মোহাবিষ্ট, তাদের প্রদান করতে হবে সত্য।*[১০]

কিন্তু আমাদের মন এখনও অস্থির। এ-সব অমঙ্গল ও দুঃখের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখবার জন্য হয়তো আমরা স্বীকৃতিপ্রদান করতে পারি ; যে অন্ধকারময় শত্রু আমাদের নিগৃহীত করছে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই শক্তির নির্মাণকারী, যেন কর্মকার সংগোপনে আমাদের চেতনাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে যথার্থ আকৃতি প্রদান করছেন, তা হয়তো আমরা বুঝতে পারি ; এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে আমরা আলোকের সেনানী হওয়ার জন্য স্বীকৃতিপ্রদান করতে পারি, প্রাচীন ঋষিদের মতো, কিন্তু প্রথম কথা, কেন এই অন্ধকার? যাঁকে আমরা মনে করি শাশ্বতভাবে পবিত্র ও পূর্ণ তিনি কেন এই জগৎ হয়েছেন, যা আপাতপ্রতীয়মানভাবে এত কম দিব্যভাবসম্পন্ন? কী তাঁর প্রয়োজন ছিল মৃত্যুতে, মিথ্যায় ও দুঃখে? এ যদি মুখোশ, কেন এই মুখোশ? এ যদি মায়া, কেন এই নিষ্ঠুর খেলা? পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, সে অনুসারে ভগবান্ এই সৃষ্টি করেন নি, তা বোধহয় এক আশীর্বাদ, কারণ আমাদের অনেক প্রকারের ধারণা আছে পূর্ণতা কী সে সম্বন্ধে, ভগবান্ কী রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে এমন-কি, তিনি কেমন হওয়া উচিত নয় সে কথাও ; এবং পরিশেষে, যা-কিছু খাপ খায় না তা ক্রমাগত বাদ দিলে আমাদের জগতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, শুধু এক বিরাট্ শূন্য ব্যতীত, যা আমাদের অস্তিত্বের অশুদ্ধতাটিকে সহন করতে পারে না— অথবা অবশিষ্ট থাকবে শুধু এক সৈন্যশিবির। শ্রীমা বলেছেন, *পুণ্য সব সময় জীবনের কোনো-না-কোনো উপাদানকে লুপ্ত করে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। এবং পৃথিবীর সকল দেশের পুণ্যগুলি যদি একত্র করা হয়, জীবনে তাহলে আর প্রায় কিছুই থাকবে না।* এখন পর্যন্ত আমরা শুধু একপ্রকার পূর্ণতা সম্বন্ধেই জানি, যা শুধু পরিবর্জন করে, অথচ যে পূর্ণতা সকল

কিছুকে সাদরে গ্রহণ করে, সে-বিষয়ে জানি না— কিন্তু পূর্ণতা হল *সমগ্রতা।* শাশ্বত সময়ের একটি মুহূর্তই শুধু আমরা একবারে দেখতে পারি, এবং আমরা যা দেখতে ও পেতে চাই, তা এই মুহূর্তটি ধারণে অক্ষম ; তখনই আমরা অনুযোগ করি ও ঘোষণা করি যে এই জগৎ ভালোভাবে রচিত হয় নি ; কিন্তু যখন আমরা মুহূর্তের মধ্য হতে মুক্ত হয়ে শাশ্বতের প্রবেশ করি, তখনই সব-কিছু পরিবর্তিত হয়ে যায়, ও আমরা দেখি পূর্ণতার রচনা। এ জগতের রচনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, এ এখনও *হয়ে উঠছে ;* ভগবানের জন্য ভগবানের দ্বারা ভগবানের উপর এ এক প্রগতিশীল বিজয় যাত্রা, যেন আমরা হয়ে উঠতে পারি *আরও বেশি, অশেষভাবে, যা আমাদের হয়ে ওঠা উচিত।*[১১] আমাদের বিশ্ব বিবর্তন-রত, এবং বিবর্তনের এক আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে :

ধরার নিযুত পথ যুদ্ধরত দেবের উদ্দেশে।[১২]

এই বিরাট্ পার্থিব যাত্রার বিষয়ে সত্যই আমরা কী জানি? আমাদের নিকট এ প্রতীয়মান হয় অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, অশুদ্ধ ; কিন্তু আমরা তো শুধু এইমাত্র জন্মগ্রহণ করেছি! আমরা এখনই আবির্ভূত হয়েছি জড়তত্ত্ব হতে, কর্দমাক্ত, তুচ্ছ ও ব্যথাক্লিষ্ট, যেন সমাধির মধ্যে স্থাপিত এক দেবতা, যিনি কিছুই জানেন না, এবং অন্বেষণরত, ডানদিকে, বাঁদিকে, সব-কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে— কিন্তু আমাদের পথে অগ্রসর হলে অন্য কোন্ জন্ম, কোন্ পুনঃপ্রাপ্ত স্মৃতি, কোন্ পুনরাবিষ্কৃত শক্তিই বা আমাদের জন্য অপেক্ষারত নেই? এই জগৎ এখনো প্রস্তুতির মধ্যে, সম্পূর্ণ কাহিনীটি এখনো আমরা জানি না।

সন্ধান করো তারে বসুন্ধরায়...
কারণ তুমিই সে, হে রাজন্।
রাত্রি শুধু আত্মায় তোমার,
তোমার স্বেচ্ছাবৃত।
দূর করো তারে।
হয়ে ওঠ পুনর্বার
সেই প্রশান্ত সমগ্রতা,
সত্যই তুমি যা স্বয়ং।[১৩]

কেন্দ্রীয় সত্তা : বিশ্বপুরুষ

"তুমিই সেই", এই হল শাশ্বত সত্য— তত্ত্বমসি। এই সত্যই প্রাচীন সকল রহস্যবাদের প্রদত্ত শিক্ষা, যা পরবর্তী ধর্মসমূহ বিস্মৃত হয়ে গেছে। এই কেন্দ্রীয় রহস্যটিকে হারিয়ে তারা পতিত হল পথভ্রষ্ট সব দ্বৈতবাদে, সেই মহান্ সরল পরম রহস্যের পরিবর্তে অস্পষ্ট সব রহস্য এনে। খৃস্ট বলেছিলেন, "আমি ও

আমার পিতা এক," (জন্ ১০, ৩০) ; "আমিই সে", বলেছিলেন ভারতের ঋষিগণ— *সোহহম্*— কারণ, এই হল সত্য, যা *সকল* মুক্ত মানব আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা হতে পারেন এশিয়ার, কিংবা পশ্চিমের হতে পারেন, হতে পারেন অতীতের কিংবা বর্তমানের। কারণ, এই হল শাশ্বত *তথ্য*, যা আমাদের সবাইকে আবিষ্কার করতে হবে, এবং এই যে "আমি" যে ভগবানের সঙ্গে একত্ব ঘোষণা করে, সে কোনো বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নয়— যেন এই বিজয়োদ্দীপ্ত বিস্ফোরণময় প্রকাশে এখনো স্থান রয়েছে এক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত একান্ত 'আমিত্বের' জন্য, যেন উপনিষদের ঋষিগণ, বৈদিক ঋষিগণ বা খ্রীস্ট তাঁদের জন্য আমাদের ঈশ্বরের পুত্রত্বের একাধিপত্য লাভ করেছিলেন! একটি একক বিশ্বময় চেতনার মধ্যে একীভূত সকল মানুষের স্বর এই : আমরা সকলেই *ঈশ্বরের সন্তান।*

এই আবিষ্কার করবার জন্য দুটি পথ আছে, কিংবা দুটি স্তর। প্রথমটি হল আবিষ্কার আত্মার, চৈত্যসত্তার, যা শাশ্বতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, সেই মহান পরম জ্যোতিঃ হতে আগত ; উপনিষদ্ বলছেন : "যে আত্মা মানবের মধ্যে নিহিত, এবং যে আত্মা আদিত্যে নিহিত, তিনি এক, এবং অন্য কিছু নেই।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩. ১০)। "যে মনে করে 'সে অন্য জন, এবং আমি অন্য জন', সে জানে না।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১. ৪. ১০)। প্রায় ছ-সাত হাজার বছর পূর্বে, অন্তর্নিহিত আত্মার আবিষ্কার বেদের ভাষায় অভিহিত হয়েছিল "পুত্রের জন্ম" : "তাঁর লোহিতবর্ণ জ্বলন্ত রূপ দৃষ্ট হয়েছে ; মহান্ দেবপুরুষ তমঃ হতে নির্মুক্ত হয়েছেন" (ঋগ্বেদ ৫. ১. ২)। তেজোদীপ্ত ভাষায় বৈদিক ঋষিগণ সুনিশ্চিত করেছেন 'পুত্র' ও 'পিতা'র শাশ্বত একত্ব এবং মানুষের দেবতায় রূপান্তরের বিষয়ে : তোমার পিতাকে উদ্ধার করো, তোমার জ্ঞানের মধ্যে তাকে সুরক্ষিত রাখো, তোমার পিতা, যিনি হয়ে ওঠেন তোমার পুত্র ও তোমাকে বহন করেন (ঋগ্বেদ ৫. ৩. ৯)।

যে মুহূর্তে আমরা *জন্মলাভ* করি, আমরা দেখি যে, আমাদের অন্তর্নিহিত এই আত্মা সকল মানুষের মধ্যেই সমান, এবং শুধু অন্যান্য সত্তাদের মধ্যেই নয়, সকল বস্তুতেও এ সুপ্ত ও অপ্রকাশিত : "তিনি জলরাশির শিশু, অরণ্যের শিশু, স্থাণু বস্তুসমূহের শিশু, সকল সচল বস্তুরও শিশু। এমন-কি, প্রস্তরেও তিনি শিশু" (ঋগ্বেদ ১. ৭০. ২)। খৃস্ট কি বলেন নি, রুটি ও মদিরা, এ দুটি জড়তম, অতি পার্থিব প্রতীক ব্যবহার করে, "এই আমার শরীর, এই আমার রক্ত"? তাঁর এ-কথা জানাবার অভিপ্রায় ছিল যে, এই জড়তত্ত্বও অদ্বিতীয়ের শরীর, ঈশ্বরের রক্ত *। যদি পূর্ব হতেই তিনি প্রস্তরে বিদ্যমান না থাকতেন, তা হলে কীভাবে মানুষের মধ্যেও তিনি নিহিত হতে পারেন, স্বর্গ হতে কোন্ অলৌকিক অবতরণের

* শ্রীঅরবিন্দের The Upanishads, 12 : 55-56 দ্রষ্টব্য।

পন্থায়? আমরা এক বিবর্তনেরই পরিণতি, খামখেয়ালি অলৌকিকতার কোনো পর্যায়ের পরিণতি নই : *সমগ্র পার্থিব অতীত আমাদের মানবপ্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান। মানুষের প্রকৃতিই ঠিক এই পূর্বসূচনা দেয় এক ভৌতিক ও প্রাণিক স্তরের, যা প্রস্তুত করেছে তার আবির্ভাব মানসক্ষেত্রে, এবং এক পাশব অতীতের যা রূপায়িত করেছে তার জটিল মানবত্বের প্রথম উপাদান। আমাদের বলা উচিত নয় যে, এর কারণ হল, প্রকৃতি বিবর্তনের সাহায্যে বিকশিত করেছে মানুষের প্রাণ, তার শরীর, ও তার পাশব মন, এবং তারপরই আত্মার অবতরণ হয়েছে, যে রূপ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে। তার অর্থ হবে, আত্মা ও শরীরের মধ্যে, আত্মা ও প্রাণের মধ্যে, আত্মা ও মনের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান, যে ব্যবধান নেই ; আত্মাবিহীন শরীর নেই, কোনো শরীর নেই স্বয়ং এক রূপ নয় যা আত্মার ; জড়তত্ত্ব স্বয়ং আত্মার রূপ ও শক্তি, এবং তা ছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকলে তার স্থিতিই অসম্ভব হত, কারণ কোনো কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যা ব্রহ্মের, শাশ্বতের উপাদান ও শক্তি নয়।*[১৪] *মূক, অন্ধ ও বর্বরও সেই 'তৎ', শুধুই সুসংস্কৃত, সচেতন মানসিকতা-সম্পন্ন মানব নয়, বা পাশব জীবনও নয়। এই সমগ্র অনন্ত সম্ভূতি পরমেরই আবির্ভাব বিভিন্নরূপে।*[১৫]

আমরা যখন চৈত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিই, বিশ্বময় চেতনার প্রথম স্তর তখন উন্মীলিত হয়ে যায়। কিন্তু এই ক্রমবর্ধমান চৈত্যসত্তা, এই চিৎশক্তি, যা ব্যষ্টিগত ভঙ্গিমা ধারণ করে ও অন্তরে ক্রমশ অধিকতর সংহত ও ঘনবদ্ধ হয়, তা বেশি দিন সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারে না এই সংকীর্ণ ব্যক্তিগত রূপে ; সে নিজেকে একাত্ম অনুভব করে 'তৎ'-এর সঙ্গে, সে হতে চায় 'তৎ'-এর মতো বিরাট, 'তৎ'-এর মতো বিশ্বময়, এবং সহজাত সমগ্রতার পুনরুদ্ধার করতে চায়। *আমাদের মধ্যে প্রকৃতির লক্ষ্য, হয়ে ওঠা, সম্পূর্ণরূপে হয়ে ওঠা ; এবং সম্পূর্ণরূপে হয়ে ওঠার অর্থ যে-সব-কিছু অস্তিমান তাই হয়ে ওঠা।*[১৬] আমরা সমগ্রতার প্রয়োজন বোধ করি, কারণ আমরা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র। যে আদর্শ ইশারায় আমাদের আহ্বান করে, যে লক্ষ্য আমাদের পদক্ষেপের দিশারী, তা সত্যই অগ্রবর্তী নয়, তা আমাদের আকর্ষণ করে না, আমাদের প্রচালিত করে, এবং তা অবস্থিত পশ্চাতে, এবং সম্মুখে, এবং অন্তরে। বিবর্তন এক পুষ্পের শাশ্বত প্রস্ফুটন, যা সবসময়ই পুষ্প ছিল। গভীর অন্তরে এ বীজ না থাকলে কোনো কিছুই স্পন্দিত হবে না, কারণ কোনো কিছুরই আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না— এ হল বিশ্বের *প্রয়োজন*। এ হল আমাদের *কেন্দ্রীয় সত্তা* এ আমাদের আলোকময় সহোদর, যে সহসা আবির্ভূত হয় যখন সব-কিছু মনে হয় নৈরাশ্যজনক, এ সেই অরুণস্নাত স্মৃতি যা আমাদের মধ্যে মন্থন সৃষ্টি করে, এবং এ আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না, যে-পর্যন্ত না আমরা আমাদের সমগ্র সূর্যের পুনরুদ্ধার করি। এ আমাদের বিশ্বময় কেন্দ্র, যেমন চৈত্ত আমাদের ব্যষ্টিগত

কেন্দ্র। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় সত্তা কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থিত নেই, অবস্থিত সকল বিন্দুতে, অচিন্তনীয়ভাবে সকল বস্তুর হৃৎকেন্দ্রে, যুগপৎভাবে সকল বস্তুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে। এ অন্তরে নিহিত, সর্বোত্তমভাবে, যেমন এ উর্ধ্বে স্থিত, সর্বোত্তমভাবে, এবং নিম্নে স্থিত, এবং সর্বত্র স্থিত— এ এক *বৃহদাকার বিন্দু*[১৭] আমরা যখন এর আবিষ্কার করি, তখন সব-কিছু আবিষ্কৃত হয়, সব-কিছুই সেখানে আছে। বিকশিত আত্মা পুনঃপ্রাপ্ত হয় তার উৎসকে, 'পুত্র' পরিণত হয় 'পিতায়', অথবা 'পিতা', যে 'পুত্র' হয়েছিলেন সেই আবার ফিরে পান 'নিজেকে' : *যে-সব প্রাচীর আমাদের সচেতন সত্তাকে বন্দী করে রেখেছিল, তারা দূরে অপসৃত হয়ে যায়, বা বিদীর্ণ হয়ে যায়, অথবা তাদের সবেগে পতন হয়, ব্যষ্টিত্ব বা ব্যক্তিত্বের সকল বোধ লুপ্ত হয়ে যায়, স্থান ও কালের মধ্যে বা কর্মে অবস্থিতি এবং প্রাকৃতিক নিয়ম বিস্মৃত হয়ে যায় ; কোনো অহং আর নেই, নেই কোনো ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট, বা যাকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, রয়ে যায় শুধু চেতনা, শুধু অস্তিত্ব, শুধু প্রশান্তি ও আনন্দ ; সত্তা হয়ে যায় অমর, হয়ে যায় শাশ্বত, হয়ে যায় অসীম ব্যক্তিগত আত্মার যা-কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা প্রশান্তিময়, মুক্তিময়, আনন্দময় এক স্তবগান যা মূর্ছিত পরম শাশ্বতের কোনো এক অংশে।*[১৮]

আমাদের বিশ্বাস ছিল, আমরা ক্ষুদ্র ও একে অন্য হতে পৃথক্, পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর মধ্যে যেন এক ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত অন্য এক ব্যক্তি। আমাদের খোলের মধ্যে বিকাশলাভ করবার জন্যই এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের প্রয়োজন ছিল ; না হলে, আমরা বিশ্বময় প্রাণরসের* মধ্যে এক বৈশিষ্ট্যবিহীন পুঞ্জীভূত অংশ হয়েই থাকতাম, দলের একটি হয়ে নিজস্ব কোনো জীবন ব্যতীত। এই বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে আমরা সচেতন হয়েছি, এবং এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই আমরা হয়েছি অসম্পূর্ণভাবে সচেতন। এবং আমরা দুঃখও পাই, কারণ এই বিচ্ছিন্নতাই আমাদের দুঃখ— অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন, সকল বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন, সব-কিছু হতে বিচ্ছিন্ন, কারণ আমরা বাইরে আছি সেই একটি কেন্দ্র বিন্দু হতে যেখানে সব-কিছু সম্মিলিত হয়।

সব-কিছু সরল করবার একমাত্র পথ চেতনাব পুনরুদ্ধার,
এবং তা খুবই সহজ।
শুধু একটিই উৎস রয়েছে।
এই উৎস হল সত্যের পূর্ণতা,
কারণ সেই শুধু একমাত্র অস্তিমান বস্তু।
বাইরে প্রকাশিত হয়ে,
নিজেকে সম্মুখে নিক্ষিপ্ত করে, ছড়িয়ে দিয়ে,

---

* **প্রাণরস** : plasma.

তা উদ্‌ভূত করেছে, যেসব-কিছু আমরা দেখি,
এবং বহুসংখ্যক খুব সুন্দর উজ্জ্বল ছোটো ছোটো মস্তিষ্ক,
যারা অন্বেষণ করে যা পায় নি তারা এখনো ;
কিন্তু তারা পেতে পারে তা,
কাবণ তারা যা অন্বেষণ করে,
তাদের অন্তরে নিহিত তা।
রোগের কেন্দ্রেই তার আরোগ্য।

[শ্রীমা, শিশুদেব সঙ্গে এক কথাবার্তায়।]

এই দীর্ঘ বিবর্তনে, জীবনের পর জীবনে, যখন আমরা যথেষ্ট দুঃখে আক্রান্ত হয়ে, যথেষ্ট পরিপক্ক হয়ে উঠি এবং উপলব্ধি করি আমাদের নিকট সব-কিছুই আসে বাইরে থেকে, আমাদের প্রাণ অপেক্ষা বৃহত্তর এক প্রাণ হতে, আমাদের মন ও স্থূল শরীর অপেক্ষা বৃহত্তর এক মন ও জড়তত্ত্ব হতে, যা বিশ্বময়, সময় তখন উপস্থিত হয়েছে, পুনর্বার সচেতনভাবে আবিষ্কার করবার জন্য, যা আমরা সবসময়ই ছিলাম অজ্ঞাতসারে— এক বিশ্বময় ব্যক্তি : *কেন নিজেকে সীমায়িত করবে তুমি? যে তরবারি তোমাকে আঘাত করে ও যে বাহু তোমাকে আলিঙ্গন করে তারই মধ্যে, সূর্যের প্রখর অংশুর মধ্যে এবং পৃথিবীর নৃত্যের মধ্যে নিজেকে অনুভব করো। নিজেকে অনুভব করো যা-কিছু অতীত এবং যা-কিছু বর্তমান এবং যা-কিছু হয়ে ওঠার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। কারণ তুমি অসীম এবং এ-সকল আনন্দ তোমার পক্ষে সম্ভব।*[১১]

একত্বের জ্ঞান

আমরা ভাবতে পারি যে এই বিশ্বময় চেতনা একপ্রকার কবিসুলভ ও রহস্যবাদী অতিকল্পনা, এক বিশুদ্ধ আত্মনিষ্ঠা* যার কোনো কার্যকারী প্রভাব নেই। কিন্তু প্রথমে আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত "বিষয়নিষ্ঠ"* ও "আত্মনিষ্ঠ"* শব্দদুটোর অর্থ সম্বন্ধে, কারণ আমরা যদি তথাকথিত বিষয়নিষ্ঠা*কে গ্রহণ করি সত্যের একমাত্র মানদণ্ডরূপে তাহলে বোধহয় সমগ্র জগৎই আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে যাবে, যেমন আমাদের কলা, আমাদের চিত্রাঙ্কন এমন-কি আমাদের বিজ্ঞানও গত পঞ্চাশ বছর ধরে অবিরতভাবে ঘোষণা করে আসছে আমাদের জন্য শুধু কিছু সুনিশ্চিত টুকরো ও গ্রাস ছেড়ে দিয়ে। নিঃসন্দেহভাবে,

---

* আত্মনিষ্ঠা : Subjectivity ; আত্মনিষ্ঠ : Subjective ; বিষয়নিষ্ঠা : Objectivity ; বিষয়নিষ্ঠ : Objective.

গোমাংস ভাজা অধিকতর বিশ্বজনীনভাবে প্রমাণযোগ্য, এবং সেজন্য অধিকতর বিষয়নিষ্ঠ, বিঠোফেন্**-এর শেষ কোয়ার্টেট্†-এ পাওয়া আনন্দের অপেক্ষা ; কিন্তু আমরা জগৎকে নগ্ন করে দিয়েছি, তাকে সমৃদ্ধ করি নি। বাস্তবিক, এ এক মিথ্যা বিরোধ : আত্মনিষ্ঠা বিষয়নিষ্ঠারই এক অগ্রগামী বা প্রারম্ভিক স্তর। একবার যখন প্রত্যেকে অনুভব করবে বিশ্বময় চেতনা, বা শুধুই বিথোফেন্-এর আনন্দ, তখনই আমরা ন্যূনতর বর্বর এক বিশ্বের বিষয়নিষ্ঠ রূপ পেতে পারব।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ শুধুই এক বিশ্বময় স্বপ্ন নিয়ে সন্তোষলাভ করবার ব্যক্তি ছিলেন না। অনুভূতির নির্ভরযোগ্যতা ও তার প্রকৃত কার্যোপযোগিতা সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা করা যেতে পারে এক অতি সরল পন্থায় : জ্ঞানলাভের এক নতুন প্রণালীর আবির্ভাব। একত্বের মাধ্যমে— আমরা এক বস্তুকে জানি, কারণ, আমরা স্বয়ং সেই বস্তু। চেতনা তার নিজের বিশ্বময় বাস্তবতার যে-কোনো বিন্দুতে অগ্রসর হতে পারে, যে-কোনো সত্তা, যে-কোনো ঘটনার উপর সে তার আলোক কেন্দ্রীভূত করতে পারে, এবং তার সম্বন্ধে অন্তরঙ্গভাবে জানতে পারে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই, যেমন কেউ জানতে পারে তার হৃৎস্পন্দনের বিষয়ে, কারণ সবই সংঘটিত হয় অন্তরে, বাইরে আর কিছুই নেই, পৃথক কিছুই নেই। এ কথা উপনিষদে পূর্বেই বলা হয়েছে : "যখন 'তৎ' বিজ্ঞাত হন, সকলই বিজ্ঞাত হয়।" (শাণ্ডিল্য উপনিষদ, ২. ২)। এই নতুন চেতনার প্রথম লক্ষণগুলি যথেষ্ট বোধগম্য : *ব্যক্তির অনুভূতি আরম্ভ হয় যে, অন্যেরা তারই অংশ, বা পুনরাবৃত্তি বিভিন্ন রূপে, একই পুরুষ প্রকৃতি দ্বারা পরিবর্তিত অবস্থায় বিভিন্ন শরীরে অবস্থিত ; অথবা, ন্যূনতমভাবে সে বাস করতে আরম্ভ করে এক বৃহত্তর বিশ্বময় আত্মায়, যা অতঃপর হয়ে উঠবে তার মহত্তর বাস্তবতা। প্রকৃতপক্ষে, সকল বস্তুই তাদের প্রকৃতি ও প্রতীয়মান রূপ পরিবর্তিত করতে আরম্ভ করে ; তার সমগ্র জাগতিক অভিজ্ঞতাই আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায় তাদের অনুভূতি থেকে যারা তাদের ব্যক্তিগত চেতনায় আবদ্ধ থাকে। এক ভিন্ন প্রকারের অনুভূতি দিয়ে সে সব-কিছু জানতে আরম্ভ করে, আরও প্রত্যক্ষ এক অনুভূতি যা বহির্মানস ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপর নির্ভরশীল নয়। এমন নয় যে ভুলের সম্ভাবনা লোপ পেয়ে যায়, তা হতে পারবে না, যে পর্যন্ত কোনো এক প্রকারের মন তার জ্ঞানের পরিপ্রকাশের যন্ত্র হয়ে থাকে। কিন্তু এক নতুন বিশাল গভীর পন্থায় সকল বস্তুকে অনুভব করা যায়, দেখা যায়, জানা যায়, ও যোগাযোগ করা যায তাদের সঙ্গে ; এবং জ্ঞানের পরিসীমা বহুদূরে অপসারিত করে দেওয়া যায়, প্রায় অপরিমিতভাবে।*[২০]

** **বিঠোফেন [Ludwig Van Beethoven] : জার্মান সংগীতজ্ঞ (১৭৭০-১৮২৭)।**

† **কোয়ার্টেট : Quartet বিশেষ যৌথ সংগীত।**

জ্ঞানের এই প্রণালী বাস্তবিক আমাদের প্রণালী হতে ভিন্ন নয়। বস্তুত যে-কোনো স্তরেরই হোক-না-কেন, জড়তম স্তর থেকে দার্শনিক উচ্চতা পর্যন্ত, যে-কোনো অনুভূতি, যে-কোনো জ্ঞান, প্রচ্ছন্নভাবে, একত্বের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানই। আমরা জানি, কারণ আমরা *স্বয়ং* তাই যা আমরা জানি। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, *সত্য জ্ঞান চিন্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। তা হল তুমি যা স্বয়ং ; তা হল তুমি যা হয়ে ওঠ।*[২১] সেই গোপন একাত্মতা ব্যতীত, সেই অন্তর্নিহিত সমগ্র একত্ব ব্যতীত, আমরা জগতের ও সত্তাসমূহের বিষয়ে কিছুই জানতে পারব না। শ্রীরামকৃষ্ণ রক্তাক্ত অবস্থায় ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন, যখন তাঁর নিকটস্থ বলদের প্রতি কশাঘাত হল ; অথবা, কোনো এক অতীন্দ্রিয়বাদী জানতে পারেন কোনো এক নির্দিষ্ট বস্তু কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে গুপ্ত আছে, বা কোনো যোগী কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থিত রোগগ্রস্ত শিষ্যকে আরোগ্য করেন, কিংবা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রকোষ্ঠে ঘূর্ণিবাত্যার প্রবেশ বন্ধ করলেন— এসব এক প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। যা প্রাকৃতিক, তা বিচ্ছিন্নতা নয়, বিভেদ নয়, তা সকল বস্তুর অবিভাজ্য একত্ব। যদি সকল সত্তা ও বস্তু আমাদের থেকে পৃথক হত, যদি আমাদের মূলসত্তায় আমরা একীভূত নই সেই ঘূর্ণিবাত্যা বা বলদের সঙ্গে, সেই গুপ্ত সম্পদ বা অসুস্থ শিষ্যটির সঙ্গে, তা হলে যে শুধুই আমরা তাদের উপর সক্রিয় হতে অসমর্থ হতাম, অথবা তাদের অনুভব করতে বা জানতে অসমর্থ হতাম তাই নয়, তারা আমাদের নিকট হয়ে উঠত অদৃশ্য বা অস্তিত্বহীন। সদৃশই জানতে পারে সদৃশকে, সদৃশই সক্রিয় হতে পারে সদৃশের উপর। আমরা যা, তাই শুধু জানতে পারি : *যা প্রাণীর বিকাশশীল আত্মায় সংগুপ্ত হয়ে নেই সম্ভাব্য জ্ঞানরূপে, তা কখনো মনকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে না। তেমনই, যে পূর্ণতা বাইরের মানুষ পেতে পারে তা শুধু তার অন্তর্নিহিত পুরুষের শাশ্বত পূর্ণতার এক উপলব্ধি মাত্র। আমরা ভগবান্‌কে জানি, ভগবান্ হয়ে উঠি, কারণ আমাদের নিগূঢ় প্রকৃতিতে পূর্ব হতেই আমরা সেই 'তৎ'। সকল শিক্ষাই এক প্রকাশ, সকল সম্ভূতি এক বিকাশ। আত্মোপলব্ধিই নিগূঢ় সূত্র ; আত্মজ্ঞান ও এক ক্রমবর্ধমান চেতনাই সাধন ও প্রক্রিয়া।*[২২]

আমাদের বিবর্তনের হাজার হাজার বছর ধরে, আমরা নিজেদের পৃথক্ করেছি জগৎ হতে, এবং সকল সত্তা হতে, আমাদের অহমিকাকে মূর্ত করেছি, বিরাট শরীরের কয়েকটি অণুকে কঠিন করেছি, আমাদের "আমি বোধ" ও "আমরা বোধ"কে ঘোষণা করেছি অন্য সকলের বিপক্ষে, যারা সকলেই অহমিকার আবরণের নিচে কঠিন হয়ে গেছে। একবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, আমরা পুনর্বার দেখতে সমর্থ হই নি আমাদের পূর্বের আত্মস্বরূপকে, যা নিহিত মাতৃরূপী মূল একত্বে। সেজন্য, আমরা উদ্ভাবন করেছি চোখ, হাত, ইন্দ্রিয় ও একটি মনের, আমাদের মহান্ অস্তিত্ব হতে যা আমরা বিচ্ছিন্ন করেছি তার সঙ্গে পুনর্বার

যোগাযোগস্থাপনের জন্য। এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের চোখ, আমাদের আঙুল, আমাদের মস্তিষ্কের সাহায্য বিনা, আমরা কিছু জানতে পারব না। কিন্তু এ আমাদের বিচ্ছিন্নতামূলক বিভ্রম। আমাদের বর্তমানের অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান আবৃত করে দেয়, আমাদের থেকে প্রচ্ছন্ন রেখে দেয় সেই অব্যবহিত স্বীকৃতি যার সাহায্য বিনা আমাদের চোখ, আমাদের আঙুল, আমাদের মস্তিষ্ক, এমন-কি, আমাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রও অসমর্থ হয় কিছু প্রত্যক্ষ করায়, বুঝতে বা কিছু করতে। আমাদের চোখ দর্শনের ইন্দ্রিয় নয়, বিভাজনের ইন্দ্রিয় ; যখন আমাদের মধ্যে সত্যের দৃষ্টি উন্মীলিত হয়, তখন পুনর্বার প্রয়োজন হয় না এসব চশমার কাচ, এসব খঞ্জের যষ্টি। পরিশেষে, আমাদের বিবর্তনের যাত্রা এক পুনর্বিজয় সেই সব-কিছুর যা আমরা নির্বাসিত করেছি : মহাস্মৃতির পুনরুদ্ধার। আমাদের প্রগতির পরিমাপ হয় না আমাদের উদ্ভাবনের পরিমাণ দিয়ে, যা শুধুই হল যা-কিছু আমরা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি তা ফিরিয়ে আনবার কৃত্রিম উপায় ; কিন্তু আমাদের প্রগতির পরিমাপ হয়, জগতের কতটুকু 'পুনঃপূর্ণায়িত'* অংশ আমরা জানতে পারি নিজের স্বরূপে, তারই উপর।

এবং সেই তো *আনন্দ*— যা-কিছু-আছে তা হয়ে ওঠাই যা-কিছু-আছে তার আনন্দ পাওয়া।

সে আনন্দ অযুত অযুতের, সকলেই যারা এক।[২৩]

"যিনি সর্বত্র একত্ব দর্শন করেন, তাঁর কিসের মোহ, কিসের দুঃখ?" (ঈশোপনিষদ, ৭)।

* পুনঃপূর্ণায়িত : re-integrated শব্দার্থ দ্রষ্টব্য।

১২

অতিচেতন

প্রহেলিকা

তা হলে, চেতনার এক ত্রিবিধ পরিবর্তনই পৃথিবীর উপর আমাদের যাত্রার মানচিত্র প্রস্তুত করে : চৈত্যপুরুষের বা অন্তর্নিহিত আত্মার আবিষ্কার, নির্বাণ বা বিশ্বাতীত আত্মার আবিষ্কার, কেন্দ্রীয় সত্তার বা বিশ্বময় আত্মার আবিষ্কার। এই বোধহয় খ্রীস্টীয় পরম্পরার ত্রয়ী পিতা-পুত্র-পবিত্রাত্মার প্রকৃত অর্থ। কোনো এক বা অন্য অনুভূতির গুণাবলী বিচার করা আমাদের লক্ষ্য নয় এখানে। আমাদের নিজেদের জন্য সেসব পরীক্ষা করে দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য : *ভগবানের বিভিন্ন ভাবের অগ্রগণ্যতা নিয়ে বিভিন্ন দর্শন ও ধর্ম বিবাদরত, এবং ভিন্ন ভিন্ন যোগী, ঋষি ও সাধু এক বা অন্য দর্শন অথবা ধর্মে গুরুত্ব আরোপ করেন। সেসবের কোনো একটি নিয়ে বিতর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ; আমাদের উদ্দেশ্য সে-সকলই উপলব্ধি করা, সব-কিছুই হয়ে ওঠা, অন্য সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে, শুধু একটি দিকেরই অনুসরণ না করে, ভগবানকে তাঁর সকল ভাবে ও ভাবের ঊর্ধ্বে স্বীকার করা*। এই হল পূর্ণাঙ্গ যোগের যথার্থ অর্থ। তথাপি আমরা বিস্মিত এই ভেবে, এই ত্রিবিধ আবিষ্কারের ঊর্ধ্বে কি কিছু নেই? কারণ, এদের প্রত্যেকটি

যতই চূড়ান্ত মনে হোক তাদের অনুভব করবার সময়, তাদের কোনোটাই আমাদের দেয় না সেই সামগ্রিক পূর্ণতা যা আমাদের অভীপ্সিত, অর্থাৎ যে পূর্ণতায়, আমরা মনে করি, পৃথিবী ও ব্যক্তি উভয়েরই অংশ গ্রহণ করা উচিত। চৈত্যপুরুষের আবিষ্কার নিশ্চয়ই এক মহান্ উপলব্ধি— আমরা আমাদের দেবত্বের সম্বন্ধে সচেতন হই— কিন্তু তা সীমায়িত ব্যক্তির মধ্যে, তা ভেঙে ফেলে না ব্যক্তির প্রাচীর যা আমাদের সীমাবদ্ধ করে রাখে। কেন্দ্রীয় সত্তার আবিষ্কার এক অতি বিশাল উপলব্ধি— জগৎ হয়ে যায় আমাদের নিজেদের সত্তা— কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের ব্যক্তিবোধ কারণ, এটা খুবই ভুল হবে, যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, মিঃ স্মিথ্ তাঁর বিশ্বময় চেতনায় উপবিষ্ট হয়ে এ দৃশ্য উপভোগ করছেন —কোনো মিঃ স্মিথই আর নেই। এবং বিশ্বাতীতকে আবিষ্কার করা এক অত্যুচ্চ উপলব্ধি, কিন্তু আমরা হারাই উভয় ব্যক্তি ও বিশ্বকে— 'তৎ' ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, যিনি সর্বদা লীলার ঊর্ধ্বে। তাত্ত্বিকভাবে, আমরা বলতে পারি 'পিতা', 'পুত্র' ও 'পবিত্রাত্মা' একই— তাত্ত্বিকভাবে আমরা যা পছন্দ করি তাই বলতে পারি— কিন্তু কার্যত যখন আমরা সেসব অনুভব করি, চেতনার এসকল পরিবর্তনের প্রত্যেকটি প্রতীয়মান হয় যেন অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন, এক অতল গহ্বর দ্বারা। যে পর্যন্ত আমরা এই ত্রিবিধ বিচ্ছেদ— বিশ্বময় ঈশ্বর, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ঈশ্বর, ও এক ব্রহ্ম— এই ত্রিবিধ মতবাদীদের পারস্পরিক বিচ্ছেদ দূরীভূত করে এক অনুভবসিদ্ধ পথের আবিষ্কার না করছি, সে পর্যন্ত পূর্ণতা সংসিদ্ধ হবে না, ব্যক্তির জন্যও নয়, বিশ্বের জন্যও নয়। আমরা সন্তোষলাভ করতে পারব না বিশ্বের সমগ্রতা ব্যতীত ব্যক্তিগত কেন্দ্রের আবিষ্কারে, কিংবা ব্যক্তিত্ব ব্যতীত জগতের সমগ্রতার আবিষ্কারে, এবং আরও কম সন্তোষ লাভ করব পরম প্রশান্তির আবিষ্কারে, যদি তা বিলীন করে দেয় উভয় এই বিশ্বকে এবং আমাদের ব্যক্তিত্বকে— "আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই!" বলেছিলেন মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। এই বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত জগতে যেখানে আমাদের 'হয়ে উঠতে' হয়, সক্রিয় হতে হয়, সব-কিছুর সম্মুখীন হতে হয়, সেখানে আমাদের *অস্তিত্বেরও* প্রয়োজন আছে। এই অস্তিত্ব ব্যতীত, আমাদের 'হয়ে *ওঠা*'ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় ভিড়ের মধ্যে। কিন্তু এই 'হয়ে *ওঠা*' ব্যতীত আমাদের অস্তিত্ব হয়ে যায় এক *আনন্দময় মহাশূন্য*[২]। এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব বিনা, এইসব বিস্ময়কর উপলব্ধি আমাদের কাছে কোনো অর্থই বহন করে না, কারণ আমাদেরই আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না তখন। এই বিরোধিতা, তারই সমাধান করতে হবে, দার্শনিক পরিভাষা দিয়ে নয়, জীবন ও কর্মশক্তির পরিভাষায়। এখন পর্যন্ত মনে হয়েছে যেন সমন্বয়ের পথ নেই বা অজানা ; এবং সেই কারণেই সকল ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মতবাদ সোপানক্রমের ঊর্ধ্বস্থ বিশ্বাতীত পিতাকেই স্থাপিত করেছেন এই দুর্ভাগ্যপূর্ণ কাহিনীর বাইরে। এবং সেই কারণেই তারা আমাদের

অভীপ্সিত সমগ্রতা অন্যত্র সন্ধান করবার জন্য আমাদের বাধ্য করে। তথাপি অন্তর্বোধ[†] আমাদের বলছে যে, যদি আমরা, যারা শরীরধারী সত্তা, সমগ্রতার জন্য অভীপ্সা করি, তা হলে তার অর্থ যে সমগ্রতা এখানেই আছে, এবং তা সম্ভব এই শবীরে, অন্যথা তার জন্য আমরা অভীপ্সা কবতাম না। "কল্পনা" বলে কোনো কিছুই নেই— কোনো কল্পনাই নেই, শুধু আছে বাস্তবতা যা বিলম্বিত, বা সত্য যা উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে। জুল ভার্ন[††] তাঁর নিজস্ব পন্থায় এ কথাই প্রমাণ করেছেন। তা হলে কি এক নতুন আবিষ্কাবেব প্রযোজন নেই, চেতনার এক চতুর্থ পরিবর্তনের, যা সব-কিছু পরিবর্তিত কবে দেবে?

বিচারকক্ষের মধ্যস্থলে লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ শ্রীঅরবিন্দ পথের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিলেন। একের পর এক তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল অন্তর্নিহিত বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় ভগবানের— খাঁচায় শুধু শরীর ছাড়া আর কিছুই আবদ্ধ ছিল না : তাঁর চেতনায় তিনি যে-কোনো স্থানে যেতে পারতেন, তাঁর ইচ্ছায়। কিন্তু বোধ হয়, তিনি মনেও রেখেছিলেন অববিন্দ নামক এক যুবককে, যিনি কেম্ব্রিজ-এর সময় থেকে, পাশ্চাত্যে যে বছরগুলো ছিলেন তখন থেকে অবিরতভাবে চেতনা অর্জন করেছিলেন তাঁর শরীরে— এবং এখন, যখন অসীম চেতনার উপলব্ধি হয়েছে, তাঁর শরীর লক্ষ লক্ষ অন্যান্য শরীরের মতোই রইল, প্রকৃতির সেই একই নিয়মাবলীর অধীন, বোধ হয় এখনও ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রভাবিত, কখনো কখনো অসুস্থ, অন্য সকল শরীরের মতো, এখনও ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে বিধ্বংসের অভিমুখে। চেতনা বিশাল, জ্যোতির্ময়, অমৃতময়, কিন্তু তার নিম্নবর্তী স্তরে, সব-কিছু একই ভাবে প্রবহমান। তিনি স্পষ্টভাবে দেখতেন, নৈতিকতা বা ঔচিত্যের দ্বারা প্রস্তুত সব মুখোশ তাঁকে আর প্রতারিত করত না ; এবং সেই কারণে, অবচেতনেও তিনি দেখলেন অসীম চেতনার নিম্নে পুরোনো জন্তুর মুখবিকৃতি, এবং দেখলেন সুন্দর দীপ্তির অন্তরালে জড় কর্দম— নিম্নবর্তী স্তরে, সব-কিছু একই ভাবে প্রবহমান, কিছুই পরিবর্তিত হয় না। তিনি বোধ হয় আরও দেখলেন, পিঞ্জরের অপরপার্শ্বে, তাঁরই নিজের অন্যান্য সকল ব্যক্তিত্ব, যাঁরা এখনও বিচার করছেন, ঘৃণা করছেন, এখনও কষ্ট পাচ্ছেন— কেই বা পরিত্রাণ পেয়েছেন? কিছুই পরিত্রাত হয় না, যে পর্যন্ত সব-কিছুই পরিত্রাত না হয়, এবং অসীম চেতনা এইসব মানুষদের জন্য কী করেছেন? তিনি দেখেন, জানেন, কিন্তু তাঁর কোন্ *শক্তি* আছে? একদিন বরোদায়, শ্রীঅরবিন্দ কি প্রস্তুত হন নি সক্রিয় হওয়ার জন্য, শক্তি

† অন্তর্বোধ : intuition শব্দার্থ দ্রষ্টব্য।

†† জুল ভার্ন (Jules Verne, ১৮২৮-১৯০৫) : ফরাসি লেখক, *Around the World in Eighty Days* এবং *Twenty Thousand Leagues under the Sea* ইত্যাদির রচয়িতা।

পাওয়ার জন্য? তিনি সেখানে তাঁর অনন্ত চেতনায় সব-কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন, এবং ঊর্ধ্বের বিশাল আনন্দের অধিকারী হয়ে অনুভব করছিলেন,

হাস্যে-ভরা নিরাবরণ হর্ষ পরমশীর্ষে।[৩]

কিন্তু তাঁর হর্ষ কী করতে পারবে, যদি ঊর্ধ্ব নিম্নেরও সর্বত্র না থাকে? নিম্নে, সব-কিছু একই ভাবে প্রবহমান, দুঃখগ্রস্ত হয়ে, মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে। তিনি বিচারকদের প্রতি কর্ণপাত করলেন না, যেসব প্রশ্নের উপর তাঁর জীবন নির্ভর করত, তাদের উত্তরও তিনি দিলেন না ; তিনি শুধুই বারংবার শুনতেন সেই দিব্যবাণী : *আমিই তোমার পথ-প্রদর্শক, সুতরাং ভয় পেয়ো না। এই কারাগারের মধ্যে তোমাকে যে কারণে এনেছি, সেই কর্মের অভিমুখী হও*। এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর খাঁচার মধ্যে চোখ বন্ধ করে থাকলেন, তাঁর অন্বেষণে মগ্ন হয়ে। ঊর্ধ্বে কি এক সমগ্রতা নেই, যা নিম্নের সমগ্রতাও হতে পারে? পথ কি শেষ হয়ে এসেছে এই *স্বর্ণময় অসমার্থ্যের*[৪] সঙ্গে। উদ্দেশ্য কী এই সমগ্র যাত্রার?

ব্যাখ্যার অতীত কোনো এক কারণে, আত্মা জড়ের মধ্যে অবতরণ করে, বা বরং হয়ে যায় এই জড়তত্ত্ব, এবং বিবর্তিত হয় যুগ যুগ ধরে ; এর ইন্দ্রিয়, এর মন, এর অনুভূতির মাধ্যমে এ অভিবৃদ্ধি লাভ করে ও ব্যক্তিভাবাপন্ন হয়, এবং ক্রমবর্ধমানভাবে স্মরণ করে এর হৃত বা নিমগ্ন দেবত্বকে, এর শক্তির মধ্যে অবস্থিত এর চেতনাকে, যে পর্যন্ত না এ আবার নিজেকে ফিরে পায়, এবং অবশেষে ফিরে যায় তার মূল উৎসে, যা হতে পারে বিশ্বাতীত ও নির্বাণময়, অথবা বিশ্বময়, এর নিয়তি ও প্রবণতা অনুযায়ী। এই সমগ্র কাহিনী কি তা হলে ভগবৎ-তত্ত্ব হতে ভগবৎ-তত্ত্ব পর্যন্ত শুধু এক দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য সংক্রমণ, জড়তত্ত্বের অন্ধকার যন্ত্রণাময় বিশোধনের মধ্য দিয়ে? কিন্তু কেন এই যন্ত্রণাময় বিশোধন, কেন এই জড়তত্ত্ব? কেন আমরা এর মধ্যে প্রবেশ করলাম, যদি এর মধ্য হতে বের হতেই হবে? আমাদের বলা হবে যে, পরিশেষের বিশ্বময় বা নির্বাণময় সকল আনন্দ যথার্থভাবেই এই সমগ্র যন্ত্রণার সমমূল্য। তা হতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে, পৃথিবী যন্ত্রণায় আর্ত। ঊর্ধ্বে আমরা পরম আনন্দে উদ্ভাসিত হতে পারি, কিন্তু এখানে নিম্নে প্রবল যন্ত্রণা, রোগ ও মৃত্যু বর্ধিষ্ণু ও জীবন্ত— আমাদের বিশ্বগত চেতনা পৃথিবীর নিয়তিতে বিন্দুমাত্রও ভিন্নতা আনে না, এবং আমাদের নির্বাণ তা আরও কম করে। আমাদের বলা হবে যে, প্রত্যেকেই সেই একই পথে চলে পৃথিবীর ভ্রান্তি হতে জাগরিত হতে পারবে— খুবই ভাল, কিন্তু পুনর্বার প্রশ্ন, যদি পৃথিবীর ভ্রান্তি হতে জাগরিত হতেই হবে, তা হলে কেন এই পৃথিবী? আমরা বলি "পতনের" কথা, আদম ও হবার[†] পতন, কোন্ এক অমূলক আদিম পাপের

[†] হবা = Eve, ইভ।

কথা, যা বিনষ্ট করেছিল ভগবানের প্রারম্ভিক সুন্দর রচনাকে— কিন্তু সবই তো ভগবান্! স্বর্গোদ্যানের সর্প যদি কোনো দিন ছিল, সেও ভগবান্, এবং শয়তান ও তার আড়ম্বর ও তার কার্যকলাপ— সবই ভগবান্ : তাঁর ব্যতীত কিছু নেই! তা হলে, তিনি কি সত্যই এতই অকুশল হতে পারেন যে, তাঁর পতন হবে অজ্ঞানতার জন্য? কিংবা এতই শক্তিহীন হতে পারেন যে যন্ত্রণাভোগ করবেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অথবা এতই পরপীড়নশীল ক্রূর হতে পারেন যে, তিনি ভুলের খেলাই খেলেন, শুধু তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আনন্দ লাভ করবার জন্য? তা হলে এ পৃথিবী কি শুধুই এক ভুল? কারণ, যদি এ পৃথিবী কোনো অর্থবহন করে না *পৃথিবীর জন্য,* যদি জগতের যন্ত্রণাভোগ কোনো অর্থবহন করে না *জগতের জন্য,* যদি এ শুধুই এমন এক স্থান যার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে, কোনো এক অমূলক পাপের বিশোধনের জন্য, তা হলে কোনো কিছু, কোনো ব্যক্তি, কোনো পরমানন্দ বা কোনো চরম আবেশ এই নিরর্থক নাট্যাঙ্ককে ক্ষমা করতে পারবে না— ভগবান জড়তত্ত্বে প্রবেশ করেন নি যদি তা থেকে বের হয়ে যেতেই হবে, কোনো প্রয়োজন নেই মৃত্যুর, এবং যন্ত্রণার এবং অজ্ঞানতার ভগবানের কাছে, যদি না এই যন্ত্রণা, এই মৃত্যু এবং এই অজ্ঞানতা *তাদের নিজেদের মধ্যেই* তাদের অর্থ বহন করে, যদি না এই পৃথিবী ও অবশেষে, এই শরীর শুধুই প্রায়শ্চিত্ত ও নিষ্কৃতির যন্ত্র না হয়ে, হয়ে থাকে এক স্থান এক নিগূঢ় রহস্যের যা পরিবর্তিত করে সব-কিছুকে।

তোমার চিরন্তন দিবসে করি না আমি আরোহণ,
শাশ্বত তব নিশীথ যেমন করেছি পরিত্যাগ...
পৃথিবীর বুকে, রাজন্, তোমার সেবাই মহত্তর
স্বর্গধামের মহিমান্বিত মুক্তি সকল হতে...
আর্তমানব হতে বহুদূর স্বর্গ সকল তব।
অসম্পূর্ণ আনন্দ নয় যা সবার তরে।[৫]

কিন্তু আমরা যদি আবার দৃষ্টিপাত করি এই প্রহেলিকার প্রতি, আত্মরূপী এই মর্মস্থলের প্রতি, যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র রহস্যটি ঘূর্ণায়মান, তখন আমরা দেখতে বাধ্য হই যে, সবাই যা বলে, আত্মার "পরিত্রাণের" কোনো প্রয়োজন নেই : তা চিরন্তনভাবে মুক্ত ও পবিত্র, নিজের ভাস্বরতায় তা সর্বদা পরিত্রাত —যে মুহূর্তে আমরা আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত রেখে আত্মায় প্রবেশ করি, আমরা তখন দেখি যে, এ বিস্ময়জনকভাবে দিব্য ও আলোকময়, যত কর্দম আমরা তার প্রতি নিক্ষেপ করি তা তাকে মোটেই স্পর্শ করতে পারে না। যাকে উদ্ধার করতে হবে সে এই পৃথিবী, কারণ সে ভারাক্রান্ত ; যাকে উদ্ধার করতে হবে সে এই জীবন, কারণ সে মরণোন্মুখ। এই মহামুক্তির বীজ কোথায়?

কোথায় সেই শক্তি যা মুক্তি দেবে? কোথায় জগতের প্রকৃত পরিত্রাণ? আত্মার পরম লঘুতা আমরা আস্বাদন করি, এ কথা চেয়ে যদি অধ্যাত্মবাদীরা যথার্থ হয়ে থাকেন, তা হলে জড়বাদীরাও যথার্থ, যারা জড়তত্ত্বের খনন করেছেন, সেই ঘনত্বের মধ্য হতে আশ্চর্যের আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু তাঁদের কাছে নেই সেই রহস্যের সূত্র— কারও কাছে নেই সেই রহস্যের সূত্র। প্রথম মতাবলম্বীদের আশ্চর্যসমুহে কোনো শরীর নেই, দ্বিতীয় মতাবলম্বীদের আশ্চর্যসমূহে আত্মা নেই।

শরীর, যা প্রথমে শুধু মনে হয়েছিল আত্মার মুক্তির পথে এক তমসাচ্ছন্ন যন্ত্র, হ্যাঁ, সেই শরীরই, অসম্ভব মনে হলেও, বোধ হয় আত্মার এক অজ্ঞাত পূর্ণতার যথার্থ উৎস-স্থল : *এই আপাত-প্রতীয়মান যন্ত্রগুলো এক রহস্যের চাবি যা ছাড়া মূলতত্ত্বগুলো তাদের সকল রহস্য ব্যক্ত করবে না।*[৬] "নিজ কর্মের অভিমুখী হও", সেই অন্তর্বাণী বলল। এবং সেই কর্ম ছিল না বিশ্বগত আনন্দে বিভোর হওয়া, তা ছিল এখানে, নিম্নভূমিতে, এই শরীরে ও পৃথিবীর জন্য, আবিষ্কার করা এক নতুন পথ, যা আবার সমন্বিত করবে একটি একক চেতনায় বিশ্বাতীতের স্বাধীনতা, বিশ্বময়ের জীবন্ত বিশালতা এবং ব্যষ্টিগত আত্মার আনন্দ, এক পরিপূর্ণ পৃথিবীতে, এক সত্যতর জীবনে। কারণ, শ্রীমা বলছেন, *সেই হল চেতনার সত্য পরিবর্তন, যা পরিবর্তন সাধন করবে জগতের ভৌতিক অবস্থার, এবং তা থেকে এক নতুন সৃষ্টি রচনা করবে।*

আবিষ্কারের শর্ত

যদি আমরা চাই "জগতের ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন", অর্থাৎ পরিবর্তন তথাকথিত ভৌতিক "নিয়মাবলীর", যা আমাদের ও জগতের অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যদি আমরা এই রূপান্তর আনতে চাই চিৎশক্তির মাধ্যমে, তা হলে দুটি শর্তের পূরণ প্রয়োজনীয় : একদিকে, আমাদের সক্রিয় হতে হবে নিজেদের ব্যক্তিগত শরীরে, বিশ্বাতীতে পলায়ন না ক'রে, কারণ, এই শরীরই জড়ের মধ্যে চেতনার প্রবেশের দ্বার ; এবং অন্যদিকে, আমাদের প্রয়াস করতেই হবে চেতনার সেই তত্ত্বটির আবিষ্কারের জন্য, যার সামর্থ্য থাকবে জড়তত্ত্বের রূপান্তর আনয়নে। এ পর্যন্ত, মানুষের জানা চেতনার কোনো রূপ বা কোনো স্তর এই রূপান্তর-সাধনের জন্য শক্তি ধারণ করে না— মানসিক চেতনাও নয়, কিংবা প্রাণিক চেতনা অথবা শারীরিক চেতনাও নয়, যে-কথা আমরা সহজেই দেখতে পারি। এটা সত্য যে শুধু সাধনার দ্বারা কিছু ব্যক্তি সমর্থ হয়েছেন প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উল্লঙ্ঘনে এবং মাধ্যাকর্ষণ, শৈত্য, ক্ষুধা, রোগ ইত্যাদির উপর জয়লাভে। কিন্তু প্রারম্ভিকভাবে এসবই ব্যক্তিগত পরিবর্তন যা কখনো সংক্রমিত হতে পারে না, এবং দ্বিতীয়ত

তাঁরা সত্যিই জড়তত্ত্বের রূপান্তর নয় : শরীর-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী মূলত অপরিবর্তিতই রয়ে যায় ; শুধু কতকগুলো বিশেষ প্রভাব থাকে প্রকৃতির উপর, কিছু হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর সময়ের জন্য, যা মনে হয় অতিপ্রাকৃতিক। আমরা এ প্রসঙ্গে একজন বিপ্লবী যোগীর দৃষ্টান্ত দিতে পারি যিনি শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী ছিলেন। তাঁকে একদিন এক পাগল কুকুর কামড়েছিল। তাঁর চেতনার শক্তির ব্যবহার করে তিনি তৎক্ষণাৎ বীজাণুর প্রভাব প্রতিহত করলেন এবং সে-বিষয়ে কোনো চিন্তা না করে জীবনযাপন করে চললেন। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদি এই যোগী চেতনার পূর্ণ অবস্থায় থাকতেন *মোটেই* তাঁকে কামড়ানো যেতে পারত না।) একদিন এক বিশেষভাবে উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক সভায় তিনি তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারলেন না। এবং কোনো এক বক্তার প্রতি প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁর মৃত্যু হল, জলাতঙ্ক রোগের প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে। তাঁর শক্তি নির্ভর করত শুধু চেতনার নিয়ন্ত্রণের উপর, এবং যে মুহূর্তে তাঁর চেতনা বিচলিত হল, সব-কিছুই পূর্বাবস্থায় ফিরে এল, কারণ শরীরের নিয়মাবলী পরিবর্তিত হয় নি, শুধু তার কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যে রূপান্তরের কথা মানসনয়নে দেখেছিলেন, তার অর্থ নয় কম বা বেশি সময় স্থায়ী কিছু "অতিপ্রাকৃতিক" শক্তির অর্জন, যেসব শক্তি নিজেদের আরোপিত করে প্রাকৃতিকের উপর, বরং তার অর্থ, মানুষের যথার্থ প্রকৃতির তথা তার ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন ; তার অর্থ নয় প্রভুত্ব, কিন্তু সত্যই, রূপান্তর। তা ছাড়া, যদি আমরা সমগ্র পৃথিবীর জন্য উপলব্ধি চাই, তা হলে অস্তিত্বের এই নতুন তত্ত্ব, যার নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন 'অতিমানস' তা নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে চিরন্তনভাবে *প্রতিষ্ঠিত* হতে হবে, প্রথমে কিছু ব্যক্তির মধ্যে, তারপর এর প্রভাব প্রসারিত হয়ে চলবে, যারা সবাই প্রস্তুত তাদের মধ্যে, যেভাবে মানসতত্ত্ব বা প্রাণতত্ত্ব চিরন্তনভাবে ও স্বাভাবিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পৃথিবীতে। অন্যশব্দে, লক্ষ্য হল পৃথিবীর উপর এক দিব্য অতিমানবজাতির সৃষ্টি, যা আর অজ্ঞানতা, যন্ত্রণা ও বিনাশের নিয়মের অধীন থাকবে না।

এই পরিকল্পনা মনে হতে পারে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু তার একমাত্র কারণ আমাদের দৃষ্টি কয়েক দশকের সীমায় আবদ্ধ। বাস্তবিক, বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিবর্তনীয় পথের অনুসারী। যদি আমরা মনে করি যে, সকল পার্থিব সম্ভূতি পরমাত্মারই সম্ভূতি বিভিন্নরূপে, এবং এইসকল মানবজন্ম মানুষের মধ্যে আত্মা বা পরমাত্মারই বিকাশ, তা হলে আমাদের সন্দেহ হতে পারে এই বিষয়ে যে পরমাত্মা সবসময়ই সন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন মানবীয় সংকীর্ণতায়, ঠিক যেমন আমাদের সন্দেহ হতে পারে যে, তিনি যাত্রার শেষে শুধুই ফিরে যাবেন তাঁর অপার্থিব মহিমা ও আনন্দে, যা, প্রথমে, তাঁর পরিত্যাগ করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না— আলোক বিদ্যমান, চিরন্তন, আলোক পূর্ব হতেই আছে, শাশ্বত,

অপরিবর্তনীয়। পরমাত্মার পক্ষে এ এক অতি সামান্য বিজয়! কিন্তু জড়তত্ত্ব, এখানে এক স্বর্গ নির্মাণ করতে হবে। বোধ হয়, পরমাত্মার ইচ্ছা সেই একই মহিমা, একই আনন্দের অনুভূতি হোক, এমন এক পরিবেশে, যা তাঁর স্বরূপের আপাতবিরোধী, এমন এক জীবনে যা পরিবৃত মৃত্যু, অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের দ্বারা, এবং এই বিশ্বের বহুসংখ্যক বৈচিত্র্যের মধ্যে, এক শূন্য একত্বের পরিবর্তে? এই জীবন ও এই জড়তত্ত্ব তখন তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে, তখন তারা এক প্রায়শ্চিত্তের পন্থা হয়ে থাকবে না, কিংবা হবে না এক ব্যর্থ সংক্রমণ বিশ্বাতীতের অভিমুখে ; তখন তারা পরিণত হবে এক প্রয়োগশালায়, যেখানে ক্রমশ জড়তত্ত্ব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে সচেতন মানবের মাধ্যমে পরমাত্মা সৃষ্টি করছেন অতিমানবের, দেবতার। *শুধু মানবত্বে বিকশিত হয়ে আত্মা যা তার করণীয় তা সম্পূর্ণ করে নি ; তাকে আরও বিকশিত হতে হবে মানবত্বের ঊর্ধ্বতর সম্ভাবনারাজিতে। স্বাভাবিকভাবেই, যে আত্মা বাস করে ক্যারিব্‌-জাতীয়*† *একজন মানুষের মধ্যে, বা একজন অশিক্ষিত আদিম মানুষের মধ্যে, অথবা একজন প্যারিসীয় অ্যাপ্যাশ্‌*†† *কিংবা একজন আমেরিকীয় গ্যাংস্টারের*††† *মধ্যে, তার পক্ষে মানবজন্মের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয় নি, বিকশিত হয় নি তার সকল সম্ভাবনা বা মানবত্বের সমগ্র অর্থ, অভিব্যক্ত করে নি বিশ্বমানবের মধ্যে সৎ-চিৎ-আনন্দের সকল তাৎপর্য; প্রাণশক্তিসম্পন্ন, উৎপাদন-কর্ম-চঞ্চল ও প্রাণিক-ভোগে-রত য়ুরোপীয়, কিংবা গার্হস্থ্য ও অর্থনৈতিক জীবনের অজ্ঞানতাপূর্ণ আবর্তে সমাচ্ছন্ন এশীয় কৃষকের মধ্যে অন্তর্নিহিত আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ। যুক্তিপূর্ণভাবে, আমাদের সন্দেহ হতে পারে যে, জনৈক প্লেটো বা শংকর শীর্ষস্থানে অবস্থিত এবং সেখানেই মানুষের মধ্যে পরমচেতনার বিকাশের সমাপ্তি। আমরা মনে করে নিতে পারি যে, সেটাই হয়তো সীমা, কারণ তাঁরা ও তাঁদের মতো অন্যান্যেরা আমাদের নিকট প্রতীয়মান হন, যেন তাঁরা মানুষের মনের উচ্চতম চূড়ায় অবস্থিত। কিন্তু তা হতে পারে আমাদের বর্তমানের সম্ভাবনার ভ্রম। আত্মার এক অতীত ছিল যা প্রাক্‌-মানবীয়, এবং তার এক ভবিষ্যৎ আছে যা অতিমানবীয়।*[৪]

শ্রীঅরবিন্দ বিবর্তনের তত্ত্ববাদী নন, তিনি বিবর্তনের প্রয়োগবিৎ। বিবর্তনের বিষয়ে তিনি যা কখনো বলেছেন বা লিখেছেন, তা তাঁর অনুভূতির পরেই

---

† Caribee : মধ্য-আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্যারিবিয়ান উপকূলের লোহিত ভারতীয় ; Carib বা Carib Indian নামেও উল্লিখিত।

†† উত্তর আমেরিকার লোহিত ভারতীয়। যে নামে পরে প্যারিস-এর বিদেশী বংশোদ্ভব গুণ্ডাও নামিত।

††† গুণ্ডা ও দুর্বৃত্ত দলের সদস্য।

এসেছে। আলিপুর জেলে অন্ধকারে হাতড়িয়ে তিনি যে অনুসন্ধান করছিলেন তার উপর কিছু আলোকপাত করবার জন্যই শুধু আমরা সময়ের আগে কিছুটা এগিয়ে গেছি, এবং সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে দেখেছিলেন যে, এই বিশ্বময় আনন্দময় বিশালতা প্রকৃতপক্ষে কর্মভূমি নয়। তাঁকে ফিরে বিনম্রভাবে নেমে আসতে হয়েছিল এই শরীরে, এবং সেখানেই অনুসন্ধান চালাতে হয়েছিল। তথাপি আমরা প্রশ্ন করতে পারি, যদি চিৎশক্তির মাধ্যমে এবং বাইরের কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই আমাদের "রূপান্তর" আনতে হবে, তা হলে বিশ্বচেতনার অপেক্ষা উচ্চতর আর কোন্ চেতনা আছে? সোপানের শীর্ষে শক্তির শেষসীমায় কি আমরা উপনীত হই নি? যদি আমরা এই আবিষ্কারের কার্যকারী প্রক্রিয়াটি বোঝবার জন্য ইচ্ছা করি, তা হলে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পর্যবেক্ষণ দু-প্রকার হতে পারে। প্রথমত, শুধু চেতনার উচ্চতর শক্তিসমূহের প্রাপ্তিই যথেষ্ট নয়, তাদের শরীরে ধারণ করবার জন্য *কোনো একজন* বিদ্যমান হওয়া উচিত। নচেৎ আমরা হয়ে যাব সেই শিকারীর মতো যে অবিশ্বসনীয় সম্পদ জয় করে, তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। এই বিশ্বচেতনায় "কোনো একজন" কে? কেউ আর সেখানে অবশিষ্ট নেই। আজকের দিনের এক দৃষ্টান্তে কথাটি বেশি ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে : আমবা এক রকেট পাঠাতে পারি সূর্যে, এবং তার দ্বারা বিশ্বের শীর্ষে উপনীত হতে পারি, কিন্তু মানুষের শীর্ষে নয়, সেই প্রক্রিয়ায় মানুষ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হয় নি, কারণ রকেট চলে গেছে পৃথিবী ক্ষেত্র হতে *বাইরে*। অনুরূপভাবে, যোগী একাগ্র হন তাঁর সত্তার একটি বিন্দুতে, তাঁর সকল শক্তি সংকেন্দ্রিত করেন, যেমন রকেটের কোন্-এ † করা হয়। তাঁর আবরণের মধ্যে এক ছিদ্র প্রস্তুত করে অন্যত্র আবির্ভূত হন তিনি, অন্য এক বিশ্বগত বা নির্বাণীয় পরিসরে :

অগ্নিময় শঙ্কুসম জ্বলন্ত আরোহী তিনি।[৮]

কিন্তু বিশ্বচেতনার উপলব্ধি *কে* করেছেন? যোগী করেন নি— যোগী পান করেন, ভোজন করেন, নিদ্রাগমন করেন, মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন অন্যান্য সব মানবীয় প্রাণীর মতো, এবং মৃত্যুও বরণ করেন। উপলব্ধি তাঁর হয় নি, তাঁর সত্তার এক অতি ক্ষুদ্র অংশের উপলব্ধি হয়েছে এই বিশ্বগত চেতনার, *ঠিক সেই* অংশ যার উপর তিনি অবিরাম একাগ্রতা নিবদ্ধ করেছেন, বাইরে যাওয়ার জন্য। অবশিষ্ট সব-কিছু, এইসব মানবিক ও পার্থিব প্রকৃতি যা তিনি বস্তুত বর্জন করেছেন, অবদমিত করেছেন, উৎপীড়িত করেছেন, পলায়নের সেই একটি বিন্দুর উপর একাগ্র হওয়ার জন্য, সেসব তাঁর বিশ্বচেতনায় অংশগ্রহণ করে না

† Cone : শঙ্কু।

শুধু পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হওয়া ব্যতীত। এইভাবে শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ্য করলেন এই প্রথম তথা গুরুত্বপূর্ তথ্য যে, একটি অংশে এক রেখাকৃতি উপলব্ধি যথেষ্ট নয় : সকল অংশে *এক বিশ্বময় উপলব্ধির* প্রয়োজন আছে, এক উপলব্ধি যা ব্যক্তির সমগ্রতাকে সাদরে গ্রহণ করে। শ্রীমা বলছেন : *যদি তুমি চাও তোমার প্রকৃতির ও তোমার সত্তার রূপান্তর এবং চাও নতুন বিশ্বের সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ, তা হলে যথেষ্ট নয় এই অভীপ্সা, এই একমুখী ও সরলরৈখিক গতি ; তোমার চেতনায় তোমাকে সব-কিছুই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সব-কিছুই ধারণ করতে হবে।* সেই কারণেই এই পূর্ণাঙ্গযোগ বা *পূর্ণযোগ*। আমরা প্রচেষ্টা করেছি আমাদের ব্যক্তিত্ব হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, আধ্যাত্মিক ও বিশ্বময় বিশালতার মধ্যে ডানা ঝাপটিয়ে ওড়ার জন্য, এই বিসদৃশ বোঝা হতে মুক্ত হয়ে। কিন্তু এ ছাড়া আমরা পৃথিবীর জন্য কিছুই করতে পারব না, উর্ধ্বের যত সম্পদ তা আমরা নামিয়ে আনতে পারব না : *অসীমের মধ্যে, শুধু ব্যক্তিত্বের এক কল্পনাপ্রসূত আবরণের আত্মবিচূর্ণন ছাড়াও আরও কিছু রয়েছে।*[৯] এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমরাও উপনীত হই এই প্রথম সিদ্ধান্তে : *ব্যক্তির শ্বাসরোধ হতে পারে মানুষের মধ্যে দেবতার শ্বাসরোধ।*[১০]

এক দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ, যা আরও গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের প্রবলভাবে অভিভূত করে। আমাদের উদাহরণে ফিরে আসা যাক ; পৃথিবীর বাতাবরণকে যে-কোনো স্থানে রকেট বিদীর্ণ করতে পারে ; নিউইয়র্ক বা বিষুবরেখা থেকে ওড়া শুরু করে এ সূর্যেও পৌঁছতে পারে : এভারেস্ট শৃঙ্গের উপর আরোহণ করবার কোনো প্রয়োজন হয় না, রকেটের প্রক্ষেপণস্থান প্রস্তুত করবার জন্য! *ঠিক তেমনই যোগী যে-কোনো অংশে বিশ্বচেতনার উপলব্ধি পেতে পারেন*— তাঁর মনে, তাঁর প্রাণে, এমন-কি, তাঁর শরীরেও— কারণ বিশ্বময় পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান, বিশ্বের প্রত্যেক বিন্দুতে, এবং অনুভূতি আরম্ভ হতে পারে যে-কোনো স্থানে, যে-কোনো উচ্চতায়, একাগ্রতা সাধন করে কোনো এক পাথরের উপর বা চড়ুই পাখির উপর, বা কোনো ধারণা, কোনো প্রার্থনা, কোনো অনুভূতির উপর, কিংবা তার উপর যাকে অনেকেই অবজ্ঞাভরে অভিহিত করে 'মূর্তি'। বিশ্বময় চেতনা মানবচেতনার উচ্চতম শীর্ষবিন্দু নয় ; সেখানে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদের ব্যক্তির উর্ধ্বস্থ *কোথাও পদক্ষেপ নিতে হবে না, বরং পদক্ষেপ নিতে হবে ব্যক্তির বাইরে।* বিশ্বগত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য, চেতনায় আরোহণের কোনো প্রয়োজন নেই, কিংবা প্লটিনাস্[†] হয়ে ওঠার কোনো প্রয়োজনও নেই ; তার

[†] Plotinus : (খ্রীঃ ২০৩-২৭০) : দার্শনিক, নব্য প্লেটোনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। বাস্তব জগতে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার পূর্ণ উপলব্ধি অপেক্ষা সেখান থেকে এক অতীন্দ্রিয় রহস্যময় পলায়নের পন্থার নির্দেশ তাঁর দর্শন দেয়।

বিপরীত, যার মনন যত কম, ততই সহজ হয় এই অনুভূতি— তারকারাশির নিচে এক মেষপালকের কিংবা গ্যালিলির †† এক মৎস্যজীবীর উৎকৃষ্টতর সম্ভাবনা আছে এবিষয়ে, বিশ্বের সম্মিলিত সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি অপেক্ষা। তা হলে কী লাভ মানবচেতনার অভিবৃদ্ধিতে, যদি লোকপ্রচলিত অতীন্দ্রিয়বাদই উৎকৃষ্টতর? আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, হয়তো আমরা সকলেই ভুল পথে যাচ্ছি, নচেৎ অতীন্দ্রিয়বাদের পলায়ন বিবর্তনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য নয়। অন্যপক্ষে যদি আমরা মনে করি যে, পার্থিব চেতনার উচ্চ শিখরগুলির পথই আমাদের অনুসরণযোগ্য বিবর্তনের পথ— যেমন, একজন লিওনার্দো দ্য ভিন্‌সি, একজন বিঠোফেন, একজন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, একজন দান্তে— তা হলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে এসকল উচ্চতা জীবনকে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয় নি। মনের বা হৃদয়ের শিখরগুলি আমাদের দেয় না প্রহেলিকার সমাধান ও জগতের রূপান্তরের শক্তি, যেমন বিশ্বগত শিখরগুলিও তা দেয় না : চেতনার অন্য এক তত্ত্বের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা হওয়া উচিত অন্য এক তত্ত্ব, অন্যান্য তত্ত্ব হতে *অবিরতভাবে অবিচ্ছিন্ন*। কারণ যদি সংযোগটি ভেঙে যায় বা ব্যক্তিটি হারিয়ে যায়, তা হলে আমরা আবার ফিরে যাই মহাজাগতিক বা অতীন্দ্রিয় বিস্ফোরণে, যার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। একত্ব ও বিশ্বাতীতের বিষয়ে সচেতন হওয়া নিঃসন্দেহে এক অপরিহার্য ভিত্তিভূমি যে-কোনো উপলব্ধির জন্য (এ ছাড়া, বিষয়টি বিনা ভিত্তিভূমিতে গৃহ-নির্মাণের মতো হবে)। কিন্তু তা অর্জন করতে হবে এমন পথে যা সম্মান করে বিবর্তনীয় অবিচ্ছিন্নতাকে— বিবর্তন হওয়া উচিত, বিপ্লব নয়। সংক্ষেপে, আমরা বাইরে যাওয়ার জন্য প্রয়াস করব, পলায়ন না করেই। সূর্যের সঙ্গে সংঘৃষ্ট হয়ে বিনষ্ট হওয়া রকেটের পরিবর্তে আমাদের প্রয়োজন এক রকেট যা পরমচেতনার সূর্যের লক্ষ্যভেদ করে ও সামর্থ্যবহন করে সেই চেতনাকে নামিয়ে আনবার জন্য আমাদের পার্থিব চেতনার সকল অংশে : *পরম জ্ঞান সেই, যা ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করে ও গ্রহণ করে বিশ্বময়ভাবে ও বিশ্বাতীতভাবে, এবং পূর্ণযোগ সেই, যা বিশ্বাতীতকে আবিষ্কার করবার পর বিশ্বে ফিরে আসতে পারে ও তাকে অধিকার করতে পারে, এবং অস্তিত্বের মহান্ সোপানক্রমে মুক্তভাবে অধিরোহণ ও অবরোহণ করবার শক্তি ধারণ করে।*[১১] ব্যক্তিগত চেতনার অধিরোহণ ও অবরোহণের এই দ্বৈত গতিই অতিমানস আবিষ্কারের মূল নিয়ম। কিন্তু পথিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ স্পর্শ করবেন এমন এক অজানা উৎস যা সব-কিছু আমূল পরিবর্তন করে দেবে।

†† Galilee : এখানে যীশু খ্রীস্ট তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। তাঁর সময়ের রোম-শাসিত প্যালেস্টাইন (Palestine)-এর এক প্রদেশ বা বিভাগ।

চেতনাব আবোহণ

শুধু শ্রীঅরবিন্দের আবিষ্কারের বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। আমাদের জানা উচিত কীভাবে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারব। তথাপি, একটা নক্‌শা এঁকে জোর দিয়ে বলা "এই হল পথ"— তা বরং কষ্টকর, কারণ আধ্যাত্মিক বিকাশ সবসময়ই ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি অনুযায়ী হয়। এবং তার যথেষ্ট কারণ আছে : আমাদের কাছে যা বিজাতীয় তেমন কোনো-কিছু শেখার প্রশ্ন নয় এ, বরং *নিজেদের* সম্বন্ধে জানার প্রশ্ন, এবং কোনো দুটো প্রকৃতি এক নয়। *আমাদের যোগের জন্য যে আদর্শ আমি স্থাপন করেছি, তা সমস্ত আধ্যাত্মিক জীবন ও প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ করে না। আধ্যাত্মিক জীবন এমন কোনো বস্তু নয়, যাকে এক কঠোর সংজ্ঞায় সূত্রবদ্ধ করা যেতে পারে বা এক স্থির মানসিক নিয়মে আবদ্ধ করা যেতে পারে : এ হল বিবর্তনের এক বিশাল ক্ষেত্র, এক বিরাট সাম্রাজ্য যা সম্ভাব্যরূপে এর নিম্নস্থ যে-কোনো সাম্রাজ্য হতে বৃহত্তর, এবং এর মধ্যে আছে কত কত অঞ্চল, সহস্র প্রকারের নমুনা, স্তর, আকার, পথ, আধ্যাত্মিক আদর্শের বৈচিত্র্য, আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্রম।*[১২] সুতরাং আমরা শুধু কিছু পথনির্দেশ দিতে পারি, এই আশায় যে প্রত্যেকেই সন্ধান পাবে কিছু সূত্রের যা তার *নিজস্ব* পথের উপর আলোকপ্রদান করতে পারবে। আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখা উচিত যে, যোগের প্রকৃত পদ্ধতি হল আমাদের *নিজেদের* চেতনার সূত্রকে ধরতে পারা, ঋষিদের "উজ্জ্বল সূত্র" (ঋগ্‌বেদ ১০.৫৩), এবং তার সঙ্গে লেগে থাকা ও শেষ সীমা পর্যন্ত যাওয়া।

আমরা বিবর্তনের যে সূত্রের অন্বেষণ করছি, তা বিশ্বগত চেতনায় ও নির্বাণে আমরা পাই নি ; সেজন্য শুরু করা যাক আমাদের অনুসন্ধান শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে, যেখানে তিনি তা ছেড়েছিলেন বরোদায়, তাঁর দুটি মহান্ অনুভূতির পূর্বে। প্রথম পদক্ষেপটি হল অতিচেতনায় আরোহণ। আমরা দেখেছি, সাধক যখন তাঁর মনে নীরবতা প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর প্রাণকে প্রশান্ত করেন এবং নিজেকে মুক্ত করেন দৈহিক চেতনার মধ্যে নিমজ্জন হতে, চেতনা তখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সহস্র প্রকার কার্যকলাপ হতে যার মধ্যে তা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ও বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে, এবং গ্রহণ করে এক স্বাধীন অস্তিত্ব। তা এক অন্তর্নিহিত সত্তার মতো, এক শক্তি যা স্পন্দনরত, ক্রমবর্ধমান তীব্রতার সঙ্গে। যতই এ বিকশিত হয়, শরীরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে ততই বেশি এ অসন্তুষ্ট হয়। আমরা দেখি, এ আলোক বিকীর্ণ করে, প্রথমে আমাদেব নিদ্রার মধ্যে, তারপর আমাদের ধ্যানে, তারপর আমাদের উন্মীলিত প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে। কিন্তু বিশ্বমনে, বিশ্বপ্রাণে ও বিশ্বময় জড়তত্ত্বে এই গতি যা মনে হয় একপার্শ্বিক, তা এর একমাত্র গতি নয় : চেতনা অভ্যুত্থানেরও অভীপ্সা করে। আরোহণের এই প্রেরণা নাও হতে

পারে এক সচেতন শৃঙ্খলার পরিণাম, তা হতে পারে এক স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োজন (এই সত্য কখনো দৃষ্টির বহির্ভূত করা উচিত নয় যে এই জীবনে আমাদের প্রচেষ্টা অন্য অনেক জীবনের অন্য অনেক প্রচেষ্টার অবিরাম অনুবৃত্তি মাত্র ; সেজন্যই বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ অসমান, এবং কোনো অপরিবর্তনীয় নিয়ম স্থির করাও অসম্ভব)। আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভব করতে পারি কিছু-একটা আমাদের মস্তকের উপর, যা আমাদের আকর্ষণ করে, এক বিশাল বিস্তৃতির মতো, অথবা এক আলোকের মতো, অথবা এক চুম্বকীয় মেরুর মতো, যা আমাদের সকল কর্ম ও চিন্তনের উৎস, কিংবা আমাদের মস্তকের শীর্ষদেশে একাগ্রতার এক অঞ্চলের মতো। সাধক তাঁর মনকে নীরব করেছেন, শুধু একটি গাছের গুঁড়ির মতো অসাড় হওয়ার জন্য নয় ; তাঁর নীরবতা মৃত নয়, জীবন্ত। তাঁর সুর ঊর্ধ্বে বাঁধা, কারণ সেখানেই তিনি জীবনের সন্ধান পান। নীরবতা লক্ষ্য নয়, উপায়, ঠিক যেমন সংগীতের তত্ত্বের বিষয়ে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য সংগীতকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা, এবং সংগীত বহুবিধ। দিনের পর দিন, যখন তাঁর চেতনা ক্রমবর্ধমানভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে, তখন তার শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতি লাভ হয়, যা প্রায় প্রত্যক্ষ করতে পারা যায় না, এবং এসবের উৎস ঊর্ধ্বের সেই নীরবতা। তাঁর চিন্তাশূন্য অবস্থায়, সহসা তাঁর মনকে অতিক্রম করে যায় এক চিন্তন— এক চিন্তনও নয়, শুধু এক ঝলক, এবং তিনি জানতে পাবেন, যথার্থভাবে, তাঁকে কী করতে হবে, এবং কীভাবে করতে হবে, তাঁর সূক্ষ্মতম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় পর্যন্ত, যেন একটি প্রহেলিকার সমাধান চোখের পলকে হয়ে যায়, এবং এক বিপুল নিশ্চয়তার সঙ্গে (নিম্নে, সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা, এবং সব-কিছুই সবসময় এদিক-সেদিক হতে পারে)। অথবা, এক মৃদু সাড়া তাঁর মনে জাগে, "অমুকের সঙ্গে দেখা করতে যাও", এবং তিনি যান ও "দৈবক্রমে" সেই ব্যক্তির প্রয়োজন থাকে তাঁকে ; কিংবা মনে জাগে, "এ কাজ কোরো না", তিনি ক্রমাগত প্রয়াস করেন এবং তাঁর হয় এক বিশ্রী পতন ; অথবা বিনা কারণেই তিনি প্রেরিত হন কোনো এক বিশেষ স্থানে যাওয়ার জন্য, এবং সেখানে সেই ঘটনাক্রমের সংস্পর্শে যা তাঁকে সাহায্য করবে ; কিংবা যদি কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়, তিনি স্থির, নীরব হয়ে ঊর্ধ্বের প্রতি প্রার্থনাশীল হন, এবং তারপর উত্তর আসে স্বচ্ছ ও অনিবার্য। কিংবা যখন তিনি কথা বলেন, বা লেখেন, তিনি খুবই বাস্তবভাবে অনুভব করতে পারেন ঊর্ধ্বে এক বিস্তৃতি, যেখান থেকে তিনি আহরণ করেন তাঁর চিন্তন, এক জ্যোতির্ময় রেশমকোষ থেকে সুতো বের করে নেওয়ার মতো —তিনি নিঃস্পন্দ হয়ে শুধু সেই প্রবাহের নিম্নে স্থিত হয়ে তাকে ভাষায় প্রকাশ করেন ; তাঁর মস্তিষ্কে কোনো ক্রিয়াই হয় না। কিন্তু তিনি যদি তাঁর মনকে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে দেন, তা হলে সব-কিছু অন্তর্হিত হয়ে যায়, বা, বরং বিকৃত হয়ে যায়, কারণ মন চেষ্টা করে ঊর্ধ্বের অনুকরণ করতে

(এ এক অনুকরণকারী বানর, যে সংশোধনের অতীত) এবং নিজেরই আলেয়ার আলো-কে গ্রহণ করে জ্ঞানজ্যোতিঃ-রূপে। সাধক যতই বেশি শুনতে শেখেন ঊর্ধ্বের বাণী, এসব সূচনার অনুসরণ করেন (এসব আদেশ নয়, কিংবা উচ্চস্বরে ঘোষিত হয় না, বরং অতি কষ্টেই শোনা যায়, নিশ্বাসের মতো, প্রায়ই চিন্তায় আসে না, শুধু অনুভূত হয় এবং এরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত)। এরা ততই বেশি হয়ে ওঠে সংখ্যাধিক, ত্রুটিহীন ও দুর্নিবার। সাধক ক্রমশ উপলব্ধি করেন যে তাঁর সকল কর্ম, তাঁর ন্যূনতম কর্মও, ঊর্ধ্বের এই নীরব উৎসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে সর্বোৎকৃষ্ট-রূপে, তাঁর সকল চিন্তন সেই উৎস হতে প্রবাহিত হয়, জ্যোতির্ময়রূপে ও বিবাদাতীত-ভাবে, এবং তাঁর অন্তরে উদিত হয় একপ্রকার *স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান*। অবিরতভাবে ছোটো ছোটো অলৌকিকতার মধ্যে তিনি জীবনযাপন শুরু করেন। *যেসব অঞ্চলের উপর এখনও আমাদের জান্তব বিবর্তন জয়লাভ করতে পারে নি, সেসব অঞ্চলে কী অসীম আনন্দ, কী পূর্ণ শক্তি, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের কী জ্যোতির্ময় পরিসীমা, আমাদের সত্তার কী বিরাট্ প্রশান্তি আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছে, যদি মানবজাতি শুধু তার এক ঝলক মাত্র পেতে পারত, তা হলে তারা সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে এসব ঐশ্বর্যের প্রাপ্তি পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করত না। কিন্তু পথ খুবই সংকীর্ণ, দ্বার সবই শক্তিপ্রয়োগেও দুর্ভেদ্য এবং সেখানে আছে ভয়, অবিশ্বাস, সন্দেহ, এবং আছে প্রকৃতির প্রহরীরা, যারা নিষেধ করে তার সাধারণ চারণভূমি হতে আমাদের পদক্ষেপ দূরে চলে যাওয়া।*[১৩]

ঊর্ধ্বের এই বিশালতা যখনই মূর্ত হয়, জীবন্ত হয়, মস্তকেব ঊর্ধ্বে এক আলোকবিস্তৃতির মতো, সাধক তখন তার সঙ্গে এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগে প্রবেশ করবার, এক উন্মুক্ত পরিসরে প্রবেশ করবার প্রয়োজন অনুভব করেন, কারণ তখন তিনি ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্মতার সঙ্গে এ কথাও অনুভব করতে শুরু করেন যে, নিম্নে প্রাণ ও মন কত সংকীর্ণ, কত মিথ্যা, যেন একপ্রকার প্রহসন। তিনি অনুভব করেন সব-কিছুর সঙ্গেই তাঁর হঠাৎ সংঘর্ষ হচ্ছে। কোথাও তিনি স্বচ্ছন্দে নেই, এবং সব-কিছুই— শব্দ, ধারণা, অনুভূতি— মিথ্যা ও কর্কশ : এ তৎ নয়, কখনো তৎ নয়, সবসময়ই স্থানচ্যুত, সবসময়ই প্রায় যথার্থ মাত্র, সবসময়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট। কখনো কখনো আমাদের নিদ্রায়, অগ্রদূতরূপে আমাদের সম্মুখে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয় এক অতি সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ, এতই প্রখরভাবে উজ্জ্বল যে স্বাভাবিকভাবেই আমরা আমাদের দৃষ্টি আবৃত করে দিই— শ্রীমার ভাষায়, *তুলনায় সূর্যও মনে হয় অন্ধকার।* এই শক্তিকে, অন্বেষণপূর্বক ঊর্ধ্বায়িত-হতে-থাকা এই চিৎশক্তিকে আমাদের ক্রমাগতভাবে অভিবর্ধিত হতে দেওয়া উচিত আমাদের অভ্যন্তরে, "অন্যকিছুর" জন্য আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে একেও আমাদের পরিচালিত করতে দেওয়া উচিত এক সত্যতর জীবন, এক সত্যতর জ্ঞান, জগৎ ও সত্তাসমূহের সঙ্গে এক সত্যতর সম্পর্কের জন্য—

আমাদের *মহত্তম প্রগতি এক নিগূঢ় প্রয়োজন।*[১৪] আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত সকল মানসিক গঠন, যে-সব প্রতি মুহূর্ত প্রয়াস করে এই জ্যোতির্ময় সূত্রটিকে ছিনিয়ে নিতে তাদের নিজেদের জন্যই। আমাদের নিজেদের রাখা উচিত এক অবিরাম উন্মুক্ত অবস্থায়, এবং হওয়া উচিত বিশালতর সকল চিন্তন হতে। কারণ আমাদের চিন্তার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন স্থানের। *শুধুই যে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের জাল আমরা নিশ্চয়ই ছিন্ন করব, তাই নয়, চিন্তাশীলের জাল, ধর্মতত্ত্ববিদের জাল, উপাসনালয়-নির্মাতার জাল, শব্দের জাল ও ধারণার বন্ধন হতেও আমাদের নিশ্চয়ই অপসৃত হয়ে যেতে হবে। এসব-কিছু আমাদের মধ্যেই নিহিত, আত্মপুরুষকে আকারের প্রাচীরে আবদ্ধ করবার জন্য। কিন্তু আমাদের সবসময় এদের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। সবসময়ই ত্যাগ করতে হবে ন্যূনতরকে মহত্তরের জন্য, সসীমকে অসীমের জন্য ; আমাদের সবসময়ই প্রস্তুত হতে হবে অগ্রসর হওয়ার জন্য, উদ্দীপ্তি হতে উদ্দীপ্তি পর্যন্ত, অনুভূতি হতে অনুভূতি পর্যন্ত, আত্মার এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থা পর্যন্ত। যে-সব সত্য আমরা অধিকতম সুরক্ষিত ভাবে ধরে রাখি, তাদের প্রতি আমরা আসক্ত হব না, কারণ তারা অনির্বচনীয়েরই কিছু রূপ ও অভিব্যক্তি মাত্র, যে অনির্বচনীয় নিজেকে কোনো রূপ বা অভিব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ করতে চান না। আমাদের সবসময়ই নিজেদের উন্মুক্ত রাখতে হবে ঊর্ধ্বতর শব্দের প্রতি, যা নিজেকে নিজের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না, এবং উন্মুক্ত রাখতে হবে চিন্তার আলোকের প্রতি, যা নিজের মধ্যেই নিজের বিপরীতকে বহন করে।*[১৫] তারপর একদিন, যখন আমাদের প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরে জ্বলন্ত হয়ে থাকবে, যখন আমরা বহুদিন ধরে থাকব এক সংকুচিত ঘনীভূত পদার্থের মতো, তখনই দ্বার উন্মুক্ত হবে। শ্রীমা বলেছেন : *চেতনা ঊর্ধ্বায়িত হয়, ও মস্তকের উপরের শক্ত আবরণ ভেঙে ফেলে, এবং তুমি আলোকের মধ্যে প্রকাশিত হও।*

তীব্র শুভ্র এক প্রশান্তি ঊর্ধ্বে বিদ্যমান।[১৬]

•

এই অনুভূতি হতেই শ্রীঅরবিন্দের যোগের আরম্ভ। এ হল অতিচেতনার মধ্যে আবির্ভাব, সংক্রমণ এক অতীত হতে, যা আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখে, এক অতীতে যা দৃষ্টিসম্পন্ন। সবসময় ভারাক্রান্ত হয়ে নিম্নে অবস্থিত হওয়ার পরিবর্তে, আমরা ঊর্ধ্বে অবস্থান করি ও মুক্ত নিশ্বাস গ্রহণ করি : *চেতনা আর অবস্থিত নয় শরীরের মধ্যে, কিংবা তার দ্বারা সীমাবদ্ধও নয় ; এ নিজেকে শুধু তার ঊর্ধ্বে অনুভব করে, তাই নয়, বরং আরও অনুভব করে যে এ মহাকাশে প্রসারিত ; এর ঊর্ধ্বস্থিতির নিম্নে শরীর অবস্থিত ও এর প্রসারিত চেতনায় আবৃত। এর সত্তার বিশালতায় তা হয়ে ওঠে শুধু একটি ঘটনাক্রম, এরই এক যন্ত্র। ঊর্ধ্বে এক উচ্চতর স্থিতির এই নির্দিষ্ট উপলব্ধিতে, নিম্নে আর কোনো অবতরণ*

প্রকৃতপক্ষে নেই, শুধু চেতনার এক অংশ নিম্নে অবতরণ করতে পারে শরীরের মধ্যে বা নিম্নস্তরগুলিতে সক্রিয় হওয়ার জন্য, এবং চিরন্তনরূপে ঊর্ধ্বস্থ এই উচ্চতম সত্তা সকল উপলব্ধি ও কর্মের উপর অধ্যক্ষতা করে।[১৭]

সমাধি

উড্ডয়নের জন্য ভূমিত্যাগের মতো এই উপলব্ধি একবার হয়ে গেলে, আমাদের ধীরে ধীরে ও সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হওয়াই ভালো। চেতনার প্রাথমিক ক্রিয়া হল তীর বেগে ঊর্ধ্বে ধাবিত হওয়া, যেন ঊর্ধ্বে টেনে নেওয়া হয় এক রকেটের মতো, অনন্ত আরোহণের সংবেদন সহ, এক জ্যোতির্ময় নির্বাণে স্থিরীভূত হওয়া পর্যন্ত। শীর্ষে (অথবা শীর্ষরূপে যা আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় সেইখানে) এই প্রস্ফুটনের সঙ্গে যে আনন্দ উপলব্ধ হয়, অথবা এই বিলয়, এতই দুর্নিবার যে, নিম্নে অন্তর্বর্তী স্তরসমূহে কোনো অন্বেষণের জন্য অবতরণ করা সম্পূর্ণরূপে অসংগত মনে হয়— তা হবে এক পতন। আমরা যে একমাত্র বস্তু চাই, তা হল যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে থাকা, যেন এই অখণ্ড প্রশান্তি বিক্ষুব্ধ না হয়। বস্তুত, মস্তকের ঊর্ধ্বে বহির্গমনের যে পথ ও পথের শেষে পরম উচ্চে যে একীভবন, তাদের অন্তর্বর্তী স্তরসমূহের বিষয়ে সাধক মোটেই সচেতন নন ; অভিভূত অবস্থায়, প্রথমবার-চোখ-খুলে-দেখা, কিছুটা এক নবজাত শিশুর মতো, সাধক খুঁজে পান না নিজেরই অস্তিত্ব, সব-কিছুই মিশিয়ে দেন একপ্রকার শুভ্রতায়, বরং এক নীলাভ শুভ্রতায়, এবং হারিয়ে ফেলেন নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ তিনি নিমগ্ন হন এক আবিষ্ট অবস্থায়, যাকে পাশ্চাত্যদেশে বলা হয় "ecstasy", অথবা ভারতবর্ষে "সমাধি"। সে অবস্থা হতে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করেন, তখন দেখেন যে, পূর্বে তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তা থেকে কিছুই অগ্রগতি হয় নি। *লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ত্বরায়, জ্ঞানের পুরাতন যোগপন্থা মনে করে যে, চিন্তাশীল মনে ও পরমোচ্চের মধ্যে অন্য কিছুই নেই, এবং সমাধিতে নিজের দৃষ্টি বন্ধ করে, যা-কিছু প্রকৃতই পথের মধ্যে আসে, সে তাদের মধ্য দিয়ে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করে, পরমাত্মার এই সব মহান ও জ্যোতির্ময় সাম্রাজ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করেই। বোধ হয়, সে তার লক্ষ্যে উপনীত হয়, কিন্তু শুধুই অসীমের মধ্যে নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে।*[১৮]

স্বাভাবিকভাবেই, সাধক বলবেন যে, এ এক বিস্ময়জনক অবস্থা, অনির্বচনীয়, পরম ; এবং তা সত্য। কিন্তু শ্রীমা মত ব্যক্ত করেছেন, *এ বিষয়ে তুমি যা খুশি তাই বলতে পারো, কারণ, তুমি কিছুই মনে রাখো না ; হ্যাঁ, যখন তুমি তোমার সচেতন সত্তার বাইরে যাও এবং তোমার এমন অংশে প্রবেশ করো যা সম্পূর্ণভাবে অচেতন, বা এমন এক অঞ্চলে যেখানে তোমার চেতনার অনুরূপ*

কিছু নেই, তখনই তুমি সমাধিমগ্ন হও। তুমি তখন অধিষ্ঠিত হও এক নৈর্ব্যক্তিক অবস্থায়, অর্থাৎ এমন এক অবস্থায় যেখানে তুমি অচেতন, এবং সে কারণেই, স্বাভাবিক-ভাবেই, তুমি কোনো কিছুই মনে রাখো না : তুমি কোনো বিষয়েই সচেতন হও নি। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন যে, সমাধি শুধুই নিশ্চেতনার এক উচ্চতর অবস্থা। বহুবার আমাদের যা বলা হয়েছে, এমনও হতে পারে যে, যাকে আমরা বলি বিশ্বাতীত, পরব্রহ্ম বা পরম, তা এক সমাধিগত বিলয়প্রাপ্তি নয়, বরং শুধু আমাদের *বর্তমান* চেতনার সীমা। এ কথা বলা হয়তো অদ্ভুত, "এখানে বিশ্বের সমাপ্তি ও সেখানে বিশ্বাতীতের আরম্ভ", যেন দুটোর মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান আছে ; পিগ্‌মির কাছে হয়তো এমন হতে পারে যে, যুক্তির অআকখ হতেই বিশ্বাতীত শুরু হয়, এবং বুদ্ধির স্তর অতিক্রম না করেও জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়। ব্যবধান কোথাও নেই, আমাদের চেতনায় ছাড়া। এক অন্তহীন বিশ্বাতীতের মধ্যে চেতনার ক্রমবর্ধমান দূরতর সীমা চিরন্তনভাবে অন্বেষণ করাই বোধহয় যথার্থরূপে বিবর্তনীয় অগ্রগতির অর্থ ; বিশ্বাতীত প্রকৃতপক্ষে "ঊর্ধ্বে" নেই, অথবা বিশ্বের বাইরে অন্য কোথাও নেই, বরং বিদ্যমান সর্বত্র, এখানে, নিম্নে, এবং নিজেকে প্রকাশ করছে আমাদের দৃষ্টিতে, ধীরে ধীরে। কারণ, যদি প্রাগৈতিহাসিক সময়ে কোনো একদিন, বিশ্বাতীত অবস্থিত ছিলেন প্রোটোপ্লাজ্‌ম্-এর [প্রাণকোষের মূল উপাদানের] কিছু ঊর্ধ্বে, তার অর্থ নয় যে তিনি প্রোটোপ্লাজ্‌মের জগৎ ছেড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এক উচ্চতর স্থানে, উভচরদের জগতের ঊর্ধ্বে, তারপর শিম্পাঞ্জিদের জগতের ঊর্ধ্বে, তারপর মানুষের জগতের ঊর্ধ্বে, যেন একপ্রকার প্রগতির দৌড়ে ধাবমান, যা থেকে তিনি ক্রমাগতভাবে বহিষ্কৃত ; এর অর্থ এই যে, আমরাই সে আদিম নিশ্চেতনাকে পরিত্যাগ করেছি, আমাদের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বাতীত সত্তার অভিমুখে কিছু কিছু অধিকতর অগ্রসর হয়ে জীবনযাপন করবার জন্য। *

সুতরাং, শীর্ষে (অথবা যাকে তিনি শীর্ষদেশ মনে করেন সেখানে) মূর্ছিত হওয়া ও নিজের সমাধিকে প্রগতির চিহ্ন মনে করা অপেক্ষা সাধকের বোঝা উচিত যে, এ হল নিশ্চেতনার এক চিহ্ন, এবং তাঁর সম্মোহিত হওয়ার অন্তস্তলে যে জীবন্ত অস্তিত্ব নিহিত আছে, তাকে অনাবৃত করবার জন্য সক্রিয় হওয়া উচিত। শ্রীমা বলেছেন : *তোমার আন্তর-ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনের প্রয়াস করো, এবং তা হলেই এসব অঞ্চলে পূর্ণ চেতনার সঙ্গে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে, সমর্থ হবে উচ্চতম অঞ্চলসমূহের সঙ্গে যোগাযোগের আনন্দ উপলব্ধি করতে, চেতনা না হারিয়ে, কোনো অনুভূতি বিনা শূন্য অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসবার*

* এই অবস্থায় এর বেশি কিছু বলা অসম্ভব। এই মিথ্যা বিরোধের সমাধান-প্রাপ্তির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে অতিমানসিক অভিজ্ঞতালাভ পর্যন্ত।

*পরিবর্তে।** এবং শ্রীঅরবিন্দ জোর দিয়ে বলেছেন : *এই উপলব্ধি জাগ্রৎ অবস্থায় আসা উচিত এবং জীবনের এক বাস্তব সত্য হওয়ার জন্য স্থায়ী হওয়া উচিত। সমাধিতে যেসব অনুভূতি হয়, তাদের উপযোগিতা রয়েছে সত্তার উন্মীলনে ও প্রস্তুতিতে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় উপলব্ধি যখন চিরন্তন হয় তখনই তা হয় প্রকৃতভাবে অধিকৃত।*[১৯] যে লক্ষ্য আমাদের অনুসৃত, তা হল পূর্ণাঙ্গ প্রভুত্ব বা নিয়ন্ত্রণের অবস্থা, কোনো অধ্যাত্মবাদী মৃষিকের অবস্থা নয়, এবং এই প্রভুত্ব বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব শুধু চেতনার অবিচ্ছিন্নতায় : আমরা যখন সমাধিমগ্ন হই, তখন হারিয়ে ফেলি সেই "একজনকে" যে সমর্থ ঊর্ধ্বের শক্তিরাশি ও নিম্নের শক্তিহীনতার মধ্যে সেতু হয়ে উঠতে।

আলিপুর জেলে, মস্তকের ঊর্ধ্বের আবরণ ভেদ করে, শ্রীঅরবিন্দ আরম্ভ করলেন এক সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে তাঁর আবিষ্কারী অন্বেষণ, চেতনার বিভিন্ন স্তরে, সাধারণ মনের ঊর্ধ্বে, ঠিক যেমন বরোদায় তিনি চেতনার নিম্নতর স্তরগুলির অন্বেষণ করেছিলেন। যেখানে তিনি ছেড়েছিলেন, সেখান থেকেই আবার শুরু করলেন আরোহণ, চেতনার বিশাল স্তরক্রমে, যা বিস্তীর্ণ কোনো ব্যবধান বা সমাধিতে বিচ্ছেদ ব্যতীত, জড়তত্ত্ব হতে সেই অজ্ঞাত বিন্দু পর্যন্ত যেখানে তিনি করেছিলেন তাঁর আবিষ্কার। কারণ, *পরমতত্ত্বের মধ্যে স্বয়ংকৃত অন্ধতা নিয়ে লম্ফপ্রদান করে উচ্চতম সত্য, পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, বরং মনের ঊর্ধ্বে এক ধৈর্যশীল সঞ্চার*[†] *দ্বারাই তা লাভ হয়।*[২০]

বিবিধ সত্তা ও শক্তি

ঠিক যেমন আমরা বিরামবিহীনভাবে ও অজ্ঞাতসারে প্রাণিক কিংবা সূক্ষ্ম-ভৌতিক স্পন্দন প্রাপ্ত হই, যা আমাদের আবেগ-সংক্রান্ত জীবন তথা জগতের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতি মুহূর্তে নির্ধারিত করে, তেমন

* কেউ কেউ চিন্তা করেন, ecstasy শব্দটি enstasy বললেই আরো ভালোভাবে বোঝা যায়। তা হলে কি বিশ্বাস করতে হবে যে, কেউ যখন নিজের বাইরে চলে যায়, তখনই নিজের মধ্যে প্রবেশ করে? কারণ, ecstasy—ex-stare-এর আক্ষরিক অর্থ হল শরীরের বাইরে, বা জাগতিক দৃষ্টিকোণের বাইরে, দাঁড়ানো। সরলভাবে বলা যায়, আমরা নিজের এমন অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাই, যা আমাদের বাইরে অবস্থিত নয়। পরম অনুভূতিটি যখন আমাদের শরীরে, দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধ হবে, তখনই তাকে আমরা যথার্থভারে বলতে পারব। অন্যথা, এই শব্দটি আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাবে, যদিও আমরা জীবন ও আত্মার মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছি, এই শব্দটি তার নিজস্ব অর্থে তা ভালোভাবেই বহন করে।

† সঞ্চার = transition, সংক্রমণ। শব্দার্থ দ্রষ্টব্য।

আমরা সকলেই বিরামবিহীনভাবে ও অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত হই বা অনুপ্রেরিত হই এইসব উচ্চতর অতিচেতন স্তরসমূহের দ্বারা, যারা আমাদের মধ্যে নিজেদের অভিব্যক্ত করে ধারণা, আদর্শ, অভীপ্সা রূপে বা কলাকৃতি-রূপে, এবং গোপনে আমাদের জীবন ও আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করে। আমরা এক ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট শরীরে আবদ্ধ থাকি, শুধু এক অনমনীয় দৃষ্টিগত অসংগতির সাহায্যে ; বস্তুত আমরা সর্বাংশে সচ্ছিদ্র এবং বিশ্বময় শক্তিরাজির মধ্যে অবগাহন করি, যেমন সমুদ্রের মধ্যে "অ্যানেমনি" †† [পুষ্পবিশেষ] : *বাইরের পরিণামগুলোর বিষয়ে মানুষ বুদ্ধিমানের মতো (= মুর্খতাপূর্ণভাবে) কিচিরমিচির করে ও সেগুলোকে আরোপ করে নিজের "মহান্ সত্তার" উপর, এই সত্য অস্বীকার ক'রে যে, তার মহান্ সত্তা আর নিজের দৃষ্টি হতে বহুদূরে গুপ্ত হয়ে আছে, তার স্বল্প-আলোকিত বুদ্ধির যবনিকার অন্তরালে, তার প্রাণিক অনুভূতির আবেগ, প্রেরণা, সংবেদনা ও প্রভাবের ধোঁয়াটে কুয়াশার অন্তরালে।*[২১] আমাদের একমাত্র স্বাধীনতা হচ্ছে, ব্যক্তিগত বিবর্তনের সাহায্যে অবিরত উচ্চতর স্তরসমূহে অভ্যুত্থিত হওয়া ; আমাদের একমাত্র ভূমিকা হচ্ছে, আমরা যে স্তরে বাস করি, তার সত্যকে জড়স্তরে প্রকাশ করা ও বাস্তবরূপ প্রদান করা। যদি আমরা বিশ্বের গঠন-প্রক্রিয়া ভালোভাবে বুঝতে চাই, তা হলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের জোর দিতেই হবে, যা উচ্চ হতে নিম্ন পর্যন্ত চেতনার এইসকল স্তরের জন্যই সমান। প্রথমত, এইসকল স্তর আমাদের উপর, কিংবা আমরা তাদের বিষয়ে যা ভাবি তার উপর নির্ভরশীল নয়। ঠিক যেমন অ্যানেমনির উপর সমুদ্র নির্ভরশীল নয়। তারা মানুষ হতে *স্বতন্ত্রভাবেই* বিদ্যমান। আধুনিক মনস্তত্ত্ব সত্তার সকল স্তরকে বিশৃঙ্খলভাবে একত্র মিশ্রিত করে দেয় এক তথাকথিত "সামূহিক নিশ্চেতনায়"। ঠিক যেন তা এক জাদুকরের বিশাল টুপি, যা থেকে আপনি বের করে আনবেন ভিন্ন ভিন্ন আদিরূপ † বা স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে আধুনিক মনস্তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয় দৃষ্টির অভাব। কারণ, প্রথমত, এসব স্তরে শক্তিরাজি কোনোপ্রকারেই নিশ্চেতন নয়, শুধু আমাদের জন্যই তারা অচেতন। অত্যন্ত সচেতন তারা, আমাদের চেয়ে বেশি, সীমাহীনভাবে ; দ্বিতীয়ত, এসব শক্তি সামূহিক নয়, এই অর্থে যে তারা মানুষ হতে উদ্‌ভূত নয়, যেমন সমুদ্র অ্যানেমনি হতে উৎপন্ন নয় : বাইরের মানুষটিই অন্তরালবর্তী বিশালতা হতে উৎপন্ন। *চেতনার সকল ক্রমই বিশ্বজনীন অবস্থা, এবং তারা নির্ভর করে না আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ; বরং আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গিই চেতনার সেই ক্রমের দ্বারা নির্ধারিত হয়, যেখানে এ সংগঠিত তার বিশেষ প্রকৃতি দ্বারা বা তার বিবর্তনীয় অবস্থার দ্বারা।*[২২] স্বাভাবিকভাবেই, মূল্যবোধের ক্রমবিন্যাসকে বিপরীত করে দেওয়া ও জগতের

†† Anemone।

† Archetype : আদিরূপ।

কেন্দ্রস্থলে নিজেকে স্থাপিত করাই মানুষের প্রকৃতি। তা ছাড়া, এ এক তাত্ত্বিক বিষয় নয়, যা সবসময়ই তর্কসাপেক্ষ ; বরং বিষয়টি অনুভূতির, যেখানে সকলেই আহূত। যখন আমরা আমাদের শরীর হতে বাইরে যাই ও সচেতনভাবে এসব স্তরে প্রবেশ করি, আমরা তখন সহজেই দেখতে পারি যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ যেমন কুমারিকা অন্তরীপের বাইরে অবস্থিত, তেমনই এসব স্তর আমাদের বাইরে অবস্থিত, তাদের সব শক্তি, এমন-কি, সব সত্তা ও স্থান সমেত, যাদের কোনো সামঞ্জস্য নেই পার্থিব জগতের সঙ্গে— একথা সমস্ত সভ্যতা স্বীকার করেছে, উল্লেখ করেছে, তাদের প্রাচীরে বা মন্দিরে খোদিত করেছে, চিত্রিত করেছে ; এসব সভ্যতা হয়তো আমাদের সভ্যতার চেয়ে দক্ষতায় ন্যূন ছিল। কিন্তু নিশ্চয়ই অধিক ছিল না বুদ্ধিহীনতায়।

এসব স্তরে যেসকল সচেতন শক্তি ও সত্তা বাস করে, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ ক্ষেত্রে আমাদর "সামূহিক" অবদানস্বরূপ যে অন্ধবিশ্বাস ও প্রতারণা, তার অংশ ও সত্যের অংশের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে আমাদের নির্ণয় করতেই হবে। সবসময়ই, এদুটো গভীরভাবে মিশে আছে ; যেজন্য, পূর্ণযোগের সাধকের উচিত অবিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত হওয়া *বিশুদ্ধ তপশ্চর্যার* অস্ত্র দ্বারা, যার উপর অনেক জোর দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। যা যুক্তির অতীত, বিভ্রান্ত হয়ে তার সঙ্গে যুক্তিহীনকে এক করা সাধকের পক্ষে অনুচিত। কার্যত, যখন আমরা সচেতন হয়ে এসব স্তরে প্রবেশ করি নিদ্রায়, অথবা ধ্যানে, অথবা স্বেচ্ছাকৃত 'বহিরভিব্যক্তির' মাধ্যমে, তখন আমরা দ্বিবিধ বিষয় দেখতে পাই : শক্তির নৈর্ব্যক্তিক প্রবাহ-সকল, যেসব হতে পারে ন্যূনাধিক জ্যোতির্ময়, অথবা ব্যক্তিগত সত্তাসমূহ। কিন্তু এসব একই তত্ত্বকে দেখবার জন্য দুটি পথ : *জড়তত্ত্বের যবনিকার অন্তরালে যখন ব্যক্তি প্রবেশ করে তখন চেতনা ও শক্তি নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে প্রাচীর, তা হয়ে যায় ক্ষীণতর। নৈর্ব্যক্তিক শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেউ যদি দৃষ্টিপাত করে কোনো এক ক্রিয়ার প্রতি, তা হলে সে দেখতে পায় এক শক্তিকে, যা কর্মরত কোনো এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ; যদি কেউ দৃষ্টিপাত করে এক সত্তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তা হলে সে দেখে এক সত্তাকেই, যে এক চেতন শক্তিকে অধিকার করে, তার পথপ্রদর্শন করে, ও তাকে ব্যবহার করে, অথবা যে তার এক প্রতিনিধি-রূপে তার দ্বারাই ব্যবহৃত হয় এক নির্দিষ্ট বিশেষ কর্মের ও অভিব্যক্তির যন্ত্ররূপে। আধুনিক বিজ্ঞানে এ কথা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যদি তুমি শক্তির গতিবিধির উপর দৃষ্টিপাত করো, তা হলে একদিকে সে প্রতীয়মান হয় তরঙ্গের মতো, অন্যদিকে সে প্রতীয়মান হয় কণিকাপুঞ্জের মতো, সক্রিয় হয় কণিকাপুঞ্জের*[1] *মতো, যেখানে প্রত্যেক কণিকা*

---

[1] কণিকাপুঞ্জ = mass of particles.

নিজের পথেই চলে। সে একই নিয়ম এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[২৩]

সুতরাং কোনো কোনো সাধক কখনো দেখতে পান না সত্তাদের, দেখতে পান শুধু জ্যোতির্ময় শক্তিরাজিকে, এবং অন্যেরা দেখতে পান শুধু সত্তাদের, শক্তিরাজিকে কখনো দেখতে পান না ; এসব নির্ভর করে আমাদের অভ্যন্তরীণ মনোভাবের উপর। আমাদের আস্পৃহার উপর, আমাদের ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক প্রস্তুতির উপর। এখানেই শুরু হয় আত্মনিষ্ঠা[†] এবং তার সঙ্গে ত্রুটি ও অল্পবিশ্বাসের সম্ভাব্য বিপদ্। কিন্তু আত্মনিষ্ঠা অনুভূতিকে ত্রুটিপূর্ণ করে না ; এ শুধু এক চিহ্ন যা সূচনা দেয় যে একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট ও প্রকাশিত হতে পারে আমাদের স্বভাব অনুযায়ী— শুধু আমাদের যদি "মূর্ত" বাস্তবের বিষয় বলা হয়, আমরা তখন প্রশ্ন করতে পারি, দু-জন চিত্রকর কি কখনো একই দৃশ্যকে সমানভাবে দেখেছেন? যদি আমাদের বিশ্বাস করতে হয় প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক তত্ত্বের বিধানবিশেষজ্ঞদের, তা হলে সত্যের মানদণ্ড হওয়া উচিত অনুভূতির এক অপরিবর্তনীয় বিরামবিহীনতা, কিন্তু তা আমাদের বোধশূন্যতার মানদণ্ড হতে পারে। অনুভূতির বহুত্ব শুধু প্রমাণ করে যে আমরা এক জীবন্ত সত্যের অভিমুখে আকর্ষিত হচ্ছি, আমাদের মানসিক ও ভৌতিক সত্যের মতো এক কঠিন অবশেষের অভিমুখে নয়। তা ছাড়া, এই চেতন শক্তিসমূহ— অত্যন্ত চেতন এসব শক্তি— নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোনো রূপধারণে সমর্থ, আমাদের প্রতারণা করবার জন্য নয়, যারা তাঁদের নিকট নিজেদের উন্মীলিত করে বা তাঁদের আবাহন করে তাদের চেতনায় নিজেদের উপলভ্য করবার জন্য। ধরা যাক, একজন খৃস্টধর্মী সন্ত ভার্জিন মেরীর দর্শনলাভ করেছেন, এবং একজন ভারতীয় দুর্গাদেবীর দর্শনলাভ করেছেন ; হয়তো, তাঁরা একই তত্ত্বের দর্শন পেয়েছেন, চেতনার একই স্তরের সঙ্গে ও একই শক্তিরাজির সঙ্গে সংযোগস্থাপন করেছেন ; এ কথা কিন্তু সুস্পষ্ট যে খ্রীস্টধর্মী ব্যক্তির জন্য দুর্গার কোনো অর্থ নেই ; তা ছাড়া, যদি সেই শক্তি তাঁর বিশুদ্ধ অবস্থায় আবির্ভূত হন, অর্থাৎ এক জ্যোতির্ময় নৈর্ব্যক্তিক স্পন্দনরূপে, তা হলে তিনি বোধগম্য হবেন না উভয় ভার্জিন মেরীর উপাসক ও দুর্গাদেবীর ভক্তের নিকট, কিংবা, আর যাই হোক, সেই শক্তি তাঁদের হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলবেন না। ভক্তিরও এক নিজস্ব দাবি আছে : একটি সহজ নিরাকার ক্ষুদ্র স্বর্ণাভ আলোকের মধ্যে প্রেমের যে তীব্রতা নিহিত আছে, তা বোঝবার জন্য প্রয়োজনীয় বিকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির নেই। কিন্তু আরো আকর্ষণীয় কথা এই যে, যদি কোনো কবি, উদাহরণস্বরূপ রিম্বড় অথবা শেলি, নিজেকে খুলে ধরেন চেতনার এই একই স্তরের অভিমুখে, তিনি আবার অন্য কিছুর দর্শনলাভ করবেন, যা অবশ্য সেই একই তত্ত্ব : দুর্গা কিংবা ভার্জিন-এর সঙ্গে

[†] আত্মনিষ্ঠা = subjectivity.

তিনি বিশেষ সম্পৃক্ত না হতে পারেন, তিনি হয়তো তার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ করতে পারেন এক মহান্‌স্পন্দন, জ্যোতির্ময় কম্পনের প্রবাহ অথবা বর্ণাঢ্য তরঙ্গমালা, যারা নিজেদের প্রকাশ করবে তাঁর মধ্যে এক তীব্র কবিত্বময় আবেগরূপে। আমরা রিম্‌বড়্‌কে স্মরণ করব :

"হে আনন্দ, হে প্রজ্ঞা,
আমি অপসৃত করলাম,
আকাশের নীলিমাকে—
সেও তো কালিমা ;
সহজ আলোকের
স্বর্ণময় স্ফুলিঙ্গ হয়ে
আমি জীবন্ত।" *

তথাপি, এ কথা বলা যেতে পারে যে, এই আবেগ এসেছে হয়তো চেতনার সেই উচ্চতা হতে, অথবা সেই স্পন্দন হতে যা সেই ভারতীয় বা সেই খৃস্টধর্মীব স্তর, যদিও, সেই প্রত্যক্ষীভূত স্পন্দনের কাব্যধর্মী পরিপ্রকাশ কোনো ধার্মিক বিশ্বাস হতে সম্পূর্ণ পৃথক। গণিতজ্ঞও আলোকের এক আকস্মিক ঝলকে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতের এক নতুন বহিরাকৃতি দর্শন করেন ; তিনিও হয়তো স্পর্শ করেছেন চেতনার সেই একই উচ্চতা, একই অভিব্যক্তিময় স্পন্দন। কারণ, "শূন্যে" কিছুই ঘটে না, সব-কিছুই ঘটে কোনো-এক স্থানে, এই স্তরে বা অন্য কোনো স্তরে ; প্রত্যেক স্তরেরই আছে তার নিজস্ব আলোকের তীব্রতা, তার বিশেষ কম্পন, এবং আমরা সেই *একই* চেতনার স্তরে *একই* প্রদীপ্তিতে উপনীত হতে পারি, সহস্র বিভিন্ন উপায়ে।

ধার্মিক রূপের স্তর যাঁরা অতিক্রম করেছেন, বা অতিক্রম করেছেন বলে মনে করেন, তাঁরা হয়তো শীঘ্রতার সঙ্গেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সকল ব্যক্তিগত রূপ প্রবঞ্চনাত্মক অথবা নিম্নপ্রকৃতির, এবং শুধুই নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরাজিই সত্য, কিন্তু তা হল মানুষী বুদ্ধির আধিক্য, যা চায় সমগ্র মানবজাতিকে একই রূপে পর্যবসিত করতে। দুর্গাদেবীর দর্শন কোনোরকমে অধিকতর মিথ্যা বা কাল্পনিক নয় শেলির কোনো এক কবিতা হতে বা

*** আর্থার রিম্‌বড়্ (Arthur Rimbaud), ফরাসি কবি (১৮৫৪-৯১)র কবিতা হতে বাংলা ভাষায় উদ্ধৃত কবিতাংশটি এই ইংরেজি ভাষান্তরের অনুবাদ :**

**"O happiness, O reason, I drew aside
the azure of the sky, which is blackness,
and I lived, a golden spark of
natural light."**

আইন্‌স্টাইনের কোনো এক সমীকরণ হতে, যা প্রমাণিত হয়েছিল দশ বছর পর। ভ্রান্তি ও অন্ধবিশ্বাস শুরু হয় এই নিশ্চয়তার সঙ্গে যে শুধু ভার্জিন মেরীই সত্য, অথবা শুধু দুর্গাই সত্য, অথবা শুধু কবিতাই সত্য। সমন্বয়কারী সত্যের *দৃষ্টিতে* এইসকল রূপই একই দিব্য আলোক হতে উদ্‌ভূত, বিভিন্ন পরিমাপে।

কিন্তু এই সব তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে উন্নতধরনের যান্ত্রিক শক্তি মনে করাও ভুল হবে। তাঁদের আছে এক তীব্রতা, এক উত্তাপ, এক জ্যোতির্ময় আনন্দ, এক ব্যক্তির সম্পূর্ণ উপস্থিতি সহ, শুধু এক মুখমণ্ডল ব্যতীত, যদি কখনো কেউ প্লাবিত হয়ে থাকেন এক স্বর্ণাভ আলোকের প্রখর স্রোতে, এক নীলকান্তমণিসম নীলিমার প্রস্ফুটনে, শ্বেত আলোকের স্ফুলিঙ্গায়নে, তিনি নিঃসন্দেহভাবে জানেন যে, সেই স্বর্ণের সঙ্গে উদ্‌ভূত হয় এক স্বতঃস্ফূর্ত ও সানন্দ জ্ঞান, সেই নীলিমার সঙ্গে আসে এক অনির্বচনীয় উপস্থিতি। কোনো কোনো শক্তি আমাদের উপর অবতীর্ণ হয় এক স্মিত হাস্যের মতো। তখনই আমরা প্রকৃতরূপে বুঝতে পারি যে, 'ব্যক্তিগত' ও 'নৈর্ব্যক্তিকের' মধ্যে, চেতনা ও শক্তির মধ্যে যে প্রাচীর আছে তা মানুষী যুক্তির দ্বারা প্রস্তুত এক ব্যবহারিক পার্থক্য, যার কোনো সম্পর্ক নেই বাস্তবতার সঙ্গে, এবং পরমপুরুষের সান্নিধ্যে বাস করবার জন্য ব্যক্তিগত রূপের দর্শনের কোনো প্রয়োজন নেই।

কার্যত, একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় হল এসব উচ্চতর অঞ্চলের প্রতি নিজেদের উন্মীলিত করা। একবার আমরা সেখানে প্রবেশ করবার পর, প্রত্যেকেরই প্রাপ্তি হয়, নিজের শক্তি, প্রয়োজন ও অভীপ্সা অনুযায়ী। এই যেসকল দ্বন্দ্ব জড়বাদী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে, দার্শনিকদের, কবিদের, চিত্রকরদের, সংগীতকারদের মধ্যে, সেসকল এক শিশু মানবজাতির বালসুলভ খেলা মাত্র, যেখানে প্রত্যেকেই চায় নিজের কাঠামোর মধ্যে সমগ্র জগৎটাকে খাপ খাওয়াতে। যখন আমরা জ্যোতির্ময় *সত্যকে* স্পর্শ করি, আমরা তখন দেখি যে সেই *সত্য* ধারণ করতে সমর্থ সব-কিছুকে, কোনো দ্বন্দ্ব ব্যতীত, এবং প্রত্যেকে তাঁরই শিশু : রহস্যবাদী তাঁর নিকট হতেই তাঁর আনন্দ পান, যাঁকে তিনি ভালোবাসেন ; কবি তাঁর নিকটেই পান কবিত্বের আনন্দ, গণিতজ্ঞ পান গাণিতিক আনন্দ, এবং চিত্রকর পান বর্ণাঢ্য সকল চমকপ্রদ প্রকাশ— এবং সব-কিছুই আধ্যাত্মিক আনন্দ।

তথাপি এক "বিশুদ্ধ তপশ্চর্যা" এক শক্তিশালী সংরক্ষণ হয়েই থাকে। কারণ, দুভার্গ্যবশত, প্রত্যেকেরই ক্ষমতা নেই উচ্চতর অঞ্চলসমূহে আরোহণ করবার, যেখানে সব শক্তিই বিশুদ্ধ : সহজতর নিজেকে উন্মীলিত করা প্রাণিক স্তরের প্রতি, যা হচ্ছে মহতী জীবনীশক্তি ও কামনাবাসনার জগৎ (এ জগৎ মাধ্যমদের ও গুপ্তবিদ্যা বিশারদদের সুপরিচিত), এবং সেখানে নিম্নতর শক্তিরা সহজেই ধারণ করে উজ্জ্বল বর্ণের দিব্যরূপ, অথবা ভয়ংকর রূপ। যদি সাধক

বিশুদ্ধ হন, তিনি উভয় প্রকারের প্রতারণা সহজেই দেখতে পাবেন, ভয়ংকর হোক বা বিস্ময়জনক, এবং তাঁর ক্ষুদ্র চৈত্য আলোক বিলীন করে দেবে প্রাণিক স্তরের ভাবপ্রবণ নাটকের সকল ভীতিপ্রদর্শন ও চাকচিক্যময় রূপ। কিন্তু নিজের বিশুদ্ধতার বিষয়ে কেউ কখনো সুনিশ্চিত হতে পারে কি? তা হলে যদি আমরা ব্যক্তিগত রূপের অনুধাবন না করে বরং শুধুই ক্রমবর্ধমান রূপের উচ্চতর সত্যের অনুধাবন করি, এবং স্বনির্বাচিত যে-কোনো রূপে প্রতিভাত হওয়ার জন্য স্বাধীনতা প্রদান করি, আমরা তখন ভ্রান্তি ও অন্ধবিশ্বাস হতে সুরক্ষিত থাকব।

এসব অতিচেতন স্তরের আভাস দেওয়ার প্রয়াস আমরা করতে পারি— আমরা যেমন তাদের আবিষ্কার করি, আনন্দময় নিশ্চেতনায় নিমজ্জিত না হয়ে, এবং শ্রীঅরবিন্দ যেমন তাদের অনুভব করেছিলেন। এটা নিশ্চিত, বিশ্বগত সত্যের নিকটতম যা তা আকার নয়; আকার সবসময়ই এক নির্দিষ্ট পরম্পরা বা যুগের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ও তদনুযায়ী সীমায়িত— যদিও এসব আকারের নিজস্ব স্থান ও নিজস্ব সত্য আছে— কিন্তু বিশ্বগত সত্যের নিকটতম হচ্ছে জ্যোতির্ময় স্পন্দনসমূহ। কিন্তু আবার আমাদের স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আমরা যখন 'স্পন্দনের' উল্লেখ করি, তখন কোয়াণ্টাম্ ফিজিক্স্-এর কিছু শূন্যগর্ভ তরঙ্গের কথা বলি না, বরং আলোকের সেই প্রবাহের কথা বলি, যা অবর্ণনীয়ভাবে ধারণ করে আনন্দ, প্রেম, জ্ঞান ও সৌন্দর্য, এবং সকল গুণাবলী যা অভিব্যক্ত হয়, বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন স্তরে, মানবচেতনার উচ্চ অভিব্যক্তিসমূহে, ধার্মিক হোক বা না হোক।

জ্যোতি এক, নয় জাত সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি হতে,
জ্যোতি এক, নিহিত যা অন্তরে, অন্তর্দ্রষ্টা সে,
বিকীর্ণ করে এক অন্তরঙ্গ দৃশ্যমানতা।[২৪]

মনের বিভিন্ন স্তর

ঊর্ধ্বতর গোলার্ধের আরম্ভ যে অতিমানস ভূমি বা স্তর হতে, সেখানে পৌঁছবার পূর্বে সাধককে অতিক্রম করতে হবে বিভিন্ন স্তর বা জগৎ, যাদের আরোহণের পর্যায় অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেন, যথাক্রমে ঊর্ধ্বমানস, জ্যোতির্মানস, বোধিমানস এবং অধিমানস (যাকে ভুল করে অতিমানস মনে করা উচিত নয়)। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা যদি চাই তা হলে অন্য পরিভাষাও ব্যবহার করতে পারব, কিন্তু এই চারটি অঞ্চল অনুভূতির কিছু অত্যন্ত নির্দিষ্ট তথ্যাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত; এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে তাঁদের দ্বারা, যাঁরা সচেতনভাবে এই আরোহণের কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য সমর্থ।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, এই চেতনার অঞ্চল-চতুষ্টয় অতিচেতনেরই অংশ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, কারণ, ব্যক্তি-বিশেষ অনুসারে অতিচেতনের দ্বারদেশ পরিবর্তিত হয়, এ কথা পূর্ণরূপে স্পষ্ট। কারও কারও জন্য, ঊর্ধ্বমানস, এমন-কি, জ্যোতির্মানসও ন্যূনতমভাবে অতিচেতন নয়, কারণ, তা তাঁদের স্বাভাবিক জাগ্রত চেতনা, কিন্তু অন্যদের জন্য, সামান্য যুক্তিবাদী মনও আন্তরিক বিকাশের এক অতি দূরের অবস্থা। অন্যশব্দে, আমাদের বিবর্তনের অগ্রগতির সঙ্গে অতিচেতনের দ্বারদেশও ঊর্ধ্বাভিমুখে সঞ্চারিত হয়। যদি অবচেতন আমাদের বিবর্তনের অতীত, তা হলে অতিচেতন আমাদের বিবর্তনের ভবিষ্যৎ— এক অতিচেতন যা ক্রমশ আমাদের জাগরিত চেতনা হয়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে অসম্পৃক্ত অবস্থায় চেতনার এসব উচ্চতর স্তর নিজেরা কী, সে-বিষয়ে আমরা এখানে কিছু বলব না। তাদের প্রত্যেকেই অস্তিত্বের এক-একটি সম্পূর্ণ জগৎ, পৃথিবী হতে বিশালতর ও সক্রিয়তায় আরও বেশি পরিপূর্ণ, এবং আমাদের মানসিক ভাষা তাদের বর্ণনা করতে অক্ষম ; আমাদের প্রয়োজন দ্রষ্টা বা কবির ভাষা— "অন্য এক ভাষা" বলেছেন রিম্‌বড্। আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য 'সাবিত্রী'র প্রতি, যেখানে তিনি তাই করেছেন।

একই বৃন্তে দোদুল্যমান নিযুত সরসিরুহ,
জগতের পর জগৎ বর্ণে ভরা হর্ষাবিষ্ট
আরোহণ করে সুদূর অদেখা মহোৎসবের দিকে।[২৫]

কিন্তু আমরা বলতে পারব চেতনার এসব ভূমি মানুষের জন্য কী আনে, এবং কীভাবে তারা পরিবর্তিত করবে জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যখন আমরা উন্নীত হব সেসব ভূমিতে।

আমরা সকলেই জানি যে সাধারণ মন সব-কিছু দেখে ক্রমে ক্রমে। ধারাবাহিকভাবে, এক-রৈখিকভাবে। এ লম্ফপ্রদান করতে পারে না। কারণ তা হলে তার যুক্তির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ দিশেহারা হয়ে যাবে সম্পূর্ণভাবে ও কথাটিকে মনে করবে "অসংলগ্ন", যুক্তিহীন ও অস্পষ্ট। এক সময়ে একটির বেশি জিনিস সে দেখতে পারে না, কারণ তা তার কাছে মনে হবে পরস্পর-বিরোধী। কোনো সত্য বা তথ্যকে তার নিজের চেতনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারে না এ, সেই সত্য বা তথ্য হতে যা-কিছু পৃথক তাকে অস্বীকার না ক'রে। এর কাজ ক্যামেরার শাটারের † মতো। এক বারে একটি, শুধু একটি মাত্র, ছবি নিতে পারে সে। যা তার ক্ষণস্থায়ী ছোটো পর্দায় পাওয়া যায় না। তাকেই মনে করা হয় ভ্রান্তি, মিথ্যা ও অন্ধকারের ভাণ্ডারের অংশভুক্ত। সব-কিছুই এক অপরিবর্তনীয় বিপরীতবোধের অন্তর্ভুক্ত— *সাদা বা কালো, সত্য বা ভ্রম,*

† **Shutter.**

ভগবান্ বা শয়তান— এবং গাধা যেমন রাস্তায় চলে কষ্ট সহকারে, ঘাসের গুচ্ছ একটার পর একটা দেখে, ঠিক তেমনই। মোটের উপর সাধারণ মন অক্লান্তভাবে সময় ও স্থানের ছোটো ছোটো অংশ পৃথক করে রাখে। চেতনার ক্রমে আমরা যতই অবতরণ করি।, সে অংশ ততই ছোটো হয়ে যায়। একটি গুব্‌রে-পোকার কথাই ধরা যাক। তার নিরুদ্‌বেগ ছোটো রাস্তাটিকে যা-কিছু অতিক্রম করে, তা তার ভবিষ্যৎ-রূপক ডানদিক থেকে এসে বর্তমানের রাস্তাটি অতিক্রম করে অতীত-রূপক বাঁদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। একজন মানুষ যদি পোকাটির দুই দিকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একসঙ্গে তার ডানদিকে ও বাঁদিকে, তা হবে অলৌকিক ও যুক্তিহীন, যদি না তার এক পা সত্যে ও অন্য পা মিথ্যায় থাকে, যা হওয়া অসম্ভব— সুতরাং মানুষটির অস্তিত্বই নেই, পোকাটির চেতনায় সে এক অসম্ভব। কিন্তু আমাদের জন্য শাটারটি অধিকতর প্রশস্ত হয়ে গেছে ; ভবিষ্যৎ ও অতীত আর নেই 'স্থানের' ডানদিকে ও বাঁদিকে, 'সময়ের' মধ্যে তারা হয়ে গেছে আগামীকাল ও গতকাল। গুবরে-পোকা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত, আমরা পৌঁছেছি সময়ের মধ্যে। কিন্তু আরও একটি চেতনা আছে, অতিমানস চেতনা, যা শাটারটিকে আরও প্রসারিত করতে পারে, সময়ের মধ্যে আরও অগ্রসর হতে পারে। এক পা গতকালে দিয়ে অন্য পা আগামী কালে দিতে পারে। যুগপৎ-ভাবে এ দেখে, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, সাদা ও কালো, সত্য ও তথাকথিত মিথ্যা, ভালো ও তথাকথিত মন্দ, হ্যাঁ ও না। কারণ সকল বিপরীতই হল সময়কে ছোটো ছোটো অংশে খণ্ডিত করার ফল। "ভুলের" কথা আমরা বলি, কারণ আমরা এখনও দেখি নি যে মঙ্গল এ প্রস্তুত করছে কিংবা এ যার অমসৃণভাবে কাটা অর্ধাংশ ; "মিথ্যার" কথা আমরা বলি, কারণ আমরা এখনও যথেষ্ট সময় পাই নি কর্দমের মধ্যে যে পদ্মফুল ফুটবে তা দেখবার জন্য ; "কালো"র কথা আমরা বলি, কিন্তু যে সেই পরম জ্যোতিঃ দর্শন করেছেন তাঁর কাছে আমাদের দিনের আলোও কালো! আমাদের 'ভুল' হল মঙ্গলের প্রয়োজনীয় সহচর। "না" "হ্যাঁর" অবিচ্ছেদ্য অপর অর্ধাংশ। সাদা ও কালো ও রামধনুকের সব কটি রঙ সেই একই আলোর বিভিন্ন রূপ, যা ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশিত করছে। কিছু নেই বিপরীত, আছে শুধু যা-কিছু পরিপূরক ; চেতনার আরোহণে সমগ্র কাহিনীটিই হল দৃষ্টির উন্মীলনের কাহিনী, এ রৈখিক ও বিসদৃশ চেতনা হতে অতিক্রম এক *বিশ্বব্যাপী চেতনায়*।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন "বিশ্বব্যাপী" : অতিমানসের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন চেতনার ঊর্ধ্বতর *গোলার্ধ*-রূপে। কারণ যাকে আমরা উচ্চতর সত্য বলি, তা পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন নয়, তার নিম্নার্ধ ব্যতীত তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ঊর্ধ্বতর নিম্নতরকে অস্বীকার করে না, তাকে *পরিপূর্ণ* করে ; শাশত ক্ষণস্থায়ীর বিপরীত নয়, যেমন আলিঙ্গনকারীর হাত দুটো আলিঙ্গনাবদ্ধ ব্যক্তির বিপরীত

নয়। যথার্থত নিগূঢ় রহস্যটি হচ্ছে ক্ষণিকের মধ্যে শাশ্বতকে, সীমার মধ্যে অসীমকে এবং অস্পষ্টতম ভগ্নাংশের মধ্যে পূর্ণ সমগ্রতাকে আবিষ্কার করা।

চেতনার এই আরোহণ শুধুই সময়ের উপর বিজয়লাভের কাহিনী নয়, আনন্দ, প্রেম ও চেতনার বিশালতার উপরও বিজয়লাভের কাহিনী। নিম্নতর বিবর্তনীয় স্তরগুলি শুধু স্থান ও কালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিখণ্ডিত করেই সন্তুষ্ট হয় না। তারা সব-কিছুকেই বিখণ্ডিত করে। *বিভাজনের নিয়ম*[২৬] ক্রমবর্ধমানভাবে কর্তৃত্ব করে চেতনার অবতরণে, পরমাত্মা হতে অণু পর্যন্ত— আনন্দের বিভাজন, প্রেম ও শক্তির বিভাজন, এবং স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান ও দৃষ্টির বিভাজন। সব-কিছু ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পরিণত হয় একগুচ্ছ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আণবিক অভিব্যক্তিতে, এক *নিদ্রাচর চেতনার*[২৭] এক অস্পষ্ট ধূলিকণার পুঞ্জে, যে চেতনা এক তৃষা আলোকের প্রতি, বা বোধ হয় আনন্দের এক স্মৃতি। *এই অবতরণের সাধারণ লক্ষণ হল তীব্রতার শক্তিহ্রাস, সত্তার তীব্রতা, চেতনার তীব্রতা, শক্তির তীব্রতা, বস্তুসমূহে নিহিত আনন্দের তীব্রতা এবং অস্তিত্বের তীব্রতা। ঠিক তেমনই, যখন আমরা পরমোচ্চ স্তরে আরোহণ করি, এইসব তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।*[২৮]

(ক) সাধারণ মন

আলোকের উৎকর্ষ বা স্পন্দনের উৎকর্ষ মুখ্যত আমাদের বুঝতে দেয় চেতনার এক ভূমি হতে অন্য ভূমির পার্থক্য। যদি আমরা আমাদের বিবর্তনীয় স্তর থেকে বিচার আরম্ভ করি এবং চেতনার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তার আলোকের অভিমুখে, যা থেকে অন্যান্য সকল অভিমুখই নির্ণীত হতে পারে, তা হলে দ্রষ্টার দৃষ্টিতে সাধারণ মন দেখা যায় ধূসর বর্ণের, কিছু কালো ছোটো ছোটো বিন্দু বা অস্পষ্ট স্পন্দনশীল গ্রন্থি সমেত, যেন এক ঝাঁক মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে মানুষদের মাথার চারধারে, তাদের সহস্রাধিক চিন্তার প্রতীক হয়ে— তারা আসে, যায়, একজন থেকে অন্যজনের কাছে উড়ে যায়, ঘূর্ণ্যমান হয়ে অন্তহীনভাবে। কখনো কখনো আলোকের এক স্বল্প বিস্ফোরণ উর্ধ্ব হতে অবতীর্ণ হয়, স্বল্প আনন্দ, প্রেমের স্বল্প আলোক, নৃত্যরত সেই ধূসরের মধ্যে। কিন্তু, শ্রীঅরবিন্দের অভিহিত *এই নিরপেক্ষতার ভূমি*[২৮] এত ঘন এত আঠালো, যে এ সব-কিছু শোষণ করে নেয়, সব-কিছুকে বিবর্ণ করে দেয়, সব-কিছুকে টেনে নেয় নিচে, তার অন্ধকারময় মহাকর্ষণের মধ্যে— আমরা বেশিক্ষণ আনন্দ বা ব্যথা সহ্য করতে পারি না, বেশি আলো সহ্য করতে পারি না : সব-কিছুই এত ছোটো, আকস্মিক, এবং শীঘ্রই নির্বাপিত হয়ে যায়। এবং হাজার শর্তের উপর নির্ভরশীল।

(খ) ঊর্ধ্বমানস

এই উচ্চতর ক্রমটি মাঝে মাঝেই পাওয়া যায় দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে এবং এ ন্যূনতর অন্ধকারময়, অধিকতর মুক্ত। পৃষ্ঠাভূমি আর সম্পূর্ণ ধূসর নয়, অথবা ধূসর বর্ণটি নীলবর্ণের নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং ছোটো ছোটো অবতরণশীল আলোকের বিস্ফোরণগুলো অধিকতর বিলম্বিতভাবে নির্বাপিত হয় ; তারা আরো তীব্র, আরো প্রচুর ও আরো ঘন ঘন আসে। আনন্দ অধিকতর সময় স্থায়ী হয়, প্রেম অধিকতর বিশাল হয়, এবং তারা নিম্নতর স্তরের অসংখ্য শর্তের অধীন কম হয়— আমরা জানতে আরম্ভ করি আনন্দ কী, প্রেম কী, তাদের নিজের স্বরূপে, অহেতুক ভাবে। আলোক এখনও শীতল, এবং কিছুটা কঠিন। মনের উপাদান এখনও ভারী, এবং ঊর্ধ্বের আলোক অধিকারে এনে নিজের উপাদানে মিশিয়ে দেয়, তাকে এক চিন্তনের আবরণ দিয়ে আচ্ছাদিত করে। অবশ্য তা করে কোনো কিছু লক্ষ্য না করেই। বস্তুত যে আলোক এ পায় তাকে তখনই বুঝতে পারে না ; তাকে অধিকতর তরল করবে, যুক্তিসিদ্ধ করে এবং বিভিন্ন পৃষ্ঠা, শব্দ ধারণায় খণ্ডবিখণ্ড করেই তাকে বুঝতে পারে। তা ছাড়া, ঊর্ধ্বমানসের পৃষ্ঠা ও অনুচ্ছেদগুলি আলোকের এক বা অল্পসংখ্যক অধিকৃত বিন্দুর উপর নির্ভর করে (যে আলোকবিন্দু, তার কার্যারম্ভের পূর্বেই গৃহীত সিদ্ধান্ত, বোধির এক ক্ষুদ্র বিন্দু যা শীঘ্রই বিলীন হয়ে যায়), এবং পথের মাঝে এই সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনো কিছু অপসারিত করবার জন্য একে অনেক কষ্টস্বীকার করতে হয়। এ কথা সত্য, উচ্চতর স্তরগুলির প্রতি উন্মুক্ত হয়ে এ আলোকের ঝলক পেতে পারে। কিন্তু তা, তার স্বাভাবিক উচ্চতা নয় : এর মানসিক উপাদানের উদ্দেশ্য আলোককে বিভাজিত করা। কোনো কিছুর ব্যাখ্যা না করে এ কিছু বুঝতে পারে না।

(গ) জ্যোতির্মানস

জ্যোতির্মানস অন্যপ্রকৃতির। যখন ঊর্ধ্বমানস নীরবতাকে গ্রহণ করতে শেখে, তখন এই স্তরে প্রবেশ করতে পারে : এর উপাদান পরিষ্কার হয়ে যায়, এবং যা বিন্দু বিন্দু হয়ে আসত, তা আসে স্রোতের আকারে। *এই ভূমি আর এক সাধারণ নিরপেক্ষতা হয়ে থাকে না, বরং হয়ে যায় এক বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ, যার মধ্যে ধ্বনিত হয় সৌন্দর্যচেতনার বিশেষ স্বরগ্রাম অথবা যেখানে তারা উদ্ভূত হয়। এই হল প্রথম মৌলিক পরিবর্তন।*[২৯] চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে যায় আলোকের বন্যায়, যা প্রায়ই স্বর্ণাভ, আমাদের আন্তর পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণের ছটাদ্বারা তা পরিপৃক্ত হয়। এ এক আলোকের আক্রমণ। এবং একই

সময়ে, এ এক "ভগবৎ-অনুপ্রেরিত প্রবল উদ্দীপনার"* অবস্থা। এক আকস্মিক জাগরণ, যেন সমগ্র সত্তা সজাগ সতর্ক হয়ে সহসা নিমগ্ন হয়ে যায় এক অতি দ্রুত ছন্দে, এক সম্পূর্ণ নতুন বিশ্বে, নতুন মূল্যবোধ, নতুন বৈচিত্র্য ও অপ্রত্যাশিত সংযোগের সঙ্গে। জগতের ধূম্রময় আবরণ অপসারিত হয়ে যায়। এক মহান্ আনন্দময় স্পন্দনের মধ্যে সব-কিছু সংযুক্ত হয়ে যায়। জীবন হয়ে যায় বিশালতর, সত্যতর ও অধিকতর জীবন্ত। ছোটো ছোটো সত্য প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে সর্বত্র, নিঃশব্দে, যেন প্রত্যেক বস্তুতে নিহিত আছে এক রহস্য, এক বিশেষ তাৎপর্য, এক বিশেষ জীবন। আমরা অবস্থিত হই *সত্যের এক অবস্থায়* যা অনির্বচনীয়, সে-বিষয়ে কিছুই বুঝি না আমরা— তা শুধুই *বিদ্যমান*। এবং বিস্ময়জনকভাবে। এ হল হাল্কা, জীবন্ত ও প্রেমময়।

আলোকের এই বন্যা প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়— আমরা সবসময়ই অতি শীঘ্রতার সঙ্গে তাকে এক আকৃতিপ্রদান করতে চাই, আমাদের সত্তার মধ্যে নীরবে সঞ্চারিত হয়ে তার উপাদানকে বিশুদ্ধ করবার কার্য করতে দেওয়ার পরিবর্তে। কারো কারো মধ্যে এক আকস্মিক কবিত্বময় প্রস্ফুটন হয়; অন্যান্যেরা নতুন স্থাপত্যের আকৃতির দর্শন পান, কিংবা নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্র অনুসরণ করেন, এবং অন্য কেউ কেউ তাঁদের ভগবানের আরাধনা করেন। সাধারণত, এই চেতনায় প্রবেশের সঙ্গে আসে সৃজনী শক্তির এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্ফুটন, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে। শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদের মধ্যে সকল ভাষায় আশ্চর্যজনকভাবে বহুসংখ্যক কবি আছেন— চৈনিক, ভারতীয়, ইংরেজি— যেন কবিত্ব ও শিল্প তাঁর যোগের প্রথম ব্যবহারিক পরিণাম : *আমার মধ্যে, এবং অন্যান্যদের মধ্যে আমি দেখেছি সকল প্রকারের কার্যক্ষমতার এক আকস্মিক প্রস্ফুটন, চেতনার উন্মীলনের সঙ্গে। আত্মপ্রকাশে যে ব্যক্তি ন্যূনতম সাফল্য পান নি, তিনি সহসা একদিনেই কাব্যময় ভাষায় ও ছন্দে পূর্ণদক্ষতা লাভ করেন। মনের মধ্যে যথার্থ নীরবতা এবং যে শব্দ নিজের প্রকাশের জন্য প্রয়াসী, তার প্রতি যথার্থ উন্মীলনের প্রশ্ন এ— কারণ শব্দ রচিত হয়ে সেইসকল অভ্যন্তরীণ স্তরে থাকে, যেখানে সকল কলাত্মক রূপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু যে মন তাকে সঞ্চারিত করবে, তার পক্ষে উচিত, বাধায় পরিণত না হয়ে, নিজেকে পরিবর্তিত করে এক বিশুদ্ধ মাধ্যমে পরিণত হওয়া।*[৩০]

চেতনার এসব উচ্চতর ভূমির পরিচিতি অভিব্যক্ত করবার জন্য কবিতাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী উপায় : কবিতার ছন্দে আমরা সহজেই তাদের স্পন্দন প্রত্যক্ষ করতে পারি। সেজন্য আমরা এখানে ও পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতেও

---

* "enthusiasm" in the Greek sense of the word. [enthusiasmos = a god-inspired zeal]

কবিতারই উল্লেখ করব যদিও অতিচেতন শুধু কবিদেরই বিশেষ অধিকার নয়। কবিতার উপর তাঁর চিঠি-পত্রের বিশাল আদান-প্রদানে ও তাঁর *Future Poetry* গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ অসংখ্য কবিতার উদাহরণ দিয়েছেন, যা উদ্ভূত হয়েছে জ্যোতির্মানস হতে, যেমন Wordsworth-এর (ওআর্ডস্ওয়ার্থের) নিম্নে উল্লিখিত কবিতাংশটি * ; বাইরের অর্থটি বাদ দিয়ে তার অন্তরালে যে স্পন্দন আছে, তা শোনবার জন্য তিনি আমাদের আহ্বান করছেন। কারণ, কবিতা এবং শিল্পকলার সমস্ত রূপ পরিশেষে শুধু এক অনির্বচনীয় ধ্বনিকে ধরে রাখবার উপায়, যা হয়তো কিছুই নয় অথচ জীবনের সত্য।

The cataracts blow their trumpets from the steep ;
No more shall grief of mine the season wrong ;
I hear the Echoes throught he mountains throng,
The Winds comes to me from the fields of sleep.

[দুরারোহ গিরি হতে নির্ঝরেরা ভেরীধ্বনি করে ;
আমার বিষাদ আর আনবে না এ ঋতুর ব্যর্থতা ;
আমি শুনি প্রতিধ্বনি, গিরিপথে সমাকীর্ণ হয়,
ঘুমের মাঠের বাতাসেরা আসে আমার সমীপে।।]

কোনো কবিতা তার অর্থের জন্য "জ্যোতির্ময়" হয় না, জ্যোতির্ময় হয় কারণ এ সেই স্তরের বৈশিষ্ট্য বহন করে। সেই একই বৈশিষ্ট্য আমরা পেতে পারি রেমব্র্যান্ট-এর (Rembrandt †-এর) চিত্রাঙ্কনে, সিজার্ ফ্র্যাংক্-এর (Franck ††-এর) সঙ্গীতের স্বরলিপিতে, কিংবা, শুধুই কোনো এক বন্ধুর কথার মধ্যে— এ হচ্ছে অন্তরালবর্তী সত্যের স্পর্শ, এক ক্ষুদ্র স্পন্দন যা সোজাসুজি হৃদয়কে স্পর্শ করে, এবং কবিতাটি, চিত্রটি বা সংগীতের স্বরলিপি শুধুই ন্যূনাধিক স্বচ্ছ বা স্থূল প্রতিলিপি মাত্র। এবং যতই আমরা উর্ধ্বে আরোহণ করি, স্পন্দন ততই অধিকতর বিশুদ্ধ, জ্যোতির্ময়, বিশাল ও শক্তিশালী হয়।

শেলি (Shelley)র কবিতাংশ :

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,

---

* মূল ফরাসি রচনায়, গ্রন্থকার এখানে ও পরবর্তী অনুচ্ছেদে রিম্বড্ (Rimbaud)-এর কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তাদের ইংরেজি অনুবাদে স্পন্দনগত উৎকর্ষ ন্যূনতর হয়ে যাবে, সেজন্য আমরা তার পরিবর্তে ইংরেজি কবিতা হতে উদ্ধৃতি দিয়েছি, শ্রীঅরবিন্দের চয়ন অনুসারে। —অনুবাদক

† Rembrandt (১৬০৬-১৬৬৯) : ডাচ্ বা ওলন্দাজ্ চিত্রকর।

†† César Franck (১৮২২-১৮৯০) : বেল্জিয়াম-দেশীয় সুরকার।

The devotion to something afar,
From the sphere of our sorrow.

[পতঙ্গের কামনা তারকার তরে,
আগামী উষার তরে নিশীথের তৃষা,
দূরের কিছুর প্রতি পরমানুরাগ
আমাদের বিষাদের পরিসীমা হতে।]

এখানে স্পন্দন এমনভাবে উপস্থিত যে, তা প্রায় দৃশ্য। কিন্তু এ এক জ্যোতির্ময় স্পন্দন নয়, এ আসে নি মস্তকের ঊর্ধ্ব হতে, বরং এসেছে হৃৎকেন্দ্র হতে, এবং তার কিছুই করণীয় নেই পঙ্‌ক্তিগুলির অর্থ নিয়ে : শব্দগুলি শুধুই আবরণ যা-কিছু স্পন্দিত হয় তার। অন্য-পক্ষে শেক্‌সপিয়ারের এই দুটো পঙ্‌ক্তি সোজাসুজি জ্যোতির্মানস হতে এসেছে :

Absent thee from felicity awhile,
And in this harsh world draw thy breath in pain

[ক্ষণিকের তরে আনন্দ হতে দূরে তুমি চলে যাও ;
বেদনার মাঝে নিশ্বাস নাও এ কঠোর দুনিয়ায়।]

এই স্তর হতে উদ্‌ভূত সকল রচনার প্রধান উৎকর্ষ হল, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, এক *জ্যোতির্ময়, তীব্র ব্যাপকতা,* এক আকস্মিক আলোক-বন্যা। এই স্পন্দন অন্য স্পন্দনের মতো নয়, সবসময়ই এর প্রভাব আছে, পরে দীর্ঘসময় পর্যন্ত এই স্পন্দন থাকে, ঠিক এক টিউনিং ফর্‌ক্ (tuning fork) †-এর মতো। কিন্তু দীর্ঘসময় পর্যন্ত কোনো কার্যে এ বিশুদ্ধ থাকে না, এবং অনেক সময়ই এ নেমে আসে এক সাধারণ মানসিক বা তামসিক স্তরে, কারণ কার্যটির গতিবিধি চেতনার গতিবিধিকেই অনুসরণ করে, অনবরত উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে, এক অনুশীলনীর মাধ্যমে স্থিরীভূত না হওয়া পর্যন্ত।

জ্যোতির্মানসের সৌন্দর্যের সঙ্গে, আমরা তার সীমাও আবিষ্কার করি : জ্যোতির্ময় কবিতা নিজেকে প্রকাশ করে প্রতিরূপ †† ও অভিব্যক্তিময় শব্দরাজির এক প্রবাহে (কারণ এই স্তরে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ও শ্রবণও উন্মীলিত হয়)— প্রাচুর্যময় ও কখনো কখনো শৃঙ্খলাবিহীন প্রতিরূপের প্রায় এক তুষার-প্রবাহ, যেন চেতনার পক্ষে খুবই কঠিন এই আলোকময় তরঙ্গ তথা তীব্রতার বাহুল্যকে ধারণ করা — অত্যধিকতাপূর্ণ এ প্লাবন। উৎসাহ উল্লাসে পরিণত হতে পারে, এবং সত্তার

† বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ।

†† প্রতিরূপ = image

অবশিষ্ট অংশ যদি যথেষ্টভাবে বিশুদ্ধীকৃত হয় নি, তা হলে নিম্নতর অংশগুলির যে-কোনো একটি অবতরণশীল আলোক ও শক্তিকে অধিকার করে নিজের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করতে পারে— এ এক সাধারণ পতন। যখন প্রকৃতির নিম্নতর অংশগুলো, বিশেষত প্রাণসত্তা, এই আলোকময় প্রবাহকে অধিকার করে নেয়, তখন তারা তাকে কঠিন করে দেয়, নাটকীয় করে দেয়, তার উপর অত্যাচার করে— শক্তি তখনও বিদ্যমান, কিন্তু কঠিন অবস্থায়— কিন্তু জ্যোতির্মানসের সারতত্ত্ব হল আনন্দ। এ প্রসঙ্গে আমরা অনেক কবি ও সৃজনশীল প্রতিভার নাম উল্লেখ করতে পারব।* তা ছাড়া, জ্যোতির্মানসের উপাদান প্রকৃতপক্ষে স্বচ্ছ নয়, তা শুধু ঈষদচ্ছ, অর্থাৎ আলোকের দ্বারা ভেদ্য, অথচ অস্বচ্ছ ; এর আলোক পরিব্যাপ্ত— যেন এ সত্যের উপস্থিতি সর্বত্র জানতে পারে, তাকে প্রকৃতই স্পর্শ না করেও— সেজন্যই মাঝে মাঝে এই অসংলগ্নতা, এই জোয়ার-ভাটা। এক 'জন্মের' এ আরম্ভ মাত্র। আরো ঊর্ধ্বতর স্তরে পৌঁছবার পূর্বে, বিশুদ্ধীকরণের আরো এক পর্যায় প্রয়োজনীয়, এবং সর্বোপরি প্রয়োজনীয় আরো প্রশান্তি, আরো সমতা, আরো নীরবতা, চেতনায় যত উচ্চে আমরা আরোহণ করি, ততই বেশি প্রয়োজন পাহাড়ের মতো অটল সমতার।

(ঘ) বোধিমানস

বোধিমানস, জ্যোতির্মানস হতে ভিন্ন, তার নির্মল স্বচ্ছতার জন্য— এ পারদের মতো, নগ্নপদে এক পর্বত হতে অন্য পর্বতে লম্ফপ্রদান করে যায়। ঊর্ধ্বমানসের মতো, এ আর শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, অর্থোপীডিক্[†] উপকরণের সঙ্গে তুলনীয় এইসব বৌদ্ধিক বন্ধনীর দ্বারা, যারা আমাদের আবদ্ধ রাখে ভূমির সঙ্গে, যেন জ্ঞান নির্ভর করে আমাদের চিন্তনের দুর্বহ পরিমাণের উপর। জ্ঞান নীরবতা হতে প্রজ্বলিত এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সব-কিছু আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আছে, প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর বা গভীরতর স্থানে নেই এবং অপেক্ষা করে আছে যে আমরা

---

* এ কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি যদি সাময়িকভাবে কখনো কোনো প্রেরণা বা আলোক পান, যা নির্ভরযোগ্য নয়, এবং অন্য এক ব্যক্তি সুশৃঙ্খলভাবে নিজের চেতনার উৎকর্ষসাধন করেছেন, ক্রমান্বয়ে, যার পরিণামে তিনি চেতনার যে-কোনো নির্বাচিত স্তরে নিজেকে অবস্থাপিত করতে পারেন এবং সেখানে নিজের ইচ্ছানুসারে দীর্ঘসময় বাস করতে পারেন ও সেখান থেকে তদনুরূপ প্রেরণা ও আলোক পেতে পারেন, তা হলে এদের দুজনের মধ্যে আছে এক বিরাট ব্যবধান। এই হল পূর্ণযোগের কাজ।

† Orthopaedics : বিকলাঙ্গতার নিরাময়ের জন্য শল্য-চিকিৎসা ; Orthopaedic : উক্ত শল্য-চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়।

কিছুটা স্বচ্ছতর হয়ে উঠব— বিষয়টি ততটা আরোহণের নয়, যতটা পথ পরিষ্কার করবার। বসন্ত ঋতুতে, ভারতের ধানক্ষেতগুলো বিস্তীর্ণ হয়ে থাকে, প্রশান্ত, সবুজ, সুগন্ধে পরিপূর্ণ, দৃষ্টি যতদূর যেতে পারে ততদূর, এক গম্ভীর আকাশের নিচে ; হঠাৎ একবার চিৎকার করেই, হাজার হাজার টিয়ে পাখি উড়ে যায়। আমরা যেন কিছুই দেখতে পাই নি। ঘটনাটি ঘটে অতিশীঘ্র, এক ঝলকের মধ্যে— চেতনা যখন বিশুদ্ধ হয় তখন এমনই তীব্র শীঘ্রতা পায়। একটি আভাস, একটি শব্দ, একটি আলোকবিন্দু, এবং তারা এনে দেয় এক অত্যুজ্জ্বল প্রাচুর্যময় জগৎ— ঝল্‌কে-ওঠা এক মুহূর্তে হাজার হাজার পাখি, যারা ধরা দেয় না। আমাদের মানদণ্ডে বোধি পুনর্বার রচনা করে সেই আদিম রহস্য এক মহান্ অবলোকনের। এক সম্ভ্রম-সঞ্চারী দৃষ্টির, যা সব-কিছু দেখেছে, এবং সব-কিছু জেনেছে, এবং যা ক্রীড়াচ্ছলে দেখে ধীরে ধীরে, বিলম্বিতভাবে, ক্রমান্বয়ে, সময়ের দৃষ্টিতে, অসংখ্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যা-কিছু সে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে, একাকী, শাশ্বতের এক ভগ্নাংশের মধ্যে।

শাশ্বত মুহূর্ত এক স্রষ্টা বর্ষসমূহের।[৩১]

বোধির সঙ্গে আসে এক বিশেষ আনন্দ, যা জ্যোতির্মানসের আনন্দ হতে ভিন্ন মনে হয়। বাইরে থেকে কোনো ধারা অন্তরে প্রবাহিত হওয়ার বোধ আর হয় না। কিন্তু একপ্রকার উপলব্ধি হয়, সত্যই যেন আমরা দুজন আছি, এক ভাই আলোকের, সবসময় আলোকে বাস করে, এবং অন্য ভাই ছায়ার, 'আমরা' স্বয়ং, নিচে বাস করি, অন্ধকারে হাতড়াই বিশৃঙ্খলভাবে, আলোকের ভাই-এর অঙ্গভঙ্গি, গতিবিধি, জ্ঞান ও মহান্ অভিযানের অনুকরণ করি। কিন্তু নিচে সব-কিছুই তুচ্ছ, সংকুচিত, পরিপাটিবিহীন। তারপর সহসা সংঘটিত হয় যুগপৎ মিলন— আমরা দুজন এক হয়ে যাই। আলোকের একই বিন্দুতে এক। আর কোনো বিভেদ নেই ; আছে আনন্দ।

যখন আমরা সর্বাংশে এক হয়ে যাই, তাই হবে দিব্য জীবন।

মিলনের এই বিন্দুটি জ্ঞানও, যা অভিব্যক্ত হয় যে-কোনো রূপে, সাময়িকভাবে আমরা যে বিষয়ে ব্যাপৃত তার উপর নির্ভরশীল হয়ে, কিন্তু তা সবসময়ই, প্রধানত, একত্বের এক 'আঘাত'। এক সাক্ষাৎকার— আমরা জানি, কারণ আমরা *চিনতে* পারি। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, *বোধি এক সত্যের স্মৃতি।*[৩২] বোধির এক ঝলকে, আমরা ভালোভাবেই দেখি যে, জ্ঞান অজ্ঞাতের আবিষ্কার নয়— আমরা শুধু *নিজেদেরই* আবিষ্কার করতে পারি, অন্য কিছুই আবিষ্কারের জন্য নেই। আলোকের সেই একমুহূর্তে আমরা যা *সকলেই দেখেছি*, এ হল সময়ের মধ্যে তাকেই ধীরভাবে চিনতে পারা। কে দেখে নি, একটিবারও? কার হয় নি জাগরণ সেই 'স্মৃতির', তার জীবনে? যা-কিছু আমাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস

হোক, হোক আমাদের সামর্থ্য বা অসামর্থ্য, আমাদের "উচ্চতা" যতই হ্রস্ব বা নাতিহ্রস্ব হোক, সবসময়ই একটি মুহূর্ত আসে, যা *আমাদের* মুহূর্ত। কোনো কোনো জীবন শুধু সেই একটি মুহূর্তই স্থায়ী হয়, অবশিষ্ট সব-কিছুই বিস্মৃতি।

বোধির ভাষা নিজেকে ঘনীভূত করে দেয় এক সংক্ষিপ্ত সূত্রে, কোনো নিষ্প্রয়োজন শব্দ থাকে না; এ পৃথক্ জ্যোতির্মানসের বাহুল্যপূর্ণ ভাষা হতে (জ্যোতির্মানস, তৎসত্ত্বেও, তার প্রাচুর্যের মাধ্যমে এনে দেয় এক প্রোজ্জ্বল ছন্দ এবং এক সত্য, যা হয়তো ন্যূনতরভাবে নির্দিষ্ট কিন্তু অবশ্যই উষ্ণতর)। যখন প্লটিনাস্ মানবীয় প্রয়াসের সম্পূর্ণ চক্রটিকে কয়েকটি শব্দের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করলেন— "উড়ে যাওয়া, নিঃসঙ্গ হতে, নিঃসঙ্গের অভিমুখে"— তিনি ব্যবহার করেছিলেন এক উচ্চ ধরনের বোধিমানসের ভাষা, যেমন ব্যবহৃত হয়েছে উপনিষদসমূহে। কিন্তু এই গুণটি বোধির সীমাও চিহ্নিত করে : আমাদের আলোকের সকল ঝলক ও সূত্রাবলী যতই জীবন্ত হোক-না-কেন, তারা সম্পূর্ণ সত্যকে ধারণ করতে পারে না— এক বিশালতর, উষ্ণতার প্রয়োজন, যেমন উষ্ণতা জ্যোতির্মানস এনেছিল, তেমনই, কিন্তু এক মুক্ততর স্বচ্ছতায়। কারণ, *বোধি সব-কিছুকে দেখে আলোকের ঝলকের মাধ্যমে। একটি অংশের পর অন্য একটি অংশকে, সমগ্রভাবে নয়।*[৩৩] আলোর ঝলকে যে অঞ্চলটি অনাবৃত হয় তা আকর্ষক ও অখণ্ডনীয়, কিন্তু তা শুধু *সত্যের এক অঞ্চল*[৩৪] মাত্র। তা ছাড়া, মন আমাদের অন্তর্ভাসলব্ধ সকল সত্যকে অধিকার করে নেয়, এবং *একই সময়ে তাদের অত্যল্প ও অত্যধিক করে দেয়।*[৩৪] অত্যধিক করে দেয়, কারণ সে অযথা তার অন্তর্ভাসকে সর্বজনীন করে দেয় ও তার আবিষ্কারকে সমগ্র অঞ্চলে বিস্তৃত করবার জন্য প্রয়াস করে; অতি অল্প করে দেয়, কারণ আমাদের উপাদানকে আলোকিত ও বিশুদ্ধ করবার কাজ এই আলোকের ঝলককে নীরবে করতে না দিয়ে, তার পরিবর্তে মন তাকে বলপূর্বক অধিকার করে, এবং আবৃত করে এক চিন্তনের প্রলেপ দিয়ে (কিংবা এক চিত্রময়, কবিত্বময়, গাণিতিক বা ধার্মিক প্রলেপ দিয়ে), এবং তাকে আর বুঝতে পারে না, তার উপর বৌদ্ধিক, কলাত্মক বা ধার্মিক রূপের মাধ্যম ন্যস্ত না ক'রে। খুবই দুরূহ মনকে বোঝানো এ-কথা যে, কোনো অন্তঃপ্রকাশ† সর্বশক্তিমান্ হতে পারে, এমন-কি প্রবলভাবে অভিভূতও করতে পারে, যদিও সে-বিষয়ে আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, এবং বিশেষত তা সর্বশক্তিমান্ থাকে সে পর্যন্ত, যে পর্যন্ত তাকে কয়েক স্তর নিচে নামিয়ে না আনা হয়, এবং তরলীকৃত ও বিখণ্ডিত করা না হয়, তাকে "বোঝবার" জন্য। যদি আমরা নীরব থাকতে পারি, এই আলোকের ঝলককে স্পন্দনশীল রেখে, যেন তার আলোকেই তাকে রাখা হয়, তার পতনরোধপূর্বক, এবং যদি আমরা তার

† অন্তঃপ্রকাশ = revelation.

উপর ঝাঁপ না দিই, তাকে ছোটো ছোটো বৌদ্ধিক খণ্ডে বিখণ্ডিত করবার জন্য, তা হলে কিছু সময় পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করব যে, আমাদের *সমগ্র* সত্তা এক পরিবর্তিত উচ্চতায় আছে, এবং আমরা পেয়েছি এক নতুন দৃষ্টিশক্তি, এক সামান্য অকেজো সূত্রের পরিবর্তে। যখন আমরা বিশ্লেষণ করি, তখন রূপান্তরকারী শক্তি তিন-চতুর্থাংশ লুপ্ত হয়ে যায়।

প্রাপ্ত আলোকের প্রাচুর্যের অপচয় করবাব জন্য সাধক তাঁর লেখনী বা তুলির প্রতি কিংবা শব্দস্রোতের মধ্যে ধাবমান না হয়ে, যদি তাঁর নীরবতা ও স্বচ্ছতাব সংরক্ষণে যত্নশীল হন, ধৈর্য যদি তিনি ধারণ করেন, তা হলে তিনি দেখতে পাবেন যে এইসকল আলোকেব ঝলক যেন ক্রমশ বহুগুণিত হয়ে একত্রীভূত হয়। এবং ধীরে ধীরে অন্য একটি চেতনা তাঁর মধ্যে আকার ধারণ করে, যা যুগপৎ পূর্ণতা ও উৎস, জ্যোতির্মানসের, বোধিমানসের, এবং সকল মানবীয় মানসিক রূপের। এই হল অধিমানস।

(ঙ) অধিমানস

অধিমানস মানবচেতনার শীর্ষ যা সহজে উপলব্ধ হয় না। এ এক বিশ্বময় চেতনা, কিন্তু এখানে ব্যক্তিচেতনার বিনাশ হয় না। সব-কিছু পরিত্যাগ করে স্বর্গের উচ্চতায় বিস্ফোরণ সহকারে প্রবেশ করবার পরিবর্তে, সাধক ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর সত্তার প্রত্যেকটি ক্রমে আরোহণ করেছেন, যেন নিম্নতমের সঙ্গে শীর্ষের সংযোগ বিদ্যমান থাকে, অবিচ্ছিন্নতা কোথাও খণ্ডিত না হয়ে। অধিমানস দেবতাদের জগৎ, ধর্মের মহান্ প্রবর্তকদের প্রেরণার উৎস। এখানেই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের পরিচিত সকল ধর্মের, অধিমানসের অসংখ্য আভিমুখ্যের কোনো-না-কোনো একটির অনুভব হতেই উদ্ভূত হয়ে। কারণ, যে-কোনো ধর্ম, যে-কোনো অন্তঃপ্রকাশ কিংবা যে-কোনো আধ্যাত্মিক অনুভূতি কোনো-না-কোনো স্তর হতেই আসে। ভগবানের বজ্র হতে বা শূন্য হতে তা বিস্ফোরিত হয়ে আসে না ; যাঁদের মধ্যে তা মূর্ত হয়, তাঁরা শূন্য হতে তার ধারণা সৃষ্টি করেন নি। অধিমানস স্তরই তাঁদের উৎস। শ্রেষ্ঠতম কলাকৃতিরও উৎস তা, তথাপি আমরা জোর দিয়ে বলব যে যদিও তা মনের শীর্ষ, তা মনেরই এক স্তর।

যখন চেতনা সেই ভূমিতে আরোহণ করে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর একের পর এক এ আর দৃষ্টিপাত করে না, বরং সে দৃষ্টিপাত করে *প্রশান্তভাবে, অবিচলিতভাবে এবং বিশাল পরিমাণে।*[৩৫] অন্যান্য ভূমি হতে প্রধান পার্থক্য নিহিত এর সমানতায়, আলোকের প্রায় সম্পূর্ণ একরূপতায় : কোনো এক বিশেষ গ্রহণশীল জ্যোতির্মানসে আমরা দেখতে পাব, উদাহরণস্বরূপ, এক নীলাভ বিস্তৃতি বা পৃষ্ঠভূমিতে আকস্মিক আলোকের ফোয়ারা, বোধিগত আলোকের ঝলক বা

ভ্রমণরত জ্যোতির্ময় বিস্ফোরণ, এমন-কি, কখনো কখনো মহান্ অধিমানসিক আলোকের নির্ঝর, কিন্তু তা হবে আলোকের অবিরাম খেলা। মাঝে মাঝে, কিছুই স্থায়ী নয়— শ্রেষ্ঠ কবিদের সাধারণত এই অবস্থা থাকে ; তাঁরা এক স্তর বা ছন্দ প্রাপ্ত হন। এক সাধারণ কবিত্বপূর্ণ জ্যোতির্ময়তা, এবং কখনো কখনো ছুটে যান উচ্চতর অঞ্চলগুলিতে ও নিয়ে আসেন সেইসব তীব্র আলোকময় কবিতা, বা সংগীতময় শব্দগুচ্ছ, যা পুনরাবৃত্ত হয়, পুরুষের পর পুরুষ ধরে, "ওপন্ সীসেম্" †-এর মতো। জ্যোতির্মানস সাধারণত ভিত্তিস্বরূপ (অত্যন্ত উর্ধ্বস্থ এক ভিত্তিভূমি এ), এবং অধিমানস এক দিব্য সাম্রাজ্য যেখানে আমরা প্রবেশ-প্রাপ্ত হই শুধু দিব্যকরুণার মুহূর্তসমূহেই।

কিন্তু আলোক সবিরাম নয়, এক পূর্ণ ও স্থায়ী অধিমানসিক চেতনার জন্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন বৈদিক ঋষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন : চেতনা *স্থির আলোকের এক ঘনীভূত বিশালতা।* পরিণতি এক অবিরাম বিশ্বময় দৃষ্টি ; বিশ্বময় আনন্দ, বিশ্বময় সৌন্দর্য, বিশ্বময় প্রেমের পরিচয় পাই আমরা। কারণ, নিম্নতর স্তরসমূহের সকল বিরোধ আসে আলোকের অভাব হতে, বা বলা যেতে পারে, আলোকের সংকীর্ণতা হতে, যা আলোকিত করে এক স্বল্প সীমায়িত ক্ষেত্র ; বিরোধ হল দুটো ঝলকের মধ্যে স্থিত ছায়াময় স্থানের মতো, বা আমাদের আলোকের শেষ স্থিত অন্ধকার সীমান্তের মতো ; এই সমতাময় আলোকে সকল বিরোধ এক একীভূত দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। যে মুহূর্তে আলোক সর্বত্র উদ্ভাসিত হয়, আনন্দ, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যও সর্বত্র বিরাজিত হয়। বিপরীতগুলো আর অনুভূত হয় না নিষেধরূপে অথবা চেতনার দুটো ঝলকের মধ্যবর্তী ছায়াময় ব্যবধান-রূপে, বরং অনুভূত হয় এক অবিরাম মহাজাগতিক ঐকতানের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন তীব্রতার উপাদানরূপে। এ কথা নয় যে অধিমানস চেতনা দেখতে অসমর্থ যাকে আমরা আখ্যা দিই কদর্যতা, অশুভ বা যন্ত্রণা ; কিন্তু সব-কিছু সুসম্বদ্ধ এক বিশাল বিশ্বময় সংগীতে, যেখানে প্রত্যেক বস্তুর স্পষ্ট স্থান ও উদ্দেশ্য আছে। এ এক চেতনা, যা ঐক্যময়, বিভেদমূলক নয়। ঐক্যের সামর্থ্যেই অধিমানস পূর্ণতার পরিমাপ। তা ছাড়া, ঐক্যের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভাগবত (ভগবান্ আর কোনো ধারণার বা মেনে নেওয়ার বিষয় নন, বরং তাকে এখানে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, এবং স্বাভাবিকভাবে তিনি *হয়ে ওঠেন* আমরা, যেমন আমাদের চেতনাও হয়ে গেছে আলোক), অধিমানস সত্তা একই আলোক সর্বত্র দেখতে পান, সকল বস্তুতে, সকল সত্তায়, যেমন তিনি নিজের মধ্যে দেখেন : বিচ্ছিন্নকারী শূন্য আর নেই, নেই আর বিজাতীয়তার পার্থক্য, একই অবিচ্ছিন্ন উপাদানে সব-কিছুই স্নাত। বিশ্বময় প্রেম, বিশ্বময় উপলব্ধি, বিশ্বময় করুণা তিনি অনুভব করেন অন্যসকল

† Open Sesame : আরব্য উপন্যাসের গুপ্তদ্বার খোলার মন্ত্র। তুলনীয়, চিচিং ফাঁক।

সত্তার জন্য, যারা তাঁরই অন্য স্বরূপ, যারা অগ্রসর হচ্ছে তাদেরই ভগবৎস্বরূপের অভিমুখে ; অথবা যারা হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে সেই আলোক, যা তারা নিজে।

এইভাবে, আমরা এই অধিমানস চেতনায় উপনীত হতে পারি সকল প্রকার পথের মাধ্যমে, ধার্মিক ঐকান্তিকতার মাধ্যমে, অথবা কবিত্বময়, বৌদ্ধিক, কলাত্মক, বীরত্বপূর্ণ তীব্রতার মাধ্যমে— যে-কোনো কিছুর মাধ্যমে যা মানুষকে সাহায্য করে নিজেকে অতিক্রম করতে। শ্রীঅরবিন্দ এক বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন চারুকলাকে, আধ্যাত্মিক প্রগতির এক মহান্ উপায় যাকে মনে করতেন তিনি, দুর্ভাগ্যবশত, কলাকারেরা ও স্রষ্টারা সাধারণত এক বৃহৎ অহমিকার অধিকারী যা তাঁদের পথের বাধা। এই তাঁদের বিশেষ অসুবিধা। ধার্মিক মানুষ তাঁর অহমিকার বিলয়ের জন্য প্রয়াস করেছেন, এবং তাঁর পক্ষে বিষয়টি সহজতর, কিন্তু তাঁর পক্ষে ব্যষ্টিগত চেতনার মাধ্যমে বিশ্বগত চেতনা পাওয়া দুষ্কর, বরং আরোহণের সোপানকে পদাঘাতে দূরে ফেলে দিয়ে, লম্ফপ্রদান করে ব্যক্তিকে অতিক্রম করেন তিনি, ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যবর্তী ক্রমসমূহকে বিকশিত করবার জন্য কোনো চিন্তা না ক'রে। তার পরিণামে, যখন তিনি "শীর্ষে" উপনীত হন, তাঁর কাছে নেই কোনো সোপান যা দিয়ে তিনি নিম্নে অবতরণ করতে পারেন, কিংবা তিনি হয়তো আর চান না তলে নামতে, কিংবা তাঁর হয়তো কোনো ব্যক্তিত্বই নেই অবশিষ্ট, তিনি যা দেখেন তা ব্যক্ত করবার জন্য। কিংবা তা হয়তো তাঁর পুরোনো অতীতের ব্যক্তিত্ব যা অপটুভাবে প্রয়াস করে তার নতুন চেতনাকে প্রকাশ করবার জন্য, যদি এ কথা ধরে নেওয়া যায় যে কোনো কিছু ব্যক্ত করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। স্তর হতে অন্য স্তরে এক নিয়মাবদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সম্ভবত একমাত্র দৃষ্টান্ত আমাদের দিয়েছেন বৈদিক ঋষিগণ, যাঁরা হয়তো পৃথিবীর পরিজ্ঞাত সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম— এ কথা শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্ত করেছেন তাঁর *বেদরহস্যে*†। কবি শব্দটির অর্থ অবিচ্ছেদ্যভাবে উভয় "সত্যের দ্রষ্টা" ও "কবিতার স্রষ্টা"। ব্যক্তিবিশেষ দ্রষ্টা ছিলেন বলেই কবিও ছিলেন। এ এক সুস্পষ্ট সত্য যা আমরা সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছি। সুতরাং চেতনার আরোহণের উপায়রূপে পরিগণিত চারুকলার সম্বন্ধে, বিশেষত অধিমানসিক স্তরে কবিতার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা খুবই প্রয়োজনীয় হতে পারে।

(চ) মন্ত্রময়ী কবিতা

চেতনার ভূমিসমূহ জ্যোতির্ময় স্পন্দনের বিভিন্ন তীব্রতার দ্বারাই শুধু জানা যায়, তা নয়, বরং বিভিন্ন ধ্বনিময় স্পন্দনের বা ছন্দের দ্বারাও জানা যায়। যা আমরা শুনতে পারি, যদি আমাদের থাকে "কর্ণের কর্ণ," যে-কথা বেদে

† The Secret of The Veda.

উল্লিখিত আছে। বিভিন্ন ধ্বনি বা চিত্র, আলোক বা শক্তি বা সত্তা একই অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক যা বৈচিত্র্যের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়, স্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তীব্রতা নিয়ে। আমরা চেতনার ক্রমে যতই অবরোহণ করি, ধ্বনির স্পন্দন ততই খণ্ডিত হয়, যেমন হয় আলোক বা সত্তা বা শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাণিক ভূমিতে আমরা প্রাণের বিশৃঙ্খল স্পন্দন শুনতে পারি, কর্কশ অথচ প্রাণচঞ্চল, যেমন সেই স্তর হতে উদ্‌ভূত বিশেষ ধরনের সংগীত, বা বিশেষ ধরনের প্রাণিক চিত্রকলা বা কবিতা, যে সব-কিছু প্রকাশ করে এই ভগ্ন তথা অতীব বর্ণাঢ্য ছন্দ। যতই আমরা ঊর্ধ্বে আরোহণ করি, স্পন্দনগুলো ততই সামঞ্জস্যপূর্ণ, ঐক্যপূর্ণ ও ক্রমশ সূক্ষ্মতর হয়ে যায়, বলা যেতে পারে। বিঠোফেনের তারবাদ্য-চতুষ্টয়ের ঐকতানের কোনো মহান্ সুরের মতো। যা মনে হয় আমাদের টেনে নিয়ে যায় উপরে, ভাব-বিহ্বলতার সঙ্গে, রুদ্ধশ্বাস করে, বিশুদ্ধ আলোকের অত্যুজ্জ্বল উচ্চতায়। শক্তি আর ব্যক্ত হয় না স্বরগ্রামের উচ্চতায় বা বহুবর্ণের স্ফুরণে, বরং তা ব্যক্ত হয় উচ্চ আন্তরিক চাপের মাধ্যমে, স্পন্দনের গতিবেগ, বর্ণের রামধনু-কে পরিবর্তিত করে দেয় বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণে, এমন এক দ্রুত উচ্চ-ধ্বনিতে যে মনে হয় তা হয়ে গেছে স্থির, যেন বিধৃত হয়ে গেছে শাশ্বতের মধ্যে ; একটি একক ধ্বনি-আলোক-শক্তি যা বোধ হয় সেই পবিত্র ভারতীয় শব্দ ওঁ —*ঊর্ধ্বের অগ্নিতে নিগূঢ় শব্দ*[৩৬]। শাস্ত্রের বাণী : "প্রারম্ভে শুধু ছিল শব্দ।"

ভারতবর্ষে আছে এক নিগূঢ় জ্ঞান যা ধ্বনি এবং চেতনার প্রত্যেক ভূমির স্পন্দনের মধ্যে যে পার্থক্য তার উপর পর্যবসিত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি ওঁ এই ধ্বনি উচ্চারণ করি, আমরা স্পষ্টভাবে অনুভব করি, তার স্পন্দন আমাদের শীর্ষকেন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে, এবং *রং* ধ্বনি স্পর্শ করে নাভিকেন্দ্রকে। যেহেতু আমাদের চেতনার প্রত্যেকটি কেন্দ্র কোনো-এক ভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত, আমরা কোনো কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনির *জপ* করে চেতনার অনুরূপ ভূমির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি।* এই হল তান্ত্রিক সাধনা নামে পরিচিত এক সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক সাধনার ভিত্তিভূমি, যা উদ্‌ভূত পবিত্র *তন্ত্রশাস্ত্র* হতে। যে মৌলিক বা প্রধান ধ্বনিসমূহের এই যোগাযোগ স্থাপন করবার সামর্থ্য আছে, তাই হল মন্ত্র। এসব *মন্ত্র* সবসময় গোপনীয় এবং গুরু দ্বারা শিষ্যকে প্রদত্ত হয়।** এবং সেসব বহুবিধ (চেতনার প্রত্যেকটি ভূমিতে অসংখ্য ক্রম

---

* চেতনার কেন্দ্রসমূহের চিত্রে প্রত্যেক কেন্দ্রের মধ্যস্থলে আমরা এক-একটি সংস্কৃত অক্ষর লক্ষ্য করি : *লং, বং, রং, যং, হং, ওঁ*। এক আরোহী ক্রমে। এই মূলধ্বনিসমূহ প্রতিনিধিত্ব করে সেই বিশেষ স্পন্দনসমূহের যা এসকল ভূমির প্রত্যেকটির শক্তির উপর কর্তৃত্ব করে। (A. Avalon -কৃত *The Serpent Power* দ্রষ্টব্য)।

** বই-এর মন্ত্র পড়ে, ইচ্ছানুযায়ী তার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে, কিন্তু গুরু-কর্তৃক প্রদত্ত না হলে, তাদের কোনো সামর্থ্য বা ক্রিয়াশক্তি থাকে না।

আছে) এবং সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করতে পারে। কয়েকটি ধ্বনির সংযোগে, চেতনার নিম্নতর স্তরসমূহে, সাধারণত প্রাণিক স্তরে, ব্যক্তি অনুরূপ শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে খুবই অদ্ভুত সব ক্ষমতা অর্জন করতে পারে : এমন মন্ত্রও আছে যা হত্যা করতে পারে (পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভয়ংকর বমনের সাথে), মন্ত্র আছে যা শরীরে নির্দিষ্ট অংশ বা অঙ্গকে ত্রুটিহীন-ভাবে আঘাত করতে পারে, মন্ত্র আছে যা আরোগ্য করতে পারে, মন্ত্র আছে যা অগ্নিসংযোগ করতে পারে, কিংবা রক্ষা করতে পারে বা বিমুগ্ধ করতে পারে। এই ধরনের জাদুবিদ্যা বা স্পন্দনের রসায়ন-বিজ্ঞান উপলব্ধ হয় শুধু নিম্নতর স্পন্দনের সচেতন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা। কিন্তু এক উচ্চতর জাদুবিদ্যাও আছে এবং তাও উপলব্ধ হয় স্পন্দনের নিয়ন্ত্রণদ্বারা, কিন্তু চেতনার উচ্চতর ভূমিসমূহে : সেসব হল কবিতা, সংগীত, উপনিষদ্ ও বেদের আধ্যাত্মিক মন্ত্রাবলী, যে মন্ত্রসমূহ গুরু প্রদান করেন তাঁর শিষ্যকে তাকে সচেতনভাবে সাহায্য করবার জন্য, চেতনার কোনো এক স্তরের সঙ্গে, কোনো এক শক্তি বা দিব্যসত্তার সঙ্গে, প্রত্যক্ষ সংযোগ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে ধ্বনিই তার মধ্যে বিধৃত করে অনুভূতি ও উপলব্ধি— ধ্বনিই আমাদের দৃষ্টিশীল করে। সুতরাং, এ কথা বোঝা যায় যে, কবিতা ও সংগীত অজ্ঞাতভাবে এসব নিগূঢ় স্পন্দনকে স্পর্শ করে এবং তার ফলে, হয়ে উঠতে পারে চেতনার উন্মীলনের এক শক্তিশালী উপায়। যদি আমরা উচ্চতর স্পন্দনগুলোকে সচেতনভাবে পরিচালিত করবার ফলস্বরূপ সচেতনভাবে কবিতা অথবা সংগীত রচনা করতাম, তা হলে আমরা সৃষ্টি করতাম শ্রেষ্ঠ অবদান যা হত মন্ত্রশক্তিময়। যে কবিতা বুদ্ধির কল্পনা ও *মনের নৃত্যাঙ্গনা*[৩৭], শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন, তার পরিবর্তে আমরা সমর্থ হতে পারব সৃষ্টি করতে এক মন্ত্রময় সংগীত বা মন্ত্রময়ী কবিতা, *আমাদের জীবনে দেবতাদের আনবার জন্য*।[৩৮] কারণ প্রকৃত কবিতা হল এক ক্রিয়া, তা চেতনায় রন্ধ্রের সৃষ্টি করে— আমরা প্রাচীরে আবদ্ধ, অবরুদ্ধ! —সেই রন্ধ্রপথে 'সত্য' † প্রবেশ করতে পারবে! এ হল *সত্যের মন্ত্র*[৩৯], সত্য-দীক্ষা। বৈদিক ঋষিগণ ও উপনিষদের দ্রষ্টগণ মন্ত্রের সাহায্যে এই ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করতেন— মন্ত্রের শক্তি ছিল যে ব্যক্তি প্রস্তুত তার মধ্যে আলোকের সঞ্চার করা।* শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future Poetry-তে এরই বিশ্লেষণ করেছেন, এবং এ কথাই প্রমাণিত করেছেন তাঁর মহাকাব্য *Savitri* ('সাবিত্রী')তে।

† The Real, সদ্‌বস্তু।

* *যাঁরা বেদ ও উপনিষদের অনুবাদই শুধু পাঠ করতে পারেন, ধ্বনির সকল জাদুকরী শক্তি তাঁদের কাছে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি মূল সংস্কৃতে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা এসবের আবৃত্তি শ্রবণ করেন, তা হলে তার অর্থ হৃদয়ংগম করতে অসমর্থ হলেও তার আলোকে প্রভাবিত হতে পারেন।*

মন্ত্র, অথবা উচ্চতর কবিতা, উচ্চতর সংগীত, পবিত্র বাণী, সকলই উদ্ভূত অধিমানস হতে। এই হচ্ছে উৎস সকল সৃজনাত্মক তথা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের (এ দুটি বিষয়কে আর পরস্পর থেকে পৃথক করা যাবে না : এই স্বচ্ছ ভূমিতে বুদ্ধির সুস্পষ্ট বিভাজন অদৃশ্য হয়ে যায়, এখানে সব-কিছুই পবিত্র, এমন-কি যা শাস্ত্রমতে অপবিত্র, তাও)। সুতরাং অধিমানসের নির্দিষ্ট স্পন্দন বা ছন্দের বিষয়ে আমরা কিছু বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রারম্ভিকরূপে, যে-কোনো ব্যক্তি, যাঁর ঊর্ধ্বতর ভূমিসমূহের সঙ্গে, নূন্যাধিক সচেতনভাবে, সংযোগস্থাপন করবার সামর্থ্য আছে— কবি, লেখক বা শিল্পী— তাঁর কাছে একথা সম্পূর্ণরূপে স্বতঃসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধিযোগ্য যে, চেতনার এক নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করবার পর, আমরা আর ধারণাসমূহকে দেখে তাদের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করবার প্রয়াস করি না। আমরা শুনি। স্পন্দন, বা তরঙ্গ, বা ছন্দ প্রকৃতই সাধককে অধিকার করে, তাঁকে অভিভূত করে, এবং তারপর যখন তারা অবতরণ করে, তখন ধারণ করে আবরণ, শব্দের ও ধারণার, অথবা সংগীতের অথবা বর্ণালির। কিন্তু সেই শব্দ বা ধারণা বা সংগীত অথবা বর্ণালি হল পরিণতি। এক দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রভাব ; তারা শুধুই এক শরীর প্রদান করে প্রচণ্ডভাবে বিবশকারী সেই প্রথম স্পন্দনকে। যদি কোনো কবি, সত্যকারের কবি, তাঁর কবিতা বারংবার সংশোধন করেন। তা কবিতার গঠনকে উন্নততর করবার জন্য নয়, যেমন বলেন অনেকেই, কিংবা আরো উন্নততরভাবে প্রকাশ করবার জন্যও নয়, বরং এই স্পন্দনশীল তত্ত্বটিকে অধিকার করবার জন্য— কারণ যদি সত্যকারের স্পন্দনটি পাওয়া না যায়, তা হলে সমস্ত জাদুকরী শক্তিই বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন কোনো বৈদিক পুরোহিত তাঁর যজ্ঞের মন্ত্র অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে তাঁর শক্তিও বিনষ্ট হয়। আমাদের চেতনা যখন স্বচ্ছ হয়, তখন আমরা ধ্বনিটি স্পষ্টভাবে শুনতে পারি, এবং এ ধ্বনি যেন এক দৃশ্য ধ্বনি, এক চিত্র-ধ্বনি, বর্ণ-ধ্বনি বা ভাবধ্বনি, যা শ্রবণকে দৃষ্টি ও চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, অবিচ্ছেদ্য, একই জ্যোতির্ময় শরীরে। সব-কিছু সম্পূর্ণ, নিহিত একটি একক স্পন্দনে। অন্তর্বর্তী স্তরসমূহে (ঊর্ধ্বমানসে, জ্যোতির্মানসে, বোধিমানসে) এই স্পন্দনগুলো সাধারণত ভগ্ন— তারা পরিণত হয় ঝলকে, সবেগ প্রেরণায়, ছন্দোবদ্ধ চঞ্চলতায়— কিন্তু অধিমানসে তারা বিশাল, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মজ্যোতির্ময়, বিঠোফেনের সুমহৎ সংগীতের মতো। তাদের আরম্ভ নেই, শেষ নেই, মনে হয় তারা *অসীম হতে উদ্ভূত হয়, এবং আবার অসীমের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়।*[৪০] তারা কোথাও "আরম্ভ" হয় না, তারা চেতনায় আসে শাশ্বতের এক জ্যোতির্বলয় নিয়ে, যা স্পন্দিত হয় পূর্ব হতেই, এবং তারপরও দীর্ঘসময় ধরে তাদের স্পন্দন অব্যাহত থাকে, যেন এ যাত্রার অন্তরালে অন্য আর-এক যাত্রা প্রতিধ্বনিত হয় :

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. *

ভার্জিল-এর এই পঙ্‌ক্তিটি শ্রীঅরবিন্দ উদ্ধৃত করেছেন অধিমানস উৎস হতে প্রাপ্ত প্রেরণাসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যরূপে। এর অধিমানসিক গুণ শব্দের অর্থের জন্য নয়, বরং সেই ছন্দের জন্য যা শব্দগুলির পূর্বে ও শব্দগুলির পরেও অনুভূত হয়, যেন সেসব বিধৃত হয়ে আছে শাশ্বতের পটভূমিতে, কিংবা স্বয়ং শাশ্বত-কর্তৃক। তেমনই, লিও পার্ডির রচিত এই পঙ্‌ক্তিটি, যা তার অর্থের জন্য মহৎ নয়, বরং যা মহৎ অর্থের চেয়ে আরো সূক্ষ্মতর কিছু-একটার জন্য, যা তারই অন্তরালে স্পন্দিত হয় :

Insano indegno mistero delle cose. **

অথবা, শেক্‌স্‌পিয়রের এই পঙ্‌ক্তিটি :

In the dark backward and abysm of Time
[অন্ধকার অন্তরালে, অতল গভীরে, সময়ের]

অথবা, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-এর এই পঙ্‌ক্তি :

Voyaging through strange seas of Thought, alone
[নিঃসঙ্গ ভ্রাম্যমাণ, চিন্তার অজানা সাগরে]।

শ্রীঅরবিন্দ রিম্‌বড্‌-এর উল্লেখ করেছেন :

Millon d´oiseaux d´or, ô future vigneur ***

কবিতা পুনঃস্থাপিত হলো তার প্রকৃত ভূমিকায়, যা চিত্ত বিনোদন নয়, বরং যা হলো জগৎকে অধিকতর বাস্তব করে তোলা, তাকে সত্য দিয়ে পূর্ণতর করে।

কিংবা আমাদের মনোভাব যদি ধার্মিক হয়, তা হলে বোধহয় আমরা দেবতাদের দর্শনলাভ করব, যাঁরা এই জগতে বাস করেন। সত্তা, শক্তি, ধ্বনি, আলোক, ছন্দঃ, এই সকলই কিছু কিছু প্রকৃত রূপ, সেই একই বর্ণনাতীত পরম বস্তুর, যাঁকে আমরা ভগবান্ আখ্যা দিই, যিনি অজ্ঞেয় নন— আমরা তাঁর নাম

---

* "The touch of tears in mortal things." [শ্রীঅরবিন্দ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ] অশ্রুর স্পর্শ মৃত্যুশীল বস্তুসকলে।

** "The insane and ignoble mystery of things." [শ্রীঅরবিন্দ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ] উন্মত্ত হীন রহস্য বস্তুসমূহের।

*** "Million golden birds, O future strengh."
[নিযুত স্বর্ণ বিহঙ্গ, হে সামর্থ্য আগামী।]

দিয়েছি ভগবান্, মন্দির নির্মাণ করেছি, প্রস্তুত করেছি বিভিন্ন নিয়ম, রচনা করেছি কবিতা সেই একক স্পন্দনকে ধরে রাখবার জন্য যা আমাদের পূর্ণ করে সূর্যালোক দিয়ে, কিন্তু যা মুক্ত, ফেনিল সাগরসৈকতের প্রবল বায়ুপ্রবাহের মতো। হয়তো, আমরা সংগীতের জগতেও প্রবেশ করব, যা, বস্তুত, অন্যদের থেকে আলাদা নয়, বরং একই প্রকাশাতীত মহৎ স্পন্দনের অভিব্যক্তির এক বিশেষ পথ। যদি একবার, শুধুই একবার, সমগ্র জীবনে কয়েকটি মুহূর্তের জন্যও আমরা সেই মহাসংগীত শ্রবণ করি, ঊর্ধ্বের গীতময় আনন্দ, তা হলে আমরা জানব বিঠোফেন ও ব্যাচ কী শুনেছিলেন। আমরা জানব ভগবান কী, কারণ, তাঁকেই আমরা শ্রবণ করব। আমরা বড়ো অক্ষরেও তাঁর কথা প্রকাশ করব না, শুধু আমরা জানব যে, *সেই 'তৎ' বিদ্যমান* এবং বিশ্বের সকল দুঃখ দুর হয়ে যাবে।

শ্রীমা বলছেন, অধিমানসের অন্তিমতম সীমান্তে শুধু *রঙিন আলোকের মহান্ তরঙ্গের মালা,* আধ্যাত্মিক শক্তিরাজির লীলা, যাদের অভিব্যক্তি হয় পরবর্তী সময়ে— কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বহুসময় পরে নতুন ধারণায়, সামাজিক পরিবর্তনে বা জাগতিক ঘটনাবলীতে, যখন তারা অতিক্রম করে একের পর এক চেতনার সকল স্তর এবং পথিমধ্যে হয়ে যায় অনেক অন্ধকারময় বা বিকৃত। এখানে নিম্নে এমন কয়েকজন দুর্লভ ও নীরব মুনি-ঋষি আছেন যাঁরা তাদের শক্তি প্রয়োগ করে এসব শক্তিদের একত্র করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাতে পারেন, যেমন অন্যেরা ধ্বনি একত্র করে কবিতার সৃষ্টি করতে পারেন। এবং তাঁরাই হতে পারেন প্রকৃত 'কবি' ; তাঁদের অস্তিত্বই এক জীবন্ত মন্ত্র, যা পৃথিবীতে পরম সত্যের অবতরণ ত্বরান্বিত করে।

এই হলো ক্রমের শেষ যেখানে শ্রীঅরবিন্দ অধিরোহণ করেছিলেন, একাকী, আলিপুর জেলে, তাঁর প্রকোষ্ঠে। আমরা এসব উচ্চতার কিছু মানবীয় বিচারধারাই উপস্থাপিত করেছি : তাদের সারতত্ত্বের বিষয়ে আমরা কিছুই উল্লেখ করি নি, এসব জগৎ তাদের যে নিজস্ব মহিমায় বিদ্যমান, আমাদের বিবর্ণ বর্ণনার ঊর্ধ্বে, সে-বিষয়ে কিছুই বলি নি। আমাদের নিজেদেরই শোনা উচিত, নিজেদেরই *দেখা* উচিত।

> Calm heavens of imperishable light,
> Illumined continents of violet peace,
> Oceans and rivers of the mirth of God
> And griefless countries under purple suns.[41]

> [অবিনশ্বর আলোকের সব প্রশান্ত স্বর্লোক।
> নীললোহিত-শান্তি-ভরা ভাস্বর সব মহাদেশ,
> ঈশ্বরের হর্ষে-ভরা সকল সিন্ধু আর নদী,
> রক্তবর্ণ সূর্যের নিচে শোকহীন সব দেশ।] [৪১]

এক বছর কারাবাসের পর, মে ৬, ১৯০৯, শ্রীঅরবিন্দ কারামুক্ত হলেন। সকলেই আশঙ্কা করেছিলেন, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। দুটো অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যই তাঁর জীবনরক্ষা হলো। একজন বন্দী তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাঁকে গুপ্ত আন্দোলনের নেতারূপে দোষারোপ ক'রে; বিচারালয়ে তার সাক্ষ্যপ্রদানের অর্থই হতো শ্রীঅরবিন্দের প্রাণদণ্ড। কিন্তু দুজন বন্দী বিপ্লবী তাকে হত্যা করলেন জেলের মধ্যেই গুলিবিদ্ধ করে (তাঁদের অতি শীঘ্রই প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো)। তারপর, বিচারের শেষ দিনগুলি উপনীত হলো; শ্রীঅরবিন্দের অধিবক্তা এক আকস্মিক প্রজ্ঞালোক-দ্বারা অধিকৃত হলেন, যা বিচ্ছুরিত হয়ে গেল সমগ্র বিচারকক্ষে, এবং জুরিদের টলিয়ে দিল : "তাঁর মহাযাত্রার বহুদিন পরেও তাঁর বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বহু সাগর অতিক্রম করে দেশ-দেশান্তরে। সেজন্য আমি বলছি, তাঁর মতো মর্যাদাসম্পন্ন এক ব্যক্তি আজ শুধু এই বিচারালয়ের সম্মুখেই দণ্ডায়মান নন, তিনি দণ্ডায়মান ইতিহাসের উচ্চ ন্যায়ালয়ের সম্মুখে।" শ্রীঅরবিন্দের তখন ছত্রিশবছর বয়স। তাঁর ভাই বারীন, যে খাঁচায় বন্দী ছিলেন তাঁরই পাশে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পেয়েছিলেন।*

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তখনও সেই স্বর শুনতেন : *"মনে রেখো, কখনো ভয়ভীত হোয়ো না, কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হোয়ো না। মনে রেখো আমিই এই কাজ করছি, তুমি নও, কিংবা অন্য কেউ নয়। সুতরাং যে-কোনো মেঘ আসুক, যে-কোনো বিপদ্ বা দুঃখকষ্ট, যে-কোনো অসুবিধা, যে-কোনো দুরূহতা আসুক, কিছুই অসম্ভব নয়, কিছুই দুষ্কর নয়।*

আমিই সব-কিছু করছি।[৪২]

---

* তাঁর শাস্তি পরে পরিবর্তিত হয়েছিল, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে।

১৩

দেব প্রতীকের আশ্রয়ে

আলিপুর জেল থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন রাজনৈতিক দৃশ্যপট শূন্য হয়ে গেছে, ব্রিটিশ সরকারের প্রাণদণ্ড ও সামূহিক দ্বীপান্তরের ফলে। তা সত্ত্বেও তিনি কাজ আরম্ভ করলেন, প্রকাশ করলেন এক বাংলা সাপ্তাহিক, *ধর্ম*, এবং অন্য এক পত্রিকা ইংরেজিতে, *কর্মযোগিন্*, যেখানে উদ্ধৃত হত গীতার পূর্ণ প্রতীকাত্মক আদর্শ-বাণী: "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" অর্থাৎ কর্মে কৌশলই যোগ। নতুনভাবে কারারুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ আবার ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশের শাসন হতে পূর্ণ স্বাধীনতা ও তাদের সঙ্গে অসহযোগিতার আদর্শ। কিন্তু এখন শুধু ভারতবর্ষের নিয়তিই তাঁর চিন্তার একমাত্র বিষয় ছিল না। জগতের নিয়তির চিন্তাও তাঁকে অধিকার করেছিল। তিনি অধিমানস চেতনা প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে চেতনা হতে ব্যক্তি একই অবলোকনে দেখতে পায় "স্থান ও কালের বিশাল বিস্তৃতিকে"; এবং মানুষের ভবিষ্যতের বিষয়েও তিনি চিন্তা করতেন! মানুষ কী *করতে* পারে?

তিনি তখন ছিলেন মানবীয় চেতনার দূরতম সীমান্তে। তার উপরে, মনে হত আর কিছুই নেই, শুধু এক সুদুর্লভ শুভ্রতা যা উপযুক্ত হয়তো অন্য সত্তাদের জন্য, বা অন্য ধরনের অস্তিত্বের জন্য, কিন্তু পৃথিবীবাসীর শ্বাসযন্ত্রের জন্য নয়।

আমরা রহস্যবাদীর পথ গ্রহণ করি, কিংবা গ্রহণ করি অপেক্ষাকৃত ধীরতর পথ যা কবির, শিল্পীর এবং অন্যান্য সকল মহান্ সৃজনশীল ব্যক্তিদের, পরিশেষে মনে হয় চেতনা ম্লান হয়ে যায় এক শুভ্রতার সীমান্তে, যেখানে সব-কিছু বিলীন হয়ে যায়। সেতুরূপে সাহায্যকারী "কোনো ব্যক্তি" সেখানে আর দৃশ্য হয় না, সকল স্পন্দন মৃত হয়ে যায়। সকল কম্পন স্তব্ধ হয়ে যায় আলোকের এক তুষারপাতে। শীঘ্র হোক বা বিলম্বে হোক, মানব বিলীন হয়ে যায় 'অমানবে' যেন এই সমগ্র বিবর্তনীয় আরোহণের লক্ষ্য হল শুধু মানবীয় ক্ষুদ্রতাকে পিছনে ছেড়ে দিয়ে মূল উৎসে ফিরে যাওয়া, যা আমাদের উচিত ছিল না কখনো ছেড়ে আসা। যদি অনুমান করা হয় যে, অধিমানসের পরেও চেতনার কোনো অজানা স্তর আছে, তা কি হবে না আরো দুর্লভ, আরো বিলীয়মান? আমরা আরোহণ করি ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর, অধিক হতে অধিকতর দিব্যভাবে, কিন্তু পৃথিবী হতে দূরে, আরো দূরে। ব্যক্তি হয়তো রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু জগৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও স্থানচ্যুত হয় না। যদি বাস্তবিকই এই অধিমানস চেতনার অতিরিক্ত আর কিছুই নেই, তা হলে আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী?

আমরা সকলেই আশা করি যে, চেতনা ও সম্মিলিত বিকাশে আমরা পাব এক উন্নততর মানবজাতি, এক অধিকতর সুসমন্বিত জীবন। কিন্তু জীবনের রূপান্তর অলৌকিকতার সাহায্যে হয় না, যন্ত্রের সাহায্যেই পরিবর্তন আসে। এবং আমাদের একটি মাত্রই যন্ত্র আছে, মন : আমাদের ধারণাগুলোই সংঘটিত করে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সুতরাং যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যতের প্রতি কিছুটা পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিপাত করতে চাই, আজকের ঘটনাচক্রের দ্বারা তার আপাত-প্রতীয়মান বিজয়সমূহের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে— আমাদের পূর্বে অনেকেই বিজয়লাভ করেছেন থীব্‌স্-এ [†], এথেন্স-এ, উজ্জয়িনীতে— তা হলে আমাদের উচিত আরও গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা আমাদের যন্ত্র মনকে। কারণ, ঠিক যেমন আমাদের মন, তেমনই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। এবং মনে হবে যে, সবচেয়ে .সৌন্দর্যময় ধারণা, ঊর্ধ্বতম সৃজনশীল সকল পরিকল্পনা, প্রেমপূর্ণ পবিত্রতম সকল কর্ম যে মুহূর্তে জীবনে অবতরণ করে, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে যায় বিকৃত, বিকলাঙ্গ, কলুষিত আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছায় না বিশুদ্ধ অবস্থায়। মনের সাহায্যে ইতিমধ্যে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিকতম বিস্ময়কর সূত্রের উদ্ভাবন করেছি— জীবন তাদের কখনো স্বীকার করে নি। আমাদের আধুনিক সভ্যতার কথাই যদি বলা হয়, তা হলে লেনিন-এর বিশ বছর পরে, বিশুদ্ধ কম্যুনিজ্‌মের আর কী অবশিষ্ট আছে? এমন-কি যীশু খ্রীস্টেরও কীই বা অবশিষ্ট আছে, শুধু কিছু অন্ধ মতবাদ ও নিষেধাজ্ঞা ছাড়া? সক্রেটিস্‌কে বিষ দেওয়া হয়েছিল এবং

---

† Thebes : প্রাচীন মিশরের নগরী।

রিম্‌বড় পালিয়েছিলেন অ্যাবিসিনিয়ার মরুভূমিতে। ফোরিয়েরিস্ট্‌দের ও অহিংসার ভাগ্য আমাদের জানা। ক্যাথারদের সমাপ্তি হয়েছিল অগ্নিদহনে কাষ্ঠদণ্ডে বাঁধা অবস্থায়। ইতিহাস আবর্তিত হয় যেন বলিপ্রিয় দেবতা মোলোক্[†]। হতে পারি, বহু পরাজয়ের পর আমরা এক বিজয়, কিন্তু অন্য কোন্ বিজয়ের তুলনায় আমরা হলাম পরাজয়? একি বিজয়ের কালানুক্রম, না পরাজয়ের? মনে হয়, জীবন প্রস্তুত এক উপাদানে যা আশাহীনভাবে বিকৃতিময়, যার মধ্যে সব-কিছুই বিলীন হয়ে যায়, যেন তা ডুবে যায় মিশরের বালুকারাশির মধ্যে, এক দুর্নিবার অধোগতি-সম্পন্ন মহাকর্ষণে সব-কিছু সমতল হয়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন: *এ কথা স্পষ্ট যে মানবপ্রকৃতিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করবার জন্য মন সমর্থ নয়। মানবীয় অনুষ্ঠানসমূহ তুমি অসংখ্যবার পরিবর্তিত করতে পারো, কিন্তু ত্রুটিগুলো তোমার সকল অনুষ্ঠান ভেদ করে দেখা দেবে। নতুন শক্তি এমন এক শক্তি যা নিম্নমুখী আকর্ষণকে যে শুধু প্রতিরোধই করতে পারে, তা নয়, তার উপর বিজয়লাভ করতে পারে।*[১]

কিন্তু যদিও আমাদের ধারণাগুলো জীবনে বিশুদ্ধ অবস্থায় আসে, তারা অসমর্থ হয় কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে, এক সামরিক সেনানিবাস ছাড়া— বোধহয়, এক পবিত্র সুখপ্রদ ধার্মিক সেনানিবাস, কিন্তু তা একটি সেনানিবাসই হবে, কারণ মন শুধু নির্মাণ করতে পারে পদ্ধতি, এবং চেষ্টা করে সব-কিছুকেই তার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে। *মানুষের বিচারবুদ্ধি জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে হয়ে যায় শুধু ইন্দ্রিয়নুভবে সীমায়িত অথবা শুধুই তত্ত্ববাদী।*[২] সত্যের এক ক্ষুদ্রাংশকে, দিব্য আলোকের এক কণাকে ধরে নিয়ে এ তাকে পরিণত করে সকলের জন্য এক বিধানে— একত্বের স্থানে একরূপত্বকে নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এমন-কি, যখন এ বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সমর্থ হয়, তখনও ব্যবহারিকভাবে তা নিয়ে কাজ করতে এ অসমর্থ হয়, কারণ এ শুধু সমর্থ তা-ই নিয়ে কাজ করতে যা পরিবর্তনহীন ও সসীম; কিন্তু এ জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। *ধারণাসমূহ সর্বদা আংশিক ও অপর্যাপ্ত: তাদের বিজয়ও যে খুবই আংশিক, শুধু তাই নয়, বরং তাদের সাফল্য সম্পূর্ণ হলেও তা হবে নৈরাশ্যজনক, কারণ তারা জীবনের সমগ্রসত্য নয়, এবং সেজন্য, তারা নিশ্চিতভাবে জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও পূর্ণতা-সাধন করতে পারবে না। আমাদের বিচারবুদ্ধি পরিশ্রম ক'রে যেসব সূত্র ও পদ্ধতি জীবনের উপর আরোপ করে জীবন তাদের এড়িয়ে যায়। জীবন নিজেকে ব্যক্ত করে অতি জটিল রূপে, অসীম সম্ভাবনায় অত্যন্ত পূর্ণরূপে, যার উপর মানুষের খামখেয়ালি বুদ্ধি অত্যাচার করতে পারে না। সকল অসুবিধার মূল কারণ এই যে আমাদের ভিতরের ও বাইরের জীবন ও অস্তিত্বের মূলভিত্তিতে*

[†] Moloch : প্রাচীন বলিপ্রিয় সেমিটিক্ দেবতা।

এমন কিছু বিদ্যমান যার উপর বুদ্ধি কখনো তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, তা "পরম", "অসীম"। জীবনে প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতেই বিদ্যমান "পরম", যার অন্বেষণ সেই বস্তুটি করে তার স্বকীয় পন্থায়। যা-কিছু সসীম, তাই প্রয়াসরত এক অসীমকে অভিব্যক্ত করবার জন্য যা তার প্রকৃত সত্য বলে সে অনুভব করে। তা ছাড়া, শুধুই যে প্রকৃতির প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রবৃত্তি এইভাবে তাদের নিজেদের গোপন সত্যকে তাদের নিজেদের পন্থায় পাওয়ার জন্য প্রেরিত হয়, তা নয়, প্রত্যেক ব্যক্তিও তার নিজের বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। সেই ভাবে, শুধুই যে এক পরম, এক অসীম নিজেই নিজের অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন, বহু রূপ ও বহু প্রবণতার মধ্যে, তাই নয়, অসীম সম্ভাবনা ও বৈচিত্র্যের একটি মূলতত্ত্বও আছে, যা যুক্তিময়, বুদ্ধিকে আশ্চর্যচকিত করে দেয়, কারণ যা স্থিরীকৃত ও সসীম, তা নিয়েই শুধু যুক্তি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে। মানুষের মধ্যে এই অসুবিধা তার চরমে উপনীত হয়েছে। মানবজাতি যে অসীম সম্ভাবনার অধিকারী, শুধু তাই নয়; তার প্রত্যেক শক্তি ও প্রবণতা তার স্বীয় পরমের অন্বেষণ করে তার স্বকীয় পন্থায়, এবং সেজন্য যুক্তির কোনো কঠোর নিয়ন্ত্রণে স্বাভাবিকভাবেই তা অস্থির হয়ে ওঠে— শুধু তাও নয়, বরং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সে-সকলের মাত্রা, পদ্ধতি তথা সংমিশ্রণ ভিন্ন ভিন্ন হয়, প্রত্যেক মানুষ শুধু সাধারণ মানবজাতির অঙ্গীভূত তা নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত অসীমেরও অংশীভূত সে, এবং সেজন্য সে অনুপম। এই হল আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতা, এবং সেজন্য বৌদ্ধিক বিচার ও বুদ্ধিগত সংকল্প, জীবনের সার্বভৌম কর্তা রূপে কাজ করতে পারে না। যদিও এখন তারা আমাদের সর্বোচ্চ যন্ত্র এবং আমাদের বিবর্তনে পরম গুরুত্বপূর্ণ ও সাহায্যকারী হতে পারে।[৩]

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ জোর দিয়ে বলেছেন, যদি বিবর্তন চেতনারই বিবর্তন হয়, আমরা তা হলে ধরে নিতে পারি যে, মানবজাতি চিরকাল এখনকার মানসিক স্তরে আটকে থাকবে না, তার মন হবে আলোকিত, হবে বোধিপ্রাপ্ত অধিক হতে অধিকতর ভাবে এবং বোধ হয় অবশেষে উন্মীলিত হবে অধিমানসের অভিমুখে। আমরা ভাবতে পারি, এক অধিমানসিক মানবজাতি জীবনের জটিল বৈচিত্র্যের পরিচালনায় সমর্থ হবে। অধিমানস দেবত্বের চেতনা, মানবজাতি যাঁদের জানে সেই শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুদের চেতনা। স্থির আলোকের এক বিশাল পুঞ্জ— মনে হবে এত উচ্চ আলোকে সব-কিছু সুসমন্বিত হয়ে যাওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত দুটি সত্য তথ্য এই আশাকে ব্যর্থ করে দেয়। একটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অসম বিকাশের বিষয়-সংক্রান্ত, অন্যটি অধিমানসের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয়। মনে হয়, আমাদের মনের তুলনায় অধিমানস বেশ ভয়ংকর ভাবেই শক্তিশালী; কিন্তু তা হল মাত্রার উৎকর্ষ, *একই প্রকারের মধ্যে*; আমরা মানস-তত্ত্বের বাইরে যাই নি। আমরা শুধু তার শীর্ষস্থানে উপনীত হয়েছি। অধিমানস মানুষের পরিসরকে প্রসারিত করতে পারে,

কিন্তু তাকে পরিবর্তিত করতে পারে না। এ মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারে, কিন্তু তাকে *অতিকায়ও করতে*[৪] পারে, যে-কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, কারণ এই নতুন শক্তিকে মানুষ তার অহংভাবে প্রয়োগ করে, তার আত্মায় প্রয়োগ করবার পরিবর্তে, তা হলে সে হয়ে উঠবে এক নীৎসীয়[†] অতি-মানব, দেবতা হবে না। আমরা চাই না আরও ভয়প্রদ কোনো এক চেতনা, আমরা চাই অন্য এক চেতনা। কিন্তু যদি আমরা মনে করি যে মানুষ তার আত্মাকে অনুসরণ করবে, তার অহংকে নয় তা হলেও অধিমানস জীবনকে পরিবর্তিত করবে না, সেইসব কারণের জন্যই, যেসব কারণ যীশুখৃস্ট ও অন্যান্য সকল মহান্ ধর্মপ্রবর্তকদের বাধা দিয়েছিল জীবনের পরিবর্তন আনয়নে: কারণ অধিমানস চেতনার এক নতুন তত্ত্ব নয়, এ ঠিক সেই তত্ত্ব যা মানুষের আবির্ভাবের সময় হতে আমাদের বিবর্তনের অধ্যক্ষতা করেছে; এই হল উৎস সকল উচ্চতর ধারণার ও সৃজনীশক্তির— আমরা দেবতাদের প্রতীকের আশ্রয়ে হাজার হাজার বছর ধরে জীবনযাপন করেছি, কখনও আমাদের ধর্মগুরুদের ও ধর্মীয় বাণীর মাধ্যমে, কখনও আমাদের কবিদের ও মহান্ সৃজনশীল ব্যক্তিদের বাণীর মাধ্যমে। এবং এ কথা স্পষ্ট, তাঁরা কেউ এই পৃথিবীকে পরিবর্তিত করতে পারেন নি, যদিও তাঁরা তার উন্নতিসাধন কিছুটা করেছেন। আমরা কি এ কথাও বলতে পারি যে, আমাদের জীবন অ্যাথেন্সবাসীগণের জীবন অপেক্ষা অধিকতর মাধুর্যপূর্ণ?

অধিমানসের বিফলতার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, এ বিভাজনের মূলতত্ত্ব। আমরা ঠিকই পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, অধিমানস চেতনা স্থির আলোকের বিশালপুঞ্জ, এর দৃষ্টি মহাজাগতিক সংহতির, মহাজাগতিক ঐক্যের, কারণ এ সর্বত্র আলোক দেখে, যেমন দেখে নিজের মধ্যে। তা ছাড়া, বিভাজনের মধ্যে বিভাজনের তত্ত্ব নয় এ, যেমন এই সাধারণ মন; এ হল একত্বের মধ্যে বিভাজনের তত্ত্ব। অধিমানস স্পষ্টভাবেই দেখে যে সকলই এক, কিন্তু এর চেতনার গঠনবৈশিষ্ট্যের জন্যই, ব্যবহারিকভাবে, এ একত্বের বিভাজনকে বাধা দিতে পারে না। এ সব-কিছুই *দেখে, কিন্তু নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে।*[৫] আমাদের ধর্মপ্রবর্তকদের আপাতবিরোধী বাণী স্মরণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁরা প্রত্যেকেই দেখেছিলেন একত্ব কিন্তু দেখেছিলেন *নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে*। তাদের চেতনা আলোকের এক রশ্মিধারার মতো জগতের চারদিকে সবেগে প্রবাহিত হয়, এবং তা সমর্থ নিজের আলোকরশ্মিতে সব-কিছু ধরে রাখতে কেনো ছায়াপাত না করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা হল একটি বিন্দুতে সমাপ্ত একটি আলোকরশ্মি। এবং

---

† জার্মান দার্শনিক নীৎসে (Nietzsche, ১৮৪৪-১৯০০) তাঁর দার্শনিক মতবাদে অতি-মানবের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর অতিমানবিক আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের অতিমানবিক লক্ষ্য হতে ভিন্ন।

আমরা উপনীত হই আপাতদৃষ্টিতে অসংগতিপূর্ণ অনুভবরাজির বা দিব্য অন্তর্দর্শনের ধারার সম্মুখে: কেউ কেউ দর্শন করেন বিশ্বময় ভগবান্‌কে সর্বত্র, আবার কেউ কেউ বিশ্বজগৎকে অতিক্রম করে দর্শন করেন বিশ্বাতীতকে সর্বত্র এবং এবং অন্যেরা দেখেন অন্তর্নিহিত ভগবান্‌কে সর্বত্র, কিংবা তাঁরা ঘোষণা করেন ব্যক্তিগত ঈশ্বরের সত্য, নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের সত্য, নির্বাণের সত্য, প্রেমের সত্য, শক্তি, সৌন্দর্য ও বোধশক্তির সত্য— অসংখ্য মুনি-ঋষি সম্প্রদায়, ধর্মসংস্থা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সত্য, যাঁরা আমাদের প্রদান করেছেন সত্যের বাণী, সবই দিব্য সত্য, সবই সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং প্রকৃত অনুভূতি, কিন্তু প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ আলোকের এক-একটি রশ্মিমাত্র। স্বভাবত, এই ধর্মপ্রবর্তকগণ যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান্‌ ছিলেন এবং অন্যান্য দিব্য অভিব্যক্তির সত্যকেও উপলব্ধি করতেন —তাঁরা তাঁদের ধর্মসংস্থা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ছিলেন, তাঁদের শিষ্যদের অপেক্ষা বিজ্ঞতর ছিলেন— কিন্তু তথাপি তাঁরা তাঁদের চেতনার এক মৌলিক অসামর্থ্যের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন, যা বিভাজনেকে বাধা দিতে পারে না, ত্রিপার্শ্ব-কাচ[†] আলোকের বিভাজন করে। মানসিক হোক বা অধিমানসিক হোক, চেতনা এক সময়ে একটিমাত্র সত্যকেই অনুভব করতে পারে। অতীত বর্তমানের সকল পুরাণশাস্ত্র এ কথাই প্রকাশ করে; প্রত্যেক দেবতা এক তথা *শুধুমাত্র একই* বিশ্বময় শক্তির অবতার: প্রেম, জ্ঞান, ধ্বংস, পালন। বুদ্ধদেব অভিব্যক্ত করেন বিশ্বাতীত শূন্যতা, এবং প্রত্যক্ষ করেন শুধুই শূন্যতা। খ্রীস্ট অভিব্যক্ত করেন প্রেমময় পরার্থপরতা এবং প্রত্যক্ষ করেন পরার্থপরতা। অন্যান্য সবই এইপ্রকার। এসব সত্যের প্রত্যেকটি যতই উচ্চ হোক-না-কেন, তা শুধু *একটি সত্য*। এবং জীবনে অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য পূর্ব হতে খণ্ডিত এই অধিমানস সত্য স্তর হতে স্তরে যতেই নিম্নে অবতরণ করে, ততই তা হয়ে যায় আরও খণ্ডিত— বিভাজন হতে আরম্ভ হয়ে তা অনিবার্যরূপে সমাপ্ত হয় অতিবিভাজনে। বুদ্ধ হতে "যান"[††] পর্যন্ত, খ্রীস্ট হতে খ্রীস্টীয় সম্প্রদায় পর্যন্ত, এই প্রক্রিয়াটি সুস্পষ্ট এবং শুধু আধ্যাত্মিক বা ধার্মিক ক্ষেত্রেই নয়, বরং সকল ক্ষেত্রেই, কারণ অধিমানসের কাজই হচ্ছে *একটি* এবং শুধুমাত্র একটি সম্ভাবনাকেই লীলায় অভিব্যক্ত করা, তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত: *প্রত্যেক সম্ভাবনাকে এ প্রদান করে পূর্ণ তথা পৃথক্‌ বিকাশ ও পরিতৃপ্তি। বুদ্ধিকে এ দিতে পারে তার কঠোরতম তপোময় বৌদ্ধিকতা, এবং যুক্তিকে দিতে পারে তার সম্পূর্ণ শৈথিল্যবিহীন যৌক্তিকতা। সৌন্দর্যকে এ দিতে পারে তার জ্যোতির্ময় রূপের পরমোজ্জ্বল আবেগোচ্ছ্বাস; যে চেতনা একে প্রাপ্ত হয়, তাকে এ প্রদান করে এক পরম উচ্চতা ও আনন্দের গভীরতা।*[৬] এইভাবেই,

---

† Prism (প্রিজম্‌)।

†† বৌদ্ধধর্মের মহাযান, হীনযান ইত্যাদি।

লক্ষ লক্ষ চিন্তনশক্তি বিশ্বজগৎকে তাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে: সাম্যবাদ ব্যক্তিবাদ; অহিংসা, যুদ্ধবাদ; ভোগবাদ, সন্ন্যাসবাদ; এবং এদের প্রত্যেকটিই দিব্য সত্যের এক-একটি দিক, প্রত্যেকেই ভগবানের এক-একটি কিরণ। কোনো স্থানে সম্পূর্ণ ভুল কিছু নেই। শুধু আছে সত্যের বিভাজন। নিঃসন্দেহে আমরা দেখতে পারি একত্ব, অন্যদের নিহিত সত্য, এবং প্রয়াস করতে পারি একটি সমন্বয়ের জন্য, কিন্তু আমাদের কোনো সমন্বয় একত্বের পুনরুদ্ধার করবে না, কারণ এখনও তা হবে এক মানসিক সমন্বয়; শ্রীমা বলেছেন, তা হবে *এক মিশ্রণ, একত্ব নয়।* এখনও এ এমন এক ত্রিপার্শ্ব-কাচ যা খেলার ছলে নিজেকে বলেছে যে সেই একই আলোক হতে সব রঙই আসে, কিন্তু ইতিমধ্যে *ব্যবহারিক ক্ষেত্রে,* জগতে সব রঙই বিভক্ত, অধিমানস স্তর হতে উদ্‌ভূত সকল শক্তিই তার নিজস্ব মূলগত বিভাজনের পরিণামস্বরূপ। এবং আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এ কথা এক বুদ্ধিগত কাল্পনিক বিচারের বিষয় নয়, সমাধানের জন্য অপেক্ষমাণ কোনো দার্শনিক সমস্যা নয়। বরং এ এক *বিশ্বজাগতিক তথ্য* এক অঙ্গীয় ব্যাপার, যেমন সজারুর পিঠে তার কাঁটা। বিভাজন বন্ধ হতে হলে ত্রিপার্শ্বকাচকে যেতেই হবে। এই কারণেই জগৎ বিভক্ত, এবং তেমনই থাকবে অনিবার্যরূপে, যতদিন পর্যন্ত চেতনার মানসিক তত্ত্ব জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সে তত্ত্ব উচ্চ হোক বা নিম্ন, সাধারণ হোক বা অসাধারণ।

যাই হোক, এ কথা চিন্তা করা যেতে পারে যে, বিবর্তনশীল ভবিষ্যতে, যা হতে পারে তুলনামূলকভাবে নিকটতর, এক পূর্ণ অধিমানসিক চেতনসত্তা অথবা যুগপৎ-ভাবে কয়েকটি চেতনসত্তা, পৃথিবীতে সশরীরে অবির্ভূত হতে পারেন। মানবজাতির যে অংশটি অপেক্ষাকৃতভাবে কম বিকশিত, তা সমগ্ররূপে এইসব জ্যোতির্ময় কেন্দ্রের চতুর্দিকে একত্রীভূত হতে পারে এবং এক সমন্বয়পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে; এবং সেই পরিমাণে জীবন পরিবর্তিত হতে পারে, এবং একপ্রকার একত্বও আসতে পারে। কিন্তু তা হবে একটি একক জ্যোতির্ময় রশ্মির মধ্যে সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের আলোকরশ্মিতে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। এবং অন্যেরা, আমাদের অনুমান অনুযায়ী, বাস করতে পারেন ভ্রাতৃপ্রেমের ভিত্তিতে রচিত পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদের আলোকরশ্মিতে। (দুর্ভাগ্যবশত বিবর্তনের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এ কথাই মনে হওয়া অধিকতর সম্ভব যে এই রশ্মিগুলো রচিত এক কঠিন আলোকে, যার কেন্দ্রে অবস্থিত কোনো অর্থনৈতিক ও দানবীয় আদর্শ।) এ প্রকার দিব্য আলোকরশ্মি জগৎকে আলোকিত করবে, তা মেনে নিলেও তাদের প্রত্যেকের একত্ব শুধু যে জীবনের রহস্যময় বৈচিত্র্যের বিনিময়ে অর্জিত হবে তাই নয়, তারা অবিরতভাবে ভয়ভীত হবে পরিপার্শ্বস্থ অন্ধকার দ্বারা— আমরা প্রায়ই একটা সত্য ভুলে যাই যে, মানুষদের বিকাশের স্তরে অসমতা আছে। এই হল আমাদের সকল মহান্ দুর্গের চিরকালীন

ত্রুটি। করুণায় ভরা এসব আলোকরশ্মি হবে *আলোকের দ্বীপের*[১] মতো ন্যূনতরভাবে বিকশিত এক মানবজাতির মধ্যে, যার এক স্বাভাবিক অবিরাম প্রবণতা থাকে এই বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত আলোককে পুনর্গ্রাসিত করবার জন্য, অস্পষ্ট করবার জন্য কিংবা অবনমিত করে সমতল করবার জন্য। এক বর্বর জগতের মধ্যে গ্রীস ও রোমের ভাগ্য— আমরা সকলেই জানি।

এক অতীব জ্ঞানগর্ভ বিবর্তনীয় বিধান অনুসারে, মনে হয় যেন, জগতের বিবর্তন জগতের সামগ্রিকতার সঙ্গে আবদ্ধ, এবং সব-কিছুর উদ্ধার না হলে কোনো-কিছুরই উদ্ধার হবে না। ধর্ম হতে বহিষ্কার, নরক, এসব হল বালসুলভ অজ্ঞানতার দৃষ্টান্ত, যেমন পৃথিবীতে বা ঊর্ধ্বে, পুরাণবর্ণিত দুধ-মধুর দেশ; কোনো স্বর্গই সম্ভব নয় যে-পর্যন্ত একজন মানুষ নরকে আছে। কারণ শুধু একজন *মানবই* বিদ্যমান। মনে করা যাক, এই আলোকদ্বীপসমূহের কোনো একটি তার কেন্দ্রস্থ শক্তির বলে বহিরাক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে, কিন্তু কোনো-কিছুই এই নিশ্চয়তা প্রদান করে না যে, কেন্দ্রস্থ এই শক্তির অবসানের পরেও এই সুরক্ষা স্থায়ী হবে; সারা জগতের সকল ধার্মিক তান্ত্রিক, মান্ত্রিক, বীরত্বব্যঞ্জক বা অন্যান্য আন্দোলনের কাহিনী এই প্রমাণ দেয় যে, গুরু ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের দেহাবসানের পর সব-কিছু বিক্ষিপ্ত, অধঃপতিত, অবনমিত, বিকৃত হয়ে যায় অথবা মৃত্যুলাভ করে। এ পর্যন্ত, নিম্নাভিমুখ মাধ্যাকর্ষণ অনতিক্রম্য প্রতীত হয়েছে। যদি বিবর্তনের জয়লাভ প্রয়োজনীয়, তা হলে সমগ্র জীবনকে রূপান্তরিত করতে হবে, শুধুই জীবনের এক অংশকে নয়, শুধুই এক বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত আলোককে নয়, বা আশীর্বাদপূত দ্বীপকে নয়। এবং সেজন্য অন্য এক *ব্যক্তির* প্রয়োজন, এক শক্তি যা নিম্নাকর্ষণকে প্রতিহত করতে পারবে, অন্য এক চেতনার তত্ত্ব, যা হবে অখণ্ড, বিশ্বব্যাপী, এবং যা জীবনের অগণিত বৈচিত্র্যকে বিকৃত না করে ধারণ করতে সমর্থ হবে।

এক সামূহিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে আমরা যদি এক ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবর্তনীয় ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তা হলে আমরা জীবনের যে পূর্ণতার জন্য অভীপ্সা করি, তাও আমাদের জন্য অধিমানস নিয়ে আসে না। যদি সত্যই বিবর্তনের লক্ষ্য হয় আরো বিঠোফেন্ বা রিম্‌বড়্-এর সৃষ্টি, এমন কি বোধ হয় কয়েকজন অতি-প্লেটোরও সৃষ্টি, তা হলে আমরা ভাবতে বাধ্য হব যে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রচেষ্টা এবং সেই পথে কোটি কোটি ব্যক্তির বিনাশের পরিণতিস্বরূপ এ হবে এক অতি সামান্য সর্বোচ্চ-সীমা। বিঠোফেন্ অথবা রিম্‌বড়্, এমন-কি সেন্ট জন্‌ও বিবর্তনের লক্ষ্যস্বরূপ হতে পারবেন না। কারণ, কারই বা এ কথা দৃষ্টিগোচর হবে না যে তাঁদের সৃষ্টি এত প্রশংসনীয় হয়েছে, কারণ জীবন এত ত্রুটিপূর্ণ? তাঁরা আমাদের বলেছেন, এই নিম্ন হতে ঊর্ধ্ব কত বেশি সুন্দর, তার নিযুত স্বর্ণ বিহঙ্গ ও দিব্য সংগীত নিয়ে। ঊর্ধ্বেই তো সব-কিছু ঘটে, কিন্তু এখানে

কী হয় ? এখানে, জীবন পূর্বের মতোই চলে। আমাদের বলা হবে যে এসব উচ্চ চিন্তাধারা, এসব কবিতা, এসব সংগীত, দিব্য দর্শনের এসব মুহূর্ত আমাদের জীবনের সমস্ত সময়ের সমষ্টি হতেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই সত্য--কিন্তু এ কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার্য যে, জীবন কত ভয়ংকরভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, কিংবা জীবনের লক্ষ্য জীবনে নেই। আমাদের প্রয়োজন শরীরের সত্য, এবং পৃথিবীরও সত্য, কিন্তু শুধুই আমাদের মস্তকের শীর্ষে স্থিত সত্য নয়। আমরা মনোরঞ্জন চাই না, চাই নতুন সৃষ্টি।

এখন পর্যন্ত, বিবর্তনে ব্যক্তির অগ্রগতির যা তাৎপর্য, তা হলো চেতনার ঊর্ধ্বতর স্তরসমূহের আবিষ্কার এবং একবার সেখানে উন্নীত হওয়ার পর, অর্থনৈতিক বিষয়াসক্ত জগতের মধ্যে, তার নিজের এক পৃথক্ জগতের নির্মাণ, আলোকের এক ব্যক্তিগত দ্বীপের নির্মাণ— কোনোটি হবে সংগীতের, কোনোটি কবিতার, অন্য কোনোটি গণিতের বা ধর্মের, অন্য কোনোটি ছুটি কাটানোর জন্য এক পালতোলা নৌকায়, অথবা কোনোটি কোনো-এক সাধুর গুম্ফায়, তাদের প্রত্যেকেরই থাকবে নিজের আকাশ-বাতায়ন, কিংবা অবসর-বিনোদনের উপায় —যেন সশরীর এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জীবন ও শরীর হতে পলায়ন। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু আমাদের নিজেদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা: আমরা কখনো জীবনের মধ্যে নেই! আমরা আছি তার পূর্বে, অথবা তার পরে মগ্ন হয়ে আমাদের স্মৃতির মধ্যে, না-হলে আশার মধ্যে— এখানে-ও-এখন বড়োই শোচনীয় ও নীরস, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, শুধু নির্দিষ্ট ভাবে সেই মুহূর্তগুলি ছাড়া, যেগুলি জীবনের বাইরে। আমরা ধর্মসম্প্রদায়সমূহক দোষ দিতে পারি না: আমরা সবসময় জীবনকে অতিক্রম করেই বাস করি; তারা প্রচার করে শুধু আরও অধিকতর অতিক্রম করবার কথা। রিম্‌বড়্‌ও বলেছিলেন: "প্রকৃত জীবন অন্য কোথাও আছে।"

শ্রীঅরবিন্দ এক সত্যকারের জীবন অন্বেষণ করেছিলেন, এখানে, নিম্নে : *জীবন, কোনো এক সুদূর নীরবতা বা ঊর্ধ্বে উন্নীত পরমানন্দময় বিশ্বাতীত অবস্থা নয়— শুধু জীবনই আমাদের যোগের ক্ষেত্র।*[৮] তিনি স্পষ্টভাবে দেখলেন যে, চেতনার শীর্ষবিন্দুগুলো জীবনের মধ্য হতে এক সত্যকার জীবন প্রস্তুত করতে পারবে না। আমরা হয়তো স্পর্শ করতে পারি অধিমানসকে, আনন্দলাভ করতে পারি, বিশালতার সংগীত আবিষ্কার করতে পারি, কিন্তু তা নয় জীবন সংগীত, জীবনের আনন্দ, জীবন চলতে থাকে বিরক্তিময় হয়ে। শ্রীমা বলছেন, *তুমি যখন তোমার চেতনার বহু ঊর্ধ্বে বাস করো, তুমি অনেক কিছু দেখো, জানো, কিন্তু বস্তুত যখন তুমি নিম্নে অবতরণ করো, জড়তত্ত্বে, মনে হয় যেন, বালির মধ্যে জল ডুবে যাচ্ছে।* আধ্যাত্মিক আকাশে আমাদের রকেট পাঠিয়েছি আমরা বহু ঊর্ধ্বে; মানুষের মধ্যে যা সর্বোত্তম, তার প্রশংসার গান আমরা গেয়েছি, নিম্নতর

স্তরগুলির বিষয়ে চিন্তা না করেই; আমাদের অন্তরের পশু যদি নিদ্রিত থাকে এমন গভীরে যে আমাদের দিব্যস্বপ্নে সে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি, এবং সে কারণেই, জীবন পশুই রয়ে যায়। আমাদের মতো: *মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন ছাড়াই, মানবজীবনের সত্যকারের পরিবর্তন আশা করা এক অযৌক্তিক ও অনাধ্যাত্মিক বিচার: এর অর্থ আশা করা এমন কিছু যা অপ্রাকৃতিক ও অবাস্তব, এক অসম্ভব অলৌকিক।*[১] সেই কারণেই আমাদের আলোকের দ্বীপগুলো প্রত্যেকবার অভিভূত হয়ে যায়, আমাদের অন্তরতম বর্বরতার দ্বারা অথবা গোপন কর্কট ব্যাধির দ্বারা, যেমন হয়েছিল অ্যাথেন্স্ বা থীব্‌স্ নামের দ্বীপগুলিতে। সেই কারণেই তারা বার বার মৃত্যুলাভ করে, যেন বিবর্তনের দেবতা প্রত্যেকবার আমাদের নাক মাটিতে ঘসে মনে করিয়ে দেন যে আমরা পূর্ণ আলোক পাই নি, যে পর্যন্ত শুধু উর্ধ্বেই আমরা তা পেয়েছি। জীবনের মৃত্যু হয় না, সে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ফলে। তার মৃত্যু হয় সে নিজেকে পায় নি, এই কারণে। শতাব্দী শতাব্দী ধরে আমরা উর্ধ্বগামী পথেই পদচারণা করেছি, দ্বীপের পর দ্বীপ জয় করেছি, কিন্তু *পরম রহস্যের* অর্ধেকটা শুধু আমরা পেয়েছি, এবং প্রত্যেকবার আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু তার কারণ এ নয় যে, ইতিহাস নিষ্ফল, অথবা আমাদের দুষ্কর্মের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিংবা কোনো সম্ভাবনারহিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হচ্ছে। বোধহয়, তার কারণ এই যে, এখানে নিম্নে, জড়তত্ত্বের মধ্যে, *রহস্যের* দ্বিতীয়ার্ধ আবিষ্কার করতে হবে। মৃত্যু ও নিশ্চেতনা দ্বারা অনুসৃত, দুঃখ ও অশুভের দ্বারা যন্ত্রণার্ত, আমাদের একমাত্র পথ নয় পলায়ন, বরং মৃত্যু ও নিশ্চেতনার গভীরতায় অশুভের ঠিক অন্তস্থলে, দিব্যজীবনের মূলমন্ত্রের অনুসন্ধানই পথ। এখানে, নিম্নে, আমাদের রাত্রিকে এবং এই বর্বরতাকে রূপান্তরিত করাই আমাদের পথ, আমাদের দ্বীপ হতে তার নির্বাসন পথ নয়। চেতনার আরোহণের পর, অবতরণ। উর্ধ্বের প্রদীপ্তির পর, নিম্নে, এখানে, আনন্দ, এবং জড়তত্ত্বের রূপান্তর। শ্রীমা বলেছেন, *আমরা বলতে পারি যে, যখন বৃত্তটি সত্যই সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং চরমবিন্দুদ্বয় সংযুক্ত হয়, যখন* উর্ধ্বতম *অভিব্যক্ত হন চরম জড়তত্ত্বে— অণুর হৃদয়ে* পরমতত্ত্ব*— তখনই অনুভূতি উপনীত হবে তার প্রকৃত উপসংহারে। মনে হয় আমরা কখনো প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করি না যদি না সে উপলব্ধি হয় শরীরের মাধ্যমে।*

কারণ, সেই পরম রহস্য যার নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন অতিমানস, তা অধিমানসের এক স্তর উর্ধ্বে অবস্থিত নয়, তা এক অতি-মানস নয়, বা অতি-আরোহণ নয়, তা এক নতুন প্রতীক যা আর দেবতাদের ও ধর্মসমূহের ভূমি নয়, এবং যার উপর আমাদের বিবর্তনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এক বছরের মধ্যেই ১৯১০, ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যায় কেউ একজন *কর্মযোগিন* অফিসে এসে তাঁকে সাবধান

করল যে, তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হবে ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হবে। হঠাৎ তিনি এক বাণী শুনলেন, তিনটি স্পষ্ট শব্দ : *তুমি চন্দননগরে যাও*।[†] দশ মিনিট পরে শ্রীঅরবিন্দ গঙ্গার উপর ভ্রাম্যমাণ প্রথম নৌকাটিকে ডাক দিয়ে তাতে প্রস্থান করলেন। সেই হলো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষ, পূর্ণযোগের শেষ, এবং অতিমানস যোগের আরম্ভ।

[†] Go to Chandernagore.

১৪

পরম রহস্য

এই পরম রহস্য আমরা প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পরীক্ষা এখনও এগিয়ে চলেছে। আরম্ভ শ্রীঅরবিন্দ করেছিলেন; তিনি এই রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন চন্দননগরে, ১৯১০-এ, এবং তার উপর কার্যরত ছিলেন চল্লিশ বছর ধরে; এতেই তিনি তাঁর জীবন দান করেছিলেন। শ্রীমা এই কার্যধারার ক্রমবাহিকা।

শ্রীঅরবিন্দ কখনো আমাদের বলেন নি, তাঁর এই আবিষ্কার কোন্ পরিস্থিতিতে হয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ ভাবে নীরব থাকতেন, সংরক্ষণাত্মক মনোভাবের জন্য নয়, বরং শুধু এই কারণে যে, তাঁর কোনো "আমি" ছিল না। চন্দননগরে তাঁকে যিনি আতিথ্য প্রদান করেছিলেন সরল বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি বলেছেন: "যখন তিনি কথা বলতেন, তখন মনে হত যেন অন্য কেউ তাঁর মধ্যে দিয়ে কথা বলছেন। তাঁর সম্মুখে আমি খাদ্যের থালা রাখলাম, তিনি সেদিকে শুধু দৃষ্টিপাত করলেন, সামান্য খেলেন, ঠিক যন্ত্রবৎ খাওয়ার সময়ও মনে হত তিনি ধ্যানমগ্ন আছেন; সাধারণত খোলা চোখেই তিনি ধ্যান করতেন।"[১] বহু কাল পরে, তাঁর রচনা হতে বা কথোপকথনের অংশ হতে আমরা তাঁর অনুভূতির সূত্র পুনরুদ্ধার করতে পারি। তাঁর শিষ্যদের একজনের

নিকট প্রদত্ত এক মন্তব্য হতে প্রথম সূত্রটি আসে, এবং তা থেকে জানা যায় যে, তাঁর আলিপুরে অবস্থানের সময়ই তিনি পথের সন্ধান পেয়েছিলেন: *মানসিকভাবে, আমাকে সবরকমের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল পনেরো দিন ধরে। সবরকমের দুর্দশার দৃশ্য আমাকে দেখতে হয়েছিল।*[২] এবং আমাদের বোঝা উচিত যে, এসব জগতে '*দেখা*'র তাৎপর্য হলো, অনুভব করা, উপলব্ধি করা। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ যখন অধিমানসের দিকে আরোহণ করছিলেন তখন একই সময়ে তিনি অবতরণ করছিলেন সেইখানে, যাকে প্রথা অনুসারে বলা হয় নরক।

এ হল, ন্যূনাধিক ভাবে, সাধকের প্রথম আবিষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম। শ্রীমা বলছেন, *এ যোগ দুর্বলের জন্য নয়।* এবং তা সত্য। কারণ শ্রীঅরবিন্দের যোগের প্রথম সুস্পষ্ট পরিণতি যদি কবিত্বময় ও কাল্পনিক প্রতিভার অভিব্যক্তি হয়, তা হলে দ্বিতীয় ও অব্যবহিত পরিণতি হলো চেতনার নিম্নদিকের প্রতি এক নিষ্ঠুর আলোকপাত, প্রথমে ব্যক্তিগত চেতনার, তারপর বিশ্বগত চেতনার। অতিচেতন ও অবচেতনের মধ্যে এই নিকট ও অদ্ভুত যোগাযোগ, বোধ হয়, শ্রীঅরবিন্দের আবিষ্কারের সূত্রপাত।

অবচেতনের ক্রম

আধুনিক মনস্তত্ত্বের "অবচেতন" অতিচেতনের মতো এক বিশাল জগতের বহিঃসীমা মাত্র, যে জগতের নিজস্ব বিভিন্ন ক্রম, শক্তি ও সত্তা বিদ্যমান (অথবা, বলা যেতে পারে, সত্তা-শক্তি)। অতিচেতন যেমন আমাদের বিবর্তনের ভবিষ্যৎ, তেমনই আমাদের বিবর্তনের নিকট তথা সুদূর অতীত এই অবচেতন, যেখানে এই জীবনের ও সকল অতীত জীবনের (জন্মের) স্মৃতি মুদ্রিত। যে সকল সত্তাবশেষ ও শক্তি জড় হতে পশু পর্যন্ত এবং পশু হতে মানুষ পর্যন্ত আমাদের আরোহণের উপর কর্তৃত্ব করেছে, তারা যে সকলেই শুধু এখানে অঙ্কিত, তাই নয়, তারা জীবন্ত ও অবিরত আমাদের উপর প্রভাবশালী। এক অতিচেতন ভবিষ্যৎ আমাদের আকর্ষণ করছে, এই কারণে আমরা আমাদের ভাবনা অপেক্ষা যদি দিব্যতর হয়ে থাকি, তা হলে আমাদের কল্পনা অপেক্ষা আমরা পাশবতর, কারণ অবচেতন ও অচেতন অতীত আমাদের নিচে টেনে নিয়ে যায়। এই দ্বৈত প্রহেলিকার মধ্যে নিহিত আছে সম্পূর্ণ পরম রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব।

অধিগম্য নয় স্বর্গ কারো, নরকের পথ বিনা।[৩]

এ কথা সত্য, শুধু আকস্মিক সংযোগ ব্যতীত, এইসব দুঃস্থানের সম্মুখীন না হয়েও আমরা আধ্যাত্মিক আনন্দে উপনীত হতে পারি। কিন্তু স্বর্গ বিভিন্ন প্রকারের আছে, যেমন নরকও বিভিন্ন প্রকারের আছে (আমাদের সত্তার প্রত্যেক স্তরের নিজস্ব "স্বর্গ" ও নিজস্ব "নরক" আছে)। সাধারণত, একজন ধর্মপরায়ণ

মানুষ, তাঁর ব্যক্তিত্বকে পিছনে ছেড়ে অগ্রসর হন, এবং একই সময়ে তাঁর অবচেতনকেও পেছনে ছেড়ে যান; তাঁকে শুধু অতিক্রম করতে হয় একটি দ্বার "প্রহরারত তত্ত্বাবধায়কদের" সঙ্গে, যাঁরা সাধুদের জীবনে উল্লিখিত সকল "রাত্রি" ও "প্রলোভনের" অপ্রীতিকর কারণ। কিন্তু তা শুধু একটিই দ্বার। অনুরূপভাবেই, যে স্বর্গের কথা তিনি অনুধ্যান করেন, তার তাৎপর্য হলো বাইরের অস্তিত্ব পরিত্যাগ করে সমাধির মধ্যে নিমগ্ন হওয়া। আমরা দেখেছি, এ যোগের লক্ষ্য চেতনার বিলয় নয়, নিম্নেও নয়, কি উর্ধ্বেও নয়, এবং বিশেষভাবে, নিম্নের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিমীলিত করাও নয়। পূর্ণযোগের সাধকের লক্ষ্য নয় অন্ধকার রাত্রি, কিংবা চোখ-ধাঁধানো তীব্র আলোক। যেখানেই তিনি যান, তাঁর দৃষ্টি অব্যাহত থাকা উচিত— এই হলো নিয়ন্ত্রণের প্রথম স্তর। কারণ, আমরা চাই না এক উন্নততর স্তরে "অতিক্রমণ", আমরা একেই রূপান্তরিত করতে চাই।

ঠিক যেমন অতিচেতনের মধ্যে অনেক ক্রম আছে, অবচেতনেরও আছে অনেক স্তর বা জগৎ, অনেক "অন্ধকারময় গুহা", ঋগ্‌বেদের ভাষায়। বস্তুত আমাদের সত্তার প্রত্যেক স্তরের পশ্চাতে আছে এক অবচেতন— এক মানসিক অবচেতন, এক প্রাণিক অবচেতন, এবং এক শারীরিক অবচেতন, যা নিমজ্জিত হয়ে যায় জড় নিশ্চেতনের* মধ্যে। সেখানে আমরা যথাক্রমে পাব, সকল বামন ও পাশব মানসিক রূপ বা শক্তি, যা প্রথমে এই জড়তত্ত্বের বা প্রাণের জগতে আবির্ভূত হয়েছিল; প্রাণের প্রারম্ভিক বিকাশের সময়ের সকল আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি, তার ভয় ও যন্ত্রণার সকল প্রতিক্রিয়া; এবং অবশেষে রোগ, বিচ্ছিন্নতা ও মৃত্যুর শক্তিবৃন্দ, যা অবচেতনভাবে আমাদের পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, কোনো প্রকৃত জীবন পৃথিবীতে সম্ভব নয়;

---

* শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে, মনস্তাত্ত্বিক বিভাজন বিবর্তনীয় আরোহণের অনুসারী, যা মনে হয় যুক্তিসম্মত। কারণ, চেতনা জড়তত্ত্বে নিহিত, এবং জড় হত শুরু করে ক্রমবর্ধমান ভাবে উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতর স্তরে অভিব্যক্ত। তদনুযায়ী, নিশ্চেতন আমাদের জড়তত্ত্বময় শারীরিক আধারের প্রতিনিধিত্ব করে, অবচেতন আমাদের পার্থিব অতীতকে ধারণ করে এবং অতিচেতন ধারণ করে আমাদের ভবিষ্যৎকে (নিশ্চেতন প্রকৃতপক্ষে চেতনাহীন নয়, শ্রীঅরবিন্দ তাকে বলতেন "অচেতন")। এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে বিশ্বময় চেতনার ভূমি আছে অনেক, একের পর এক; এদের সমগ্রভাবে শ্রীঅরবিন্দ কখনো কখনো বলতেন "মগ্নচেতন", অবচেতন হতে তাদের স্পষ্টরূপে পৃথক করবার জন্য। অবচেতন অত্যল্পভাবে বা সামান্যভাবে সচেতন, কিন্তু মগ্নচেতন ভূমিসমূহ অত্যন্ত সচেতন শক্তিরাজিতে পরিপূর্ণ। এসব অঞ্চলের "ব্যক্তিগত" অংশটি এক ক্ষুদ্র সীমিত ক্ষেত্র: আমাদের নিজেদের শরীর এবং আমাদের এ জন্মে ও পূর্বের সকল জন্মে আমরা যা-কিছু "ব্যক্তিভাবাপন্ন" করেছি বা যার উপর আমরা "উপনিবেশস্থাপন" করেছি, তাই।

যতদিন এইসব জগৎ আমাদের পার্থিব নিয়তির নিয়ন্তা। কারণ আমরাই এই যুদ্ধের ক্ষেত্র— এইসকল জগৎ আমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্মুখীন হয়, উচ্চতম হতে নিম্নতম পর্যন্ত। পলায়নের বা অবজ্ঞাপ্রকাশের অথবা নিজেদের মধ্যে বিরোধিতার কোনো অর্থ হয় না। যুদ্ধক্ষেত্র প্রবেশ করে আমাদের জয়লাভ করতেই হবে:

বইতে হবে যে শৃঙ্খল ছিন্ন করতে এসেছে সে;
সইতে হবে সে যন্ত্রণা, যার নিরাময় করবে সে।[৪]

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সীমা

সমসাময়িক মনস্তত্ত্বও অবচেতন এবং তাকে বিশুদ্ধ করবার প্রয়োজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ শুধু ছবির অর্ধেক দেখেছেন— অবচেতন, অতিচেতন ছাড়াই— এবং তাঁরা মনে করেছেন যে তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করতে পারবে দস্যুদের এসব গুহাকে। একটি ফ্ল্যাশলাইট সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যেও যাত্রারম্ভ হয়তো আমরা করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে যে অবচেতন তাঁরা দেখেন, তা শুধুই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সম্মুখ-ব্যক্তিত্বের অন্তস্তল। কারণ অবতরণ অধিরোহণের সঙ্গে সমানুপাতিক— আমরা যতদূর আরোহণ করেছি, তার চেয়ে বেশি অবতরণ করতে পারি না। কারণ অবতরণের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, আরোহণের জন্যও ঠিক সেই শক্তিরই প্রয়োজন। এ এক মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধান, যা কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না। যদি কোনো দুর্ঘটনার জন্য আমাদের আরোহণের সামর্থ্য অপেক্ষা অধিকতর নিম্নে আমরা অবতরণ করি, তা হলে তার স্বতঃস্ফূর্ত পরিণাম হবে কোনো দুর্ঘটনা, প্রেতাবেশ বা উন্মত্ততা, কারণ, আমাদের অভাব হবে অনুরূপ সুরক্ষা-শক্তির। নিম্নে এখানে আমরা যতই সত্যের নিকটবর্তী হই, ততই আমরা আবিষ্কার করি এক অপরিমেয় প্রজ্ঞা। মিঃ স্মিথ্-এর সকল অন্ধকারময় বিকৃতি তাঁর সম্মুখ-ব্যক্তিত্ব হতে স্বল্প কয়েক ইঞ্চি নিচে অবস্থিত, এ কথা যদি আমরা বলি, তা হলে তাঁর সচেতন অস্তিত্বও কয়েক ইঞ্চি উর্ধ্বে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের মনোবিজ্ঞানীরা যদি বিশেষভাবে আলোকপ্রাপ্ত না হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁরা অবচেতনের গভীরে প্রকৃতই যেতে পারবেন না, এবং সেজন্য, কোনো কিছুরই নিরাময় করতে পারবেন না, শুধু অল্প কিছু অগভীর অস্বাভাবিকতা ব্যতীত এবং সে-ক্ষেত্রেও সবসময় এক আশা থাকে যে, সেসব বিশৃঙ্খলা পুনর্বার অন্য কোথাও অঙ্কুরিত হতে পারে, অন্য কোনো রূপে। আমরা আরোগ্য করতে পারব না, যদি না আমরা পূর্ণরূপে নিম্নতম পর্যন্ত আরোগ্য করি এবং আমরা নিম্নতম পর্যন্ত যেতে পারব না, যদি না আমরা উর্ধ্বতম পর্যন্ত যেতে পারি। যতই গভীরে আমরা অবতরণ করতে চাই, ততই শক্তিশালী আলোক আমাদের প্রয়োজন, অন্যথা আমরা

পরিণত হব জীবন্ত আহারে।

যদি মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তার অগভীর সীমায় আবদ্ধ থাকে, তাতে কিছু ভুল নেই; অবশেষে সে নিজেই তার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হবে, এবং সে সময়ের মধ্যে ছোটো ছোটো অস্বস্তিকর অবস্থার উপশম করে নিজেকে উপযোগী করে তুলবে। দুর্ভাগ্যবশত, মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনেকের জন্য হয়ে উঠেছে এক নতুন ধরনের শাস্ত্র, এবং হয়ে উঠেছে এক শক্তিশালী কারণ, মানুষের মন বিকৃত করে তোলার জন্য, মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সম্ভাবনাগুলোর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিব্য সম্ভাবনাগুলোর পরিবর্তে। নিঃসন্দেহে, আমাদের বিবর্তনের পথে আমাদের "ভুলগুলি" অবশেষে পায় তাদের নিজস্ব স্থান ও উদ্দেশ্য; আমাদের নৈতিক মধ্যবিত্তশ্রেণীয় আত্মপ্রসাদ ভেঙে যাওয়া ভালো, কিন্তু যে উপায় নির্বাচিত হয়েছে তা ভয়াবহ, কারণ তা রোগকে আমন্ত্রণ জানায়, অথচ তার আরোগ্যশক্তি নেই। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: *মন ও প্রাণকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অশুদ্ধ করবার প্রবণতা এর আছে। আধুনিক মনস্তত্ত্ব এক শিশু বিজ্ঞান, যা একই সঙ্গে অসতর্ক অনভিজ্ঞ ও অপরিণত। শিশু-অবস্থার সকল বিজ্ঞানে মানবমনের ব্যতিক্রমহীন অভ্যাস হলো কোনো আংশিক বা স্থানীয় সত্যকে গ্রহণ করে, তাকে অত্যধিক সর্বজনীন করে তোলা এবং প্রকৃতির এক সমগ্র ক্ষেত্রকে এর সংকীর্ণ পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা— এ কথা এ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলভাবে প্রবল। প্রকৃতির এক নির্দিষ্ট বিভাগ, যা অন্ধকারতম, অধিকতম বিপজ্জনক, অধিকতম অসুস্থ, অর্থাৎ নিম্নপ্রাণের অবচেতন স্তর * তাই নিয়ে ফ্রয়েডের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যাপৃত হয় এবং তার কুৎসিততম তত্ত্বের কিছু অংশ পৃথক্ করে নেয়, এবং তার ও এসকল তত্ত্বের উপর এমন এক কার্যধারা আরোপিত করে, যা তার প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত প্রকৃত ভূমিকা হতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অনুভূতি লাভের জন্য অপরিপক্বভাবে বা ভ্রমপূর্ণভাবে একে জাগিয়ে তোলায় সচেতন অংশগুলিও এর অন্ধকারময় ও জঘন্য উপাদানে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, এবং এইভাবে সমগ্র প্রাণিক প্রকৃতি, এমন-কি মানসিক প্রকৃতিও বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সেজন্য নাস্তিসূচক অনুভূতি দিয়ে নয়, এক অস্তিসূচক অনুভূতি দিয়ে সবসময় শুরু করা উচিত, চেতন সত্তার যে-সব অংশ রূপান্তরিত হবে তাদের মধ্যে দিব্যপ্রকৃতির কিছু অংশ প্রশান্তি, আলোক, সমতা, পবিত্রতা এবং দিব্য সামর্থ্য নামিয়ে এনে।*

---

* যেমন বলা হয়েছে, অবচেতনে অনেক স্তর ও উপস্তর আছে। বিশেষ বিবেচনা করেই এসব নিম্নতর জগতের বিবরণী আমরা দিলাম না : যখন সময় আসবে, সাধক নিজেই তাদের অনুভব করবেন। অনেকে যেমন কল্পনা করেন, এসব নিম্নতর শক্তিকে এক সুনির্দিষ্ট মানসিক রূপ দেওয়া তাদের উচ্ছেদে সাহায্য করে না, বরং আমাদের চেতনার উপর তাদের এক অধিকতর নিয়ন্ত্রণ দেয়। মন আরোগ্যের যন্ত্র হতে পারে না।

যখন যথেষ্টভাবে এই কর্ম সম্পন্ন হবে, যখন এক দৃঢ় অস্তিসূচক ভিত্তি স্থাপিত হবে, তখনই নিরাপদ্ হবে লুক্কায়িত অবচেতন-বিরোধী উপাদানগুলোকে জাগিয়ে তোলা তাদের বিনষ্ট ও বিলীন করবার জন্য, দিব্যশান্তি, আলোক, শক্তি ও জ্ঞানের সামর্থ্যের সাহায্যে।[৫]

কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অন্য একটি অসুবিধা আছে, আরও গুরুতর। কারণ, সত্যই যদি দৈবক্রমে মনোবিশ্লেষকগণ সমর্থ হন অবচেতনে অবতরণের জন্য, তাঁরা যে কোনো কিছুর নিরাময় করবেন না, শুধু তাই নয়, তাঁরা যে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বাইরে বিভিন্ন শক্তিকে সক্রিয় করে দেবেন জাদুকরের শিষ্যের মতো, শুধু তাও নয়, কিন্তু যদি তাঁদের সামর্থ্য থাকত এসব শক্তিদের নিয়ন্ত্রণ ও ধ্বংস করবার জন্য, তাঁরা মন্দের সঙ্গে ভালোকে নষ্ট করে দিতেন ও আমাদের প্রকৃতিকে বিকলাঙ্গ করে দিতেন অপূরণীয়ভাবে। কারণ, তাঁদের জ্ঞানের অভাব। কারণ তাদের মনের উচ্চাসন থেকে তাঁরা বেশি দূর দেখতে সমর্থ হন না, বুঝতে সমর্থ হন না এই অশুভের মাধ্যমে যে শুভ প্রস্তুত হচ্ছে তাকে, যে সক্রিয় মহাশক্তি আছে বিপরীতের লীলার অন্তরালে তাকে। এই তমোময় পরিণয়ের বিচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রয়োজন অন্য এক শক্তি, এবং সর্বোপরি অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি: *অংশকে জানার পূর্বে তোমার জানা উচিত সমগ্রকে, নিম্নতমকে প্রকৃতরূপে বুঝতে পারার পূর্বে তোমার বোঝা উচিত উচ্চতমকে। এই হলো বৃহত্তর মনস্তত্ত্বের পরিশ্রুতি যা অপেক্ষা করে আছে তার যথার্থ সময়কে, এবং যার সম্মুখে এসব অন্ধ ত্রুটিপূর্ণ অনুসন্ধান অন্তর্হিত হয়ে শূন্যতায় পরিণত হবে।*[৬]

এখন, আমাদের মনস্তত্ত্বের মৌলিক ত্রুটির বিষয়ে আসা যাক। বোঝবার কোনো সামর্থ্য এর নেই; কারণ, এর অনুসন্ধান নিম্নে, আমাদের বিবর্তনীয় অতীতে। এ কথা সত্য, পরম রহস্যের অর্ধেক সেখানে আছে, কিন্তু ঊর্ধ্বের শক্তিই নিম্নের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারবে। পিছনে ফিরে দেখবার জন্য আমরা উদ্দিষ্ট নই, বরং আমরা উদ্দিষ্ট অতিচেতন আলোকে সম্মুখে ও ঊর্ধ্বে দেখবার জন্য, কারণ সেখানেই আমাদের ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যৎ-ই অতীতের ব্যাখ্যা করতে পারবে। তাকে নিরাময় করতে পারবে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জনৈক শিষ্যকে আবার লিখলেন: *এইসব মনোবিশ্লেষকদের গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। হয়তো তাই উচিত, কারণ অর্ধজ্ঞান এক শক্তিশালী বস্তু, এবং তা প্রকৃত সত্যের সম্মুখে আসবার পথে এক বিরাট বাধা হতে পারে। তাঁরা নিম্ন হতে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করেন এবং নিম্নতর অস্পষ্টতার সাহায্যে ঊর্ধ্বতর আলোকের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, কিন্তু এসব বস্তুর মূল ভিত্তি ঊর্ধ্বে আছে, নিম্নে নেই। বস্তুসমূহের প্রকৃত ভিত্তি অবচেতন নয়, অতিচেতন। পঙ্কজের তাৎপর্য পাওয়া যাবে না যে পঙ্কে সে উদ্‌ভূত হয় তার রহস্যের বিশ্লেষণে; তার রহস্য জানা যাবে পঙ্কজের*

স্বর্গীয় আদিরূপ হতে যা উর্ধ্বে শাশ্বত আলোকে চির-প্রস্ফুটিত।[৬]

মনে হয়, আমরা এগিয়ে চলেছি নিম্ন হতে উর্ধ্বে, কিংবা অতীত হতে ভবিষ্যতে, অথবা রাত্রি হতে সচেতন আলোকে। কিন্তু তা হলো আমাদের সংকীর্ণ ক্ষণিক দৃষ্টি যা চিত্রের সমগ্রতাকে খণ্ডিত করে দেয়, না-হলে আমরা দেখতে পেতাম ভবিষ্যৎ আমাদের আকর্ষণ করছে, অতীত আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে না; এবং উর্ধ্ব হতে আলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করে আমাদের রাত্রিতে— রাত্রি কীভাবে এত আলোকের সৃষ্টি করতে পারে? আমরা যদি রাত্রি হতে উদ্‌ভূত হতাম তা হলে শুধু রাত্রিতেই সমাপ্ত হয়ে যেতাম। কঠোপনিষদের বাণী: "এই সেই সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ যা উর্ধ্বমূল কিন্তু যার শাখাগুলি নিম্নগামী" [কঠোপনিষদ্ ২.৩.১]। আমরা অনুভব করি, আমরা প্রভূত প্রচেষ্টা করছি অভিবৃদ্ধির জন্য, বোঝবার ও জানবার জন্য, ভবিষ্যতের প্রতি আমরা এক চাপা উত্তেজনা অনুভব করি, কিন্তু তা হলো আমাদের ক্ষুদ্র পরিপ্রেক্ষিত। অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতও সম্ভব, যেখান থেকে আমরা দেখব, এই অতিচেতন ভবিষ্যৎ আমাদের বর্তমানে প্রবেশের প্রয়াসী। এবং আমরা হয়তো দেখতে পাবে যে, যা ছিল আমাদের প্রভূত প্রয়াস তা ছিল এক *প্রতিরোধ* যা আমাদের স্থূলতা ও অন্ধকার দ্বারা উপস্থাপিত। ভবিষ্যৎ শুধু নিম্ন হতে উর্ধ্বে গতি করে না; তা হলে পৃথিবীর জন্য কোনো আশাই থাকত না, পৃথিবী এক চরম চৈত্যিক চাপে মহাকাশের মধ্যে বিস্তারিত হয়ে যেতো, কিংবা পুনর্বার রাত্রির তমিস্রায় তার পতন হত। ভবিষ্যৎ উর্ধ্ব হতে নিম্নেও গতি করে। সে অবতীর্ণ হয়, ক্রমবর্ধমানভাবে, আমাদের মনের কুয়াশায়, আমাদের প্রাণের বিশৃঙ্খলায়, আমাদের অবচেতন ও নিশ্চেতন রাত্রির মধ্যে, যে পর্যন্ত না সব-কিছুকে সে আলোকিত করে, সব-কিছুকে প্রকাশিত করে, সব-কিছুকে নিরাময় করে। যতই তার অবতরণ হয়, ততই প্রতিরোধ বৃহত্তর হয়। আমাদের সময় লৌহযুগ, মহান্ বিপ্লব ও ধ্বংসের সময়। আশার সময়। যে চরম বিন্দুতে এই ভবিষ্যৎ স্পর্শ করে অতীতের নিম্নতম গভীরতাকে, যেখানে এই আলোক বিস্ফোরিত হয় রাত্রির নিম্নতম প্রদেশে, সেখানে আমরা পাব মৃত্যুর ও অমৃতময় জীবনের রহস্য, যদি তাই হয় ভগবৎসংকল্প। কিন্তু আমরা যদি শুধুই নিম্নদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, অন্য কোথাও না করে, তা হলে আমরা শুধুই পাব কর্দম, ও কর্দম ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

সত্যের অন্ধকার অর্থ

এখন আমরা রহস্যের নিকটতর হচ্ছি। সাধক আরম্ভ করেছিলেন এক অস্তিসূচক অনুভূতি নিয়ে: 'অন্য কিছুর' জন্য প্রয়োজনবোধের কারণেই এই পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। মানসিক নীরবতার জন্য তিনি প্রয়াস করেছিলেন, এবং দেখলেন

তাঁর সেই চেষ্টাই এনে দিল এক উত্তর। তিনি অনুভব করলেন, এক শক্তি অবতরণ করছে, তাঁর মধ্য এক নতুন স্পন্দন, জীবনকে যা করে দিল আরও স্বচ্ছ, আরও জীবন্ত। বোধ হয় তিনি এ কথাও অনুভব করলেন যেন হঠাৎ সকল সীমা বিদীর্ণ হয়ে গেল ও তিনি উপনীত হলেন অন্য এক উচ্চতায়। তাঁর মধ্যে এক নতুন ছন্দের স্থিরীকৃত হওয়ার চিহ্ন সহস্র পথে আসতে পারে। তারপর, এই উর্ধ্বায়িত আরম্ভের পর, সব-কিছু হঠাৎ আবৃত হয়ে যায়, যেন তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন, বা মোটামুটি, কেনো এক বালসুলভ উৎসাহে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মধ্যে কিছু একটা এখন তার প্রতিশোধ নিচ্ছে অবিশ্বাস, বিরক্তি ও বিদ্রোহের এক উত্তাল তরঙ্গের মাধ্যমে। এবং সেটাই হবে দ্বিতীয় চিহ্ন, বোধহয় প্রকৃত চিহ্ন, যে তাঁর অগ্রগতি হচ্ছে এবং তিনি তাঁর প্রকৃতির বাস্তবের সম্মুখীন হচ্ছেন, বা অবতরণশীল শক্তি তার মন্থন-ক্রিয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। সর্বশেষে, প্রগতি এক আরোহণের ব্যাপার ততটা নয়, যতটা তা হলো যা-কিছু বাধা দেয় সেসবকেই দূর করবার ব্যাপার। যখন আমরা স্বচ্ছ, তখন সব-কিছুই বিদ্যমান। সুতরাং সাধক তাঁর অনেক বাধাবিঘ্ন আবিষ্কার করেন। পূর্ণযোগের পথে প্রায়ই ধারণা এই হয় যে, সর্বোত্তমের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে সম্মুখীন হতে হয় অশুভতমের, শান্তি ও আলোকের সন্ধানে এসে সন্ধানপ্রাপ্তি হয় যুদ্ধের। সত্যই এ এক যুদ্ধ, এ কথা গোপন রাখার কোনো অর্থ হয় না। যে পর্যন্ত আমরা স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলি, আমরা ভাবতে পারি যে আমরা খুবই উত্তম, যথার্থ ও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা আমাদের গতিপথ বিপরীত করি, সব-কিছুই প্রতিরোধ করে। তখন আমরা বাস্তবরূপে বুঝি সেইসব বিশাল শক্তিকে যারা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাকে মোহিত করে দেয়— যে পর্যন্ত আমরা প্রভাবমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা না করি, সে পর্যন্ত আমরা তাদের দেখি না। সাধক যখন ঊর্ধ্বে প্রথম নির্দিষ্ট উন্মীলন প্রাপ্ত হন, যখন তিনি আলোক দর্শন করেন, প্রায় একই সময়ে, তিনি নিম্নে অনুভব করেন বারংবার এক আঘাত, যেন তাঁর মধ্যে কিছু একটা যন্ত্রণা অনুভব করছে। তখন তিনি জানতে পারেন শ্রীঅরবিন্দ কী বলতে চান তাঁর এই পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে:

আলোর বিরোধে অভিযোগ করে আহত অন্ধকার।[৭]

তখন তিনি তার প্রথম শিক্ষা লাভ করেন: ঊর্ধ্বে আমরা কোনো এক পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারি না, নিম্নেও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ না ক'রে।

পথের এসব তীব্র আবর্তনকে ভাগ্যের একপ্রকার নির্দেশ না ভেবে, সাধকের পক্ষে উচিত তাদের স্বীয় কর্মের মূলভিত্তিতে পরিণত করা। অধিরোহণ ও অবরোহণের এই দ্বৈত গতিবিধিই হলো পূর্ণাঙ্গ যোগের প্রধান প্রক্রিয়া: *প্রত্যেক উচ্চতা আমরা জয় করবার পর তার শক্তি ও তার আলোককে নিম্নতর মৃত্যুশীল গতিবিধির মধ্যে নামিয়ে আনবার জন্য আমাদের লক্ষ্য ফেরাতে হবে।*[৮] জীবনকে

রূপান্তরিত করবার এই হলো মূল্য, নচেৎ যখন চেতনার শিখরসমূহে আমরা শুধুই কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতায় রত থাকি, তখন নিম্নে পুরাতন জীবন ক্রমাগত আঘাত পায়। কার্যত নিম্নাভিমুখ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কখনো মনের খামখেয়ালি নিষ্পত্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় না— মন যতো কম হস্তক্ষেপ করবে ততই বেশি ভালো। তাছাড়া এ কথা ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয়, মন কীভাবে কখনও অবতরণ করতে পারে, কারণ সে তো তার ছোট ডেস্ক্-এর পিছনেই বসে থাকে ? জাগরিত ও ব্যক্তিত্বে পরিণত যে চিৎশক্তি আমাদের মধ্যে নিহিত, সে-ই সকল কার্য সম্পন্ন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যখনই আমরা চেতনা বা আলোকের একটি নির্দিষ্ট তীব্রতা স্পর্শ করি, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের অবশিষ্ট প্রকৃতির উপর চাপ প্রয়োগ করে যা নিজের অনুরূপ অস্পষ্টতা বা প্রতিরোধ বাইরে প্রকাশ করে। এ কথা ঠিক মহাসাগরের গভীরতায় অত্যধিক অক্সিজেন হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার মতো: অল্প কিছু সামুদ্রিক ঈল্ ও স্কুইড় মাছ প্রচণ্ড সংঘর্ষ করবে। এমন-কি, বিস্ফোরিত হয়ে যেতেও পারে। এ হলে চেতনার এক অদ্ভুত বৈপরীত্য যেন এক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত প্রকোষ্ঠ হতে সেই *একই* অন্ধকাব প্রকোষ্ঠে যাওয়া, এক আনন্দময় প্রকোষ্ঠ হতে সেই *একই* দুঃখার্ত প্রকোষ্ঠে যায়— সব-কিছুই সমান, তথাপি সব-কিছুই পরিবর্তিত। যেন এ সেই একই শক্তি একই স্পন্দনের তীব্রতা —এমন-কি, সেই *অভিন্ন স্পন্দন*— শুধু সহসা তার সম্মুখে এক বিয়োগ চিহ্ন উপস্থিত হয়। তখন আমরা দেখতে পারি এবং গতিবিধি প্রায় লক্ষ্য করতে পারি, উদাহরণস্বরূপ, কীভাবে ভালোবাসা ঘৃণায় পরিণত হয়, পবিত্র অপবিত্রে পরিণত হয়— একই বস্তু, শুধু আবর্তিত। কিন্তু যে পর্যন্ত আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাগুলি শুধু পরস্পরের বিরোধী হয়ে থাকবে, এবং আমাদের ভালোমন্দের বিপরীত হয়ে থাকবে (বোধ হয় আমাদের বলা উচিত মন্দের সম্মুখভাগ), সে পর্যন্ত জীবনের রূপান্তরের কোনো আশা নেই। প্রয়োজন এমন-কিছুর যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন— অন্য এক চেতনা। আমাদের সকল কবি ও সৃজনশীল মনীষী চেতনার এইসব দোলায়মান অবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। এমন-কি, যে সময়ে *আলোকপ্রাপ্তি* হয় রিম্বড় তখন অদ্ভুত অঞ্চলসমূহে প্রবেশ করেছিলেন, যা তাঁকে "ভয়বিহ্বল" করে তুলেছিল; তিনিও অন্ধকার বৈপরীত্যের নিয়ম মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এক প্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত অচেতনভাবে দোলায়িত হওয়ার পরিবর্তে, আরোহণের প্রক্রিয়া না জেনে আরোহণ করবার পরিবর্তে কিংবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবতরণ করবার পরিবর্তে, পূর্ণযোগের সাধক সাধনারত হন সুশৃঙ্খলভাবে, সচেতনভাবে, তাঁর সমতা না হারিয়ে এবং সর্বোপরি, বিশ্বাস স্থাপন করে এই চিৎশক্তির উপর যা কখনো সৃষ্টি করে না এমন প্রতিরোধ যা তিনি সহন করতে পারেন না, অনাবৃত করে না এমন আলোক যা তিনি ধারণ করতে পারেন না। দীর্ঘসময় ধরে এক বিপদ্ হত অন্য বিপদের মধ্যে জীবনযাপন করবার

পর শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করি এক পদ্ধতি, এবং লক্ষ্য করি যে, প্রত্যেকবার যখন মনে হয় আমরা আরোহণের বক্রপথটিকে ছেড়ে দিয়েছি কিংবা আমাদের প্রাপ্ত কোনো উপলব্ধি হারিয়ে ফেলেছি তখন পরিশেষে আমরা সেই উপলব্ধি আবার ফিরে পাই, কিন্তু তা হয় এক উচ্চতর স্তরে— যা পরিব্যাপ্ত ও সমৃদ্ধ হয়, আমাদের পতন দ্বারা নতুন আলোকে সমন্বিত, আমাদের অধিকারগত এক সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের মাধ্যমে— আমাদের পতন না হয়ে থাকলে এই নিম্নতর ক্ষেত্রটি ঊর্ধ্বতর ক্ষেত্রের সঙ্গে কখনোই যুক্ত হত না। সামূহিক স্তরে বোধ হয়, অনুরূপ এক প্রক্রিয়াই এথেন্‌স্-এর পতন এনেছিল, যার ফলে হয়তো, প্রাচীনকালের কিছু বর্বরও প্লেটোকে বুঝতে পেরেছিল একদিন। পূর্ণযোগের অগ্রগতি হয় না একটি সরলরেখার মতো, ঊর্ধ্ব হতে আরও ঊর্ধ্বে আরোহণে, দৃষ্টির বাইরে, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বিন্দুতে বিলীন হয়ে, বরং শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন, তা সংঘটিত হয় এক চক্রবৎ গতিতে ধীরে ও সুশৃঙ্খলভাবে, আমাদের সত্তার সকল স্তরকে গ্রহণ ক'রে, বিশাল হতে বিশালতর এক উন্মীলনে এবং *গভীর হতে গভীরতর* এক ভিত্তির উপর। এই শক্তির অথবা বরং এই চিৎশক্তির, অন্তরালে শুধুই একটি পদ্ধতি আমরা উপলব্ধি করি না, বরং আরও উপলব্ধি করি নিয়মিত সব সময়াবর্ত ও এক ছন্দ, জোয়ার-ভাটার মতো, চাঁদের মতো। আমরা যতই অগ্রসর হই সময়াবর্তগুলো ততই বিশালতর হয়, কোনো বিশ্বময় গতিবিধির সঙ্গে তাদের সংযোগ নিবিড়তর হয়, এবং পরিশেষে আমরা লক্ষ্য করতে পারি আমাদের নিজেদের সকল অবতরণের মধ্যে পৃথিবীর সকল সাময়িক অবতরণ, এবং আমাদের নিজেদের সকল বাধাবিঘ্নের মধ্যে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহে পূর্ণ পৃথিবীর সকল আলোড়ন। ঘটনাক্রমে, সব-কিছু এমন অন্তরঙ্গভাবে সংযুক্ত হয়ে উঠবে যে, ক্ষুদ্রতম বস্তুর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সূক্ষ্মতম আকস্মিক ঘটনার মধ্যে এবং আমাদের চারদিকের সকল বিষয়ে আমরা দেখতে পাব, মানবজাতির উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য এবং একই বিবর্তনীয় শিখরের উপর আরোহণে বা অবরোহণে তাদের প্রবর্তিত করবার জন্য উদ্যত যে বিশাল নিম্নচাপ, তার চিহ্ন। তখন আমরা দেখতে পাব যে আমরা অব্যর্থভাবে পরিচালিত হচ্ছি এক লক্ষ্যের অভিমুখে এবং সকল বস্তুরই এক তাৎপর্য আছে, এমন-কি ক্ষুদ্রতম বস্তুরও— সব-কিছু আলোড়িত না হয়ে কোনো ক্ষুদ্র বস্তুও আলোড়িত হয় না, এবং আমরা যা মনে করেছিলাম, তার চেয়ে মহত্তর এক দুঃসাহসিক অভিযানের পথে আমরা যাত্রারত।

শ্রীঘ্রই এক দ্বিতীয় বিরোধাভাস আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় যা সব সময়ই অপরিবর্তিত থাকে। শুধু যে আরোহণ-অবতরণের একটি নিয়মই আছে, তা নয়, মনে হয় একটি কেন্দ্রীয় বিরোধাভাসও আছে। আমাদের প্রত্যেকের একটি লক্ষ্য আছে যেখানে আমাদের এ জীবনে ও সকল জীবনের মধ্যে দিয়ে উপনীত হতে

হবে, যার অভিব্যক্তি হবে অনুপম, কারণ প্রত্যেক মানুষ অনুপম— সেই আমাদের কেন্দ্রীয় সত্য, আমাদের নিজস্ব বিশেষ বিবর্তনীয় কঠোর প্রয়াস। ধীরে ধীরে এই লক্ষ্যটি আবির্ভূত হয়, অনেক অনুভূতি ও ক্রমাগত অনেক জাগরণের পর, যখন আমাদের সত্তা এক আন্তরিক রূপগ্রহণ আরম্ভ করে; তখন আমরা অনুভব করি আমাদের জীবন গ্রথিত একই সূত্রে— এবং আমাদের সকল জন্মও তাই, যদি আমরা তাদের বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি— এবং তা সূচিত করে এক নির্দিষ্ট অভিমুখ্যের প্রতি যেন সব-কিছু সবসময় আমাদের প্রেরিত করছে সেই একই দিশায়। দিশাটি আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণতর ও অধিকতর নির্দিষ্ট। কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের বিষয়ে আমরা সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যুগপৎভাবে, আমরা আবিষ্কার করি বিশেষ অসুবিধা যা আমাদের লক্ষ্যের বিপরীত বা বিরোধাভাসের মতো। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, যেন আমরা আমাদের আলোকের অবিকল ছায়া ধরে রাখি— এক বিশেষ ছায়া বা অসুবিধা বা সমস্যা যা নিজেকে আমাদের সামনে বার বার তুলে ধরে, এক বিশৃঙ্খল হঠকারিতার সঙ্গে, যা সবসময় অপরিবর্তিত থাকে বিভিন্ন ছদ্মবেশের অন্তরালে এবং দূরতম পরিস্থিতির মধ্যেও, যা প্রত্যেক যুদ্ধ-বিজয়ের পর ফিরে আসে বর্ধিত শক্তি নিয়ে, আমাদের চেতনার নতুন গভীরতার অনুপাতে, যেন আমাদের সেই একই যুদ্ধ বারংবার জয়লাভ করতে হবে, চেতনার প্রত্যেক নতুন বিজিত স্তরে। লক্ষ্যটি যতই পরিষ্কার হয়ে আসে, ছায়াটি ততই বলবত্তর হয়। আমরা শত্রুর দেখা পেয়েছি:

মানুষের বুকে নিবাসী গুপ্ত এই শত্রর 'পর
জয়ী হতে হবে, অথবা হারাবে নিয়তি ঊর্ধ্বতর,
অন্তরের এ সংগ্রাম হতে নিষ্কৃতি নেই তার।[১]

শ্রীঅরবিন্দ একে বলতেন 'অশুভ পুরুষ'*। আমাদের লক্ষ্য কী হতে পারে, তা অস্তিবাচকরূপে বুঝে উঠবার পূর্বে কখনো কখনো আমরা তা নাস্তিবাচকরূপে অনুমান করতে আরম্ভ করি— সেই একই প্রতিকূল পরিস্থিতির, একই বিফলতার পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে, যেসব মনে হয় একই দিশার অভিমুখী, যেন আমরা এক ক্রমবর্ধমানরূপে অত্যাচারী এক বৃত্তের মধ্যে ক্রমাগত ভাবে আবর্তিত হয়ে, নিকট হতে নিকটতর হই এক কেন্দ্রবিন্দুর, যা উভয় লক্ষ্য ও লক্ষ্যের বিপরীত। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন : *কোনো ব্যক্তি যদি এই কর্মসাধনের জন্য প্রভূতরূপে সহজাত-প্রতিভাসম্পন্ন হয়ে থাকেন— অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সর্বজনীন নিয়ম প্রস্তুত করা উচিত নয়— তা হলে সবসময় বা প্রায় সবসময় তাঁর সঙ্গে এক সত্তা সংযুক্ত হয়ে থাকেন; কখনো কখনো মনে হয় যে এই সত্তা তাঁরই এক অংশ, কিন্তু করণীয় কর্মে তিনি প্রধানত যে তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন, এ সত্তাটি*

---

* The Evil Persona.

ঠিক তারই বিরোধাভাস। কিংবা যদি সেখানে সত্তাটি প্রথম হতেই না থাকে, তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে থাকে, তা হলে এই প্রকারের এক শক্তি তাঁর পরিবেশে প্রবেশ করে যখনই তিনি উপলব্ধির জন্য তাঁর গতিবিধি আরম্ভ করেন। মনে হয়, তার কাজই হলো বিরোধিতা করা, বাধা ও প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা, এক কথায়, যে কর্মটি তিনি সংসিদ্ধ করতে আরম্ভ করেছেন, তার সমস্ত সমস্যা তাঁর সম্মুখে স্থাপন করা। মনে হয়, বস্তুসমূহের পরিচালনায় গূঢ়বিদ্যার ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্যাটির সমাধান হতে পারবে না, নিয়তি-নির্দিষ্ট এই যন্ত্রটি তাকে নিজস্ব করে নিয়ে তার সমাধান করা পর্যন্ত। এ থেকে অনেক কথাই বোঝা যেতে পারবে, যা অগভীর দৃষ্টিতে মনে হবে খুবই বিভ্রান্তিকর।[১০] তাঁর কথাবার্তায়, শ্রীমা তাঁর শিষ্যদের নিকট এ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন: *যখন তুমি এক বিজয়ের সম্ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করো, তখন সবসময়ই তোমার মধ্যে সেই বিজয়ের বিপরীত বস্তুও নিহিত থাকে, যা তোমাকে অবিরত কষ্টপ্রদান করে। যখন তুমি কোথাও দেখতে পাও গভীর কালো এক ছায়া যা খুবই যন্ত্রণাদায়ক, তুমি তখন নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তোমার মধ্যে আলোকের এক অনুরূপ সম্ভাবনা আছে।* শ্রীমা আরও বলেছেন: *তোমার এক বিশেষ লক্ষ্য আছে, এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে এবং তোমার মধ্যেই তুমি বহন করে চলো উপলব্ধিটিকে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন করবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বাধাবিঘ্ন। সবসময় তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার মধ্যে ছায়া ও আলো একসঙ্গে আছে। তোমার যদি সামর্থ্য আছে, তা হলে তোমার মধ্যে সেই সামর্থ্যের অভাবও আছে। কিন্তু তুমি যদি এক নিশ্ছিদ্র ও সুগভীর-প্রসারিত ছায়া আবিষ্কার করো, তা হলে সুনিশ্চিত হবে যে তোমার মধ্যে কোথাও এক মহান্ আলোকও বিদ্যমান। কীভাবে একটিকে ব্যবহার করে অন্যটিকে উপলব্ধি করতে হবে তা তোমার উপর নির্ভর করে।*

অবশেষে এ কথা সম্ভব যে, জীবনের গূঢ় রহস্য আমাদের পরিহার করে চলে গেছে, কারণ অন্ধকার ও আলোকের দ্বৈত নিয়ম, এবং পাশব ও দিব্য, এই যুগ্ম প্রকৃতির প্রহেলিকা আমরা পূর্ণভাবে হৃদয়ংগম করতে পারি নি। আমরা প্রতিপালিত হয়েছি অস্তিত্বের এক ম্যানিকিয়ান* চিন্তাধারায়, সেজন্য আমরা আমাদের নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম অনুযায়ী অস্তিত্বের মধ্যে দেখি এক কঠোর সংগ্রাম ভালো ও মন্দের মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, যে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভালোর দিকে থাকা, ভগবানের ডান দিকে থাকা। আমরা সব-কিছুকেই

* Manichaean : Manicheaeus বা The Persian Mani -কর্তৃক খ্রীঃপূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচারিত ধর্মমত সংক্রান্ত— Mesopotamia, Centre Asia, North Africa ইত্যাদি অঞ্চলে এর প্রচার হয়েছিল, এবং ১১৮০ খ্রীস্টাব্দে France-এর Albigenes নামক ধর্মীয় মতবাদকে এ প্রভাবিত করেছিল।

দ্বিধাবিভক্ত করেছি ভগবানের রাজ্যে ও শয়তনের রাজ্যে, এ জগতের নিম্নতর জীবন ও স্বর্গের প্রকৃত জীবনে। লক্ষ্যের বিপরীতকে আমরা পরিত্যাগ করার চেষ্টা করেছি এবং তার সঙ্গে, লক্ষ্যটিকেও পরিত্যাগ করেছি। কারণ, লক্ষ্যটিকে কাটছাঁট করতে হবে না, উপরেও না নিচেও না। যে পর্যন্ত আমরা একটির জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করে চলব, আমরা ব্যর্থ হব শোচনীয়ভাবে, এবং অস্তিত্বের লক্ষ্য আমরা হারাব। কারণ, সব-কিছু এক অখণ্ড তত্ত্ব এবং আমরা যদি একটি ক্ষুদ্র অংশ অপসৃত করি তা হলে সব-কিছু ভেঙে পড়বে। আমরা নিজেদের কীভাবে মুক্ত করব "অশুভ" হতে সমগ্র জগৎকে ধ্বংস না ক'রে? যদি একজন মানুষকেও নিজেকে "অশুভ" হতে মুক্ত করতে হয়, তা হলে জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কারণ সকলই *এক*; জগৎ একই উপাদানে রচিত, দুটো উপাদানে নয়, ভালো ও মন্দে নয়। আমরা কিছুই দূর করতে পারব না; আমরা কিছুই যোগ করতে পারব না। সেজন্য, কোনো অলৌকিকতাই জগৎকে উদ্ধার করতে পারবে না: অলৌকিকতা জগতের মধ্যে *পূর্ব হতেই* বিদ্যমান, সকল সম্ভব আলোকই জগতের মধ্যে *পূর্ব হতেই* বিদ্যমান: এখানে কিছুই প্রবেশ করতে পারবে না, সূত্রটিকে বিপর্যস্ত না করে— এখানে সব-কিছুই আছে; অলৌকিকের *ঠিক* মধ্যে আমরা আছি, শুধু আমাদের কাছে চাবিটি নেই। বোধ হয় আমাদের জন্য যোগ করবার বা বিয়োগ করবার কিছুই নেই, বোধ হয়, অন্য কিছুও আবিষ্কারের জন্য নেই, বরং *একই বস্তু* ভিন্নভাবে দৃষ্ট।

যদি আমরা লক্ষ্যে উপনীত হতে চাই, তা হলে আমাদের দূর করতে হবে ম্যানিকিজম* এবং বাস্তবভাবে হৃদয়ংগম করতে হবে যা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "সত্যের অন্ধকার অর্ধ"[১১]। তিনি লিখেছেন : *মানবীয় জ্ঞান এক ছায়া নিক্ষেপ করে সত্যের গোলকের অর্ধেকই নিজের সূর্যালোক থেকে লুক্কায়িত করে দেয়।... বিশুদ্ধ সত্যের অন্বেষী মনের দ্বারা মিথ্যার প্রত্যাখ্যান হলো অন্যতম কারণ, যে-জন্য মন উপনীত হতে পারে না প্রতিষ্ঠিত সমগ্র ও সম্পূর্ণ সত্যে।*[১২] যদি আমরা দূর করে দিই যা-কিছু অসরল— এবং ভগবান্ জানেন এ জগৎ ভুলে ও অশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ— তা হলে হয়তো আমরা কোনো এক সত্যে উপনীত হতে পারি, কিন্তু তা হবে এক শূন্যগর্ভ সত্য। এই *পরম রহস্যের* ব্যবহারিক প্রারম্ভ হলো, প্রথমে সচেতন হওয়া ও তারপর *দেখা* যে, এই জগতে প্রত্যেক বস্তু, *এমন-কি, অদ্ভুততম বা দূর-বিস্তৃত ভ্রান্তিও*[১৩] অগ্নির এক স্ফুলিঙ্গ ধারণ করে, আবরণের অন্তরালে, কারণ এখানে, নিম্নে, সব-কিছুই আত্মানুসন্ধানে নিরত **ভগবান্ স্বয়ং**। তাঁর বাইরে কিছুই নেই। *কারণ ভ্রান্তি প্রকৃতপক্ষে এক অর্ধসত্য যার পদস্খলন হয় তার সসীমতার জন্য। কখনো কখনো সত্য ছদ্মবেশ ধারণ*

---

* Manichaeism : ম্যানিকিয়ান মতবাদ।

করে তার লক্ষ্যে অলক্ষিত ভাবে উপনীত হওয়ার জন্য।[১৩] যদি এই জগতে একটিও বস্তু সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা হয় তা হলে সমগ্র জগৎ হবে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। সুতরাং সাধক যদি তাঁর কাজ আরম্ভ করেন এই সূত্রের উপর— এক নিশ্চয়াত্মক সূত্র— এবং আরোহণ করেন ক্রমে ক্রমে এবং প্রত্যেক আরোহণের সঙ্গে নিম্নে অবতরণের অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে, এই উদ্দেশ্যে যে, সেই *অভিন্ন আলোক*[১৪] মুক্ত হবে যা লুক্কায়িত আছে প্রত্যেক ছদ্মবেশের নিচে, প্রত্যেক উপাদনে, এমন-কি অন্ধকারতম কর্দমে, অদ্ভুততম ভ্রমে, হীনতাম পাপে, তা হলে ক্রমশ তিনি দেখবেন, সব-কিছু তাঁর দৃষ্টির সম্মুখেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাত্ত্বিকভাবে নয়, বাস্তবিকভাবেই, এবং শুধুই সত্যের শিখরসমূহ নয়, তিনি আরও আবিষ্কার করবেন *সত্যের বিশাল গহ্বরসমূহ।*[১৫] তিনি দেখবেন যে তাঁর শত্রু একজন দক্ষতম সাহায্যকারী, তাঁর উপলব্ধির ত্রুটিহীন পূর্ণতার প্রতি অধিকতম মনোযোগী, প্রথমে এই কারণে যে, প্রত্যেক সংগ্রাম তাঁর শক্তিবৃদ্ধি করেছে, এবং তার পর এই কারণে যে প্রত্যেক পতন তাঁকে বাধ্য করেছে নিম্নের সত্যকেও মুক্ত করতে, শূন্য শিখরসমূহে একাকী পলায়ন না ক'রে। তিনি দেখবেন যে, তাঁর বোঝা *পৃথিবীমাতারই* বোঝা; পৃথিবীমাতাও ঈপ্সা করেন আলোকের অংশের জন্য। রাত্রির রাজপুত্রেরা পূর্ব হতেই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছেন! তাঁরাই কর্মী, তাঁরাই এক সর্বগ্রাহী সত্যের যত্নশীল পূর্ণতাদায়ক, সর্বত্যাগী সত্যের নয়:

সেথায় শুধু যে শুদ্ধ দেবতাদের আশা, তাই নয়,
শুভ্র অমরসমূহ ব্যর্থ যা পেতে, তা লভিবারে
লম্ফ প্রদান করেছে সরোষে একই বক্ষ হতে
হিংস্র তমসাবৃত দেবগণ: তারাও সুরক্ষিত।[১৬]

তিনি দেখতে পাবেন, প্রত্যেক বস্তুরই এক অনিবার্য স্থান আছে: কোনো কিছুকেই পরিত্যাগ করা যেতে পারবে না; শুধু তাই নয়, বোধ হয়, *কোনো কিছুই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বা ন্যূনতর গুরুত্বপূর্ণ নয়,* যেন সমস্যাটির সমগ্রতা নিহিত আছে ক্ষুদ্রতম ঘটনার মধ্যে, স্বল্পতম দৈনন্দিন ইঙ্গিতের মধ্যে, ঠিক যেমন তা নিহিত আছে মহাজাগতিক মহাপরিবর্তনের মধ্যে; এবং তা ছাড়াও আলোক ও আনন্দের সমগ্রতাও যেন নিহিত আছে ক্ষুদ্রতম অণুর মধ্যে, ঠিক যেমন তা নিহিত আছে অতিচেতন অসীমতায়। সত্যের অন্ধকারময় অর্ধ তখনই আলোকিত হবে। প্রত্যেক পদস্খলন প্রজ্বলিত করে দুঃখের এক অগ্নিশিখা, এবং যেন উন্মুক্ত করে দেয় এক পথ নিম্নে আলোকের প্রজ্বলনের জন্য; প্রত্যেক দুর্বলতা শক্তির জন্য এক আহ্বান, যেন পতনের শক্তিই হলো ঠিক উত্থানের শক্তি; প্রত্যেক অপূর্ণতা হলো এক শূন্যতা যা উদ্দিষ্ট সামগ্রিক পূর্ণতার জন্য— নেই কোনো পাপ,

নেই কোনো ভ্রম, শুধু আছে অন্তহীন দুর্দশা যা আমাদের বাধ্য করে আমাদের সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিস্তৃতির মধ্যে অম্বেষণ করতে, বাধ্য করে সব-কিছুকে আলিঙ্গন করতে, যেন সব-কিছু আরোগ্যলাভ করে, পরিপূর্ণ হয়। আমাদের বর্মের এক ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক প্রেম ও করুণা জগতের জন্য প্রবেশ করেছে যে-কথা আমাদের সকল জ্যোতির্ময় পবিত্রতা বুঝতে পারবে না কখনো— পবিত্রতা অভেদ্য, অবরোধের দ্বারা সুরক্ষিত, কংক্রিটের মতো আবদ্ধ;সত্যের প্রবেশের জন্য প্রয়োজন এক ছিদ্রপথের।

ভ্রান্তিরে করিলেন তিনি সত্যের প্রবেশের দ্বার।[১৭]

অশুভের অন্তরালে নিহিত আছে প্রেমের সত্য। যতই আমরা নারকীয় বৃত্তের অভিমুখে অবতরণ করছি, ততই আমরা আবিষ্কার করি যে অশুভের গভীরে বিদ্যমান এক তীব্র *প্রয়োজন,* আবিষ্কার করি যে আমরা কিছুই আরোগ্য করতে পারব না, অনুরূপ এক তীব্রতা ব্যতীত: অন্তরে প্রজ্বলিত হয় এক অগ্নিশিখা, অধিক হতে অধিকতর শক্তিশালী ও উষ্ণ, এক শ্বাসরোধকারী চাপের মধ্যে— 'তৎ' অবশিষ্ট থাকে শুধু, শুধুই 'তৎ', অন্য কিছুই নয়— যেন শুধুই প্রেম মুখোমুখি হতে পারে রাত্রির, ও তাকে বাধ্য করতে পারে তার জ্যোতির্ময় অর্ধেক দ্বারা আলোকিত হওয়ার জন্য। মনে হয় যেন এ সমস্ত ছায়ার প্রয়োজন ছিল প্রেমের জন্মের জন্য। প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রত্যেক ছায়া ও প্রত্যেক অশুভের হৃৎকেন্দ্রে বিদ্যমান এক বিপরীত রহস্য। এবং আমাদের প্রত্যেকের যেন এক বিশেষ অসুবিধা আছে যা আমাদের নিয়তির বিরোধাভাস ও সংকেতচিহ্ন, তেমনই হয়তো এই দুর্বল, পাপময়, যন্ত্রণাপূর্ণ পৃথিবীর বড়ো বড়ো স্তরচ্যুতি, তার সহস্রাধিক শোচনীয় গর্ত, তার নিয়তিই সংকেতচিহ্ন; এবং একদিন সে নামিয়ে আনতে পারবে পূর্ণ প্রেম ও আনন্দ, কারণ তখন সে সব-কিছু সহন করবে, সব-কিছু হৃদয়ঙ্গম করবে।

যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই অতিচেতন রেখা ঊর্ধ্বে চলে যায়, এবং অবচেতন রেখা নিম্নে অপসৃত হয়। সব-কিছুই প্রসারিত ও জ্যোতির্ময় হয়ে যায়, কিন্তু তৎসঙ্গে সব-কিছু হয়ে যায় নিকটতর, একটি অন্ধকার বিন্দুর চতুর্দিকে কেন্দ্রীভূত হয়, ক্রমবর্ধমানভাবে হয় তীক্ষ্ণ, সমস্যাপূর্ণ ও চাপযুক্ত। যেন আমরা বছরের পর বছর— জীবনের পর জীবন— ঘুরেছি সেই একই সমস্যার চারদিকে, কখনো তাকে প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ না করে, এবং এখন সমস্যাটি এখানে গহ্বরের তলদেশ জড়িয়ে ধরে আছে, আলোকের নিচে সংঘর্ষরত— জগতের সকল মন্দ একই বিন্দুতে। পরম রহস্যের মুহূর্ত আসন্ন। কারণ অবতরণের বিধান এক লৌহ-বিধান নয়, পাপের বা পতনের বিধান নয় কিংবা অনুতাপের বা স্বর্গাভিমুখে পলায়নেরও বিধান নয়; প্রকৃতপক্ষে এ এক স্বর্ণ-বিধান, এক অপরিমেয় প্রাঙ্‌মগ্নতা যা আমাদের একই সময় আকর্ষণ করে নিম্নে ও ঊর্ধ্বে অবচেতনের

ও নিশ্চেতনের গভীরে *কেন্দ্রীয় বিন্দু*[১৮] পর্যন্ত যা হলো জীবন ও মৃত্যু, আলোক ও ছায়ার গ্রন্থি, যেখানে পরম রহস্য আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ। যতই আমরা নিকটবর্তী হই শিখরের, ততই আমরা স্পর্শ করি নিম্নতমকে।

মহান্ পথ

অবতরণের শেষ পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয় আমাদের বিবর্তনীয় অতীতের গভীরে, অবচেতনকে অতিক্রম করে, যা ছিল আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিগত চেতনা, এমন এক স্তরে যেখানে, জগতে প্রথমবার, প্রতীয়মান মৃত্যু হতে জীবন্ত কোনো কিছু আবির্ভূত হয়েছিল; অর্থাৎ তা হয়েছিল জড় নিশ্চেতনা ও দৈহিক চেতনার মধ্যবর্তী সীমারেখায়, আমাদের শরীরে, যা জগতে প্রথম জন্মের সাক্ষী এবং অবশেষ। আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কোষগুলির আছে তাদের নিজস্ব চেতনা, যা অত্যন্ত সংগঠিত ও জাগরিত, যা জানে কীভাবে নির্বাচন, গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করতে হয়। এবং যা আমরা তখনই নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, যখন আমরা যৌগিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট উচ্চতায় উপনীত হব। যদি প্রশ্নটি হত শুধুই বর্তমান জীবনের অবস্থার উন্নতি, তা হলে সাধারণ যৌগিক চেতনাই যথেষ্ট হত: জীবনকে দীর্ঘায়িত করা, রোগকে প্রতিহত করা এবং চিরযৌবনলাভ যোগ-শৃঙ্খলার সচরাচর পরিণাম। কিন্তু বলা হয়েছে, আমরা চাই জীবনের রূপান্তর, শুধু তার মুখমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধি চাই না। শারীরিক চেতনার অন্তরালে আছে এক শারীরিক অবচেতনা যা উদ্‌ভূত হয় জড়তত্ত্বে জীবনের বিবর্তনে; এবং তার মধ্যে জীবনের পুরোনো অভ্যাসগুলি গভীরভাবে খোদাই করা আছে এবং সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্টতম অভ্যাস হলো মৃত্যুর অভ্যাস— এর প্রতিবর্তী ক্রিয়া, ভয়, প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি, কঠিন হয়ে যাওয়ার অভ্যাস, যেন এ সংরক্ষিত করেছে সেইসব অস্থিময় আবরণের অসংখ্য স্মৃতি, যেসবের মধ্যে সে নিজেকে রক্ষা করত বিকাশলাভের জন্য। এবং এই শারীরিক অবচেতনার ঠিক নিম্নদেশে, যে বিন্দুতে চেতনা ও স্মৃতির সকল প্রকার গঠন বা রূপ মনে হয় লুপ্ত হয়ে যাবে সেখানে আমরা উপনীত হই এক প্রস্তর শয্যায়, এক প্রারম্ভিক আবরণে যা হলো মূল মৃত্যু যা থেকে জীবন নিজেকে ছিন্ন করে নিয়েছে। তা অতি কঠিন, অতি বিশাল-– এত কঠিন এত বিশাল যে বৈদিক ঋষিগণ তার নাম দিয়েছেন "অনন্ত অশ্মন্"। এই হলো নিশ্চেতন। এ একটি প্রাচীর— কিংবা বোধ হয়, একটি দ্বার। এ হলো নিম্নদেশ— কিংবা বোধ হয় এক বহিরাবরণ। এবং সম্পূর্ণরূপে মৃত বা নিশ্চেতন এ নাও হতে পারে। কারণ আমরা যার সাক্ষাৎ পাই তা নাস্তিবাচকরূপে নিশ্চল কিছু নয়, বরং এমন কিছু যা অস্তিবাচক রূপে নাস্তিবাচক, যদি তা আমরা বলতে পারি, এমন কিছু যা জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে, জীবনকে বলে "না"।

জীবনের গভীরেতে নির্বাক্ কঠিন অস্বীকার,
বস্তুরাজির উৎসের মাঝে নিহিত জ্ঞানহীন না।[১৯]

এই নিম্নতম দেশ যদি অনস্তিত্বের শূন্যতা হত, তা হলে কোনো আশাই থাকত না; তা ছাড়া শূন্য হতে কোনোদিন কিছুই উদ্‌ভূত হতে পারে না। কিন্তু এই নিম্নতম দেশে *কিছু* আছে: যদি সেখানে এক না থাকে, তা হলে সেখানে নিশ্চয় এক হ্যাঁ-ও আছে; যদি সেখানে এক মৃত্যু বিদ্যমান, তা হলে জীবনও সেখানে নিশ্চয়ই বিদ্যমান। এবং পরিশেষে যদি এক সমাপ্তি থাকে, তা হলে, অন্যপক্ষে এক আরম্ভও আছে। প্রত্যেক 'নিষেধ' অবশ্যই এক 'নিশ্চয়ের' অপর পার্শ্ব। আমাদের প্রত্যেক নিম্নতম দেশ, কোনো কিছুর উপরের পৃষ্ঠদেশ। শ্রীঅরবিন্দের যোগের যথার্থ তাৎপর্যই হচ্ছে এই সমস্ত 'নিষেধের' মধ্য হতে 'নিশ্চয়'কে আবিষ্কার করা, প্রত্যেক উপাদানে, চেতনার প্রত্যেক স্তরে, এবং যদি ভগবানের সংকল্প তাই হয় তা হলে, আবিষ্কার করা পরম নিশ্চয়কে (যিনি নিশ্চয়াত্মক নন, বা নিষেধাত্মক নন, শুধুই অস্তিমান্), যাঁর মধ্যে সকল দ্বৈতভাব সমাহিত হয়ে যাবে, নিম্নতর ভূমির দ্বৈতবোধ এবং মৃত্যুশীল জীবনের বা জীবন্ত মৃত্যুর দ্বৈতবোধের সঙ্গে।

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ উপনীত হয়েছিলেন শারীরিক অবচেনায় সর্বনিম্ন ক্রমগুলিতে। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন এক প্রাচীরের সম্মুখে : *না, জ্যোতির্ময় জগৎ নিয়ে আমি ব্যস্ত ছিলাম না; যদি তাই হত, তা আমার ইচ্ছানুযায়ী হত। বরং আমি বিপরীত পার্শ্বের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।*[২০] মানসিক অবচেতনা ও প্রাণিক অবচেতনা যা এক সর্পগর্ত— কেবল একবার স্পর্শ করলেই যে প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন আমরা হই, তা যদি আমরা পূর্ব হতেই জানি, তা হলেই আমরা অনুমান করতে পারব 'এই' অবতরণ কেমন হয়ে থাকবে। এবং যত গভীরে আমরা অবতরণ করি, ততই ঊর্ধ্বতর চেতনা ও অধিকতর শক্তিশালী আলোক আমাদের প্রয়োজন হয়, কারণ আমরা যত ঊর্ধ্বে আরোহণ করি তত নিম্নেই আমরা অবতরণে সমর্থ। যদি আমাদের বোধগম্য হয় যে, চেতনা এক শক্তি, যা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতোই বাস্তব, তা হলে উদাহরণস্বরূপ, আমরা অনুমান করতে পারি কী প্রকার যন্ত্রণা ও আঘাত অধিমানস শক্তি ও আলোকের সঙ্গে আসে, যা এক জলপ্রপাতের মতো পতিত হয় শারীরিক অবচেতনার কর্দমের মধ্যে— *ঈথারের ও অগ্নির এক আক্রমণ...।*[২১] অনেক বাধাবিঘ্ন আছে সেখানে, বিপদ্‌ও আছে— সেকথা আমরা *'রূপান্তরের'* প্রসঙ্গে আলোচনা করব। যে পর্যন্ত তা মানসিক বা প্রাণিক প্রতিরোধের প্রশ্ন, আমাদের নৈতিক মিথ্যার প্রশ্ন, আমাদের প্রয়োজন শুধু আমাদের সংকল্প ও ধৈর্যের অনুশীলন, কিন্তু যখন আমরা আরও গভীরে অবতরণ করি, আমরা নিশ্চয়ই মুখোমুখি হব *শরীরের মিথ্যার,* শ্রীমার ভাষায়, *যেমন রোগ ও মৃত্যু। সেজন্য শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা তাঁদের শিষ্যদের জন্য*

পাথরের মতো শক্ত এক শারীরিক ভিত্তির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন : *দু-দিক থেকেই কাজ করো, একটির জন্য অন্যটির অবহেলা কোরো না।*

যখন শ্রীঅরবিন্দ অধিমানসের শেষ সীমায় উপনীত হলেন, যেখানে "বিশাল রঙিন তরঙ্গমালা" ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায় এক শ্বেত সীমান্তে তখন তিনি একই সময়ে স্পর্শ করলেন নিম্নতম দেশের কৃষ্ণ অশ্মকে:

খনন করে চলেছি আমি সুদুর গভীরে
পঙ্ক আর কর্দমের বিভীষিকা মাঝে...
ধ্বনিত হলো, "যায়নি যেথা কেউ, সেথা যাও!
খনন করো গভীরে আরো, যে পর্যন্ত
কঠিন ভিত্তি-প্রস্তরে উপনীত হয়ে
চাবি-না-থাকা দুয়ারে তুমি আঘাত না করো।"[২২]

তারপর, একদিন ১৯১০-এ চন্দননগরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কিন্তু সেই অনুভূতি যা আমাদের বিবর্তনের রূপ ও গতিপথ পরিবর্তিত করে দেয় তা পুনর্বার বর্ণনা করবার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে, কিছু সময় অপেক্ষা করে আলোচনা করা যাক আমাদের বর্তমান মানুষের অবস্থার সম্বন্ধে ও নির্ণয় করা যাক তার অবস্থান। কথাটি খুবই সরল: আমরা কারারুদ্ধ হয়ে আছি জড়তত্ত্বের মধ্যে, এখানে এই *কৃষ্ণবর্ণ অণ্ডাকৃতি তত্ত্বের* মধ্যে, যা আমাদের সংকুচিত করে দেয সব দিক্ হতে দিনের প্রত্যেক মুহূর্তে। এর মধ্য হতে বাইরে যাওয়ার জন্য একশোটি পথ নেই, বস্তুত শুধু মাত্র দুটি পথই আছে: হয়তো নিদ্রা যাওয়া (স্বপ্ন দেখা, সামাধিমগ্ন হওয়া, বা ধ্যান করা, কিন্তু এসব নিদ্রারই বিভিন্ন ক্রম, হয়তো ন্যূনাধিক উচ্চ বা সচেতন বা দিব্য) কিংবা মৃত্যুলাভ করা। শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতি আমাদের এনে দেয় তৃতীয় চাবিটি, যা আমাদের বাইরে যাওয়ার জন্য সমর্থ করে। সমাধিমগ্ন না হয়ে মৃত্যুবরণ না ক'রে, এবং অবশেষে, বাইরে না বেরিয়ে; এবং তা মানুষের আধ্যাত্মিক বিবর্তনের গতিপথকে বিপরীত করে দেয়, কারণ বাইরে যাওয়ার পথ শুধু আর উর্ধ্বে নেই, কিংবা বাইরে নেই, বরং যথার্থভাবে, আছে অভ্যন্তরে। এবং তা জাগরিত জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় সকল স্বপ্নের জন্য, সকল হর্ষাবেশের জন্য এবং বিশেষভাবে সেইসব শক্তির জন্য যারা আমাদের সামর্থ্য দেবে আমাদের স্বপ্নগুলোকে মূর্তরূপ দেওয়ার জন্য, এবং রূপান্তরিত করে দেবে এই কৃষ্ণাণ্ডকে এক স্বচ্ছ ও জীবন্ত স্থানে, যা হবে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য উপযুক্ত। চন্দননগরে, ১৯১০-এ, সেদিন শ্রীঅরবিন্দ উপনীত হয়েছিলেন গহ্বরের নিম্নতম দেশে, সকল প্রতিকূল স্তর তিনি অতিক্রম করেছিলেন যেখানে জীবন প্রস্ফুটিত হয় পুষ্পের মতো, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। সেখানে শুধু ছিল সেই উর্ধ্বস্থ আলোক যা বিকীর্ণ হচ্ছিল উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর রূপে, তীব্রভাবে, তাঁর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে; সকল মলিনতা তার রশ্মির ঠিক নিচে আসছিল

অল্প অল্প করে, যেন এই সমগ্র রজনী আহ্বান করছিল অবিরত আরও আলোককে, যেন অবচেতনের সীমা দূরে অপসৃত হচ্ছিল, গভীর হতে গভীরতরে, ঘন হতে ঘনতর ভাবে, ঊর্ধ্বের ঘনত্বের প্রতিবিম্বের মতো, এবং ছায়ার একক প্রাচীরটি এই একক আলোকের নিচে ছিল— তখনই সহসা, এই নিশ্চেতন জড়তত্ত্বের মধ্যে, এই শরীরের অন্ধকারময় কোষগুলির মধ্যে কোনো স্তর-সংক্রমণ ব্যতীত, কোনো সমাধি ব্যতীত, ব্যক্তিত্বের কোনো হ্রাস ব্যতীত, কোনো বিশ্বগত বিলয় ব্যতীত, এবং দৃষ্টি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখে শ্রীঅরবিন্দ নিক্ষিপ্ত হলেন পরম আলোকের মধ্যে।

প্রবেশ হলো তাঁর অন্য কালে আর ব্যাপ্তিস্থানে।[২৩]

রাত্রি, অশুভ, মৃত্যু— এসব ছদ্মবেশ। চরম বিরোধ জাগ্রত করে চরম তীব্রতা। এবং সদৃশ পরিবর্তিত হয় স্বরূপে। অবশেষে বিদ্যমান শুধু এক, *তদেকম্।* সৌর বিশ্ব, পরম দিব্য চেতনা— অতিমানস— অন্য সব-কিছু যাঁর বিভিন্ন রশ্মিরেখা, তিনি নিহিত জড়তত্ত্বের হৃৎকেন্দ্রে। অধিমানসের উপরের যে ক্রম, তা নেই ঠিক "উপরে", তা আছে এখানে নিম্নে ও সকল বস্তুতে। নিম্নের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় ঊর্ধ্বের দ্বার ও সকল স্থানের দ্বার।

আলোকের অপরিমেয় অবরুদ্ধ এক বিস্ময়।[২৪]
সুমহান্ এক বিপরীতবোধ রাত্রি ও দিবসের;
ভিন্ন হলো মূল্য সব জগতের...।[২৫]
ঊর্ধ্বের দেখা নিম্নের সাথে, যোজনা সকলি এক।[২৬]

অতীতের চরমসীমা স্পর্শ করে ভবিষ্যতের গর্ভকে, যা তাকে ধারণ করেছিল; দিব্য আত্মার সাক্ষাৎ হয় দিব্য জড়ের সঙ্গে, এই তাই হল সশরীরে দিব্যজীবন। ঊর্ধ্বে অধিরোহী *সচ্চিদানন্দই* নিম্নে অবরোহী *সচ্চিদানন্দ,* সৎ-চিৎ-শক্তি-আনন্দ। বিবর্তন ব্যর্থ হয় না কোনো শ্বেত বা কৃষ্ণ নিদ্রায়, রাত্রির দ্বারা কিছুই গ্রাসিত হয় না, উচ্চ স্বর্গরাজিতে কিছুই বিস্ফোরিত হয় না, সব-কিছু পরিসমাপ্ত এক পরিপূর্ণ বৃত্তের মধ্যে। অধিরোহী আনন্দই অবরোহী আনন্দ:

সুষুপ্তির গভীর-তার মাঝে বিজয়ের উল্লাস,
হৃদয় হর্ষময় যন্ত্রণাময় জগতের মাঝে।[২৭]

আমাদের শীর্ষের ঊর্ধ্বে এক নিষ্ফল আনন্দের পরিবর্তে, আমাদের শিরাপ্রশিরায় প্রবাহিত হয় এক ফলপ্রসূ আনন্দ, এক শক্তিশালী উদ্ভাসন:

সর্বক্ষম শক্তি রুদ্ধ প্রকৃতির জীবকোষে।[২৮]

কারণ, অতিমানস এক অধিকতর বায়বীয় চেতনা নয়, বরং আরও ঘনত্ব পূর্ণ; এ সেই স্পন্দন যা অন্তহীনভাবে জড়ত্বকে ও সকল বিশ্বকে গঠিত ও পুনর্গঠিত করে, এই স্পন্দনই পৃথিবীকে পরিবর্তিত করতে পারে।

শ্রীমা বলেছেন, *অচেতনার নিম্নতম ভূমিতে— যা কঠিনতম, দৃঢ়তম,*

সংকীর্ণতম ও অধিকতম শ্বাসরোধকারী— আমি সহসা আবিষ্কার করলাম এক অতি শক্তিশালী নির্ঝর; তা আমাকে তৎক্ষণাৎ নিক্ষিপ্ত করল এক নিরাকার সীমাহীন বিশালতার মধ্যে, যা নতুন বিশ্বের সম্ভাবনারাজিতে স্পন্দনশীল।

এই হলো রূপান্তরের সমাধান সূত্র, জড়তত্ত্বে নিহিত চেতনার সাহায্যে জড়তত্ত্বের নিয়মাবলীর উপর বিজয়প্রাপ্তির সমাধান সূত্র; অধিরোহী চেতনাই অবরোহী চেতনা— দু হাজার বছর পূর্বে বিভিন্ন শাস্ত্রে যে ভবিষ্যৎ জগৎ ও নতুন পৃথিবী ঘোষিত হয়েছিল, এ তারই দ্বারদেশ: "এক নতুন পৃথিবী যেখানে সত্য নিবাস করবে" (২পিটার ৩/১৩)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীই আমাদের মুক্তি, পৃথিবীই বিজয়ের ক্ষেত্র, পূর্ণ সিদ্ধিব ক্ষেত্র। স্বর্গসমূহে পালিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, সবই এখানে বিদ্যমান, সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান, এক শরীরের মধ্যে —পরম আনন্দ, চেতনা শক্তি— যদি আমাদের সাহস থাকে, আমাদের দৃষ্টি উন্মীলিত করবার জন্য, অবতরণ করবার জন্য, নিদ্রিত স্বপ্নের পরিবর্তে এক জীবন্ত স্বপ্ন দেখবার জন্য:

সর্বশেষ সসীমতার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতে হবে, যদি তারা চায় সর্বশেষ অসীমতায় উপনীত হতে।[২৯]

সেই একই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ পুনরুদ্ধার করছিলেন সেই হৃত রহস্যকে যা ছিল বেদে এবং যা ছিল ন্যূনাধিক বিকৃতিপ্রাপ্ত পরম্পরার মধ্যে, যেসব পরম্পরা পরিক্রম করেছিল ইরান থেকে মধ্য আমেরিকা ও রাইন নদীর তীর পর্যন্ত, ইলিউসিস থেকে ক্যাথার্স পর্যন্ত এবং রাউন্ডটেব্‌ল্[†] থেকে অ্যাল্‌কেমিস্ট্‌দের পর্যন্ত— পূর্ণতার সকল অন্বেষীর *রহস্য*। এ হলো গিরিগুহার মধ্যে ঐশ্বর্যের সন্ধান, এ হলো যুদ্ধ অবচেতন শক্তিদের বিরুদ্ধে, রাক্ষস, বামন ও সর্পের বিরুদ্ধে: এ হলো অ্যাপোলো ও পাইথন (সূর্যদেব ও অজগর), ইন্দ্র ও বৃত্রসর্প, থর ও দৈত্যসমূহ, সিগার্ড ও ফ্যাফ্‌নারের কাহিনী। এ হলো মায়াদের[††] সৌররহস্য, অর্‌ফিউস্[†††]-এর অবতরণ, এই হলো তত্ত্বান্তর[††††]। এই হলো সর্পের স্বপুচ্ছ-দংশন। এবং সর্বোপরি, এ হলো রহস্য বৈদিক ঋষিগণের, যাঁরা সম্ভবত প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, যা তাঁদের ভাষায় ছিল "মহান্ পথ", *মহঃ পথঃ* (ঋগ্‌বেদ, ২.২৪.৬), "অখণ্ড আলোকের" জগৎ *স্বঃ*, নিশ্চেতনের অশ্মের মধ্যে আমাদের

[†] উপকথা-বর্ণিত, ব্রিটনদের রাজা আর্থার ও তাঁর নাইট্ (knight)-দের ব্যবহৃত গোল টেব্‌ল্।

[††] Maya: মধ্য আমেরিকার (মুখ্যত মেক্সিকো ও য়ুকাটিন্-এব)প্রাচীন সভ্যজাতি, যে সভ্যতা এখন লুপ্ত।

[†††] গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন সংগীতজ্ঞ ও কবি।

[††††] Transmutation

পিতৃগণ তাঁদের শব্দের দ্বারা শক্ত ও দৃঢ়স্থানগুলোকে ভগ্ন করেছেন; অঙ্গিরস* ঋষিগণ তাদের উচ্চৈঃস্বরে পার্বত্য অশ্মকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন; আমাদের মধ্যে তাঁরা এক পথ নির্মাণ করেছেন মহান্ স্বর্গে যাওয়ার জন্য, তাঁরা আবিষ্কার করেছেন অহঃ ও সূর্যলোক, "(ঋগ্‌বেদ ১.৭১.২); তাঁরা আবিষ্কার করেছেন "অন্ধকার-নিবাসী সূর্যকে" (৩.৩৯.৫)। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন "অনন্ত অশ্মের মধ্যে বিহঙ্গশিশুর মতো, গোপন গুহার মধ্যে গুপ্ত স্বর্গীয় সম্পদ" (১.১৩০.৩)।

আলো ও ছায়া, ভালো ও মন্দ, জড়তত্ত্বের মধ্যে এক দিব্যজন্মের প্রস্তুতি করছিল: "দিবা ও রাত্রি, উভয়ে দিব্যশিশুকে স্তন্যদান করেন"।[৩০] কিছুই অভিশপ্ত নয়, কিছুই বৃথা নয়; রাত্রি ও দিবা "ভগ্নীদ্বয়, মৃত্যুহীন, যাদের একজনই অভিন্ন প্রেমিক (সূর্য)... উভয়েই সদৃশ, যদিও দুজনেই ভিন্ন" (ঋগ্‌বেদ, ১.১১৩.২,৩)। অধিরোহণ ও অবরোহণের "তীর্থযাত্রার" শেষে, সাধক হন "জননীদ্বয়ের পুত্র" (৩.৫৫.৭), তিনি *অদিতির* পুত্র, যে অদিতি অতিচেতন অসীমের শ্বেতমাতৃকা**; তিনি কৃষ্ণ অসীমের পার্থিব জননী *দিতিরও* পুত্র। তিনি প্রাপ্ত হন "জন্মদ্বয়", মানবীয় ও দিব্য, "শাশ্বত, ও একই নীড়ে... তাঁর পত্নীদ্বয়ের উপভোক্তারূপে" (ঋগ্‌বেদ ১.৬২.৭)। "পরম জন্মের জন্য সম্মুখে সমাগত, সম্ভাবনাপূর্ণ পর্বতের*** সকল আধেয়... এক দেবতা উন্মুক্ত করলেন সকল মানবীয় দ্বার" (ঋগ্‌বেদ ৫.৪৫)। "তারপর, তাঁরা সত্যই জাগ্রত হলেন, এবং নিজের পশ্চাতে ও চতুর্দিকে সব অবলোকন করলেন, তারপর তাঁরা সত্যই স্বর্লোকে অনুভূত চরমানন্দকে ধারণ করলেন। দ্বারযুক্ত সকল ভবনে**** অবস্থিত হলেন দেবগণ। (ঋগ্‌বেদ, ৪.১.১৮)।

মানুষের আশা পরিপূর্ণ হয়েছে, যেমন হয়েছে ঋষির প্রার্থনা: "স্বর্গ ও পৃথিবী সমান ও এক হোক।"[৩১] মহৎ সমত্বের পুনরুদ্ধার হলো।

স্বর্গ তার হর্ষে দেখে স্বপ্ন পূর্ণ পৃথিবীর,
পৃথ্বী তার দুঃখে দেখে স্বপ্ন পূর্ণ স্বর্গের...
তাদের ঐক্য হতে তারা দূরে মুগ্ধ ভয়ের তরে।[৩২]

এই তো আনন্দ। তা বিদ্যমান সকল বস্তুর প্রারম্ভে এবং শেষে, এবং সর্বত্র, যদি আমরা যথেষ্ট গভীরভাবে অন্বেষণ করি। এ হলো "অশ্ম-দ্বারা আবৃত মধু-নিঃসারী উৎস" (ঋগ্‌বেদ, ২.২৪.৪)।

---

* প্রথম ঋষিগণ

** এই প্রাচীন পরম্পরা হিব্রুদেরও জ্ঞাত ছিল, এবং তা পুনর্বার আক্ষরিকরূপেই গৃহীত হয়েছে ভার্জিন মেরীর 'নিষ্পাপ মাতৃত্বের' প্রসঙ্গে।

*** জড় নিশ্চেতন।

**** আমাদের সত্তার সকল ভূমিতে বা চেতনা সকল কেন্দ্রে।

১৫

অতিমানস চেতনা

মানসিক পরিভাষায় অতিমানস চেতনার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, কারণ তাৎপর্য অনুসারে এ অ-মানসিক, এবং আমাদের সকল ত্রি-মাত্রিক নিয়ম ও পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করে। বোধ হয়, শব্দটিই যথার্থ অর্থ বোঝায় না : এ মানবীয় চেতনার শীর্ষদেশ নয়, বরং অন্য এক চেতনা। এর এক মোটামুটি বর্ণনা দেওয়ার জন্য আমরা প্রয়াস করতে পারি, এর দুটি দিকের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে, একটি চেতনা বা দৃষ্টি, অন্যটি শক্তি, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা মনের ফাঁদে ধরা পড়ে গেছি, কারণ এই দুটি দিক্ অবিচ্ছেদ্য, এই চেতনাই শক্তি, এ এক সক্রিয় দৃষ্টি। প্রায়ই, যখন শ্রীঅরবিন্দ বা শ্রীমা চেষ্টা করেছেন তাঁদের অনুভূতির বর্ণনার জন্য, আমরা শুনেছি তাঁদের মন্তব্য একে অন্যের প্রতিধ্বনি করতে, ইংরেজিতে এবং ফরাসিতে : আরেক ভাষার প্রয়োজন, *অন্য এক ভাষা*।

অতিমানস দৃষ্টি

অতিমানস দৃষ্টি এক বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি। ছোটো ছোটো ভগ্নাংশে বিভক্ত করে একেকে অন্যের বিরুদ্ধে তুলে ধরে মন; অধিমানস একটি একক আলোকরশ্মিতে

সব-কিছুকে সংযুক্ত করে, কিন্তু এর রশ্মি শুধু একটি বিন্দুতেই শেষ হয় এবং এ সব-কিছুকে দেখে নিজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে; এ একাত্মক ও বিশ্বজনীন, অন্য সব দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দেয় এ, বা তাদের অনুবদ্ধ করে। বস্তুসকলের তথা সত্তাসমূহের সমগ্র জগৎকে অতিমানস একটি একক দৃষ্টিতে দেখে, যা সকল রশ্মিকে একত্রীভূত কবে, পাবস্পরিক কোনো বিরোধিতা ব্যতীত, কিন্তু শুধু তাই নয়, প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক সত্তা, প্রত্যেক শক্তির দৃষ্টিভঙ্গিকেও এ দেখে। এ এক সামগ্রিক দৃষ্টি যা শেষ হয় না কোনো কেন্দ্রবিন্দুতে, ববং অগণিত বিন্দুতে :

এক অথচ অসংখ্য দৃষ্টি...[১]

অতিমানস সত্তা বস্তুসকলকে এভাবে দেখেন না যে, তারা বর্তমানের তথ্যাবলী ও ঘটনাবলীর অরণ্যদ্বাবা বেষ্টিত স্তরসমূহে অবস্থিত, তিনি তাদেব ঊর্ধ্ব হতে দেখেন, বাইরে থেকে দেখেন না, কিংবা অগভীরভাবে বিচার করেন না, বরং তাদের দেখেন ভিতর থেকে, এবং তাদের কেন্দ্রগত সত্য দিয়ে তাদেব বিচার করেন।[২] সেজন্য, আমরা অতিমানসের বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারব না, যদি না আমরা অবিরত-ভাবে অন্য এক পরিসবের কথা মনে রাখি। কিন্তু এ কথা আমরা বুঝতে পারি যে, এ হলো প্রজ্ঞারই দৃষ্টি, কারণ প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক সত্তা, প্রত্যেক শক্তি এখানে নিম্নভূমিতে উপনীত হয় এক পরম অভিব্যক্তিতে, যা সে করে ন্যূনাধিক ত্রুটিপূর্ণভাবে, এবং অনেক সময়ই যথেষ্ট বিকৃতভাবে, কিন্তু এইসব ত্রুটি ও বিকৃতির মধ্য দিয়ে এক অন্তরঙ্গ নিয়ম মেনে চলে, যা তাকে প্রেরিত করে তার সত্তার এই অনন্য সত্যের প্রতি— যে কোনো বৃক্ষের প্রত্যেকটি পত্রই অনন্য। আমাদের প্রত্যেকের কেন্দ্রে এই 'পরম' না থাকলে, আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব। এবং সেই কারণেই আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা ও ভ্রমের প্রতি আসক্ত, কারণ আমরা অনুভব করতে পারি যে, সত্য তাদের পশ্চাতে আছে ও তাদের অন্তরালে অভিবৃদ্ধি লাভ করছে, ঠিক যেন এইসব ক্ষুদ্রতা এবং এইসব পদস্খলনের দ্বারাই তা *সুরক্ষিত*[৩], যা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। আমরা যদি সমগ্র সত্যকে একবারেই ধরতে পারতাম, তা হলে আমাদের এখনকার স্তর অনুসারে, বামনে পরিণত হতাম। চিন্তন বা ভালো কর্মের সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই— যদিও সেগুলো পথের সোপান— সত্যের সম্পর্ক সত্তার প্রসারের সঙ্গে, এবং আমাদের অভিবৃদ্ধি ধীর ও কষ্টপ্রদ। *তারা চিৎকার করে, "ভ্রান্তি, মিথ্যা, পদস্খলন!" কত উজ্জ্বল ও সুন্দর তোমার ভ্রান্তিগুলি, হে প্রভু! তোমার মিথ্যাগুলো সত্যকে জীবন্তভাবে রক্ষা করে: তোমার পদস্খলনে জগৎ ত্রুটিহীন হয়।*[৪] কিন্তু মন বস্তুসমূহের বর্তমানের উপরিভাগ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখে না, যা-কিছু বাইরে বেড়ে থাকে, তাকে কেটে ফেলতে চায়, শূন্যতার মাধ্যমে বিশুদ্ধ করে, এবং

তার জগৎকে পর্যবসিত করে এক একবিধ, ন্যায়পরায়ণ সত্যে, যা হবে যথাযথ ও উপযোগী। এ নির্ণয় প্রদান করে, "এ ভালো, সে মন্দ, এ এক বন্ধু, সে এক শত্রু"। সে হয়তো চাইতে পারে জগৎ হতে সকল নাজিদের[†] বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য, কিংবা উদাহরণস্বরূপ, সকল চৈনিকদের, এই মনে করে যে তারা এক অপ্রয়োজনীয় বিপদ্। এবং সংজ্ঞা অনুযায়ী, এ যথার্থ, কারণ মন যুক্তিসিদ্ধ হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট, ও ব্যক্ত করে এক মানসিক বা নৈতিক চরম সত্য, যার এক নিজস্ব স্থান ও উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা *একটি* দৃষ্টিভঙ্গি*। এবং এই কারণেই আমাদের শক্তির অভাব, কারণ যদি আমাদের শক্তি থাকত, তা হলে আমরা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তার অপচয় করতাম ভয়ংকর বিশৃঙ্খল ভাবে, অজ্ঞানতা ও অদূরদৃষ্টির মাধ্যমে। আমাদের দুর্বলতাগুলো প্রয়োজনীয় দুর্বলতা। অতিমানস চেতনা শুধু যে সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকার করে তাই নয়, প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে ক্রিয়ারত গভীরতর শক্তিগুলোকে ও প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকেও অধিকার করে— এ এক *সত্যচেতনা*— এবং যেহেতু এ সব-কিছু দেখে, এর *শক্তি* আছে; একটি হতে অন্যটি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে আসে। যদি আমরা শক্তিহীন, তার কারণ আমরা দৃষ্টিহীন। দেখতে পাওয়া ও সামগ্রিকভাবে দেখতে পাওয়ার অর্থই হলো শক্তিধারণ করা। কিন্তু অতিমানস শক্তি মানে না আমাদের যুক্তি বা নৈতিকতা, দৃষ্টি তার বহুদূর— স্থানে ও সময়ে। ভালোর রক্ষার্থে এ মন্দকে ছেঁটে ফেলতে চায় না, কিংবা অলৌকিকতার মধ্য দিয়ে সে কাজ করে না : মন্দের মধ্যে যে ভালো আছে তাকে সে মুক্ত করে নেয়; বস্তুর অন্ধকার অর্ধের উপর তার শক্তি ও আলোকের প্রয়োগ করে। যেন তারা তাদের জ্যোতির্ময় অর্ধকে স্বীকার করে। যেখানেই সে নিজেকে প্রয়োগ করে, তার প্রথম অব্যবহিত ফল হলো এক সংকটকে স্পর্শ করা, অর্থাৎ ছায়াকে আলোকে সম্মুখে উপস্থাপিত করা। এ এক বিস্ময়কর বিবর্তনীয় আলোড়ন।

শ্রীঅরবিন্দ-রচিত গ্রন্থাবলী যদিও এক অতিমানস সত্যের মানসিক ভাষান্তর, তা এই সামগ্রিক দৃষ্টির এক ব্যবহারিক উদাহরণ। এটা অনেকের কাছেই হতাশাব্যঞ্জক, কারণ একটি চিন্তনের সহজবোধ্য হওয়ার জন্য যেসব দৃষ্টিকোণের

---

† Nazis

* আমাদের বলা হবে, আমাদের পক্ষপাতিত্ব, আমাদের মন ও আমাদের নৈতিকতা আজকের পৃথিবীতে চলবার জন্য অপরিহার্য যন্ত্র, এবং তা স্পষ্ট। আমাদের পক্ষপাত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এবং সেই কারণেই জগৎ সম্পূর্ণ নয়। আমরা এই সত্যকে দৃষ্টির অগোচর করব না যে, এসবই হলো মধ্যবর্তী-কালীন যন্ত্র, এবং আমাদের উদ্দেশ্য রাখা উচিত, এই সব *সাময়িক ব্যবস্থাগুলোকে*[৫]— শ্রীঅরবিন্দ তাদের যা অভিহিত করেছেন— প্রতিস্থাপিত করা এক চেতনার দ্বারা যা এক দৃষ্টি, এক শক্তি।

প্রয়োজন তা এতে নেই— মতবাদ তৈরি করা কত সহজ। শ্রীঅরবিন্দ আক্ষরিকভাবে প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আলোচনা করে তার গভীরতর সত্যের নিষ্কর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু কখনো নিজের মতবাদ ন্যস্ত করেন নি (কারণ, বোধ হয়, তাঁর নিজস্ব কোনো মতবাদ ছিল না, অথবা সবই ছিল তাঁর মতবাদ); তিনি শুধু দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে প্রত্যেক সত্যই সম্পূর্ণ *সকল জ্ঞানের অভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু সত্যের বিরুদ্ধে সত্যকে প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে কে স্থায়ী হয়ে বিদ্যমান থাকবে তা দেখে না, বরং সত্যকে সত্যের দ্বারা পূর্ণ করে, এক পরম সত্যের আলোকে, সকল সত্য যার বিভিন্ন দিক্।*[৬] এবং তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল *এক চিন্তন যা নিজের মধ্যে বহন করে তার নিজের বিপরীত।*[৭] এই হলো যা শ্রীমার ভাষায় *"গোলকাকার চিন্তন"*[†] আমরা যখন শ্রীঅরবিন্দের কথা বলি, তখন নিজেকে মনে হয় ভয়ংকরভাবে মতান্ধ ও নিয়মাবদ্ধ; তার কারণ, সম্ভবত, ভাষার অপর্যাপ্ততা, যা তার আলোকপাত করে একটি বিন্দুর উপর, অন্য কোনো বিন্দুর উপর না করে, এবং গভীর ছায়াপাত করে অন্যত্র; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সব-কিছুই গ্রহণ করেন, কোনো প্রকার "সহনশীলতার" জন্য নয়, যা এক মানসিক প্রতিকল্প একত্বের; বরং তিনি গ্রহণ করেন এক অখণ্ড দৃষ্টির দ্বারা, যা সত্যই প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে *এক*, প্রত্যেক বস্তুর হৃদয়ে বিদ্যমান। বোধ হয় এই হলো *প্রেমের* দৃষ্টি?

এই অখণ্ড দৃষ্টি এতই বাস্তব যে, জড়জগতের দৃশ্যও অতিমানস চেতনার নিকট পরিবর্তিত হয়ে যায়, অথবা তা পরিবর্তিত হয় না, বরং জগৎই দেখা যায় যেমন তা প্রকৃতপক্ষে। আমরা যে দৃষ্টি-বিভ্রমে বাস করি তা মিলিয়ে যায়: লাঠিটি আর ভাঙা নেই, সব-কিছু একীভূত হয়ে গেছে— আমরা যেমন দেখি জগৎ তা নয়: *অতিমানস সংজ্ঞানের নিকট কিছুই প্রকৃতপক্ষে সসীম নয়; সকলের মধ্যে প্রত্যেক ও প্রত্যেকের মধ্যে সকল, এই অনুভূতির উপর তা প্রতিষ্ঠিত। এর অনুভবগত সংজ্ঞা সীমিততার প্রাচীর সৃষ্টি করে না: এ এক মহাসাগরের মতো, মহাকাশের মতো সংজ্ঞান, যার মধ্যে সকল নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও সংবেদন হলো একটি তরঙ্গ, অথবা গতি, অথবা কণিকা, অথবা বিন্দু, যা একই সময়ে সমগ্র মহাসাগরের সান্দ্র রূপ এবং মহাসাগর হতে অবিচ্ছেদ্য। মনে হয় যেন, কবির ও শিল্পীর দৃষ্টি স্থান গ্রহণ করেছে স্বাভাবিক দৃষ্টির, যা অনির্দিষ্ট বা তুচ্ছ, যা দেখতে পায় না; বরং এ এক অনন্য আধ্যাত্মিক ও মহিমান্বিত দৃষ্টি —প্রকৃতই যেন এ পরম কবি ও শিল্পীর দৃষ্টি, যেখানে আমরাই অংশগ্রহণ করছি, যেখানে আমাদের পূর্ণভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর সত্য ও উদ্দেশ্য এই বিশ্বের ও বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর পরিকল্পনায়; সেখানে আছে এক অসীম তীব্রতা,*

[†] thinking spherically

যা দৃষ্ট সব-কিছুকে করে দেয় উৎকর্ষ, ধারণা, রূপ ও বর্ণের মহিমার এক প্রকাশ। তখন মনে হয়, আমাদের স্থূল চক্ষু নিজের মধ্যে বহন করে এক আত্মা, এক চেতনা, যা শুধু বস্তুর জড় দিক্‌টিকে যে দেখে তাই নয়, বরং আরও দেখে সেখানে নিহিত উৎকর্ষময় আত্মাটিকে, শক্তিময় স্পন্দনটিকে, যে আলোক শক্তি ও আধ্যাত্মিক উপাদানে তা গঠিত, তাকে। সেই একই সময়ে, এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন অনুভূত হয়, যা সকল দৃশ্য বস্তুকে এক প্রকার চতুর্থ মাত্রায় দেখায়, যার বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণতা; এ শুধু বহির্ভাগের বা বাহ্যরূপের দেখা নয়, বরং যা-কিছু তার রূপ গঠন করে ও সূক্ষ্মভাবে তার চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে, তাকেই দেখা। এই দৃষ্টিতে দৃষ্ট জড়বস্তু, আমরা এখন যা দেখি তা থেকে ভিন্ন হয়ে যায়; অবশিষ্ট প্রকৃতির পটভূমিতে বা পরিবেশে একটি পৃথক বস্তু তা নয়, বরং আমরা যা-কিছু দেখি তাদের একত্বের এক অবিভাজ্য অংশ, এবং সূক্ষ্মভাবে তারই এক প্রকাশ তা। এবং এই একত্ব হলো শাশ্বতের অভিন্নতা, ব্রহ্মের একত্ব। কারণ অতিমানসিক দৃষ্টিতে জড়জগৎ ও মহাকাশ ও জড়বস্তু আর জড় হয়ে থাকে না, যে অর্থে আমরা এখন বুঝি, শুধুমাত্র আমাদের সীমিত স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহের সাক্ষ্যের জোরে। তারা প্রতীত হয়, দৃষ্ট হয় আত্মা-রূপে, তারই স্বরূপে ও সচেতন বিস্তৃতিতে।[৮]

গোলক-আকার দৃষ্টি, অখণ্ড দৃষ্টি, এবং শাশ্বত দৃষ্টিও। সময় বিজিত। অধিমানস চেতনা দেখে "স্থান ও কালের বিশাল বিস্তৃতিকে", অতিমানস ত্রিকালকে একীভূত করে; *এ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে সংযুক্ত করে তাদের অবিভাজ্য যোগাযোগ দ্বারা, জ্ঞানের এক অবিচ্ছিন্ন মানচিত্রে, পাশাপাশি।*[*৯]

সকল সময় একটি শরীর, ব্যাপ্তি গ্রন্থ এক।[১০]

চেতনা আর নয় এক দ্বার, যার সংকীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, কারণ সংকীর্ণতা তাকে বিস্ফোরিত হওয়া থেকে রক্ষা করত; এ এক মহান্ প্রশান্ত দৃষ্টি : ঋগ্‌বেদের বাণী, "স্বর্লোকে বিস্তৃত চক্ষু সম" (১.১৭.২১)। শ্রীমা বলছেন, *সাধারণ ব্যক্তিচেতনা একটি অক্ষের মতো, এবং সব-কিছুই সেই অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। যদি তা স্থানচ্যুত হয়, আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই। এ এক বৃহৎ অক্ষের*

---

* আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে এক আকর্ষক তুলনা করা যেতে পারে। আইন্‌স্টাইনের মতে, আলোকের গতিবেগের যত নিকটতর আমরা হই, সময় তত ধীর হয় ও দূরত্ব কমে যায়। আলোকের গতিবেগে, আমাদের ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়, ও আমাদের মাপার ফিতেও সংকুচিত হয়ে শূন্য হয়ে যায়। অতিমানস স্বয়ং আলোক, এবং তা সময়ের উপর বিজয়ও। পদার্থবিজ্ঞানীদের আলোকের সঙ্গে ঋষির আলোকের পার্থক্য, বোধহয়, আমরা যা ভাবি তার চেয়েও কম।

মতো (বৃহৎ হোক, বা ন্যূনতরভাবে বৃহৎ হোক, এ অত্যন্ত ক্ষুদ্রও হতে পারে) যা সময়ের মধ্যে স্থাপিত, এবং সব-কিছুই তার চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হয়। চেতনা প্রসারিত হতে পারে ন্যূনাধিক, ন্যূনাধিক উচ্চ হতে পারে। ন্যূনাধিক শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু তা অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। এবং আমার জন্য, আর কোনো অক্ষ নেই— তা চলে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে! সেজন্য চেতনা যেতে পারে উত্তরে, যেতে পারে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে; তা যেতে পারে সম্মুখে, পশ্চাতে, যে কোনো স্থানে। আর কোনো অক্ষ নেই।

এই বিশ্বজনীন ব্যক্তির দৃষ্টি কেমন হতে পারে তা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। আমাদের মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এ কথা ভাবতে প্রলুব্ধ হতে পারি যে, ত্রিকালের পূর্ণজ্ঞান তৎক্ষণাৎ দূর করে দেয় অস্তিত্বের সকল অননুমেয়ত্ব। কিন্তু তা হলো মনের উপযোগী নিয়ম ও প্রতিক্রিয়া অতিমানস চেতনার উপর প্রয়োগ করা। জগৎকে দেখবার তথা *অনুভব করবার* পথটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা যেভাবে থাকি ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্‌বিগ্ন হয়ে, অতিমানস চেতনা সেভাবে থাকে না। তার দৃষ্টিতে সব-কিছুই উন্মুক্ত, কিন্তু সে দিব্যভাবে সময় যাপন করে : সময়ের *প্রত্যেক মুহূর্ত* পরম, সম্পূর্ণ, সকল সহস্রাব্দের সমষ্টির মতো সমগ্র। বিপরীতভাবে, এ হলো সময়ের সম্পূর্ণ পূর্ণতা : সাধারণ জীবনে আমবা কখনো বর্তমান মুহূর্তে বাস করি না। আমরা হয় সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হই, অথবা পিছনে আকর্ষিত হই, আমাদের আশা কিংবা আমাদের অনুতাপের জন্য, কারণ বর্তমান মুহূর্ত কখনো তা নয় যা হওয়া উচিত, তার সবসময় কোনো কিছুর অভাব থাকে, তা ভয়ংকরভাবে শূন্য। অপরপক্ষে, অতিমানস চেতনার নিকট, প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক মুহূর্তে যা হওয়া উচিত ও যেমন হওয়া উচিত, পূর্ণরূপে তাই। এ শাশ্বত অপরিবর্তনীয় আনন্দ। মহাজাগতিক চলচ্চিত্রের প্রতিটি ক্রম, প্রতিটি চিত্র পরিপূর্ণ থাকে সকল বিগত চিত্রে ও সকল আগামী চিত্রে, তা অভাবী হয় না ভবিষ্যতের অনুপস্থিতিতে বা অন্তর্হিত অতীতের জন্য— ঋগ্‌বেদের বাণী : "সেই আনন্দ যা বৃহত্তম, পূর্ণতম এবং নিশ্ছিদ্র" (৫.৬২.৯)। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, সেই *অনাহত আনন্দ*[১১]। ব্যাপ্তি-স্থানেরও এ পূর্ণ পূর্ণতা : আমরা সবসময়ই নতুন বস্তুর ও নতুন বিষয়ের সন্ধানে থাকি, কারণ প্রত্যেক বস্তু অভাববোধ করে অন্য সকল বস্তুর যা সে নয়— আমাদের বস্তুগুলোও আমাদের মুহূর্তগুলোর মতোই শূন্য। ঠিক এর বিপরীত; প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক বস্তু যা অতিমানস চেতনা স্পর্শ করে তা হয়ে ওঠে সমগ্রতায় এত পূর্ণ, এত অসীম, যেন তা সুবিস্তৃতিময় দৃষ্টি, অথবা সকল সম্ভব বস্তুর সমষ্টি : *পরম সর্বত্র বিদ্যমান, প্রতিটি সসীম বস্তুই অসীম।*[১২] এবং রয়েছে এক চিরনবীন বিস্ময়ের বোধ, যা কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা হতে আসে না, আসে এই শাশ্বত অনন্তের, এই সময়াতীত পরমের আবিষ্কার হতে, যা নিহিত প্রত্যেক স্থানাবদ্ধ বস্তুতে, সময়ের

প্রত্যেক ভগ্নাংশে। এই হলো জীবনের সম্পূর্ণ পূর্ণতা, কারণ আমাদের সসীম সময়াবদ্ধ জীবন পূর্ণ নয়, তা ভয়ংকরভাবে অভাববোধ যুক্ত : আমরা বাধ্য, সময়াবদ্ধকে পরিত্যাগ করতে সময়াতীতের আবিষ্কারের জন্য, কিংবা সসীমের উপভোগের জন্য অসীমের প্রতি আমাদের প্রয়োজনবোধকে ত্যাগ করতে। সেক্ষেত্রে, অতিমানসিক পূর্ণতা আবিষ্কার করে সসীমের মধ্যে অসীমকে, সময়াবদ্ধের মধ্যে সময়াতীতকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক মুহূর্ত হতে পরবর্তী মুহূর্তে এ বিদ্যমান; এ বিদ্যমান প্রত্যেক ক্ষণে প্রত্যেক বস্তুতে, এবং যে বিশালতা ধারণ করে সকল ক্ষণকে, সকল বস্তুকে, তারও মধ্যে এ বিদ্যমান। একই বস্তুকে উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করবার এ হলো দুটো *সমকালীন* পন্থা।

অতিমানস চেতনার যে শুধু এক মহাজাগতিক অবস্থান আছে, তাই নয়, বরং আছে এক বিশ্বাতীত অবস্থান, এবং উভয় পরস্পরের বিরোধী নয়। শুধু যে তারা পরস্পরকে বিরোধ করে না, তাই নয়, তাদের সমকালীনত্ব প্রকৃত জীবনের প্রকৃত সমাধান। কারণ জীবন দুঃখপূর্ণ, শুধু তার শূন্যগর্ভ বস্তু ও ভগ্ন মুহূর্তের জন্য নয়, বরং তার অভাব আছে প্রশান্তির ও দৃঢ়তার। মানুষের মধ্যে এই মূল প্রয়োজন হতেই উদ্‌ভূত হয়েছে সকল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা : আবিষ্কার করবার জন্য এক চিরস্থায়ী আধার, এক শান্তির আশ্রয়, জগতের এই সব বিশৃঙ্খলার বাইরে, জগতের অস্থায়িত্বের বাইরে, জগতের এই যন্ত্রণার বাইরে, সবসময়ের জন্য বাইরে, সুরক্ষিত। তারপর হঠাৎ, আমাদের সাধনার পথে, আমরা আবির্ভূত হই এক বিশাল নীরবতার মধ্যে, জগতের বাইরে এক বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে, এবং আমরা বলি "ভগবান্", "পরম", "নির্বাণ"— শব্দের কোনো গুরুত্ব নেই : আমরা উপনীত হয়েছি পরম মুক্তিতে। এ এক মূল অনুভব। এই মহান্ নীরবতার সামান্য নিকটেও কখনো আমরা উপনীত হই, তা হলে সব-কিছু পরিবর্তিত হয়ে যায় : আমরা পাই নিশ্চয়তা, প্রশান্তি, জাহাজডুবির লোকের মতো, যে জড়িয়ে ধরে পাহাড়। জীবনের সব-কিছুই আমাদের হাত থেকে চলে যায়; শুধু যায় না এই পাহাড় কখনো। সেজন্যই বলা হয় যে, ভগবানের রাজ্য এই জগতের নয়। শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতিও শুরু হয়েছিল নির্বাণের সঙ্গে, কিন্তু তার পরিসমাপ্তি হলো জগতের সম্পূর্ণতার সঙ্গে। এই হলো এক প্রধান বিরোধাভাস, যা আমাদের হৃদয়ংগম করা উচিত যদি আমরা জানতে চাই প্রকৃত জীবনের ব্যবহারিক নিগূঢ় সূত্র।

মন, এমন-কি আমাদের ধর্মগুরুদের অধিমানসও, দ্বৈতবোধের সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে তা অসংশোধনীয় (একত্বের মধ্যে দ্বৈতবোধ) : যদি ঈশ্বর ঊর্ধ্বে আছেন, তিনি নিম্নে নেই; এ যদি সাদা, তা হলে এ কালো নয়। অতিমানস অনুভূতিতে সব-কিছু বৃত্তাকার। শ্রীমা বলছেন : *একই সঙ্গে, এ সবসময় হ্যাঁ ও না*; প্রত্যেক বস্তুর মেরুদ্বয় শাশ্বতভাবে সংযুক্ত, অন্য এক "পরিসরে' (বৈদিক ঋষি বলছেন, "গূঢ় আন্তর ব্যাপ্তিস্থান-সমূহ", ঋগ্‌বেদ, ২.৪.৯)। সুতরাং

বিশ্বাতীত নেই অন্য কোথাও, জগতের বাইরে; তিনি সর্বত্র বিরাজমান, একই সময়ে পূর্ণভাবে অন্তরে ও পূর্ণভাবে বাইরে। একই ভাবে, অতিমানস চেতনা সম্পূর্ণ জগতের মধ্যে ও সম্পূর্ণভাবে জগতের বাইরে। তিনি আছেন শাশ্বত নীরবতায় এবং সকল আলোড়নের মধ্যে। তিনি আসীন এক অনমনীয় পর্বতের উপর, এবং একই সময়ে স্রোতের হৃৎকেন্দ্রে। সেই কারণে তিনি জীবনকে প্রকৃতই উপভোগ করতে পারেন ও হতে পারেন তার নিয়ন্ত্রক। কারণ আমরা যদি শুধুই স্রোতে ভাসি, তা হলে আমরা শান্তিও পাই না, নিয়ন্ত্রণও লাভ করি না : আমরা ভেসে যাই একটি তৃণগুচ্ছের মতো। এই অতিমানস অনুভূতির একটি অস্পষ্ট সূচনা আমরা পেতে পারি, যদি আমরা শুধু ফিরে যাই আমাদের যোগসাধনার প্রারম্ভিক ছোটো ছোটো অনুভূতিগুলিতে। বাস্তবিক, আমরা অতি শীঘ্রই উপলব্ধি করেছিলাম যে আমাদের চেতনার পশ্চাতে শুধু একটি পদক্ষেপ নিয়ে, পিছনে সামান্য গতি করলেই, আমরা অন্তরালে এক নীরবতার বিস্তৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হই, যেন আমাদের সত্তায় একটি কোণ আছে, যেখানে আমাদের দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ সুদূর উত্তরের তুষারশুভ্রতার প্রতি। বাইরে কোলাহল, দুঃখকষ্ট, সমস্যা, তারপর আমরা কিছু সামান্য অন্তর্মুখী গতি করি, যেমন দরজার চৌকাঠ পার হওয়া, এবং হঠাৎ আমরা চলে যাই বাইরে (কিংবা অন্তরে ?), এক হাজার মাইল দূরে, এবং কোনো কিছুই আর গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা শায়িত বরফের কোমল মখমলের উপর। ঘটনাক্রমে, অনুভূতিটি এত সহজ হয়ে যায় (যদি তা বলা যেতে পারে) যে, ঠিক ঘোর কার্যমগ্নতার মধ্যে, রাস্তায়, আলোচনার মধ্যে, কর্মস্থলে, আমরা ঝাঁপ দিই অন্তরে (কিংবা বাইরে ?), এবং কিছুই থাকে না, শুধু এক স্মিতহাস্য ব্যতীত— এর জন্য প্রয়োজন হয় মুহূর্তাংশ। তখন আমরা শান্তি উপলব্ধি করতে আরম্ভ করি। সর্বত্র বিদ্যমান আমাদের জন্য এক অভেদ্য আশ্রয়, সকল পরিস্থিতিতে। এবং আমরা আরও আরও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করি যে, এই নীরবতা শুধুই আমাদের মধ্যে অন্তরে বিদ্যমান, তাই নয়, বরং সর্বত্র বিদ্যমান, যেন সেই হলো মহাবিশ্বের গভীরতর উপাদান, যেন প্রত্যেক বস্তু সেই পটভূমিতেই অবস্থাপিত, তা থেকেই এসেছে, এবং তাতেই ফিরে যায়। প্রত্যেক বস্তুর হৃদয়ে নিহিত মাধুর্যের উৎসের মতো, এক মখমলি পোশাকের মতো, যা সব-কিছুকে আবৃত করে রেখেছে। এই নীরবতা শূন্য নয়, তা হলো পরম পূর্ণতা যার মধ্যে কিছু নেই, কিংবা বরং এক পূর্ণতা যার মধ্যে নিহিত যা-কিছু সম্ভব তার সারতত্ত্ব, তার জন্মের ঠিক এক মুহূর্ত পূর্বে— তখন এর অস্তিত্ব নেই, অথচ সব-কিছুই আছে, ঠিক একটি গানের মতো যা এখনও গাওয়া হয়নি। তার ভিতরে (কিংবা বাইরে ?) নিজেকে বিস্ময়করভাবে বিপন্মুক্ত মনে হয়। এ হলো বিশ্বাতীতের প্রথম পরিণাম। তার চরম পরিণতিতে ব্যক্তি নির্বাণের মধ্যে চলে যায়। এই নীরবতা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। কিন্তু অতিমানসে উপনীত হলে

অন্য কোনো পথের প্রয়োজন হয় না, কোনো দরজার চৌকাঠ পার হতে হয় না; আমরা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যাই না, যাই না নীরবতা হতে কোলাহলে, অন্তর হতে বাইরে, দিব্য হতে অদিব্যে— উভয়ে এক হয়ে যায় একটি একক অনুভবে : সব-কিছুর বাইরে যে নীরবতা, এবং সম্ভূতি যা সর্বত্র প্রবাহিত হয়। একটি অন্যটিকে অস্বীকার করে না, এবং একটি *অন্যটি ব্যতীত থাকতে পারে না*। কারণ, পরম নীরবতা যদি নীরবতার বিরোধকে ধারণ করতে না পারে, তা হলে সে আর অসীম নয়। যদি নীরবতা, যা তার বিপরীত বলে মনে হয়, তার সম্পূর্ণ বাইরে থাকতে না পারে, তা হলে সে তার বিপরীতের বন্দী হবে। ভগবানের রাজ্য এই জগতের, এবং এই জগতের নয়। সমগ্র গূঢ় রহস্যটি হলো দুটি অনুভবকে একসঙ্গে সংযুক্ত করা, অসীমকে সীমার মধ্যে, সময়াতীতকে সময়াবদ্ধের মধ্যে, বিশ্বাতীতকে বিশ্বময়ের মধ্যে। তখন আমরা উপলব্ধি করি কর্মের মধ্যে প্রশান্তি ও সকল পথে আনন্দ।

গভীর সাগর স্থির, গড়ানো ঢেউ-এর মাঝে সে হাসে :
বিশ্বময়, সে সব-কিছু— বিশ্বাতীত, সে কিছু নয়।[১৩]

অতিমানস চেতনা পুনরাবৃত্তি করেন সেই মহান্ প্রশান্ত আলোকের যিনি "একদিন" সময়ের বাইরে সংকল্প করেছিলেন নিজেকে দেখার জন্য সময়ের মধ্যে, ক্রমশ, অগণিত দৃষ্টিভঙ্গি হতে, কিন্তু তিনি একত্ব ও সমগ্রতা হতে বিরত হননি, এক শাশ্বত মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ধারণ করে আছেন। বিবর্তনের একমাত্র লক্ষ্য হলো ঊর্ধ্বের সমগ্রতাকে নিম্নে পুনরাবিষ্কার করা, এবং এখানে পৃথিবীতে তীব্রতম দ্বৈতভাব ও বিরোধাভাসের ঠিক মধ্যে, উন্মুক্ত করা পরম একত্ব, পরম আনন্ত্য ও পরম আনন্দ। এই নিগূঢ় সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যই আমরা নিম্নে আকর্ষিত হই প্রত্যেকবার, যখনই আমরা একটিও পদক্ষেপ ঊর্ধ্বাভিমুখে গ্রহণ করি।

অতিমানস শক্তি

অধ্যাত্মবাদীরা শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সত্যান্বেষীর জন্য অনুপযুক্ত এক অস্ত্ররূপে; এটা অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের মত নয় : বরং শক্তির ধারণা তাঁর যোগের প্রধান নীতি। শক্তি বিনা কিছুই রূপান্তরিত করতে পারব না। "সাবিত্রী" ঘোষণা করছেন :

অগ্নি যে ভগবান্, চাই তাঁরে, স্বপ্ন যে তাঁরে নয়।[১৪]
সময়ের মাঝে শাশ্বতকে আবাহন করে অগ্নি,
আত্মানন্দ সম করে জীবন্ত দেহের হর্ষে।[১৫]

নৈতিক বা ধার্মিক মনের একটি ভুল হলো শক্তিকে নিন্দিত করা এমন এক বস্তুরূপে যা স্বয়ং গ্রহণযোগ্য কিংবা অন্বেষণ-যোগ্য নয়, কারণ তা স্বাভাবিকরূপেই ভ্রষ্ট ও মন্দ; বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা এর আপাত যাথার্থ্যের প্রতিপাদন সত্ত্বেও, মূলত এ এক অন্ধ ও যুক্তিহীন কুসংস্কার। যেমন প্রেম ও জ্ঞানও দোষযুক্ত ও অপব্যবহৃত হয়, তেমনই যত দোষযুক্ত ও অপব্যবহৃত হলেও শক্তি দিব্য, এবং এখানে অবস্থাপিত দিব্য উদ্দেশ্যে। শক্তি, সংকল্প ও সামর্থ্য জগৎসমূহের পরিচালক; এবং, জ্ঞানশক্তি হোক বা প্রেমশক্তি, অথবা কর্মশক্তি কিংবা শারীরশক্তি, তা সবসময় মূলত আধ্যাত্মিক ও গুণাবলীতে দিব্য। পশু, মানব ও অসুরের দ্বারা অজ্ঞানতার মধ্যে শক্তির প্রয়োগকে দূরীভূত করতে হবে, এবং তাকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে তার মহত্তর স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা— যা আমাদের নিকট স্বাভাবিকতার অতীত মনে হতে পারে— যে ক্রিয়া পরিচালিত হবে অসীম ও শাশ্বতের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা এক অন্তশ্চেতনার দ্বারা। পূর্ণযোগ জীবনের কর্ম প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, তা সন্তুষ্ট হতে পারবে না শুধু আন্তর অনুভূতির দ্বারা; তাকে অন্তরে প্রবেশ করতে হবে, বাইরে রূপান্তর আনবার জন্য।[১৬]

ভারতবর্ষ শাশ্বত জননীরূপে যাকে উপস্থাপিত করেছে, তা চেতনার এই "শক্তি" বা "সামর্থ্যের" দিক্। চেতনা ব্যতীত শক্তি নেই, এবং শক্তি ব্যতীত সৃষ্টি নেই —পুরুষ ও প্রকৃতি একের মধ্যে দুই, অবিচ্ছেদ্য।

এ সমগ্র বিশাল জগৎ শুধুই পুরুষ প্রকৃতি।[১৭]

সমগ্র বিবর্তন প্রকৃতি দ্বারা পুরুষের পুনরাবিষ্কারের কাহিনী; এবং প্রকৃতি প্রয়াসরতা পুরুষকে সর্বত্র শরীরে প্রকাশ করবার জন্য। যথার্থ বিষয়টি হলো, একের জন্য অন্যটিকে বর্জন না করা —পুরুষ ব্যতীত আমরা এক অন্ধ শক্তির বন্দী, প্রকৃত ব্যতীত আমরা এক প্রোজ্জ্বল শূন্যের বন্দী— এক পরিপূর্ণ বিশ্বে একটিকে অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত করাই আসল কথা। "অবিদ্যার উপাসনা যারা করে, তারা প্রবেশ করে অন্ধ তমিস্রে। শুধুই বিদ্যার উপাসনা যারা করে তারা বৃহত্তর অন্ধ তমিস্রে প্রবেশ করে।"—ঈশোপনিষদের বাণী (৯)।

প্রথমত ও প্রধানত অতিমানস এক শক্তি— এক বিপুল শক্তি। জড়তত্ত্বে নিহিত আত্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ শক্তি অতিমানস। সকল চেতনাই শক্তি, এবং যতই আমরা উর্ধ্বে উঠি, শক্তি ততই অধিকতর হয়, তখন আমরা পৃথিবী হতেও অধিকতর দূরে চলে যাই। সুতরাং দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি জাগতিক ঘটনাবলীর প্রতি আমরা আমাদের অধিমানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে চাই, তা হলে আমাদের তাকে অবতীর্ণ করিয়ে আনতে হবে স্তর হতে স্তরে, এবং তাকে মধ্যবর্তী স্তরগুলোর সকল নিয়তি অতিক্রম করতে হবে, নিম্নতম স্তরে, জড়তত্ত্বে সে উপনীত হওয়ার পূর্বে। অবতরণের শেষে, শুধুই অবশিষ্ট থাকে এক ভারাক্রান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন অধিমানসিক প্রতিফলন, যাকে সংঘর্ষ করতে হবে ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহী ও গুরুতর

নিয়তির সঙ্গে। সেই কারণেই অধ্যাত্মবাদীরা জীবনকে কখনো পরিবর্তিত করতে পারেননি। কিন্তু অতিমানস, জড়ের হৃৎকেন্দ্রে স্থিত পরমা চিৎশক্তি— কোনো মধ্যবর্তী স্তর ব্যতীত। এই হলো বেদের "অন্ধকারে নিহিত সূর্য", যে স্থানে উর্ধ্ব ও নিম্ন সম্মিলিত হয় প্রত্যক্ষভাবে। সুতরাং তা সব-কিছুকেই পরিবর্তিত করতে পারবে। শ্রীমার কথা স্মরণযোগ্য : "চেতনার প্রকৃত পরিবর্তন তাই, যা জগতের ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে, এবং তাকে পরিণত করতে পারবে সম্পূর্ণ নতুন এক সৃষ্টিতে।"

সরাসরিভাবে আমরা বলতে চাই, অতিমানস শক্তি অলৌকিক প্রক্রিয়া বা হিংসার মাধ্যমে কোনো কাজ করে না— অলৌকিকের ধারণাই সামঞ্জস্যহীন; শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন : *অলৌকিকতা বলে বস্তুত কিছুই নেই।*[১৮] শুধু এমন কিছু ব্যাপার আছে যার প্রণালী আমরা বুঝি না, এবং যে দৃষ্টিমান্, তাঁর পক্ষে, তা শুধু কোনো এক উর্ধ্বতর স্তরের নিয়তির হস্তক্ষেপ নিম্নতর স্তরের নিয়তির মধ্যে। শুঁয়োপোকার নিয়তির কাছে মন প্রতীয়মান হতে পারে অলৌকিক বলে, কিন্তু আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী, আমাদের মানসিক অলৌকিকতা এক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। অতিমানসের পক্ষেও সেই একই কথা বলা যেতে পারে। সে কোনো নিয়ম ভঙ্গ করে না; সে শুধু লম্ফপ্রদান করে তাদের উর্ধ্বতর স্তরে (অথবা, তাদের অভ্যন্তরে ?), এমন এক ক্রমে, যেখানে তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই, যেমন মানুষের জন্য শুঁয়োপোকার নিয়মগুলোর কোনো অস্তিত্ব আর থাকে না। কথাটি বোঝানো যাক, কিছু-সংখ্যক স্পন্দনের অভ্যাসগত পুনরাবৃত্তি, যা কোনো ব্যক্তির চারপাশে যেন জমাট বেঁধে যায়, তাই তাঁর নিকট এক স্থায়ী গঠনের রূপ গ্রহণ করে অবশেষে, এবং তিনি বলেন তিনি তাঁর প্রকৃতির "নিয়ম" পালন করছেন। কিন্তু এই তথাকথিত "নিয়ম" মোটেই অনিবার্য নয়, এবং ঠিক যেন ঘরে ফেরবার জন্য একটি পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নেওয়ার মতো। এ শুধু অভ্যাসের কথা। সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য সেই একই কথা সত্য। আমাদের যে-সব ভৌতিক নিয়মকে আমরা অনিবার্য বলে মনে করি, সে-সব তেমনই জমাট বাঁধা অভ্যাস। এবং সে-সব মোটেই অনিবার্য নয়; তাদের উল্লঙ্ঘন করা যেতে পারে, যদি আমরা অন্য এক পথ গ্রহণ করতে চাই, অর্থাৎ চেতনার পরিবর্তন করতে চাই। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, *সাধারণ নিয়মগুলি প্রকৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যকে বোঝায়; তার অর্থ শক্তিসমূহের সুষমতা। এ শুধু এক বিবর, যার মধ্যে প্রকৃতি কোনো নির্দিষ্ট পরিণতি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য কাজ করতে অভ্যস্ত। কিন্তু তুমি যদি চেতনার পরিবর্তন করো, তা হলে বিবরটিরও পরিবর্তন হতে বাধ্য।*[১৯] এ-সব "বিবরের পরিবর্তন' আমাদের বিবর্তনের সমগ্র পথটিকে যতিচিহ্নে চিহ্নিত করেছে; তার আরম্ভ জড়তত্ত্বে প্রাণের আবির্ভাবে, যা ভৌতিক বিবরটির পরিবর্তন আনল; তারপর মনের আবির্ভাব হলো প্রাণে, যা পরিবর্তিত

করল জড় ও প্রাণের বিবরটিকে। অতিমানস হচ্ছে বিবরটির তৃতীয় পরিবর্তন, যা পরিবর্তিত করবে মন, প্রাণ ও জড়তত্ত্বকে। সে-কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে, অনুভূতিটি এখন প্রগতির পথে। মূলত, প্রত্যেক উপাদানে অন্তর্নিহিত চেতনাকে মুক্ত করাই অতিমানস প্রক্রিয়া। বিশ্বের শৃঙ্খলাকে এ বিপর্যস্ত করে না, কখনো হিংসা অবলম্বন করে না, এ শুধু তার শক্তির প্রয়োগ করে অন্ধকারকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য, যেন সে তার নিজের আলোক বিকীর্ণ করতে পারে। ঋগ্‌বেদের বাণী : "চর্ম-বিদীর্ণ-কারীর মতো তিনি অন্ধকার বিদীর্ণ করেছেন, যেন আমাদের পৃথিবী*কে তিনি বিস্তৃত করতে পারেন তঁর ঔজ্জ্বল্য-প্রদায়ী সূর্যের নীচে" (৫.৮৫.১)। যেহেতু সৌর দিব্যচেতনা সর্বত্র বিদ্যমান, বিশ্ব এবং বিশ্বে স্থিত প্রত্যেক অণুও দিব্য— যিনি সকল বিশ্বের ঈশ্বর, ঋগ্‌বেদের "অচেতন বস্তুসমূহে নিহিত একমাত্র চেতনা"ও তিনি। জড় নয় এক অশোধিত বস্তু যার পরিবর্তন অসম্ভব, আমাদের হস্তদ্বয়ের বা আমাদের মস্তিষ্কের হিংস্রতা ব্যতীত, যে হিংস্রতা দৈত্য ব্যতীত অন্য কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; এ এক দিব্য বস্তু যা প্রতিরোধ করবার পরিবর্তে উত্তর দিতে পারে, এবং তার পুরোনো অভ্যাসের বশে নিম্নমুখী মাধ্যাকর্ষণ ও বিধ্বংসের অভিমুখে আমাদের টেনে নেওয়ার পরিবর্তে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু এ এক অন্ধকারময় নিদ্রামগ্ন দেবত্ব; শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, এক "নিদ্রাচর"; বেদের ভাষায়, এক "হারানো, সমাবৃত সূর্য" : *অচেতন হচ্ছে অতিচেতনের নিদ্রা।*[২০] *জ্যোতির্ময় অতিচেতনের মধ্যে যা-কিছু শাশ্বতভাবে স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছে, জড় বিশ্বের প্রতীয়মান নিশ্চেতনা সে-সবই ধারণ করে, নিজের মধ্যে, তমসাবৃত রূপে।*[২১] সুতরাং অতিমানস নিজেরই আলোক ব্যবহার করবে তদনুরূপ আলোক— *একই* আলোক— জড়ের মধ্যে জাগ্রত করবার জন্য :

ঊর্ধ্বের সত্য করবে জাগরিত নিম্নসত্য।[২২]

কারণ, নিয়ম শাশ্বতভাবে একই : সদৃশই শুধু সদৃশের উপর সক্রিয় হতে পারে। ঊর্ধ্বতম উচ্চতা গভীরতম নিগূঢ়তার মধ্যে নিহিত সত্যকে মুক্ত করতে পারে।

তা হলে, কী এই শক্তি? যে কোনো একাগ্রতা এক সূক্ষ্ম উত্তাপ বিমুক্ত করে, যে-কথা ভালোভাবেই তাঁরা জানেন যাঁরা কিছু যোগসাধনা করেছেন (*তপস্যা* বা যোগসাধনার তাৎপর্য "যা তাপ সৃষ্টি করে")। অতিমানসিক শক্তি এ প্রকারই এক শক্তি যা অত্যধিক তীব্র, এবং শরীরের কোষসমূহে বিদ্যমান। এ উত্তাপ বিমুক্ত হয় জড়তত্ত্বে চিৎশক্তির জাগরণের ফলে; শ্রীমা বলেছেন : *ঠিক যেন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন রৌপ্যময়, কিন্তু অতিমানস জীবন স্বর্ণময়;*

---

* বেদের পৃথিবী আমাদের শরীরের মাংসের প্রতীক।

যেন এখানকার সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবন এক রৌপ্যময় স্পন্দন, শীতল নয়, বরং এক আলোক, যে আলোক শিখরে যায়, যে আলোক সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ এবং তীব্র; কিন্তু অন্যটিতে, অতিমানস জীবনে, আছে এক সমৃদ্ধি এবং এক শক্তি, এক উষ্ণতা যা সৃষ্টি করে সকল পার্থক্য। এই উষ্ণতাই সকল অতিমানস রূপান্তরের মূল ভিত্তি। বস্তুত দহন ও অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিকীর্ণ উত্তাপ ও পারমাণবিক সম্মিশ্রণ অথবা বিভাজনে বিমুক্ত ততোধিক উত্তাপ শুধুই এক পদার্থগত ভাষান্তর এক মৌলিক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের, যা বৈদিক ঋষিগণ ভালোভাবেই জানতেন ও নাম দিয়েছিলেন *অগ্নি*, জড়তত্ত্বে নিহিত দিব্য অগ্নি : "হে অগ্নি, অন্যান্য সকল অগ্নিশিখা তোমারই শাখাপ্রশাখা, হে অগ্নি, হে বৈশ্বানর, তুমি সকল পৃথিবীর ও তাদের অধিবাসীদের নাভিগ্রন্থি; জাত সকল মনুষ্যকে তুমিই স্তম্ভের মতো নিয়ন্ত্রিত করো, আধৃত করো। স্বর্গের শীর্ষ তুমিই, পৃথিবীরও নাভি তুমি; তুমিই সেই শক্তি যা উভয় জগৎকে ক্রিয়ারত করো" (ঋগ্‌বেদ, ১.৫৯)। "হে অগ্নি, তোমার দীপ্তি বিদ্যমান স্বর্গে, এবং পৃথিবীতে, এবং এর সকল উদ্ভিদে ও এর জলরাশিতে, তোমার দীপ্তি দ্বারা তুমি ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষে: তা এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃসমুদ্র, যার মধ্যে দিব্যদর্শন নিহিত" (ঋগ্‌বেদ, ৩.২২.২)। "অগ্নি প্রবেশ করেছে পৃথিবীতে ও স্বর্গে, যেন তারা এক" (ঋগ্‌বেদ, ৩.৭.৪)। জড়তত্ত্বে ও শরীরের কোষসমূহে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা এই পরম *অগ্নি* আবিষ্কার করেছিলেন— এই হলো শরীরের রূপান্তরের ও বিশ্বের ভৌতিক পরিবর্তনের উত্তোলন-দণ্ড[†]।এরপর থেকে, সকল মধ্যবর্তী মানসিক ও প্রাণিক নিয়তির বিকৃতিময় ও দুর্বহ মাধ্যম দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে, জড়তত্ত্ব স্বয়ং জাগরিত হয়ে ওঠে নিজের শক্তির চেতনায় এবং তার নিজের রূপান্তর প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন করে। শক্তিবিহীন চেতনা, যা নিয়ে যায় জ্ঞানীর পরমানন্দে, অথবা চেতনাবিহীন শক্তি, যা নিয়ে যায় অণুর অমার্জিত উল্লাসে— এই দুটি মেরুর অন্তর্বর্তী হয়ে দ্বিধাবিদীর্ণ প্রতীয়মান হওয়া বিবর্তনের পরিবর্তে, অতিমানস পুনঃস্থাপিত করে ভারসাম্য এক *সমগ্র* সত্তায়; উর্ধ্বতম চেতনা সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির মধ্যে, আত্মার অগ্নি জড়তত্ত্বে— ঋগ্‌বেদের আবাহন, "হে অগ্নি, শত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার সহ" (ঋগ্‌বেদ, ১.৫৯)।

এ কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আধ্যাত্মিক আবিষ্কার করেছিলেন ১৯১০এ, বেদাধ্যয়নেরও পূর্বে, এমন এক সময়ে যখন পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান শুধু তত্ত্বগত অনুমানের স্তরেই ছিল। আমাদের বিজ্ঞান আমাদের চেতনার অগ্রবর্তী, সেজন্যই আমাদের নিয়তির গতি বিপজ্জনক।

পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে সাদৃশ্য আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে,

lever = উত্তোলন দণ্ড।

যদি আমরা পরীক্ষা করে দেখি অতিমানস শক্তি-সম্বন্ধীয় একটি বর্ণনা, যেমন তা প্রতীয়মান দ্রষ্টার দৃষ্টিতে। আমরা বলেছি, চেতনার যত উর্ধ্বে আমরা আরোহণ করি, আলোক ততই স্থায়ী ও অখণ্ড মনে হয় : বোধিমানসের স্ফুলিঙ্গ হতে অধিমানসের 'স্থায়ী বিদ্যুদ্দীপ্তি" পর্যন্ত, আলোক হয়ে ওঠে অধিকতর সমরূপ। সুতরাং আমরা ভাবতে পারি যে অতিমানস আলোক এক প্রকার জ্যোতির্ময় সমগ্রতা, অত্যন্ত স্থির ও অবিচ্ছিন্ন, কোনো সূক্ষ্ম বিভাজন ব্যতীত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, অতিমানসের আলোকের গুণ চেতনার অন্যান্য ক্রমের আলোকের গুণ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মধ্যে সম্মিলিত হয়েছে সম্পূর্ণ নিশ্চলতা ও দ্রুততম গতি। এখানেও দুটো বিপরীত মেরু সংযুক্ত হয়েছে, এ কথা পরীক্ষালব্ধ। আমরা শুধুই তথ্যটি উপস্থাপিত করতে পারি, কিন্তু তার কোনো ব্যাখ্যাপ্রদানে অসমর্থ। অতিমানস আলোকের সম্বন্ধে তাঁর প্রথম অনুভূতিকে শ্রীমা বর্ণনা করেছেন : *শক্তির, উষ্ণতার, স্বর্ণের এক পরিপূর্ণ গভীর ছাপ; তা তরল নয়, ধূলির কুয়াশার মতো। এবং এ-সব বস্তুর প্রত্যেকটি ছিল জীবন্ত স্বর্ণের মতো, উষ্ণ স্বর্ণের ধূলি (তুমি এদের কণিকা বা অংশ বা বিন্দুও বলতে পারবে না, যদি না অবশ্য তুমি "বিন্দু" ব্যবহার করে থাকো এক গাণিতিক অর্থে, যে অর্থে বিন্দুর কোনো ব্যাপ্তি থাকে না)— আমি বলতে পারি না তা ছিল উজ্জ্বল, কিংবা তা ছিল অন্ধকার, এ কথাও বলতে পারি না; আমরা আলোক বলতে যা বুঝি এ তাও ছিল না : বরং, অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণময় বিন্দু, তাছাড়া অন্যকিছুই নয়। মনে হলো তারা আমার চোখমুখ স্পর্শ করেছিল। এবং কী প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে! এবং সেই একই সময়ে, পূর্ণতার বোধ, সর্বশক্তিমত্তার শান্তি। তা ছিল ঐশ্বর্যময়, সম্পূর্ণ। এ ছিল তীব্রতম গতি, আমরা যা-কিছু কল্পনা করতে পারি তদপেক্ষা বহুগুণ বেশি দ্রুততর, এবং সেইসঙ্গে এ ছিল পরম প্রশান্তি, পূর্ণ স্থৈর্য**। কয়েক বছর পরে, যখন অনুভূতিটি অনেক পরিচিত হয়ে যায়, তখন এই বিষয়ে শ্রীমা যা বলেছেন, তা এই : *এ এক গতি, যা এক শাশ্বত স্পন্দনের মতো, অনাদি, অনন্ত। এমন-কিছু যা বিদ্যমান শাশ্বত কাল হতে, শাশ্বত কালের জন্য। সময়ের কোনো বিভাগ নেই, শুধু যখন তা কোনো এক পর্দার উপর নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তা সময়ের বিভাজন গ্রহণ করতে আরম্ভ করে; কিন্তু তুমি বলতে পারবে না এক সেকেণ্ড, এক মুহূর্তও তুমি বলতে পারবে না— বোঝানো খুবই কষ্টকর। তুমি প্রত্যক্ষ করবার পূর্বেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়— এমন-কিছু যার সীমা নেই, আরম্ভ নেই, সমাপ্তি নেই, এক গতি যা সমগ্র— সমগ্র ও অবিরত, অবিরত*

* আলোকের গতিতে আমরা পাই পূর্ণ নিশ্চলতা চরম গতিশীলতার মধ্যে— যদি ব্যাপারটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি ভিতর থেকে তা হলে তা নিশ্চলতা, যদি বাইরে থেকে তাকে প্রত্যক্ষ করি, তা হলে তা গতিশীলতা।

—যে-কোনো দৃষ্টির নিকট, তা এক পূর্ণ নিশ্চলতার অনুভব প্রদান করে। এ সম্পূর্ণরূপে অবর্ণনীয়, তথাপি এই হলো পৃথিবীর উপর সংঘটিত বিবর্তনের উৎস ও অবলম্বন। এবং আমি লক্ষ্য করেছি যে চেতনার এই অবস্থায়, যে শক্তি কোষগুলিকে একত্রীভূত করে এক ব্যক্তিগত রূপ দেয়, তার অপেক্ষা গতির শক্তি অধিকতর। যেদিন আমরা এই স্পন্দন বা এই গতিকে আমাদের নিজেদের জড়তত্ত্বে প্রয়োগ করতে শিখব, সেদিনই আমরা জানতে পারব এবং পৃথিবীতে প্রথম অতিমানস বা মহিমান্বিত শরীর আমরা পাব।

গতির মধ্যে এই নিশ্চলতাই অতিমানস সত্তার সকল কার্যকলাপের মূলভিত্তি। অতিমানসের অভিমুখী যে-কোনো শৃঙ্খলার এই হলো ব্যবহারিক অ-আ-ক-খ, বোধহয় এই জগতে যে-কোনো ফলপ্রসূ কর্মেরও বোধহয় এই হলো অ-আ-ক-খ। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, স্থিরতা, অর্থাৎ অন্তরের স্থিরতা, স্পন্দনের বিলয়সাধনে সমর্থ; আমরা যদি অন্তর হতে পূর্ণরূপে স্থির থাকতে পারি প্রতিক্রিয়ার ন্যূনতম স্পন্দন ব্যতীত, তা হলে আমরা যে-কোনো আক্রমণ থেকে রক্ষালাভ করতে পারি, কোনো পশু থেকে, কোনো মানুষ থেকে। এই নিশ্চলতার শক্তি তখনই প্রকৃতরূপে অর্জিত হয়, যখন আমরা অন্তরালস্থিত পরম নীরবতার সম্বন্ধে সচেতন হতে আরম্ভ করি, যখন আমরা যে-কোনো মুহূর্তে অন্তরের মধ্যে পদক্ষেপ নিয়ে বাইরের ঘটনাচক্র হতে দূরে বহুদূরে চলে যেতে পারি, হাজার হাজার মাইল দূরে। জীবনের অভ্যন্তরকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য, আমাদের সমর্থ হতে হবে, জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বাইরে চলে যাওয়ার জন্য। এটা আশ্চর্যের কথা, অথচ স্বাভাবিক, যে, এই অতিমানস শক্তি উপলব্ধ হতে পারে না, যদি না আমরা সম্পূর্ণরূপে বাইরে চলে যাই, শাশ্বত ভিত্তিভূমির উপর স্থির হয়ে, সময়ের বাইরে, স্থানের বাইরে— ঠিক যেন পরম ক্রিয়াশক্তি উদ্‌ভূত হতে পারে শুধু পরম নিশ্চলতার মধ্য হতে। এ কথা মনে হতে পারে আপাত বিরোধাভাসপূর্ণ, কিন্তু তাই অর্থপূর্ণ। আমরা বুঝতে পারি যে, সাধারণ চেতনা, যা সামান্যতম হাওয়ায় আন্দোলিত হয়ে যায়, যদি এই "উষ্ণ স্বর্ণধূলির" সংস্পর্শে আসে, তা হলে তৎক্ষণাৎ ভেসে চলে যাবে, নতুবা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। শুধু সম্পূর্ণ নিশ্চলতা এই গতি সহ্য করতে পারবে। এবং যাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছেন তাঁদের কাছে এটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে : শুধু তাঁর জ্যোতির্ময় নয়নদ্বয়ই নয় (যেমন শ্রীমার ক্ষেত্রে), বরং অনুভূত হতো এক নিশ্চল বিশালতা, এত সংহত, এত ঘনীভূত, মনে হতো যেন ব্যক্তি প্রবেশ করছে এক নিবিড় নিঃসীমতায়। তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোঝা যেতো, কেন তাঁর প্রকোষ্ঠে ঘূর্ণীবাত্যা প্রবেশ করতে পারেনি; বোঝা যেতো, তাঁর এই বাক্যাংশটির সমগ্র অর্থ : *মৃত্যুহীন আত্মার দৃঢ় নিশ্চলতা।*[২৩] এই নিশ্চলতার শক্তির মাধ্যমে তিনি চল্লিশ বছর ধরে কার্যরত ছিলেন, এবং প্রত্যেক রাত্রে বারো ঘণ্টা লিখতেন, দিনে আট ঘণ্টা পদচারণা

করতেন (তাঁর ভাষায়, "জড়তত্ত্বের মধ্যে আলোকের অবতারণ করবার জন্য"), এবং ক্লান্তি অনুভব না করে, নিশ্চেতনার মধ্যে তিনি কঠোরতম যুদ্ধে নিরত থাকতেন। *যখন তুমি বিরাট্ কর্মসমূহে নিরত, এবং বৃহৎ পরিণামসমূহের পরিচালনায় রত, তখন যদি তুমি উপলব্ধি করতে পার তুমি কিছুই করছ না, তা হলে তুমি জানবে যে ভগবান্ তোমার চোখের পাতা হতে তাঁর আবরণ অপসৃত করে নিয়েছেন। যদি পর্বতশিখরে তুমি একাকী, নিশ্চল ও নীরব হয়ে উপলব্ধি করতে পার যে সব তুমি পরিচালিত করছ, তা হলে তোমার দিব্যদৃষ্টি উন্মুক্ত হয়েছে এবং বাইরের প্রতীয়মান রূপ হতে মুক্ত হয়েছে।*[২৪]

নিশ্চলতা অতিমানস শক্তির ভিত্তি, কিন্তু নীরবতা এর ত্রুটিহীন কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনীয় পরিবেশ। অতিমানস চেতনা তার কর্মধারা নির্ণয়ের জন্য মানসিক বা নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে না। এর জন্য, কোনো "সমস্যা" আর নেই। স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কাজ করে। স্বতঃস্ফূর্ততা অতিমানসের পরিচায়ক চিহ্ন : জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা, জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ততা, শক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা। সাধারণ জীবনে, আমরা জানতে চেষ্টা করি ভালো কী, ঠিক কী, এবং আমরা যখন মনে করি আমরা তা জানতে পেরেছি, আমরা আমাদের চিন্তাকে কার্যে প্রয়োগ করবার জন্য সর্বোত্তমভাবে প্রয়াস করি। তুলনামূলকভাবে অতিমানস জানার চেষ্টা করে না, কী করতে হবে, কিংবা কী না, তাও নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে না। এ পূর্ণভাবে নীরব ও নিশ্চল; সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সে অতিবাহিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ভবিষ্যতের প্রতি অত্যধিকভাবে অভিমুখী না হয়ে; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যথার্থ প্রয়োজনীয় জ্ঞান চেতনার নীরবতার মধ্যে পতিত হয়। আলোকের এক বিন্দুর মতো : এটা করতে হবে, সেটা বলতে হবে, বা দেখতে হবে, বা বুঝতে হবে। *অতিমানস চিন্তন আলোক হতে উন্মুক্ত এক তীর, আলোকে উপনীত হওয়ার জন্য এক সেতু নয়।*[২৫] "সম-স্তর বিস্তৃতির মধ্যে তাঁরা একত্র হন, এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেন", ঋগ্‌বেদের বাণী (৭.৭৬.৫)। এবং চেতনায় প্রত্যেকবার যখন এক চিন্তন বা দৃষ্টি আবির্ভূত হয়, তা ভবিষ্যতের বিষয়ে এক অনুমান নয়, বরং এক তাৎক্ষণিক কর্ম :

প্রতি চিন্তন প্রতি অনুভব কর্ম সেথায় এক।[২৬]

জ্ঞান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্তিময় হয়ে যায়। কারণ এ এক সত্য, সর্বদ্রষ্টা জ্ঞান, এবং সত্য জ্ঞান শক্তিময়। আমাদের শক্তির অভাব, কারণ আমরা সমগ্রটিকে দেখি না। কিন্তু এই সমগ্রদর্শন আমাদের সাময়িক বিবেচনার বহুদূরে; প্রত্যেক বস্তুর সময়ের মধ্যে যে বিস্তৃতি তা সে দেখতে পারে; বস্তুর স্বাভাবিক গতিধারা বিপর্যস্ত করবার জন্য আগত কোনো স্বেচ্ছাচারী আদেশ এ নয়; বরং এ শুধু এক জ্যোতির্ময় চাপ যা গতিকে *তীব্রতর করে*, এবং প্রত্যেক বস্তুকে, প্রত্যেক

শক্তিকে, প্রত্যেক ঘটনাকে, প্রত্যেক সত্তাকে প্রত্যক্ষ সংযোগে এনে দেয় তার স্বীয় আলোকের সারতত্ত্বের সঙ্গে, তার স্বীয় দিব্য সম্ভাবনার সঙ্গে, এবং প্রথম হতে যে পরম *লক্ষ্য* তাকে গতিশীল করেছে তার সঙ্গে। যে-কথা আমরা বলেছি : এ এক বিশাল বিবর্তনীয় আলোড়ন।

বোধহয়, কিছু বলা উচিত, কীভাবে এ শক্তি প্রকাশিত হয় ব্যবহারিকভাবে তাঁদের জীবনে ও কর্মে, যাঁরা অতিমানসকে শরীরে ধারণ করেন— এ-পর্যন্ত, শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু, যেহেতু কোনো ব্যাখ্যাই সন্তোষজনক নয়, ব্যক্তি নিজে না দেখা পর্যন্ত, এবং যেহেতু অভিজ্ঞতা তখনই দৃঢ়প্রত্যয় উৎপন্ন করতে পারবে, যখন তা এক সামূহিক সম্ভাবনা হবে, সেই কারণে নীরব থাকাই আমরা শ্রেয়স্কর মনে করি। তা ছাড়া, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কর্মধারায় যাঁরা উপকৃত হয়েছেন, তাঁরাও অনেক সময়ে তা বুঝতে পারেননি। শুধু এই সাধারণ কারণে যে, আমরা কোনো-কিছু বুঝতে পারি তখনই যখন আমরা থাকি একই স্তরে। আমরা শুধুই উপস্থিত মুহূর্তটিকে দেখি, দেখি না সেই অলৌকিকতা যা এই সরল দৃষ্টি, আলোকের এই মুহূর্ত, প্রস্তুত করছে, যা পরিপক্বতা লাভ করবে বিশ বছর ধরে বা তিন শতাব্দী ধরে, আমাদের অস্পষ্টতার অন্তরালে, "স্বাভাবিক" হয়ে ওঠার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন, তাঁর কোনো এক জীবনী-রচয়িতার প্রতি : *আমার জীবনের বিষয়ে তুমি বা অন্য কেউ কিছুই জানো না, মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে বাহ্যস্তরে কিছুই ঘটেনি।*[২৭] শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণার জন্য, এই শক্তির সম্বন্ধে বলা কঠিন হয়ে ওঠে। যখন আমরা "শক্তিরাজির" কথা বলি, আমরা তৎক্ষণাৎ আশা করি উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত ঘটনা, কিন্তু তা সত্যকারের শক্তি নয়, এবং বিশ্বের প্রকৃত চমৎকারিতাও তা নয়। অতিমানস ক্রিয়া কোনো অলৌকিক আলোড়ন সৃষ্টি করে না, যা আমাদের হতবুদ্ধি করে দেয়। এ এমন এক ক্রিয়া যা শাশ্বতের মতো স্থির, যা প্রেরিত করে জগৎকে ও জগতের প্রত্যেক বস্তুকে, তার স্বীয় পূর্ণতার উদ্দেশে, অপূর্ণতার সকল মুখোশের মধ্য দিয়ে। প্রকৃত অলৌকিকতা বস্তু-সমূহের প্রতি উগ্র আচরণ করা নয়, বরং তাদের প্রেরিত করা, গোপনতার সঙ্গে, অতি সংগোপনে, তাদের স্বীয় কেন্দ্রের উদ্দেশে, যেন তাদের সে গভীরতা হতে তারা চিনে নিতে পারে সেই মুখমণ্ডল, যা তাদেরই মুখমণ্ডল। অলৌকিকতা শুধু একটিই রয়েছে, এই তাৎক্ষণিক চিনে-নেওয়া, যখন "অন্য" আর কিছুই নেই।

ব্যক্তি অতিমানস শক্তির চাবি; অতিমানস সত্তার শুধুই যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় ধারা আছে, তাই নয়, ব্যষ্টিগত ধারাও আছে। অভিজ্ঞতার যে বিচ্ছেদ-ত্রয় বিভাজিত করেছিল একেশ্বরবাদী, সর্বেশ্বরবাদী ও ব্যক্তিবাদীকে, তা দূরীভূত হলো। তাঁর বিশ্বাতীত ধারা জগৎ ও ব্যক্তিকে বিলুপ্ত করে না, যেমন তাঁর বিশ্বময় ধারা তাঁকে বিশ্বাতীত বা ব্যক্তি হতে বঞ্চিত করে না, কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত ধারা

তাঁকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় হতে বিচ্ছিন্ন করে না। শীর্ষে আরোহণের সোপান তিনি পদাঘাতে অপসৃত করেননি, বরং নিম্ন হতে শীর্ষ পর্যন্ত সকল বিবর্তনীয় স্তরের পরিমাপ তিনি নিয়েছেন সচেতনভাবে— কোথাও কোনো ব্যবধান নেই, কোনো সংযোজক তত্ত্ব হারিয়ে যায়নি— এবং যেহেতু তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছেন, নিজেকে কোনো আলোকময় "জনহীন দেশে" বিস্ফোরিত না করে; সুতরাং তিনি যে শুধু আরোহণ করতে পারবেন, তাই নয়, *অবরোহণ* করতেও পারবেন অস্তিত্বের মহান্ সোপানক্রমে, এবং তাঁর ব্যক্তিগত সত্তাকে ব্যবহৃত করতে পারবেন জড়তত্ত্বের মধ্যে উচ্চতম ও নিম্নতমের মধ্যে সেতু বা সংযোজক রূপে। পৃথিবীতে তাঁর কাজ হলো এক প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা পরমা শক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে, পরমচেতনা ও জড়তত্ত্বের মধ্যে— শ্রীমার ভাষায়, *দুটি প্রান্তকে সংযুক্ত করা।* পৃথিবীতে সদ্‌বস্তুর অধঃক্ষেপণকারী তিনি। এই কারণেই আশা আছে যে, যে-সব অন্ধ নিয়তি এখন পৃথিবীতে শাসন করছে— মৃত্যু, যন্ত্রণা, যুদ্ধ— তাদের পরিবর্তিত করা যেতে পারে এই পরমা নিয়তি দ্বারা, এবং আলোকের মধ্যে এক নতুন বিবর্তনের পথ প্রশস্ত করতে পারে : *সম্মুখেই আমরা দেখি এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব, এবং ভৌতিক বিপ্লব শুধু তার ছায়া ও প্রতিফলন।*[২৮]

চন্দননগর আগমনের দু'মাস পরে, শ্রীঅরবিন্দ আবার শ্রবণ করলেন এক বাণী : পণ্ডিচেরী যাও। কিছুদিন পরে, *ডুপ্লে* জলযানে আরোহণ করে, ব্রিটিশ পুলিশকে হতবুদ্ধি করে তিনি যাত্রারম্ভ করলেন গোপনে, এবং চিরতরে ছাড়লেন উত্তরভারত। *ভগবান্ আমাকে যেভাবে পরিচালিত করতেন, আমি সেইভাবে চালিত হওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলাম।*[২৯] তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছর তিনি অতিবাহিত করেছিলেন, শ্রীমার সহযোগিতায়, এই ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে এক পার্থিব উপলব্ধিতে রূপান্তরিত করবার জন্য : *আমরা চাই অতিমানসকে এক নতুন শক্তিরূপে অবতীর্ণ করিয়ে আনতে। এখন যেমন মন মানবজাতির মধ্যে চেতনার এক স্থায়ী অবস্থা, তেমনই আমরা চাই এক নতুন জাতি সৃষ্টি করতে যার মধ্যে অতিমানস হবে চেতনার এক স্থায়ী অবস্থা।*[৩০] এবং তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়, সেজন্য শ্রীঅরবিন্দ বারংবার গুরুত্ব আরোপ করেছেন : *ভবিষ্যতের মানবজাতির জন্য নতুন বা পুরোনো কোনো ধর্মের প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য হতে বহুদূর। এ বিষয়ে আমার ধারণা হলো, একটি পথ উন্মুক্ত করতে হবে, যা এখনও অবরুদ্ধ হয়ে আছে, কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা নয়।*[৩১] আমরা এখনও জানি না, এই অতিমানস অভিযান সফল হবে কি না। বৈদিক ঋষিগণ এই পথের বাধা অপসারিত করতে সমর্থ হননি, সমগ্র জগতের জন্য "এই মহান্ পথ" উন্মুক্ত করতে সমর্থ হননি, এবং তাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে এক স্থায়ী ও সামূহিক উপলব্ধিতে পরিণত করতে পারেননি— তার একটি কারণ ছিল। দেখতে হবে, সেই কারণ আজও আছে কি না।

১৬

মানব, এক পরিবর্তনকালীন সত্তা

পণ্ডিচেরীতে প্রথম কয়েকটি বছর শ্রীঅরবিন্দ কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। যাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে পারতেন, তাঁদের থেকে অনেক দূরে তিনি ছিলেন, একজন সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরূপে, যাঁর চিঠিপত্র পরীক্ষা করা হতো, এবং তাঁর ন্যূনতম গতিবিধিও ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা লক্ষ্য করত, এবং তারা বিভিন্ন কৌশলে তাঁকে প্রত্যর্পণ করবার চেষ্টায় রত থাকত; তিনি যে ঘরে বসবাস করতেন, সেখানে সন্দেহজনক কাগজপত্র রেখে তাঁকে ফ্রেঞ্চ পুলিশের* কাছে বদনাম করবার চেষ্টা তারা করেছিল। এমন-কি, তারা তাঁকে অপহরণ করে নেওয়ার চেষ্টাও করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ শান্তিতে মোটেই ছিলেন না— সেদিন পর্যন্ত, যেদিন ফ্রেঞ্চ পুলিশ অধীক্ষক তাঁর ঘরে খানাতল্লাসি করবার জন্য এসে তাঁর ড্রয়ারে আবিষ্কার করলেন হোমার্-এর গ্রন্থাবলী; তা সত্যই গ্রীক্ কি না সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসাদি করবার পর এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ-গ্রন্থাধ্যয়নকারী, ফ্রেঞ্চভাষী ভদ্র যোগীর প্রশংসায় তিনি পরিপূর্ণ হয়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে এই নির্বাসিত ব্যক্তি ইচ্ছানুযায়ী যে-কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন ও খুশিমতো

* পণ্ডিচেরী সে-সময়ে এক ফ্রেঞ্চ-অধিকৃত অঞ্চল ছিল।

যাওয়া-আসা করতে পারতেন। অনেক সহযোদ্ধা তাঁর অনুসারী ছিলেন, এবং তাঁরা অপেক্ষায় ছিলেন কখন তাঁদের "নেতা" আবার রাজনৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ করছেন; কিন্তু "দিব্য বাণী" নীরব ছিল, সেজন্য তিনি আর কোনো পদক্ষেপ নিলেন না। তা ছাড়া, শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন, সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রস্তুত হয়ে আছে, স্বাধীনতার উদ্দীপনা তাঁর দেশপ্রেমী বন্ধুদের মধ্যে জাগরিত হয়েছে, এবং স্বাধীনতা পর্যন্ত ঘটনার স্রোত অবশ্যম্ভাবী পথে গতি করবে, ঠিক যেমন তাঁর ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন। অন্যান্য কাজ তাঁর অপেক্ষায় ছিল।

রচনাবলী

নির্বাসনের এই প্রথম বছরগুলির উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার : তাঁর দ্বারা মূল বেদের অধ্যয়ন। সে-পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ অধ্যয়ন করেছিলেন শুধু ইংরেজি বা ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ, এবং অন্যান্য সংস্কৃত বিদ্বান্‌দের সঙ্গে তার মধ্যে দেখেছিলেন কর্মকাণ্ডীয় মন্ত্রাবলীর এক অস্পষ্ট সমূহ, *যার মূল্য বা গুরুত্ব কিন্তু খুবই কম ছিল চিন্তার ইতিহাসের জন্য বা এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য।*[১] কিন্তু হঠাৎ, মূল বেদে তিনি সন্ধান পেলেন *চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সব চেয়ে মূল্যবান স্বর্ণপ্রবাহের।*[২] *প্রথমে আমি দেখতে পেলাম যে বেদের মন্ত্রাবলী নির্মল ও নির্ভুলভাবে আলোকপাত করেছিল আমার নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিসমূহের উপর, যার যথার্থ ব্যাখ্যা য়ুরোপীয় মনস্তত্ত্বে বা যোগ বা বেদান্তের কোনো শিক্ষণের মধ্যে আমি পাইনি।*[৩] আমরা নিশ্চয় ভালোভাবে কল্পনা করতে পারি, শ্রীঅরবিন্দ কত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তাঁর নিজের অনুভূতিতে, এবং তাঁর কী হচ্ছে তা বোঝবার জন্য তাঁকে কীভাবে অনেক বছর অতিবাহিত করতে হয়েছিল। চন্দননগরে তাঁর অতিমানস অনুভূতির কথা আমরা বর্ণনা করেছি, যেন স্তরগুলো পরিষ্কারভাবে একের পর এক অনুসরণ করে এসেছে, তাদের ব্যাখ্যাপূর্ণ টীকা সমেত, কিন্তু ব্যাখ্যা এসেছে দীর্ঘকাল পরে— সে-সময়ে তাঁর জন্য কোনো সাইন্‌পোস্ট্ ছিল না তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য। চতুর্বেদের* প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদই অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে সংকেতপ্রদান করে যে, তিনি এই গ্রহে সম্পূর্ণ একাকী ও পথভ্রষ্ট নন। পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা, এমন-কি ভারতীয় বিদ্বানেরাও এসব গ্রন্থের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি যে উপলব্ধি করতে পারেননি, তাতে কিছুই আশ্চর্যান্বিত হওয়ার নেই, যখন আমরা বুঝতে পারি যে সংস্কৃত শব্দমূলগুলোর দ্বিবিধ, এমন-কি, ত্রিবিধ অর্থও আছে, এবং সে-সব অর্থ আবার দ্বিবিধ প্রতীকত্বও বহন করে : অভ্যন্তরীণ বা নিগূঢ়, এবং প্রকাশিত বা উন্মুক্ত। এই স্তোত্রগুলি পাঠ করা

* চতুর্বেদ : ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ।

যেতে পারে উপর্যুপরি দু-তিনটে অর্থের স্তর নিয়ে, এবং যথার্থ তাৎপর্য পাওয়ার পরেও আমরা কয়েকটি প্রতীককে অদ্ভুত মনে করতে বাধ্য হব, যেমন "জলমধ্যস্থ অগ্নি", "পরমজন্মের সম্ভাবনাপূর্ণ পর্বত", কিংবা "হারানো সূর্যের" সম্পূর্ণ অন্বেষণ, এবং তারপর "অন্ধকার-নিবাসী সূর্যের" আবিষ্কার, যদি-না আমাদের উপলব্ধি হয় জড়তত্ত্বে আধ্যাত্মিক অগ্নির, নিশ্চেতনার অশ্মের বিদীর্ণ হওয়ার অথবা শরীরের কোষসমূহে ভাস্বরতার পরীক্ষামূলক তাৎপর্য। ঋষিগণ কি নিজেরাই বলেননি, "ঋষিপ্রজ্ঞাময় নিগূঢ় শব্দরাজি ঋষির নিকট ব্যক্ত করে অন্তর্নিহিত অর্থ" (ঋগ্‌বেদ, ৪.৩.১৬)। শ্রীঅরবিন্দ দেখেছিলেন যা, তার জন্য সকল তাৎপর্য বুঝতে পারলেন, এবং ঋগ্‌বেদের এক বৃহৎ অংশের অনুবাদ আরম্ভ করলেন, বিশেষত বিস্ময়কর অগ্নিসূক্তাবলী (Hymns to the Mystic Fire)। আমরা চিন্তামগ্ন ও বিস্মিত হয়ে যাই, যখন বিবেচনা করি যে পাঁচ বা ছ হাজার বছর পূর্বের এই ঋষিগণ শুধু তাঁদের স্বীয় অনুভূতিই আমাদের হস্তান্তরিত করে নি, তাঁদের "পূর্বপুরুষদের", তাঁদের ভাষা অনুযায়ী "মনুষ্য পিতৃগণের", অনুভূতিও হস্তান্তরিত করেছেন— কত সহস্রাব্দ পূর্বের কথা?— এবং তা পুরুষানুক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়ে এসেছে, কোনো ত্রুটি ব্যতীত, ক্ষুদ্রতম মাত্রারও বিচ্যুতি ব্যতীত, কারণ মন্ত্রের শক্তি নির্ভর করে বিশেষভাবে তার উচ্চারণের নির্ভুলতার উপর। আমাদের সমক্ষে এ হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম পরম্পরা, অক্ষুণ্ন অবস্থায়। আমাদের মানব যুগচক্রের (বোধহয়, এর পূর্বেও অন্যান্য যুগচক্র বিগত হয়ে গেছে) প্রারম্ভিক সময়ের পরম রহস্য শ্রীঅরবিন্দ পুনরাবিষ্কার করেছেন এমন এক যুগে যাকে ভারতীয়েরা অভিহিত করেন "তিমিরাচ্ছন্ন' *কলিযুগ*, এবং এ কথা তাৎপর্যশূন্য নয়। এ কথা যদি সত্য হয় যে নিম্নতমের নিম্নে নতুন স্তরের উপরিভাগ আছে, তা হলে আমরা নিকটবর্তী হচ্ছি।*

যা হোক, শ্রীঅরবিন্দকে যদি আমরা বৈদিক অন্তঃপ্রকাশের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দিই, তা হলে তা ভুল হবে। আমাদের কাছে তা যতই বিস্ময়কর মনে হোক, তাঁর কাছে তা ছিল পথ-পরিচিতির চিহ্ন, ঘটনার পরে দৃঢ়ীকরণ। বিংশ শতাব্দীতে বেদের পুনঃপ্রচলন— যেন তা উপনীত হয়েছিল সত্যের চূড়ান্ত শিখরে সবসময়ের জন্য— তা হবে এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা, কারণ সত্য কখনো নিজেকে

* ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে, প্রত্যেক যুগচক্রে চারটি যুগ : *সত্যযুগ*, সত্যের যুগ (বা স্বর্ণযুগ) ; তারপর আসে *ত্রেতাযুগ*, যে যুগে "সত্যের তিন-চতুর্থাংশ" অবশিষ্ট থাকে,তারপর "সত্যার্ধের" *দ্বাপরযুগ*, এবং অবশেষে যে যুগে সত্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য, *কলিযুগ* : যখন সংকেত-শব্দ হারিয়ে গেছে। কলিযুগের পর নতুন সত্যযুগ আসে, কিন্তু তার মধ্যে সংঘটিত হয় এক প্রলয়, সম্পূর্ণ ধ্বংস, যখন বিশ্ব "আবার বিলয়প্রাপ্ত" হয়। শ্রীঅরবিন্দের মতানুযায়ী, অতিমানসের আবিষ্কার অন্য সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে।

পুনরাবৃত্ত করে না। শ্রীঅরবিন্দ একবার হাস্যচ্ছলে লিখেছিলেন : *সত্যই, অতীতের প্রতি এই আতঙ্কিত শ্রদ্ধা এক বিস্ময়কর ও ভয়াবহ বস্তু! সব-কিছু সত্ত্বেও, ভগবান্ অসীম, এবং সত্যের প্রকাশও হতে পারে এক অন্তহীন প্রক্রিয়া। তা এমন কোনো বস্তু নয় যা বাদামের মধ্যে থাকে, ও প্রথম ঋষি বা জ্ঞানীর দ্বারা একবার ভাঙা হলেই তার অন্তর্নিহিত বিষয় নিঃশেষিত হয়ে যাবে, এবং তাঁর পরবর্তী সকলকে সেই একই বাদামের খোল ভাঙতে হবে, ধার্মিক নিষ্ঠার সঙ্গে।* [৪] শ্রীঅরবিন্দ ঋষিদের মতো শুধু ব্যক্তিগত উপলব্ধির জন্যই সাধনা করেননি, সাধনা করেছিলেন এক সামূহিক উপলব্ধির জন্য, এমন এক পরিবেশে, যা আর সেই প্রাগৈতিহাসিক মেষপালকদের পরিবেশ ছিল না। প্রারম্ভিক ভাবে, অধিকাংশ সময় তিনি অতিবাহিত করতেন তাঁর গ্রন্থাবলীর রচনায়, এবং সম্ভবত সেই মুহূর্তে তাই ছিল তাঁর সামূহিক কর্মের সর্বাপেক্ষা অধিকতম দৃশ্য চিহ্ন। ১৯১০-এ একজন ফরাসি লেখক পণ্ডিচেরী এসেছিলেন, পল্ রিশার্ (Paul Richard) ; তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন, এবং তাঁর মতামতে এত গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন যে, তিনি আবার এসেছিলেন ১৯১৪-এ, বিশেষ করে তাঁকে দেখবার জন্যই, এবং এবার তাঁকে প্রেরণা দিলেন তাঁর চিন্তাধারাকে লেখায় ব্যক্ত করতে। একটি দ্বিভাষিক আলোচনামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হল, এবং রিশার্ ফরাসি বিভাগের দায়িত্বে রইলেন। এইভাবেই জন্মগ্রহণ করল *আর্য* বা *Philsophical Review*, এবং তার ফরাসি মুদ্রণটির নাম হল *Revue de la Grande Synthèse (Review of the Great Synthesis)*। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, রিশার্ আহূত হয়ে ফিরে গেলেন ফ্রান্সে ; এবং শ্রীঅরবিন্দ একাকী রয়ে গেলেন প্রত্যেক মাসে চৌষট্টি পৃষ্ঠার দর্শন প্রকাশ করবার জন্য, যদিও তাঁর মধ্যে কোনো দার্শনিক মোটেই ছিলেন না : *দর্শন! বিশ্বাসের সঙ্গে তোমাকে আমি বলতে চাই যে, আমি দার্শনিক ছিলাম না, কখনো না, কখনো না, কখনো না— যদিও আমি দর্শন লিখেছি, যা অন্য এক কাহিনী। দর্শনের বিষয়ে আমি প্রায় কিছুই জানতাম না, যোগ আরম্ভ করে পণ্ডিচেরী আসবার পূর্বে— আমি ছিলাম কবি ও রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ছিলাম না। দর্শন লিখতে কীভাবে সমর্থ হলাম, এবং কেন? কারণ প্রথমে পল্ রিশার্ আমাকে প্রস্তাব দিলেন এক দার্শনিক আলোচনামূলক পত্রিকায় সহযোগিতা করতে— এবং আমার সিদ্ধান্ত ছিল যে একজন যোগী যে কোনো জিনিসে হাত দিতে পারা উচিত। সেজন্য আমি বিশেষভাবে অসম্মতি প্রকাশ করতে পারলাম না ; তারপর তাঁকে যুদ্ধে চলে যেতে হলো, আমাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে, প্রতি মাসে চৌষট্টি পৃষ্ঠার দর্শনের সঙ্গে যা আমাকেই একাকী লিখতে হতো। দ্বিতীয়ত দৈনিক যোগাভ্যাসে আমি যা পর্যবেক্ষণ করেছিলাম ও জানতে পেরেছিলাম সে-সব বুদ্ধি পরিভাষায় আমাকে শুধু লিপিবদ্ধ করতে হতো, এবং এভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শনের উদ্ভব হলো। কিন্তু তা দার্শনিক হওয়া নয়।* [৫]

এইভাবে শ্রীঅরবিন্দ একজন লেখক হলেন। তাঁর বয়স তখন বিয়াল্লিশ বছর। তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, নিজে কোনো নিষ্পত্তি তিনি গ্রহণ করেননি; "বাহ্য" ঘটনাচক্রই তাঁকে এই পথে উপনীত করেছিল।

১৯২০ পর্যন্ত, ছ বছর ধরে অব্যাহতভাবে শ্রীঅরবিন্দ একাদিক্রমে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর রচিত প্রায় সকল গ্রন্থাবলী, যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার। কিন্তু তিনি এক অসাধারণ উপায়ে লিখতেন, একটি গ্রন্থের পর আরেকটি গ্রন্থ না লিখে, একই সঙ্গে চারটি, এমন-কি, ছটি গ্রন্থও রচনা করতেন, অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর, যেমন *The Life Divine (দিব্যজীবন)*, তাঁর মূল দার্শনিক গ্রন্থ ও বিবর্তনের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি, *The Synthesis of Yoga (যোগসমন্বয়)*, যেখানে তিনি পূর্ণযোগের বিভিন্ন স্তর ও অনুভূতির বিষয় বর্ণনা করেছেন ও সকল প্রাচীন ও আধুনিক যোগসাধনার বিষয় বর্ণনা করেছেন ও সকল প্রাচীন ও আধুনিক যোগসাধনার বিষয় পর্যালোচনা করেছেন, *Essays on the Gita (গীতা নিবন্ধমালা)*, যা প্রকাশ করে তাঁর কর্মদর্শন, *The Secret of the Veda (বেদরহস্য)*, ভাষার মূল উৎসের উপর এক আলোচনা সমেত, *The Ideal of Human Unity (মানব ঐক্যের আদর্শ)* এবং *The Human Cycle (মানবযুগচক্র)*, যা বিবর্তনের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের বিচার ও মানবসমাজের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পরীক্ষা। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন

এক সংকেত ব্যাখ্যা যা করে সকল সংকেতের।[৬]

দিনের পর দিন, নীরবে, শ্রীঅরবিন্দ পৃষ্ঠাগুলো পূর্ণ করে চললেন। অন্য কেউ হলে ক্লান্ত হয়ে যেতেন, কিন্তু তিনি "চিন্তা" করতেন না কী লিখবেন; তিনি এক শিষ্যকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন : *লেখার জন্য আমি কোনো চেষ্টাই করিনি; আমি উচ্চতর শক্তিকেই কাজ করবার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম, এবং যখন তা কাজ করেনি, আমি কোনো চেষ্টাই করিনি। পুরোনো বৌদ্ধিক দিনগুলিতে আমি কখনো কখনো জোর করে কাজ করেছি, কিন্তু যোগের মাধ্যমে কবিতা ও গদ্যের উৎকর্ষসাধনের পর আমি আর তা করিনি। আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, যখন আমি "আর্য" লিখতাম, এবং আমি যখন পত্র বা পত্রোত্তর লিখি, আমি কখনো চিন্তা করি না। এক নীরব মন হতেই আমি লিখি যা-কিছু ঊর্ধ্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আসে।*[৭] অনেক সময়ে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা লেখক বা কবি ছিলেন, তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করতেন যৌগিক প্রক্রিয়ায় সাহিত্য-সৃষ্টির বিষয়ে; তিনি বিস্তৃতভাবে প্রণালীটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, কখনোই নিশ্চেষ্ট হননি, কারণ তিনি মনে করতেন যে সৃজনশীল কর্ম এক শক্তিশালী মাধ্যম। অতিচেতন সীমাকে দূরবর্তী করে দেওয়ার এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাগুলোকে জড়ত্বের মধ্যে

নিক্ষিপ্ত করবার লক্ষ্যাভিমুখে। এই পত্রাবলীর কয়েকটি অতীব শিক্ষাপ্রদ। সেই পত্রাবলীর একটিতে তিনি লিখছেন : *শরীরের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ উপশম শরীরের বাইরে ও মস্তকের উর্ধ্বে চিন্তা করা (কিংবা মহাশূন্যে অথবা অন্য কোনো স্তরে, কিন্তু শরীরের বাইরে)। যাই হোক, আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল; যখন তা হয়েছিল, আমি অনুভব করেছিলাম, অপরিমেয় শান্তি; তারপর আমি শারীরিক ক্লান্তি অনুভব করেছি, কিন্তু আর কখনো মস্তিষ্কে কোনো প্রকার ক্লান্তি অনুভব করিনি।*[৮] আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, "শরীরের বাইরে চিন্তা করা" কোনো প্রকারে এক অতিমানসিক ব্যাপার নয়, এবং এ এক সহজ অনুভূতি যা লাভ করা যেতে পারে, মনকে যখন নীরব করা হয়, তখনই। শ্রীঅরবিন্দের মত অনুযায়ী, প্রকৃত প্রক্রিয়া হলো কোনো চেষ্টা না করবার জন্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া, নিজেকে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে অপসৃত করে নেওয়া, যেন স্রোতটি নিজের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যায় : *গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড-এ পৌঁছবার দুটি পথ আছে। একটি হলো আরোহণ করা, সংঘর্ষ করা, প্রচেষ্টা করা (সেই তীর্থযাত্রীর মতো, যে ভূ-শায়িত হয়ে শরীর দিয়ে পথ মেপে মেপে ভারত পরিক্রমা করে— সে হলো প্রয়াসের পথ)। একদিন তুমি নিজেকে হঠাৎ পাবে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড-এর উপর, যখন তুমি মোটেই সে আশা কর না। অন্যটি হলো মনকে এমনভাবে প্রশান্ত করে দেওয়া যে, এক বৃহত্তর মহামানস তার মধ্য দিয়ে কথা বলতে পারে (আমি এখানে অতিমানসের কথা বলছি না)।*[৯] একজন শিষ্য প্রশ্ন করেছিলেন, যদি আমাদের মন চিন্তা না করে, চিন্তা বাইরে থেকে আসে, তা হলে একজনের চিন্তা হতে অন্যজনের চিন্তা কীভাবে আলাদা হয়? শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিয়েছিলেন : *প্রথমত এইসব চিন্তাতরঙ্গ, চিন্তাবীজ বা চিন্তারূপ অথবা যা-কিছু তারা, তারা কিন্তু বিভিন্ন মূল্যের, এবং চেতনার বিভিন্ন স্তর থেকে আসে। এবং সে-সব চিন্তার উপাদান উর্ধ্বতর কিংবা নিম্নতর স্পন্দন গ্রহণ করতে পারে, এবং তা নির্ভর করে, চেতনার যে ভূমির মধ্য দিয়ে সে-সব চিন্তা প্রবেশ করেছে (উদাহরণস্বরূপ, চিন্তাশীল মন, প্রাণিক মন, ভৌতিক মন, অবচেতন মন), কিংবা চেতনার যে শক্তি তাদের ধরে নিয়ে কোনো এক ব্যক্তির প্রতি প্রচালিত করে তার উপর। তা ছাড়া, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনের কিছু উপাদান আছে, এবং আগন্তুক চিন্তন তাই ব্যবহার করে নিজেকে আকার দেওয়ার জন্য, কিংবা ভাষায় প্রকাশ করবার জন্য (সাধারণত আমরা তাকে বলি প্রতিলিপিকরণ), কিন্তু সেই উপাদান কোনো এক মনে অন্যান্য মনের অপেক্ষা হতে পারে সূক্ষ্মতর বা স্থূলতর, বলবত্তর বা দুর্বলতর ইত্যাদি। তা ছাড়া, এক প্রকৃত বা সম্ভাব্য মনঃশক্তি আছে যা ভিন্ন প্রত্যেকের মধ্যে, এবং এই মনঃশক্তি চিন্তার গ্রহণে হতে পারে আলোকময় বা অস্পষ্ট, সাত্ত্বিক [প্রশান্ত], রাজসিক [আবেগময়] বা তামসিক [জড়], যার ফলাফল প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়।*[১০] শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন : *বুদ্ধি*

প্রকৃতির এক অকারণ ও অতিরিক্ত কর্মচঞ্চল অংশ। সে সবসময়ই মনে করে যে, সে নিজে হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত কোনো কাজই ভালোভাবে করা যেতে পারবে না। এবং সেজন্য সে প্রবৃত্তিবশত হস্তক্ষেপ করে সকল প্রেরণার মধ্যে, তার অর্ধেক বা অর্ধাধিক প্রেরণার পথরোধ করে, এবং যে শব্দ বা ছন্দ প্রকৃতই আসা উচিত, তার পরিবর্তে তার নিজেরই নিম্নমানের কষ্টসাধ্য সৃষ্টিকে স্থাপিত করবার জন্য পরিশ্রম করে। কবি যন্ত্রণার মধ্যে পরিশ্রম করে একটি যথার্থ শব্দ, একটি বিশুদ্ধ ছন্দ, তাঁর বক্তব্যের দিব্য সারতত্ত্ব পাওয়ার জন্য, কিন্তু তা সবসময়ই অন্তরালে অপেক্ষা সম্পূর্ণ ও প্রস্তুত অবস্থায়।[১১] শিষ্য আবারও মতদ্বৈধ প্রকাশ করলেন, প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে, বারংবার আঘাত ও মুদ্‌গরের প্রহারের মতো কঠোর প্রয়াসের প্রেরণা আবির্ভূত হয় : *যথার্থ। যখন কোনো প্রকৃত প্রভাবের সৃষ্টি হয়, তা বারংবার আঘাত বা কঠোর প্রয়াসের জন্য হয় না; বরং, তা হয়, কারণ, মুদ্‌গরের তুলে ধরা ও তার পড়ার মধ্যেই প্রেরণা চুপিসারে অবতীর্ণ হয়ে প্রবেশ করে, পাশবিক কোলাহলের আবরণের মধ্যে।*[১২] তাঁর শিষ্যদের জন্য এত গ্রন্থরচনার পর, শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, গ্রন্থাবলী ও দর্শন রচনা করবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, প্রকৃতই মনকে আলোকিত করা নয়, বরং তাকে নীরব করা, যেন, প্রশান্ত হয়ে, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণার অনুভব আরম্ভ করতে পারে এবং গ্রহণ করতে পারে। বিবর্তনের আরোহণে মনের ভূমিকার বিষয়ে তিনি সংক্ষেপে বলেছেন : *প্রকৃতির বিশাল ও সুনির্দিষ্ট অবচেতন ক্রিয়া ও পরমেশ্বরের বিশালতর অমোঘ অতিচেতন ক্রিয়ার অন্তর্বর্তী এক অকুশল অবস্থা। এমন-কিছু নেই যা মন করতে পারে, অথচ মনের নিশ্চলতা ও চিন্তাযুক্ত স্থিরতার মধ্যে আরো ভালোভাবে করা যেতে পারে না।*[১৩]

ছ বছর পর ১৯২০-তে, শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করলেন, উপস্থিত সময়ের মতো, তিনি যথেষ্ট বলেছেন। *আর্য* বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর লেখক জীবনের অবশিষ্ট প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হলো তাঁর বিশাল পত্রাবলীর রচনায়— হাজার হাজার পত্র, যেখানে আছে সকলপ্রকার যৌগিক অভিজ্ঞতার, বাধাবিঘ্নের ও অগ্রগতির কার্যকারী সূচনা। এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা, ত্রিশ বছরেরও বেশি এক সময় ধরে তিনি তাঁর বিস্ময়কর ২৮৮১৩-পঙ্‌ক্তির মহাকাব্য *সাবিত্রী* রচনা ও পুনর্বিন্যাস করলেন, পঞ্চম বেদের মতো, যা তাঁরই বাণী, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর অনুভূতি নিম্নতর ও ঊর্ধ্বতর জগৎসমূহে, অবচেতনায় তথা নিশ্চেতনায় তাঁর সংঘর্ষ, এবং পার্থিব ও বিশ্বময় বিবর্তনের সমগ্র নিগূঢ় ইতিহাস —তাঁর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় দিব্যদৃষ্টি পর্যন্ত :

আত্মার সংকেতে বিশ্বের অর্থবিচার করে
অন্তর হতে পাঠ করলেন বহির্বিষয় তিনি।[১৪]

শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দ শুধু গ্রন্থরচনার জন্য আসেননি, করণীয় কর্মও ছিল তাঁর। জানুয়ারি ১৯২১ থেকে তিনি আর্য বন্ধ করলেন, শ্রীমার পণ্ডিচেরীতে বাস করবার জন্য আগমনের কয়েক মাস পরে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রথম শিষ্যদের একবার বলেছিলেন : *যখন আমি পণ্ডিচেরী আসি, আমার সাধনার জন্য অন্তর হতে একটি কার্যক্রমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আমি তা অনুসরণ করে নিজের জন্য কিছু অগ্রগতি করলাম কিন্তু অন্যদের সাহায্য করবার জন্য বিশেষ কিছু করতে পারলাম না। তারপর শ্রীমা এলেন এবং তাঁরই সাহায্যে আমি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি পেলাম।*[১৫]

শ্রীমার বিষয়ে বলা সহজ নয়, কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁর মতো এমন এক ব্যক্তিত্বকে কয়েকটি ছোটো ছোটো সত্য ঘটনার বর্ণনার মধ্যে সহজে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না— তিনি এক গতিশীলা মহাশক্তি। যা-কিছু ঘটে গেছে গতকালই, যা-কিছু বলা হয়েছে, করা হয়েছে বা অনুভূত হয়েছে পূর্বদিন পর্যন্ত, তা-ই তাঁর কাছে হয়ে গেছে পুরোনো, আকর্ষণবিহীন; তিনি সবসময়ই অগ্রণী, সবসময়ই সম্মুখবর্তী, সাবিত্রীর মতো, তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল *সীমালঙ্ঘনের জন্য।* সেজন্য, তাঁকে এক কার্যক্রম-নির্ধারিত জীবনে বন্দী করা যথার্থ হবে না।

শুধু এ কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭৮ ফেব্রুয়ারি ২১-এ, এবং তাঁরও অতিমানস দিব্যদৃষ্টি উপলব্ধ হয়েছিল, স্বতন্ত্ররূপে। এ কথা আশ্চর্যজনক নয় যে, এই চেতনার সাহায্যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের অস্তিত্বের বিষয় জেনেছিলেন, তাঁকে সশরীরে দেখবার ও তাঁর নিকট আসবার বহুপূর্বে। তিনি বলেছেন : *এগারো থেকে তেরো বছরের মধ্যে উপর্যুপরি অনেক চৈত্যিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির এক পর্যায় আমার নিকট শুধুই যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রকাশ করল, তাই নয়, তা ছাড়া এ কথাও প্রকাশ করল যে মানুষের পক্ষে ভগবান্‌কে পাওয়া ও তাঁকে তার চেতনায় ও কর্মে সমন্বিতরূপে ব্যক্ত করা এবং পৃথিবীতে এক দিব্যজীবনে তাঁকে অভিব্যক্ত করা সম্ভব। এই অন্তঃপ্রকাশ এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য এক ব্যবহারিক ও নিয়মানুগ উপদেশও আমাকে আমার শারীরিক নিদ্রার মধ্যে বিভিন্ন গুরু কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল, যাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়েছিল জীবনের পরবর্তী সময়ে অন্তত তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে, অন্তরের ও বাইরের এই বিকাশের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, এইসব সত্তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক সম্পর্ক ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট ও ফলপ্রদ হয়ে উঠল।... যে মুহূর্তে আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম, আমি জানতে পারলাম যে, এই সেই ব্যক্তি, যিনি এসেছেন পৃথিবীতে এক নির্দিষ্ট কার্যের সংসিদ্ধির জন্য, এবং আমাকে তাঁরই*

সঙ্গে কাজ করতে হবে। রূপন্তরের আরম্ভ আসন্ন হয়ে এসেছিল। ১৯২৬-এ শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে সম্পূর্ণ নির্জনতায় প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর শ্রীমা আশ্রমের ভার গ্রহণ করলেন, এবং ১৯৫০-এ তাঁর মহাসমাধির পর শ্রীমা সেই কাজ অব্যাহত রেখেছেন। *শ্রীমার ও আমার চেতনা অভিন্ন।*[১৬] এ কথা অত্যন্ত প্রতীকাত্মক যে, শ্রীঅরবিন্দ পূর্ব থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন্ত সমন্বয়ের প্রতিনিধি, এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই নতুন সংযোগে তা সম্পূর্ণ হলো, যেন এই বিশ্বজগৎ প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ হতে পারবে একত্রে আগমনে চিরতরে— অস্তিত্বের মেরুদ্বয়ের, চেতনা ও শক্তির, পরমাত্মা ও পৃথিবীর, পুরুষ ও প্রকৃতির।

বিবর্তনের রূপরেখা

শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ যে রূপান্তর-কার্যে নিরত, আমরা সকলেই একদিন-না-একদিন সেই কার্যে যোগদান করব, কারণ তাই আমাদের বিবর্তনের ভবিষ্যৎ। প্রক্রিয়া, বাধাবিঘ্ন এবং ব্যর্থতা বা সার্থকতার সম্ভাবনার বিষয়ে আমরা যদি যথাযথভাবে বুঝতে চাই, তা হলে আমাদের নিজেদের বিবর্তনের তাৎপর্য বোঝা উচিত, যেন আমরা এতে এক সক্রিয় অংশ নিতে পারি, অন্তহীন গোলকধাঁধার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দের হাতে আমাদের এই কাজের ভার ছেড়ে না দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ তত্ত্বকথায় আগ্রহী নন, তাঁর বিবর্তনের অন্তর্দৃষ্টি মুখ্যত নির্ভর করে এক অনুভূতির পর। যদি তা প্রকাশ করবার জন্য তিনি প্রয়াস করেছেন এমন এক পরিভাষায় যা আমাদের নিকট তাত্ত্বিক মনে হয়, তার কারণ আমাদের সে অনুভূতি হয়নি (এখন পর্যন্ত হয়নি); তাঁর উদ্দেশ্য নয়, এ জগতে ভ্রাম্যমাণ লক্ষ লক্ষ ধারণার মধ্যে আমাদের সঙ্গে আরো একটি ধারণায় অংশগ্রহণ করা; তাঁর উদ্দেশ্য, আমাদের *নিজেদের* ক্রিয়াশক্তির ভারসাম্য রক্ষার উপায়টিকে ধারণ করবার জন্য এবং বিবর্তনপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবার জন্য আমাদের সাহায্য করা। নিঃসন্দেহে, মানবজাতির বর্তমান পরিস্থিতি আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার উপযুক্ত নয়।

সেই উপায় *অগ্নি,* চিৎশক্তি, এবং সমগ্র বিবর্তনের বর্ণনা করা যেতে পারে অগ্নির যাত্রারূপে, চতুষ্টয় গতির মাধ্যমে— নিবর্তন, অববর্তন, নিবর্তন, বিবর্তন —আরম্ভ তার শাশ্বত কেন্দ্র হতে ও বিকাশ তাঁরই মধ্যে। এই গতি-চতুষ্টয় বস্তুত তিনি স্বয়ং। সব-কিছুই তিনি। *তিনিই স্বয়ং লীলা, তিনিই লীলাময়, তিনি লীলাভূমি।*[১৭] তিনি স্বয়ং সময়ের বাইরে, ব্যাপ্তির বাইরে, বিশুদ্ধ সত্তা, বিশুদ্ধ চেতনা, সেই বিশুদ্ধ শুভ্র নীরবতা যার মধ্যে সব-কিছু স্থিত এক *নিবর্তিত* অবস্থায়, আত্মস্থিত, নিরাকার। এবং তিনিই স্বয়ং এই সম্ভূতির মধ্যে : শক্তি চেতনা হতে বিচ্ছিন্ন হয়, প্রকৃতি পুরুষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং অগ্নির যাত্রা আরম্ভ হয় :

মুদিত গভীরতায় বিকীর্ণ, তাঁর আলোকিত স্মিত
অগ্নিদীপ্ত করে দিল সব জগতের নীরবতা।[১৮]

প্রকৃতি নিজেকে পুরুষ হতে বাইরে নিক্ষিপ্ত করেন, আনন্দের বিস্ফোরণের সঙ্গে, তাকে পুনর্বার সময়ের মধ্যে পাওয়ার খেলা খেলবার জন্য— পুরুষ ও প্রকৃতি, একের মধ্যে দুই। *এই সমগ্র বিষয়ের আরম্ভ তা হলে কোথায়? সৎ নিজেকে বহুগুণিত করেছেন, অস্তিত্বের বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য, এবং অগণিত পরার্ধ পরার্ধ রূপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন, যেন তিনি নিজেকে অসংখ্যভাবে পেতে পারেন।*[১৯] কিন্তু এই আরম্ভ চিরন্তন, সময়ের মধ্যে কোথাও তা স্থিত নয়। যখন আমরা বলি "প্রথমে" শাশ্বত, "তারপর' সম্ভূতি, আমরা তখন স্থান-কাল-সীমায়িত ভাষার ভ্রমের অধীনে চলে আসি; যখন আমরা "উচ্চ" বা "নীচের" কথা বলি, তখনও একই কথা। আমাদের ভাষা ভ্রমাত্মক, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির মতো। বস্তুত, সৎ ও সম্ভূতি, পুরুষ ও প্রকৃতি, একটি একক শাশ্বত সত্যের দুটি মুখ যা *সমকালীন*— এই বিশ্ব এক শাশ্বত ঘটনা, সময়াতীত নীরবতা যেমন শাশ্বত : *বলা হয়েছে, প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন শাশ্বত, অসীম, অদ্বিতীয়। বলা হয়েছে, মধ্যে বিদ্যমান সসীম, ক্ষণস্থায়ী, বহু। বলা হয়েছে, পরিশেষে বিদ্যমান থাকবেন অদ্বিতীয়, অসীম, শাশ্বত। কিন্তু প্রারম্ভ কখন হয়েছিল? সময়ের কোনো বিশেষ ক্ষণে হয়নি, কারণ, আরম্ভ প্রত্যেক মুহূর্তেই হচ্ছে; আরম্ভ সবসময় ছিল, সবসময় আছে, সবসময় থাকবে। দিব্য প্রারম্ভ সময়ের পূর্বে, সময়ের মধ্যে, এবং সময়ের অতীতে— চিরন্তন রূপে। শাশ্বত, অসীম, অদ্বিতীয় এক শেষহীন আরম্ভ। এবং মধ্যবর্তী সময় কোথায়? কোনো মধ্যবর্তী সময় নেই, কারণ বিদ্যমান শুধু এক সন্ধিক্ষণ শাশ্বত শেষ ও শাশ্বত আরম্ভের; তা হলো সৃষ্টির চিহ্ন— যে সৃষ্টি প্রতিমুহূর্তে নূতন। সৃষ্টি চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। শাশ্বত, অসীম, অদ্বিতীয় তাঁর স্বীয় অস্তিত্বের বিস্ময়কর মধ্যবর্তী সময়; তিনিই এই অনাদি অশেষ সৃষ্টি। এবং শেষ কোথায়? কোনো শেষ নেই। ধারণার পরিসীমায় স্থিত কোনো মুহূর্তে শেষ সম্ভব নয়। কারণ বস্তুসমূহের সকল সমাপ্তি নবীন বস্তুসমূহের আরম্ভ, যা সেই একই অদ্বিতীয়, সর্বদা বিকাশশীল ও পৌনঃপুনিকভাবে মূর্ত। কোনো কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ সব-কিছুই তিনি, যিনি চিরন্তন। শাশ্বত, অসীম ও অদ্বিতীয় সেই অকল্পনীয় পরিণতি যা কখনো তাঁর মহিমার সীমাহীন নবীন প্রসারিত দৃশ্যাবলীর অবসান করে না।*[২০] শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন : *একটি পৃথিবীর উপর মানবজীবনের পরীক্ষণ এখন প্রথমবার সংঘটিত হচ্ছে না। পূর্বে, লক্ষ লক্ষ বার তা সংঘটিত হয়েছে এবং এই দীর্ঘ নাটক লক্ষ লক্ষ বার পুনরাবৃত্ত হবে। আমরা এখন যা-কিছু করি, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আবিষ্কার, আমাদের ত্বরান্বিত বা দুরূহ প্রাপ্তি— এ-সবের মাধ্যমে আমাদের*

অবচেতন লাভবান্ হয়, এবং আমাদের অজ্ঞাত গ্রহসকলে ও এ-পর্যন্ত সৃষ্ট না হওয়া জগৎসমূহে আমাদের পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। ঘটনাক্রম, আকস্মিক পরিবর্তন ও চরম পরিণতি অবিরত পরিবর্তিত হয়, তথাপি তারা পরিচালিত হয় এক শাশ্বত শিল্প দ্বারা। ঈশ্বর, মানব ও প্রকৃতি তিনটি চিরন্তন প্রতীক। শাশ্বত পুনরাবৃত্তির ধারণা ভয়ে শিহরিত করে দেয় মনকে, যা সীমিত, সসীমের সকল মিথ্যা সুরক্ষা মিনিট, ঘণ্টা, বৎসর, শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু শক্তিমান্ আত্মা নিজের অমর উপাদানের বিষয়ে ও নিজের চিরপ্রবহমান শক্তির অশেষ সমুদ্রের বিষয়ে সচেতন, এবং এই ধারণার দ্বারা অধিকৃত হয় এক অকল্পনীয় আনন্দের শিহরনের সঙ্গে। এই চিন্তার অন্তরালে অসীমের শিশুসুলভ হাসি সে শুনতে পায়, তাঁর আনন্দের সঙ্গে।[২১]

সৎ হতে সম্ভূতি পর্যন্ত এই শাশ্বত সংক্রমণই শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় *অববর্তন*। এ এক ক্রমান্বয়িক সংক্রমণ : পরম চেতনা তৎক্ষণাৎ জড়তত্ত্বে পরিণত হন না। জড়তত্ত্ব সর্বশেষ অধঃক্ষিপ্ত অবস্থা, চেতনার বিরামবিহীন বিভাজন বা সংক্ষেপণের শেষ পরিণতি, যা ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে। এই অববর্তনের গতিপথের "শীর্ষে"— যা শীর্ষ নয়, বরং এক পরম বিন্দু যা সর্বত্র বিরাজমান— অতিমানস চিৎশক্তি সম্ভূতির অসীম সম্ভাবনাকে ধারণ করেন, যা সংগৃহীত হয়ে থাকে একটি একক অবলোকনে, যেমন সূর্যের অগ্নি তার সকল রশ্মিকে ধারণ করে তার কেন্দ্রে। ঋগ্‌বেদের বাণী : "সূর্যের অশ্বদের তাঁরা মুক্ত করেন; এক সহস্র দণ্ডায়মান সম্মিলিতভাবে; সেখানে বিদ্যমান সেই এক, তদেকম্" (৫.৬২.১)। তারপর অধিমানস উন্মুক্ত হয়, চেতনার "বিরাট্ বিভাজন" আরম্ভ হয়; সূর্যের রশ্মিগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, একক চিৎশক্তি এরপর থেকে নিক্ষিপ্ত হন পরার্ধ পরার্ধ শক্তিরূপে, যাদের প্রত্যেকে তার স্বীয় পরম উপলব্ধি অন্বেষণ করবে। একবার আরম্ভ হওয়ার পর, এই লীলা বন্ধ হবে না যে-পর্যন্ত সকল সম্ভাবনা সংসিদ্ধ না হয়েছে, এবং তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শাশ্বত লীলাময়ের বিপরীত বলে যা মনে হয় তাও। সেই শক্তি ক্রমবর্ধমান গতিশীল আবেগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, যেন তা সহসা উপস্থিত হতে চায় নিজেরই সীমান্ত দেশে, নিজেরই অন্বেষণে, সবসময় বহুদূরে, এবং অদ্বিতীয়কে প্রতিস্থাপিত করতে চায় এক অসম্ভবসংখ্যক পরিমাণ দ্বারা। এবং চেতনা বিকীর্ণ হয়ে যায়, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়, ক্রমবর্ধমানভাবে ঘন অস্পষ্ট হয়ে যায়, স্থিরীকৃত হয় স্তরের পর স্তরে, বা জগতের পর জগতে, যাদের প্রত্যেকে অধ্যুষিত হয়ে থাকে তার নিজের সত্তা ও শক্তিদের দ্বারা, তার বিশিষ্ট জীবনধারার সঙ্গে। সকল পবম্পরাই এ সব শক্তিদের সাক্ষ্য বহন করে; আমরাও হয়তো তাদের সাক্ষাৎ পাই আমাদের নিদ্রায়, কিংবা আমাদের খোলা চোখে, যদি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হয়ে থাকে। দেবগণ হতে শুরু করে প্রতীকাত্মক বামনদের

পর্যন্ত, চেতনা ন্যূনতর হয়, বিভাজিত হয়, বিচূর্ণিত হয় : অধিমানস, বোধিমানস, জ্যোতির্মানস, ঊর্ধ্বমানস, তারপর, প্রাণ ও সূক্ষ্ম ভৌতিক স্তর— নিজেরই শক্তির মধ্যে চেতনা ক্রমবর্ধমানভাবে আবদ্ধ ও বিজড়িত হয়ে যায়, বিশৃঙ্খলিত হয়ে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির মধ্যে, এক মুহূর্ত হতে অন্য মুহূর্তে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেদনের মধ্যে, যা তাকে জীবনধারণে সমর্থ করে, এবং তারপর তার সর্বশেষ বিঘটন হয় জড়ের মধ্যে, যেখানে সব-কিছুই খণ্ডিত বিখণ্ডিত হয়ে আছে। বেদের উক্তি, "আরম্ভে, অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে সংগুপ্ত ছিল, এ সব-কিছু ছিল এক নিশ্চেতনার মহাসাগর। বিশ্বময় সত্তা বিভাজন দ্বারা প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল" (ঋগ্‌বেদ, ১০.১২৯.১, ৫)। অববর্তন সম্পূর্ণ। এ ছিল *আলোকের নিমজ্জন তার নিজের ছায়ার মধ্যে*[২২], অর্থাৎ জড়তত্ত্বে।

আমরা এখন দুটি মেরুর সম্মুখে। শীর্ষে, এক পরম নাস্তিধর্মী তত্ত্ব (অথবা অস্তিধর্মী তত্ত্ব, যা নির্ভর করে নিজের মতের উপর) যেখানে মনে হয় শক্তি বিলীন হয়ে গেছে *আলোকের এক শূন্যতার* মধ্যে, অবিক্ষুব্ধ এক প্রশান্তির অতল গভীরতার মধ্যে, যেখানে সব-কিছু আত্মনিহিত। অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন নেই ন্যূনতম স্পন্দনের— এই হলো *সৎ*। অন্য মেরুতে, এক পরম অস্তিধর্মী তত্ত্ব (অথবা নাস্তিধর্মী তত্ত্ব, যা নির্ভর করে নিজের মতের উপর), যেখানে মনে হয় চেতনা বিলীন হয়ে গেছে অন্ধকারের এক শূন্যতার মধ্যে, অন্ধ শক্তির এক অতল গহ্বরের মধ্যে, যেখানে শক্তি চিরতরে বন্দী তার অস্পষ্ট ঘূর্ণনের মধ্যে— এই হলো *সম্ভূতি*, অপ্রতিহত ও অবিরত। এই হলো প্রথম দ্বৈতত্বের উদ্‌ভব, যা হতে অন্যগুলি উদ্‌ভূত হয় : এক ও বহু, অসীম ও সসীম, চেতনা ও শক্তি, আত্মা ও জড়, নিরাকার ও বহু আকারের উত্তেজনা— পুরুষ ও প্রকৃতি। আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব এক মেরু হতে অন্য মেরু পর্যন্ত হ্রাস পায় ও পুনর্বার প্রবাহিত হয়; আমাদের মধ্যে কয়েকজন শুধু বিশ্বাতীত সত্তাকেই প্রত্যক্ষ করবার জন্য সংকল্পবদ্ধ, যাঁকে তাঁরা অভিহিত করেন পরম অস্তিবাচক তত্ত্ব, ও জড়তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন এক প্রকার সাময়িক মিথ্যারূপে, যাকে তাঁরা সহ্য করেন মহান্ প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা ক'রে (কিন্তু কোথায় সেই 'প্রত্যাবর্তন' হওয়া সম্ভব, যদি-না তা হয় সর্বত্র, ঊর্ধ্বে, নিম্নে, ডানে, বাঁয়ে!); এবং অন্যেরা শুধু জড়তত্ত্বের উপরই বিশ্বাস করেন, যাকে তাঁরা অভিহিত করেন পরম অস্তিবাচক তত্ত্ব, এবং আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করেন এক সুনিশ্চিত ও নাস্তিবাচক মিথ্যারূপে, কারণ, মানবীয় যুক্তি অনুযায়ী, অস্তিবাচক কখনো নাস্তিবাচক হতে পারে না, কিন্তু নাস্তিবাচকও অস্তিবাচক হতে পারে না। কিন্তু তা এক ভ্রম মাত্র। চেতনা শক্তিকে লুপ্ত করে না, কিংবা জড়তত্ত্বও আত্মাকে লুপ্ত করে না, অসীমও সীমাকে লুপ্ত করে না, যেমন ঊর্ধ্ব নিম্নের বিরোধ করে না— কারণ, তা নিম্ন শুধু আমাদের কাছে, এবং প্রত্যেক চরমবিন্দুতে অন্তর্নিহিত আছে তার শাশ্বত সঙ্গী। *এই*

জগৎকে আমরা যেমন দেখি, সেখানে আমাদের মানসিক চেতনাকে আমরা যতই ঊর্ধ্বে নিয়ে যাই-না-কেন, আমরা লক্ষ্য করি যে প্রত্যেক অস্তিবাচক তত্ত্বের সঙ্গে একটি নাস্তিবাচক তত্ত্ব আছে। কিন্তু এই নাস্তিবাচক তত্ত্ব শূন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, যা-কিছু আমাদের শূন্য বলে বোধ হয়, তা-ই পরিপূর্ণ শক্তিতে, অস্তিত্বের ক্ষমতায় পরিপূর্ণ। নাস্তিধর্মী তত্ত্বের বিদ্যমানতা তার অনুরূপ অস্তিধর্মী তত্ত্বকে অস্তিত্ববিহীন বা অবাস্তবে পরিণত করে না। তা অস্তিধর্মী তত্ত্বকে পরিণত করে শুধু বস্তুসমূহের সত্যের, এমন-কি, বলতে পারি, অস্তিধর্মী তত্ত্বের নিজস্ব সত্যেরও এক অসম্পূর্ণ নিরূপণে, কারণ, অস্তিধর্মী তত্ত্ব ও নাস্তিধর্মী তত্ত্ব শুধু যে পাশাপাশি অবস্থিত, তাই নয়, বরং পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বিদ্যমান। তারা পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে, এবং যেখানে সীমিত মন উপনীত হতে পারে না, সেই সর্বদৃষ্টির নিকট, পরস্পরের ব্যাখ্যা করে। প্রত্যেকে শুধু নিজের রূপেই প্রকৃতপক্ষে পরিজ্ঞাত হয় না, তার গভীরতর সত্যে তাকে আমরা জানতে আরম্ভ করি, যখন আমরা তার মধ্যে দেখতে পাই তার আপাতপ্রতীয়মান বিপরীতের ইঙ্গিত।[২৩] ঊর্ধ্বে, প্রকৃতি যেন নিদ্রিত পুরুষের মধ্যে; গভীরতায়, পুরুষ যেন নিদ্রিত প্রকৃতির মধ্যে; শক্তি চেতনায় বিলীন, ও চেতনা শক্তিতে বিলীন; সীমার মধ্যে নিহিত অসীম, যেমন বৃক্ষ ও তার শাখাপ্রশাখা নিহিত বীজে। শ্রীঅরবিন্দ একেই অভিহিত করেন "নিবর্তন" : *জড়তত্ত্বের নিশ্চেতনা এক আবৃত চেতনা, এক অন্তর্লীন বা নিদ্রাচর চেতনা, যা আত্মার সকল অব্যক্ত ক্ষমতা ধারণ করে। জড়তত্ত্বের প্রত্যেক কণায়, পরমাণুতে, অণুতে, কোষিকায় গুপ্তভাবে বিদ্যমান ও অজ্ঞাতভাবে সক্রিয় শাশ্বতের সর্বজ্ঞতা, ও অসীমের সর্বশক্তিমত্তা।*[২৪] ঊর্ধ্বের নিবর্তন সমাপ্ত হয় নিম্নে নতুন নিবর্তনে, যেখান সব-কিছু নিহিত, অব্যক্তভাবে রাত্রির মধ্যে, ঠিক যেমন সবই নিহিত ছিল ঊর্ধ্বে, অব্যক্তভাবে, আলোকের মধ্যে। *অগ্নি সেখানে* "উষ্ণ স্বর্ণরেণুর মতো"। ঋগ্বেদের বাণী : "*অগ্নি* প্রবেশ করেছেন পৃথিবী ও স্বর্লোকে, যেন তারা এক" (৩.৭.৪)। *এক অর্থে, বলা যেতে পারে যে, সমগ্র সৃষ্টি এক গতিশীলতা দুটি নিবর্তনের মধ্যে : পরমাত্মা, যাঁর মধ্যে সব-কিছু অন্তর্নিহিত। এবং যাঁর মধ্য হতে সব-কিছু নিম্নাভিমুখে বিবর্তিত [বা, অববর্তিত] হয় অন্য মেরু জড়তত্ত্বের অভিমুখে, এবং জড়তত্ত্ব, যার মধ্যেও সব-কিছু অন্তর্নিহিত, এবং যার মধ্য হতে সব-কিছু ঊর্ধ্বাভিমুখে বিবর্তিত হয় অপর মেরু পরমাত্মার অভিমুখে।*[২৫]

এই নিবর্তন ব্যতীত কোনো বিবর্তন সম্ভব নয়, কারণ, শূন্য হতে কীভাবে কোনো কিছু উদ্ভূত হতে পারে? বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার জন্য, অন্তর হতে প্রেরিত করবার জন্য কিছু একটা প্রয়োজনীয়। *জড়তত্ত্ব হতে কিছুই বিবর্তিত হতে পারবে না, যদি তা পূর্ব হতেই সেখানে নিহিত না থাকে।*[২৬] কিন্তু এখন জাগরণরত এই নির্বাক্ নিশ্চলতার গভীরে, রূপের বিবর্তনাত্মক বিস্ফোরণের

অন্তরালে, *অগ্নিই* প্রচালিত করেন, অনুপ্রাণিত করেন উদ্দীপনাকে, শক্তিকে চেতনার অন্বেষণে, প্রকৃতিকে পুরুষের অন্বেষণে, পুরুষের অভিব্যক্তিতে ক্রমবর্ধমানভাবে সমর্থ রূপের অন্বেষণে। প্রকৃতি তাঁর নিশ্চেতন রাত্রি হতে নির্গত হন ও তাঁর নিযুত কর্মের মধ্য দিয়ে, নিযুত প্রজাতির মধ্য দিয়ে অন্বেষণ করেন, মনে হয়, যেন সেই হারানো একক রূপের সৌন্দর্য সর্বত্র পুনরধিকার করবার জন্য, সেই একক আনন্দকে অগণিতভাবে পুনরধিকার করবার জন্য— *এক নিযুত-শরীরী আনন্দ*[২৭], এক শূন্য হর্ষাবেশের পরিবর্তে। এবং বেদোক্ত "কর্ণের কর্ণ" যদি আমাদের থাকে, তাহলে আমরা শুনতে পাব যে, রাত্রি সর্বদা ক্রন্দনরতা আলোকের জন্য, প্রাচীরাবদ্ধ চেতনা ক্রন্দনরতা আনন্দের জন্য,

সকল অস্তিত্বে গভীর অধ্যাত্ম ক্রন্দন।[২৮]

তা-ই আমাদের প্রেরিত করে গভীর অন্তর হতে। অন্তরে এ এক অগ্নি, জড়তত্ত্বে অগ্নিশিখা, আমাদের মনে অগ্নিশিখা, আমাদের আত্মায় অগ্নিশিখা, এই অগ্নিকে আমাদের অধিকার করতেই হবে, এই হলো সূত্র, উত্তোলন-দণ্ড, সংগুপ্ত বিবর্তনীয় প্রেরণা, এই হলো জগতের আত্মা ও অগ্নিশিখা। যদি এ জগৎ প্রাণহীন জড় প্রস্তর ব্যতীত অন্য-কিছুই না হতো, তাহলে তা রয়ে যেতো শুধু প্রাণহীন জড়প্রস্তর হয়ে, যদি জড়ের মধ্যে পূর্ব হতেই আত্মা নিহিত না হতো, তা হলে তা মানুষের মধ্যে কখনো অভিব্যক্ত হতে পারত না। *কিন্তু প্রতীয়মানের অন্তরালে কী এই, যা রহস্য মনে হচ্ছে? আমরা দেখতে পারি যে, এই যে চেতনা যা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল তা আবার ফিরে আসছে নিজের কাছে, তার বিশাল আত্মবিস্মৃতির মধ্য হয়ে প্রকাশিত হয়ে, ধীরে ধীরে, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, এক জীবনরূপে, যা সম্ভাব্য সংবেদনশীল, অর্ধসংবেদনশীল, স্বল্পসংবেদনশীল এবং সম্পূর্ণ সংবেদনশীল, এবং অবশেষে সংঘর্ষ করে সংবেদনশীল হতে অধিকতর কিছু হওয়ার জন্য, পুনর্বার দিব্যভাবে আত্মসচেতন, মুক্ত, অসীম ও অমর হওয়ার জন্য।*[২৯]

জীবনের প্রকাশ এইভাবে চলে, সে-দিন পর্যন্ত, যখন প্রকৃতি অভিব্যক্ত করেন মানুষকে, যে তাঁর সচেতন যন্ত্র, এবং যার মধ্যে, যার সাহায্যে ও যার মাধ্যমে তিনি পুরুষকে পুনর্বার প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সমর্থ হবেন। *আমাদের মানবত্ব সসীম ও অসীমের এক সচেতন মিলন-স্থল, এবং এই পার্থিব জন্মে অসীমের প্রতি অধিকতর বিকাশলাভ করা, সেই হলো আমাদের সুযোগ।*[৩০] কিন্তু যখন *অগ্নি* তাঁর যাত্রায় মানবীয় স্তরে উপনীত হন, তখন এক বিশেষ ঘটনা ঘটে। পূর্বের সকল স্তরে, বিবর্তনীয় অগ্নিশিখা স্বয়ং প্রশমিত হয়ে যায় বলে মনে হয়, যখন নতুন আবির্ভাবের স্থিরতা সুনিশ্চিত হয়ে যায়: জীবনের ক্ষেত্রে

প্রাণীজগৎ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্ভিদ্‌জগতের বহুলতা প্রশমিত হয়েছে, ঠিক যেমন মানবজাতি বিবর্তনে একবার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রাণীজগতের প্রাচুর্যও প্রশমিত হয়েছে। বিবর্তনের শীর্ষস্থান মানুষ অধিকার করবার পর মনে হয় না যে প্রকৃতি-দ্বারা উদ্ভিদ্‌জগতের বা প্রাণীজগতের কোনো নতুন গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। অন্য কথায়, প্রজাতিগুলো মোটামুটিভাবে স্থির হয়ে গেছে, একপ্রকার পূর্ণতা তারা পেয়েছে, প্রত্যেকে নিজের পর্যায়ে, এবং তারা সেখানেই অবস্থান করে। কিন্তু মানুষের বিবর্তনীয় প্রেরণা প্রশমিত হয়নি, যদিও তার প্রজাতি বিবর্তনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সে সংসিদ্ধ নয়, অন্যান্য প্রজাতির মতো সন্তুষ্ট নয়। তার মধ্যে সমন্বয় নেই, সমতাপ্রাপ্তির আনন্দ তার মধ্যে নেই। *মানুষ এক অস্বাভাবিক সত্তা যে তার স্বাভাবিকতা এখনও পায়নি —সে কল্পনা করতে পারে যে সে তা পেয়েছে, তার নিজের ধরনে সে স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা এক প্রকারের সাময়িক শৃঙ্খলা। সুতরাং মানুষ উদ্ভিদ্ ও পশু হতে প্রভূতভাবে শ্রেষ্ঠতর হলেও নিজের প্রকৃতিতে সে উদ্ভিদ ও পশুর মতো পূর্ণ নয়।*[৩১]

শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন : *এই অপূর্ণতা মোটেই কোনো পরিতাপের বিষয় নয়। বরং এ এক সুযোগ, এক সম্ভাবনা।*[৩১] যদি আমরা সম্পূর্ণ ও সুসংগত প্রজাতি হতাম, তা হলে আমরা পরিণত হতাম এক স্থির প্রাণীতে, উভচরদের মতো, শামুকদের মতো। কিন্তু আমরা বিরাট্ বিশ্বময় লীলার পুনঃপ্রকাশ করি, এবং আমাদের মধ্যে তপঃ এখনও প্রয়াসরতা চেতনা-প্রাপ্তির জন্য, শক্তি প্রয়াসরতা আত্মার প্রাপ্তির জন্য, প্রকৃতি পুরুষের জন্য— প্লেটো কখনো কি সন্তোষ পেয়েছিলেন, মাইকেলেঞ্জেলো কি শান্তি পেয়েছিলেন কখনো? "এক রাত্রিতে আমি সৌন্দর্যকে অঙ্কে ধারণ করেছিলাম, এবং দেখলাম সেও তিক্ত।" রিম্‌বড়্-এর প্রকাশ। এই হলো চিহ্ন যে, মানসিক বুদ্ধি বা সৌন্দর্যবোধের সূক্ষ্মতার এক শিখর এই যাত্রার লক্ষ্য নয়, পূর্ণতা নয়, নয় সেই মহৎ সমত্ব যা প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের পুনরাবিষ্কারে প্রাপ্ত হয়। অন্তরস্থ আত্মা যা জাগরিত হয়, বিকশিত হয়— প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ— কেন্দ্রস্থ ক্ষুদ্র শিখা, প্রথমে স্পর্শ করেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, অণু, বংশবীজ†, প্রাণাংশ††; নিজের চারধারে এ সংগঠিত করেছে এক পৃথক ও খণ্ডিত অহং; ভালোভাবে দেখতে এ অসমর্থ এবং অন্ধকারে হাতড়ায়; এ দ্বিবিধভাবে "নিবর্তিত" এবং এক বিশাল অবচেতনা ও এক প্রচণ্ড অতিচেতনার মধ্যস্থিত এক সংকীর্ণ মানসিক বাতায়নের মাধ্যমে এ দেখে। এই বিভাজন শিশুসুলভ— কারণ এ আমাদের সকল ভুল ও দুঃখকষ্টের

---

† gene ;

†† protoplasm

কারণ : এ ছাড়া অন্য কোনো পাপ নেই। আমাদের সকল অশুভ, দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা হতে উদ্‌ভূত হয়, যা আমাদের সম্বন্ধে ও এই জগতের সম্বন্ধে এক মিথ্যা দৃষ্টি। কারণ, প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্বজগৎ, এবং আমাদের শরীরের প্রত্যেক কোষিকা *সচ্চিদানন্দ*— **সৎ, চিৎ,** আনন্দ। আমরা আলোক ও আনন্দ। *আমাদের ইন্দ্রিয়াবলীর অসামর্থ্য অন্ধকারের উদ্ভাবন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, আলোক ব্যতীত অন্য কিছুই নেই, শুধু, আমাদের ক্ষুদ্র মানবীয় দৃষ্টিশক্তির সীমিত পরিসরের ঊর্ধ্বে এবং নিম্নেও, আলোক বিদ্যমান।*[৩২] এবং সব-কিছুই আনন্দ : "কারণ কেই-বা জীবনধারণ করতে পারবে, অথবা নিশ্বাসগ্রহণ করতে পারবে, যদি না থাকত এই অস্তিত্বের আনন্দ, আমরা যে আকাশের মধ্যে বাস করি তার মতো?" বলছেন উপনিষদ্ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২.৭.)। আমাদের দৃষ্টির দুর্বলতাই লুকিয়ে রাখছে আমাদের থেকে *বস্তুসমূহের হৃদয়ে নিহিত পরম আনন্দ,*[৩৩] এই *আমাদের ম্লান ইন্দ্রিয়*[৩৪] এখনও অপরিপক্ব, এখনও জানে না কীভাবে এই বিশালতাকে ধারণ করতে হবে— আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মা এখনও প্রয়াস করছে নিজেকে আবিষ্কার করবার জন্য। অগ্নির যাত্রা এখনও সমাপ্ত হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মানুষ বিবর্তনের শেষ কথা নয়, সে *এক পরিবর্তনকালীন সত্তা।*[৩৫] *জড়তত্ত্বে প্রাণের বিবর্তন ও জড়তত্ত্বে মনের বিবর্তনের কথা আমরা বলি। কিন্তু বিবর্তন একটি শব্দ যা শুধু ঘটনাটির উল্লেখ করে, তার ব্যাখ্যাপ্রদান করে না। কারণ, মনে হয় কোনো কারণ নেই কেন প্রাণ বিবর্তিত হবে জড় উপাদান হতে বা মন জীবন্ত রূপ হতে, যদি-না আমরা স্বীকার করি যে প্রাণ পূর্ব হতেই জড়ে নিহিত এবং মন প্রাণে নিহিত, কারণ মূল উপাদানে, জড়তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন প্রাণের এক রূপ, এবং প্রাণ প্রচ্ছন্ন চেতনার এক রূপ। এবং তারপর মনে হয় আর কোনো বাধা থাকবে না এই ক্রমপর্যায়ের পরবর্তী পদক্ষেপে এবং এই স্বীকৃতিতে যে, মানসিক চেতনা স্বয়ং হতে পারে মানসাতীত ঊর্ধ্বতর অবস্থাসমূহের শুধু এক রূপ ও আবরণ। সেক্ষেত্রে, ভগবানের প্রতি, আলোক, আনন্দ, মুক্তি ও অমরত্বের প্রতি মানুষের অজেয় আবেগ নিজেকে শৃঙ্খলের যথার্থস্থানে উপস্থাপিত করে শুধু এক আদেশব্যঞ্জক প্রেরণারূপে, যার সাহায্যে প্রকৃতি প্রয়াসে রত বিবর্তনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনকে অতিক্রম করে; এবং এ কথা তেমনই স্বাভাবিক, সত্য ও যথার্থ মনে হয়, যেমন প্রাণের প্রতি যে প্রেরণা, প্রকৃতি রোপণ করেছিলেন জড়তত্ত্বের কিছু রূপের মধ্যে, অথবা মনের প্রতি যে প্রেরণা, প্রকৃতি রোপণ করেছিলেন প্রাণের কিছু রূপের মধ্যে। বলা হয়, পশু এক জীবন্ত গবেষণাগার, যেখানে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। মানুষ তেমনই হতে পারে এক চিন্তাশীল জীবন্ত গবেষণাগার, যার মধ্যে ও যার সচেতন সহযোগিতায় প্রকৃতি সৃষ্টি করবেন অতিমানব, দেবতা। কিংবা, বলা যেতে পারে প্রকৃতি অভিব্যক্ত করবেন ভগবান্‌কে।*[৩৬] বিবর্তন যদি উপনীত হয় এই দুরূহ পরিবর্তনের

সমাপ্তিতে, তা হলে মহান্ ভারসাম্যের উপলব্ধি হবে, আমরা প্রবেশ করব "বৃহৎ আবাসে"† (ঋগ্‌বেদ ৫।৬৮।৫)। জ্ঞানহীনভাবে ইতস্তত ভ্রমণ করবার পরিবর্তে শক্তি পুনর্বার আবিষ্কার করবে তার সমগ্র চেতনা, এবং অসমর্থভাবে বোঝা ও ভালোবাসার পরিবর্তে চেতনা আবিষ্কার করবে তার সমগ্র শক্তি।

কিন্তু ঋষিরাও জানতেন যে যাত্রার সমাপ্তি হয়নি; তাঁদের ভাষায়, *অগ্নি* "পদমস্তকহীন, গুপ্ত তাঁর উভয় শেষসীমা" (ঋগ্‌বেদ, ৪.১.১১)। স্বর্লোকের অতিচেতন *অগ্নি* ও ভূলোকের অবচেতন *অগ্নির* মধ্যবর্তী খণ্ডিত ক্ষুদ্র এক অগ্নিশিখা আমরা; আমরা যন্ত্রণা ভোগ করি, আমাদের দুর্দশার শয্যায় বিক্ষোভিত অবস্থায় থাকি, এক মুহূর্তে স্বর্গের সন্ধান করি ও পরবর্তী মুহূর্তে পৃথিবীর সন্ধান করি, কিন্তু কখনোই দুটো দিক্‌কে একত্রীভূত করতে পারি না। আমাদের মধ্যে অন্য এক জাতি আবির্ভূত হবে, এক পূর্ণ মানব, শুধু যদি তার জন্য আমরা সম্মত হই:

"বয়ন করো একটি নিষ্পাপ কর্ম;
মানব হয়ে ওঠো,
সৃষ্টি করো দেবতার জাতি,
সত্যের দ্রষ্টা তুমি,
ধারালো করো উজ্জ্বল বর্শাগুলোকে,
তুমি যা দিয়ে পরিষ্কার করবে
অমৃতগামী পথ;
গোপন সকল স্তরের জ্ঞাতৃগণ,
দেবতারা যে সোপান দিয়ে
অমৃতত্ব পেয়েছিলেন,
সেগুলো গঠন করো।"

(ঋগ্‌বেদ, ১০-৫৩-৬, ১০)

তখন আমরা ফিরে পাব আমাদের সৌর পূর্ণতা, আমাদের উভয় গুপ্ত শেষসীমা, আমাদের মাতৃদ্বয়কে একরূপে: "হে অগ্নি, তুমি স্বর্গের মহাসমুদ্রে যাও, দেবতাদের উদ্দেশে; প্রচেষ্টা করো সকল স্তরের দেবতাগণকে একত্রীভূত করবার জন্য, সূর্যের ঊর্ধ্বস্থ জলরাশির সঙ্গে নিম্নস্থ জগতের জলরাশিকে একত্রীভূত করবার জন্য" (ঋগ্‌বেদ ৩.২২.৩)। তখন আমরা উভয় জগতের, সকল জগতের আনন্দ, আনন্দ পৃথিবীর ও স্বর্গের, যেন দুটিই এক: "হে অগ্নিশিখা, মৃত্যুশীলকে পরম অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করো তুমি; জন্মদ্বয়ের জন্য

† "বৃহন্তং গর্তম্"। শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ: "vast home"।

তৃষিত ঋষির জন্য, তুমিই সৃষ্টি করো দিব্য আনন্দ ও মানবীয় হর্ষ" (ঋগ্‌বেদ, ১.৩১.৭)। কারণ, এই হলো বিবর্তনের পরিসমাপ্তিতে আমাদের লক্ষ্য : আনন্দ। আমরা প্রেমের কথা বলি, কিন্তু কোনো শব্দ এর অপেক্ষা অধিকতর মিথ্যাপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কি? যেমন হয়েছে আমাদের ভাবপ্রবণতার দ্বারা, আমাদের রাজনৈতিক দলসমূহের দ্বারা, আমাদের উপাসনালয় সকলের দ্বারা? কিন্তু এই আনন্দের অনুকরণ কেউ করতে পারবে না : এ এক শিশু যে সূর্যালোকে হাস্যরত, প্রেমময় সে, তার নৃত্যের সঙ্গে সে সব-কিছু ভাসিয়ে নিতে চায়। হ্যাঁ, আনন্দ, যদি আমাদের সাহস থাকে তা চাইবার জন্য। *বিজয়ী মানব-আত্মার লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজয়মাল্য, ক্রুশ্ নয়*[৩৭]— কিন্তু, *মানুষ এখনও দুঃখকেই ভালোবাসে, সেজন্য খৃস্ট এখনও জেরুজালেম্-এ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছেন।*[৩৮] আনন্দ, অস্তিত্বের, সামগ্রিক অস্তিত্বের, যা-কিছু বিদ্যমান তার মধ্যে, যা-কিছু হয়ে গেছে তার মধ্যে, যা-কিছু হবে তার মধ্যে, এইখানে নিম্নভূমিতে, অন্যত্র, সর্বত্র, *যেন শুধু আস্বাদন করছে নিজেকে ও নিজের সকল বিন্দুকে, এবং তার সকল বিন্দু পরস্পরকে আস্বাদন করছে ও প্রত্যেক বিন্দু সমগ্র মধুচক্রকে আস্বাদন করছে।*[৩৯] তারপর, বিবর্তন রাত্রি হতে নির্গত হয়ে সৌরচক্রে প্রবেশ করবে; আমরা বাস করব পরম একের চিহ্নের নিচে। আমাদের অন্তর্নিহিত ক্রুশবিদ্ধ ভগবান্ তাঁর ক্রুশ্ হতে অবতরণ করবেন ও মানুষ অবশেষে হয়ে উঠবে স্বয়ং পরম, হয়ে উঠবে স্বাভাবিক। *স্বতঃস্ফূর্ত সুসমন্বিত গতি দ্বিবিধ : জীবনের গতি, যা নিশ্চেতন বা মুখ্যত অবচেতন, যে সমন্বয় আমরা পাই পশুজগতে তথা নিম্নপ্রকৃতিতে; অন্যটি আত্মার। মানুষের অবস্থা পরিবর্তন, প্রয়াস ও অপূর্ণতার স্তর যা এ দুটির মধ্যবর্তী, প্রাকৃতিক ও আদর্শগত বা আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যবর্তী।*[৪০] *

---

* এ কথা উল্লেখনীয় যে শ্রীমার মতানুযায়ী, পার্থিব স্বর্গোদ্যানের সর্প বিবর্তনীয় শক্তির এক প্রতীক, যা মানবকে বাধ্য করেছে পাশব আনন্দ হতে বাইরে চলে আসতে, যেন জ্ঞানের ফল ভক্ষণ করে ও প্রত্যাবর্তনের সীমা পর্যন্ত মানসিক শক্তির অভিবৃদ্ধি করে সে উপনীত হতে পারে দিব্য আনন্দের অবস্থায়। গ্রীস্-এও পক্ষযুক্ত সর্পেরা দেবতা ডিমিটার্ (Demeter)-এর রথ টানে। সর্প শুধুই বিশ্বগত বিবর্তনের প্রতীক নয়, ব্যক্তিগত বিবর্তনীয় শক্তিরও প্রতীক : যখন আমাদের মূলদেশে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন ও আমাদের ভৌতিক চেতনা হতে মুক্তিলাভ করেন, যেখানে তিনি সর্পের মতো কুণ্ডলিতা হয়ে সুপ্তা ছিলেন, তখন তিনি কেন্দ্র হতে কেন্দ্রে উত্থিতা হন, এবং বিবর্তিত মানব সাধারণ নিশ্চেতনা হতে নির্গত হয়ে এক বিশ্বময় চেতনায় প্রবেশ করে, এবং পরিশেষে মস্তকোর্ধ্বে উন্মীলিত হয়ে সে দিব্য সৌর চেতনায় প্রবেশ করে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ও ঋষিগণের জন্য ঊর্ধ্বস্থ সৌর চেতনার আবিষ্কার শুধু এক প্রাথমিক বিবর্তনীয় স্তর; তারপর আবিষ্কার করতে হবে সেই সৌর চেতনাকে নিম্নে, জড়তত্ত্বে। এই হলো সেই সর্প যে নিজের লেজ নিজেই দংশন করে; অথবা এই হলো যা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "রূপান্তর"।

১৭

রূপান্তর

এক অতিমানস চেতনায় তথা এক নতুন শরীরে, এক নতুন জাতিতে আত্মার অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী, যেমন ছিল বানরের পর মানুষের আবির্ভাব। আসল প্রশ্ন হলো, এই নতুন বিবর্তন আমাদের নিয়ে সংঘটিত হবে, না, আমাদের ছাড়াই হবে। শ্রীঅরবিন্দ সমস্যাটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন : *পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক বিকাশ যদি জড়তত্ত্বে আমাদের আবির্ভাবের গোপন সত্য হয়ে থাকে, যদি তা মূলত হয়ে থাকে এক চেতনার বিবর্তন যা সংঘটিত হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে, তা হলে মানুষ তার এখনকার অবস্থায় সেই বিবর্তনের শেষ সীমা হতে পারে না : সে আত্মার এক অত্যন্ত অপূর্ণ প্রকাশ, মন স্বয়ং এক অতি সীমিত গঠন ও যন্ত্র; মন চেতনার শুধু এক মধ্যবর্তী অবস্থা, মানস সত্তা শুধু এক পরিবর্তনকালীন সত্তা। মানুষ যদি অসমর্থ হয় তার মানসিকতাকে অতিক্রম করায়, তা হলে তাকে অতিক্রম ক'রে অতিমানস ও অতিমানব সুনিশ্চিতভাবে আবির্ভূত হবে ও সৃষ্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি তার মনের সামর্থ্য থাকে যা তাকে অতিক্রম করে তার প্রতি উন্মীলনের জন্য, তা হলে কোনো কারণই নেই কেন মানুষ অতিমানসে ও অতিমানবত্বে উপনীত হবে না, অথবা তার মন, প্রাণ ও শরীরকে প্রকৃতির মধ্যে বিকাশোন্মুখ আত্মার বৃহত্তর অবস্থার বিবর্তনের*

জন্য কেন ব্যবহৃত হতে দেবে না?[১] শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আমরা উপনীত হয়েছি *রূপান্তরের এক সংকটে,*[২] যা নতুন, এবং যা তেমনই নির্ণায়ক, যেমন ছিল জড়তত্ত্বে প্রাণের আবির্ভাব বা প্রাণে মনের আবির্ভাবের সময়ের সংকট। এবং আমাদের মনোনয়নও নির্ণায়ক, কারণ এই সন্ধিক্ষণের প্রাণীদের জন্য কোনোপ্রকারে উদ্‌বিগ্ন না হয়েই তত্ত্বান্তর সংঘটিত করবার স্বীকৃতি প্রকৃতিকে দেওয়ার পরিবর্তে আমরা এবার "আমাদের নিজেদের বিবর্তনে সচেতন সহযোগী" হতে পারব, এই আহ্বানের সম্মুখীন হতে পারব, কিংবা অতিক্রান্ত হয়ে যাব, যে কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন।

ভবিষ্যতের আশা

কেমন হবে এই নতুন জাতি? এই লক্ষ্যটিকে বুঝতে পারা রূপান্তরের পথে এক বৃহৎ পদক্ষেপ, কারণ সেই ভবিষ্যৎকে কিছু সামান্যভাবে বুঝতে পারলে এবং তার প্রতি আস্পৃহান্বিত হলেও এক অদৃশ্য দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়, যার মধ্য দিয়ে আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর শক্তি প্রবেশ করতে পারে, এবং আমরা সহযোগিতা আরম্ভ করি। কারণ, আমাদের নিজেদের মানবীয় শক্তি সংঘটিত করতে পারবে না অতিমানসের অভিমুখে এই সংক্রমণ, বরং তা সম্ভব হবে ঊর্ধ্বের এই শক্তির প্রতি এক ক্রমবর্ধমানরূপে সচেতন সমর্পণের দ্বারা।

অতিমানস সত্তার চেতনার গঠন সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে জোর দিয়ে যা বলেছেন, আমরা তার উল্লেখ করছি : *অতিমানবত্ব নয় মানবের নিজের স্বাভাবিক শীর্ষে উন্নীত অবস্থা, নয় মানবীয় মহত্ত্ব, জ্ঞান, শক্তি, মেধা, সংকল্প, চরিত্র, প্রতিভা, কর্মশক্তি, সাধুত্ব, প্রেম, পবিত্রতা বা পূর্ণতার কোনো ঊর্ধ্বতর স্তর। অতিমানস এমন কিছু যা মানসিক মানবের ও তার সকল সীমার অতীত।*[৩] মন তার শেষ সীমায় উন্নীত হলে মানুষকে শুধু কঠিনতা দিতে পারে, তাকে দিব্যত্ব প্রদান করতে পারে না, এমন-কি তাকে আনন্দও দিতে পারে না, কারণ এ বিভাজনের এক যন্ত্র, এবং তার সমস্ত স্তরক্রম অবশ্যম্ভাবীরূপে নির্ভর করে শক্তিপ্রয়োগের উপর, এবং সে শক্তি হতে পারে ধার্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা আবেগজনিত; কারণ মন তার গঠনের জন্য মানবীয় সত্যের সমগ্রতাকে গ্রহণ করতে অসমর্থ। এবং যদি কখনো গ্রহণ করতে সমর্থ হয়, সে তার প্রয়োগে অসমর্থ হয়। যদি সামূহিক বিবর্তন বাস্তবিকরূপে আমাদের শুধু এক মানবিক ও সামাজিক "মহত্ত্বের" এক মনোরম মিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছু দিতে না পারে, দিতে পারে শুধু সেন্ট ভিন্‌সেন্ট ডি পল্ ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের কিছু নিক্ষিপ্ত অংশ, এবং সবৈতনিক অবকাশ, তা হলে এ কথা ভাবতে বাধ্য হব যে,

এমন এক পরিসমাপ্তি ব্যক্তিগত মানসিক বিবর্তনের শীর্ষদেশের "নিযুত স্বর্ণবিহঙ্গ" বা তারবাদ্য-চতুষ্টয়ের ঐকতান অপেক্ষা নীরসতর। যদি এত হাজার বছরের যন্ত্রণা ও প্রচেষ্টার একমাত্র পরিণতি হয় পৃথিবীতে এই প্রকারের আমোদপ্রমোদ, তা হলে বিশ্বময় প্রলয়— যার প্রতিশ্রুতি প্রাচীন পরম্পরাগুলো দিয়েছে— মোটেই খারাপ মনে হবে না।

যদি আমাদের মানসিক সম্ভাবনাগুলো পর্যাপ্ত নয়, এমন-কি তাদের শীর্ষস্থানেও. আমাদের প্রাণিক ও দৈহিক সম্ভাবনাগুলো আরও অপর্যাপ্ত। এ কথা সন্দেহজনক যে, আত্মা যখন অতিমানস চেতনায় অভিব্যক্ত হবে, তখন সে সন্তুষ্ট হবে এমন এক শরীরে যা ক্ষয় ও মাধ্যাকর্ষণের ভৌতিক নিয়মাবলীর অধীন; এ কথাও সন্দেহজনক যে, আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যমরূপে আমাদের মানসিক ভাষা, কলম, বাটালি* কিংবা তুলি-র সীমিত সম্ভাবনাকে সে স্বীকার করবে কি না। অন্য শব্দে, জড়তত্ত্বকে পরিবর্তিত হতে হবে। এই হল "রূপান্তরের" লক্ষ্য। এবং তা আরম্ভ করতে হবে আমাদের নিকটতম জড়বস্তু, শরীর দিয়ে : *আধ্যাত্মিক পরম্পরায় শরীরকে এক প্রতিবন্ধক মনে করা হয়েছে। তা আধ্যাত্মিকতা বা রূপান্তরের জন্য অসমর্থ, এবং এক গুরুভার বস্তুরূপে আত্মাকে পার্থিব প্রকৃতির সঙ্গে ধরে রাখে, এবং পরমের মধ্যে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার উপলব্ধিতে বা পরমের জন্য ব্যক্তিসত্তাকে বিলীন করে দেওয়াতে বাধাপ্রধান করে। যে সাধনা পৃথিবীকে শুধু দেখে অজ্ঞানের এক ক্ষেত্ররূপে, এবং পার্থিব জীবনকে দেখে মোক্ষপ্রদ প্রত্যাহারের এক প্রস্তুতিরূপে, সেখানে আমাদের নিয়তিতে শরীরের এই ভূমিকার ধারণা হয়তো যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু এখানে আত্মা-কর্তৃক শরীরধারণের এক সামগ্রিক উদ্দেশ্যের অংশরূপে পৃথিবীর উপর এক দিব্যজীবন ও পার্থিব প্রকৃতির মুক্তি সম্বন্ধে যে সাধনা চিন্তা করে, তার জন্য এ ধারণা যথেষ্ট নয়। সত্তার সম্পূর্ণ রূপান্তর যদি আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে শরীরের রূপান্তর নিশ্চয় তার এক অপরিহার্য অঙ্গ; অন্যথা, পৃথিবীতে এক পূর্ণ দিব্যজীবন সম্ভব নয়।*[৪]

শ্রীঅরবিন্দের মত অনুযায়ী, অতিমানসীকৃত জড়তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হল গ্রহণশীলতা : সচেতন সংকল্পশক্তির আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার জন্য এবং তার ইচ্ছানুযায়ী নিজেকে রূপায়িত করবার জন্য জড়তত্ত্ব সমর্থ হবে, যেমন মৃৎশিল্পীর আঙুলের আজ্ঞানুবর্তী হয় মাটি। নিবর্তিত অবস্থায় সে যে আধ্যাত্মিক শক্তি ধারণ করে, তাকে মুক্ত করে দিয়ে সে একবার প্রকাশ্যভাবে সচেতন হওয়ার পর জড়তত্ত্ব অতিমানস চেতনার অনুরূপ স্পন্দনের প্রতি সাড়া দিতে পারবে, ঠিক যেমন আমরা ক্রোধের স্পন্দনের প্রতি সাড়া দিই ক্রোধের সাহায্যে, কিংবা প্রেমের স্পন্দনে সাড়া দিই আমাদের হৃদয়ের এক উষ্ণতা দিয়ে। সচেতন নমনীয়তা

---

* chisel, ছেনি, যা ভাস্করের ব্যবহার্য।

অতিমানসীকৃত জড়তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হবে। অন্য সকল বৈশিষ্ট্য এই মুখ্য বৈশিষ্ট্য হতেই উদ্ভূত : অমরত্ব, কিংবা ন্যূনপক্ষে নিজের আকারের পরিবর্তন করা বা ইচ্ছানুসারে অন্যরূপ প্রদান করা, লঘুত্ব, সৌন্দর্য, জ্যোতির্ময়তা। অতিমানসীকৃত জড়তত্ত্বের এই হবে স্বাভাবিক গুণাবলী। *পরম সৌন্দর্য ও আনন্দের অভিব্যক্তিময় এক আধার এই শরীর হতে পারে— আত্মার আলোকময় সৌন্দর্য তাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে, তার মধ্য হতে বিকীর্ণ হতে পারে, যেমন একটি প্রদীপ বিকীর্ণ করে, পরিব্যাপ্ত করে তার অন্তর্নিহিত বহ্নিশিখাকে; শরীর তার মধ্যে বহন করতে পারে আত্মার পরমানন্দ, দ্রষ্টা মনের আনন্দ, প্রাণের হর্ষ ও আধ্যাত্মিক তৃপ্তি, এবং এক আধ্যাত্মিক চেতনায় মুক্ত ও এক অবিরাম আনন্দে রোমাঞ্চিত জড়তত্ত্বের হর্ষ।*[৫] বেদে কি পূর্বেই বলা হয় নি : "তখনই তোমার মানবত্ব হয়ে উঠবে এই সব দেবতাদের দিব্যকর্ম, মনে হবে, যেন স্বর্গের দৃশ্য জ্যোতিঃ তোমার মধ্যে স্থাপিত হয়েছে" (ঋগ্বেদ ৫.৬৬.২)?

এই সব উল্লেখনীয় পরিবর্তনের পূর্বে, যা বোধ হয় সর্বশেষে অভিব্যক্ত হবে, শ্রীঅরবিন্দ মনশ্চক্ষে দেখেছেন আমাদের শরীরতত্ত্বে যথেষ্ট পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরে আসব, যখন রূপান্তরের জন্য উদ্দিষ্ট ব্যবহারিক কর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করব। এখন শুধু উল্লেখ করা যাক, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শরীরে যে কয়েকটি ক্রিয়ামূলক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, সে সকল বিষয়ে। *দৈহিক যন্ত্রাবলীর প্রয়োগ-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সুনিশ্চিতরূপে হবে। তা বেশ হতে পারে ঠিক তাদের গঠনে ও তাদের গুরুত্বে; নতুন শারীরিক জীবনের উপর তাদের সীমিততাকে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যস্ত করতে দেওয়া যেতে পারে না। ...চিন্তারাজির আকার সঞ্চারিত করবার জন্য মস্তিষ্ক হয়ে উঠবে এক পথ, এবং শরীর ও বহির্জগতের উপর এক প্রভাবশালী ব্যাটারির মতো ক্রিয়াশীল হবে, যেখানে সকল চিন্তা নিজেদের সঞ্চারিত করবে প্রত্যক্ষভাবে মন হতে অন্যমনে, কোনো স্থূল উপকরণ ব্যতীত, এবং অনুরূপ প্রত্যক্ষতার সাহায্যে প্রভাবশীল হবে অন্যদের চিন্তায়, কর্মে ও জীবনে, এবং জড়বস্তুদের উপরও। হৃদয়ও সমানভাবে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং মাধ্যম হবে অনুভব ও আবেগের আদানপ্রদানের, যে-সব-কিছু বিকীর্ণ হবে বহির্জগতে চৈত্য কেন্দ্রের শক্তিসমূহের দ্বারা। হৃদয় হৃদয়কে উত্তর দেবে প্রত্যক্ষভাবে, জীবনীশক্তি অন্যান্য জীবনের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে, এবং তাদের আহ্বানের উত্তর দেবে, অপরিচিতি ও দূরত্ব সত্ত্বেও; অনেক সত্তা বাইরের কোনো যোগাযোগ ব্যতীতই বার্তার আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠবে, এবং একই দিব্য কেন্দ্র হতে বিকীর্ণ নিগূঢ় আলোকে সম্মিলিত হবে। সংকল্পশক্তি নিয়ন্ত্রিত করবে আহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল শারীরিক যন্ত্র, ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ করবে, লোভ ও কামনার বিলোপসাধন করবে, পরিবর্তে সূক্ষ্মতর প্রক্রিয়া প্রতিস্থাপিত করবে, কিংবা*

বিশ্বময় প্রাণশক্তি হতে শক্তি ও উপাদান আহরণ করবে, যেন শরীর দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি ব্যতীত, তার নিজস্ব শক্তি ও উপাদান বজায় রাখতে পারবে, এবং জড়তত্ত্ব হতে পুষ্টি আহরণের কোনো প্রয়োজন বোধ করবে না। অথচ কোনো ক্লান্তি ব্যতীত, বা নিদ্রা বা বিশ্রামের জন্য বিরতি ব্যতীত, আয়াসসাধ্য কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। এ কথা অনুমেয় যে হয়তো বিবর্তনের শীর্ষে সেই তত্ত্বকে পুনর্বার আবিষ্কার করা যেতে পারে, যা আমরা দেখি জীবনের মূলদেশে —যা হল নিজের নবীকরণ ও পোষণের জন্য নিজের চতুষ্পার্শ্ব হতে আহরণের শক্তি।[৬] মনকে অতিক্রম করে পূর্ণমানব সচেতনভাবে পুনরাবিষ্কার করে, পূর্ব হতেই যার প্রতিনিধিত্ব করে জড়তত্ত্ব— শক্তি ও শান্তি— কারণ বস্তুত জড়ই আত্মার নিদ্রা।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখেছেন যে, রূপান্তরের পরবর্তী এক স্তরে আমাদের শারীরিক যন্ত্রগুলো আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের বা চক্রের এক সচল ক্রিয়াশীলতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। নিম্নতর বিবর্তনের দ্বারা অভিব্যক্ত পশুমানব হতে নতুন বিবর্তনের মানবীয় মানবে এই হল প্রকৃত পরিবর্তন। যে-সকল কাজ শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা হাতে নিয়েছেন এ হল তাদের একটি। যোগের ঠিক প্রাথমিক স্তর হতেই আমরা দেখেছি যে, ঊর্ধ্বতম হতে জড়তম পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেক কাজ বিধৃত বা গতিশীল হয়, চিৎশক্তির এক প্রবাহ দ্বারা, যা কোনো-না-কোনো স্তরের, কোনো-না-কোনো কেন্দ্রের অভিমুখী হয়, এবং তা নির্ভর করে কার্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন স্পন্দনের উপর; আমরা যদি এই প্রবাহকে ব্যবহার করবার জন্য ন্যূনতম প্রয়াসও করে থাকি, তা হলে এ কথা লক্ষ্য করে থাকব যে তা শক্তির এক বিশাল উৎস যা সীমিত হয় শুধু আমাদের সামর্থ্যের সীমা দ্বারা। সুতরাং এ কথা অনুমানের বাইরে নয় যে, আমাদের শারীরিক যন্ত্রগুলো শুধু পশ্চাদ্‌বর্তী এই প্রবাহের জড়তত্ত্বে অভিব্যক্তি বা স্থূল সান্দ্র রূপ, এবং তারা বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রতিস্থাপিত হতে পারে চেতনার এই কেন্দ্রসমূহের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দ্বারা এবং এই-সব কেন্দ্র সমগ্র নতুন শরীরে তাদের শক্তি বিকীর্ণ করবে, যেমন এখন সমগ্র শরীরে হৃদয় রক্ত বিকীর্ণ করে ও স্নায়ুগুলো সমগ্র শরীরে শক্তি বিকীর্ণ করে। ভবিষ্যৎ শরীরের বিষয়ে শ্রীমা একবার শিশুদের বলেছিলেন : *রূপান্তরের অর্থ হল এই যে, এই সকল সম্পূর্ণ স্থূল ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত হবে কেন্দ্রীভূত শক্তিসমূহের দ্বারা যার প্রত্যেকটি হবে ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দনের; বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তে সচেতন শক্তির কেন্দ্রসমূহ ক্রিয়াশীল হবে এক সচেতন সংকল্প-শক্তির দ্বারা। পাকস্থলী আর থাকবে না; রক্ত-সঞ্চালনও আর হবে না, থাকবে না শ্বাসযন্ত্র; এ সব-কিছু অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং প্রতিস্থাপিত হবে বিভিন্ন স্পন্দনের এক ক্রিয়া দ্বারা, যে-সব স্পন্দন প্রতিনিধিত্ব করবে এ-সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যার প্রতীক তাকেই। কারণ এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিকেন্দ্রসমূহের জড়ময় প্রতীক, কিন্তু তার মূলবস্তু নয়। তারা শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতে এ-সব শক্তিকেন্দ্রকে স্থূল*

আকার দেওয়ার বা তাদের অবলম্বনস্বরূপ হওয়ার প্রচেষ্টা করে। রূপান্তরিত শরীর তখন প্রকৃত শক্তিকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে কার্যকরী হবে— পশু শরীরে বিকশিত তার প্রতিনিধিমূলক যন্ত্রসমূহের মাধ্যমে নয়। সুতরাং প্রথমে তোমাদের জানতে হবে, বিশ্বময় শক্তির মধ্যে তোমাদের হৃদয় কিসের প্রতিনিধিত্ব করে, তোমাদের রক্তসঞ্চালন, তোমাদের মস্তিষ্ক, তোমাদের শ্বাসযন্ত্র বিশ্বময় শক্তির মধ্যে কিসের প্রতিনিধিত্ব করে? তারপরই, সে-সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে-সব মূল স্পন্দনের প্রতীক, তাদের উপর তোমরা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সমর্থ হবে, এবং সমর্থ হবে ধীরে ধীরে এই সকল শক্তিকে তোমাদের শরীরের মধ্যে একত্রীভূত করে প্রত্যেক অঙ্গকে পরিবর্তিত করতে সচেতন শক্তির এক কেন্দ্রে, যা প্রতীকাত্মক গতিবিধিকে প্রকৃত গতিবিধি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, শ্বাসযন্ত্রের প্রতীকাত্মক গতিবিধির অন্তরালে এক সত্যকারের গতিবিধি আছে যা তোমাদের দেয় হালকা হওয়ার সামর্থ্য, এবং তোমরা অতিক্রম করো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম। প্রত্যেক অঙ্গের বিষয়েই সেই এক কথা, প্রত্যেক অঙ্গের প্রতীকাত্মক গতিবিধির অন্তরালে আছে সত্যকারের গতিবিধি। এর অর্থ নয় যে, আর কোনো আকার থাকবে না, যা চিনতে পারা যাবে। আকারের নির্মাণ হবে গুণাবলীর দ্বারা, স্থূল পদার্থকণিকার দ্বারা হবে না। বলতে গেলে, এ হবে এক ব্যবহারিক বা কার্যকরী আকৃতি : নমনীয়, সচল, এবং ইচ্ছা অনুসারে হালকা, যা এখনকার স্থূল জড় আকৃতির নিশ্চলতার বিপরীত।* জড়তত্ত্ব হয়ে উঠবে এক দিব্য অভিব্যক্তি; অতিমানস ইচ্ছাশক্তি তার আন্তরজীবনের সমগ্রতাকে অভিব্যক্ত করতে সমর্থ হবে তার নিজের উপাদানে অনুরূপ পরিবর্তন দ্বারা, যেমন এখন আমাদের মুখমণ্ডল পরিবর্তিত হয় (অতি স্বল্প পরিমাণে, অতি ত্রুটিপূর্ণভাবে) আমাদের আবেগের প্রেরণা অনুযায়ী : শরীর নির্মিত হবে *সংকল্পানুবর্তী ঘনীভূত শক্তির* দ্বারা। এপিক্‌টেটাসের শক্তিশালী শব্দানুসারে "শবশরীরবহনকারী এক ক্ষুদ্রকায় আত্মা"** হয়ে ওঠার পরিবর্তে আমাদের হয়ে ওঠা উচিত এক জীবন্ত শরীরে এক জীবন্ত আত্মা।

অতিমানস চেতনায় শুধুই আমাদের শরীর ও মন পরিবর্তন হবে তা নয়, জীবনের উপাদানও পরিবর্তিত হবে। যদি আমাদের মানসিক সভ্যতার কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন থাকে, তা হল কৃত্রিমতা। কোনো কিছুই স্বাভাবিকভাবে হয় না; আমরা এক ভয়ংকর কৃত্রিম কুশলতার বন্দী হয়ে আছি : এরোপ্লেন, টেলিফোন্,

---

* শ্রীঅরবিন্দের মতানুসারে, শ্বাসক্রিয়ার অন্তরালে বিদ্যমান শক্তি, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের শক্তির সঙ্গে সমান; প্রাচীন যোগীরা একেই বলেছেন বায়ু বা প্রাণ। সুপরিচিত শ্বাসপ্রক্রিয়ার অনুশীলনী প্রাণায়াম অনেক পদ্ধতির মধ্যে শুধু একটি পদ্ধতি, যা অন্যতম, বায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য, যা সাধককে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করতে সমর্থ করে।

** শ্রীঅরবিন্দ -কর্তৃক উদ্ধৃত (১৭. ৩৭৩-৩৭৪)

টেলিভিজন্‌ এবং যন্ত্রাবলীর প্রাচুর্য যা আমাদের দীনতাকে আবৃত করে রাখে; এমন-কি, আমরা আমাদের স্বাভাবিক শক্তিরও বিসর্জন দিই, যা ক্ষয় করে দেয় আমাদের, পুরুষানুক্রমে, আলস্য ও অজ্ঞতার সাহায্যে। এক সরল মৌলিক সত্য আমরা ভুলে যাই— তা এই যে, আমাদের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো শুধু আমাদের অন্তরে যে-সব শক্তি আছে তারই জড়ময় পরিপ্রকাশ— তারা যদি আমাদের অন্তর্নিহিত না হত, তা হলে, আমরা কোনো প্রকারেই আবিষ্কার করতে পারতাম না। আমরা শ্রীঅরবিন্দ-কথিত সেই *ঐন্দ্রজালিক সংশয় করে যে অলৌকিকে।*[৭] আমাদের জন্য দেখার দায়িত্ব, আমাদের জন্য শোনার দায়িত্ব এবং আমাদের জন্য ভ্রমণের দায়িত্ব আমরা অর্পণ করেছি যন্ত্রের উপর, এবং তার ফলে, যন্ত্র ব্যতীত আমরা কোনো কিছু করতে অসমর্থ হয়ে গেছি। আমাদের মানবসভ্যতা জীবনের আনন্দের জন্য গড়ে উঠেছে কিন্তু জীবনের উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের ক্রীতদাস হয়ে গেছে মানুষ— আমাদের জীবনকালের শতকরা ষাট ভাগ এ-সব উপকরণের সংগ্রহেই অতিবাহিত হয়, এবং শতকরা ত্রিশ ভাগ ব্যয়িত হয় নিদ্রায়। শ্রীমা বলেছেন : *এখানে এক অদ্ভুত কথা এই যে, আমাদের ব্যবহার করতে হবে সকল কৃত্রিম যন্ত্র। প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলো সংগ্রহ করবার ক্ষমতা যার আছে, সে এক মূর্খ হয়ে থাকলেও অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু সত্যময় জগতে, এক অতিমানস জগতে, তুমি যত বেশি সচেতন হবে ও বস্তুসমূহের সঙ্গে যতই বেশি সমন্বয়পূর্ণ হবে, ততই বেশি তোমার কর্তৃত্ব থাকবে বস্তুর উপর, এবং বস্তু ততই বেশি সংকল্পের অনুবর্তী হয়। সেখানে, কর্তৃত্ব প্রকৃত কর্তৃত্ব। তোমার যদি বস্ত্রের প্রয়োজন, তোমার শক্তি থাকা উচিত তা প্রস্তুত করবার জন্য। যদি তোমার সে শক্তি নেই, তা হলে যথার্থই তোমার থাকা উচিত নির্বস্ত্র! শক্তির অভাব পূর্ণ করবার জন্য কোনো কৃত্রিম উপায় নেই। এখানে, নিযুত বারের মধ্যে একবারও এমন নয় যে, কর্তৃত্ব সত্য কোনো কিছুর অভিব্যক্তি। সব-কিছুই আশ্চর্যজনকভাবে নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ।* অতিমানসিক কর্তৃত্ব কোনো অতীব শক্তিশালী জাদুকরী কৌশল নয়, এ এক অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, রাসায়নিক পরীক্ষার মতো নির্দিষ্ট ও যত্নপূর্ণ। শুধু, বাইরের বস্তুসকলের পরিচালনায় হাত না দিয়ে, অতিমানস সত্তা প্রত্যেক বস্তুর কেন্দ্রে স্থিত প্রকৃত স্পন্দন নিয়ে সক্রিয় হয় ও অন্যান্য স্পন্দনের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে, কোনো বিশেষ পরিণতির জন্য, যেমন চিত্রকর রঙের মিশ্রণ করেন কোনো-এক চিত্র অঙ্কন করবার জন্য, কিংবা কবি যেমন ধ্বনির সংযোগ করেন কবিতার জন্য। এবং তিনি প্রকৃতই একজন কবি, যা তিনি নামাঙ্কিত করেন তাই তিনি সৃষ্টি করেন, কারণ কোনো এক বস্তুর সত্যকারের নাম হল সেই স্পন্দন যার দ্বারা তা গঠিত। কোনো বস্তুর নামপ্রদান করার অর্থ তাকে আবাহন করা অথবা তাকে ধ্বংস করা।

সর্বশেষে, শুধু সত্যই স্বাভাবিক, এবং অতিমানস জীবনের স্বতঃস্ফূর্তি ও

স্বাভাবিকতা অতিমানস শিল্পকলায়ও নিজেকে প্রকাশ করবে, যা হবে আমাদের নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক স্বরের এক প্রত্যক্ষ নিরাবরণ অভিব্যক্তি, এক কলাকৃতি যেখানে ছলনার কোনো স্থান নেই, কারণ আমাদের অন্তরের আলোক জড়তত্ত্বে অন্তর্নিহিত আলোকের উপর ক্রিয়াশীল হতে পারবে এবং তার মধ্য হতে যথাযথ আকার প্রকাশিত করতে পারবে। যদি আমাদের স্পন্দন ধূসর হয়ে থাকে, আমাদের পৃথিবী ধূসর হবে, এবং যা-কিছু আমরা স্পর্শ করব তাও ধূসর হবে। আমাদের বাইরের পার্থিব পরিবেশ হবে আমাদেব অন্তরের পরিবেশের প্রতিকৃতি— আমরা যা, শুধু তাই অভিব্যক্ত করতে পারব। এবং আমাদের জীবনই হবে আমাদের কলাকৃতি। আমাদের বাইরের রাজত্ব হবে অন্তরের অবস্থার পরিবর্তনশীল দৃশ্যের পটভূমিকা। এবং শব্দও শক্তি লাভ করবে আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে, তা হয়ে উঠবে এক জীবন্ত *মন্ত্র*; মুখমণ্ডলে আবেগের প্রতিফলনের মতো দৃশ্য হবে ভাষা। সকল ছলনার সমাপ্তি হবে, তা রাজনৈতিক হোক, বা ধার্মিক, সাহিত্যিক, কলাত্মক, অথবা আবেগমূলক। একদিন যখন এক শিষ্য সন্দিগ্ধ মনে ঘোষণা করলেন যে অতিমানস এক অসম্ভব আবিষ্কার, মুখ্যত এই কারণে যে, তা কখনো দৃষ্ট বা সংসিদ্ধ হয় নি, শ্রীঅরবিন্দ তার উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাস্যরসের সঙ্গে : *কী আশ্চর্য যুক্তি! যেহেতু তা পূর্বে কখনো সংসিদ্ধ হয় নি, সেজন্য তা কখনো সংসিদ্ধ হবে না! সেই যুক্তিতে, প্রোটোপ্লাজ্‌মের বহু পূর্বেই পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস বন্ধ হয়ে যেত। যখন সে গ্যাসের পিণ্ড ছিল, তখন কোনো প্রাণের আবির্ভাব হয় নি, সুতরাং প্রাণের আবির্ভাব অসম্ভব হত। যখন সেখানে শুধুই প্রাণ ছিল, তখন মনের আবির্ভাব অসম্ভব হত। এখন মন আছে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করে কিছুই নেই; সুতরাং কারও মনে অতিমানসের অভিব্যক্তি হয় নি, অতএব অতিমানসের আবির্ভাব কখনো সম্ভব নয়। শোভানাল্লা! মহিমা, মহিমা, মানুষের যুক্তির মহিমা!! সৌভাগ্যবশত, ভগবান্ কিংবা বিশ্বপুরুষ কিংবা প্রকৃতি অথবা যিনিই বা সেখানে বিরাজমান, তিনি মানবীয় যুক্তিকে মোটেই গ্রাহ্য করেন না। যা তাঁর করণীয়, তা তিনি নিশ্চয়ই করবেন, তা সম্ভব হোক বা অসম্ভব।*[৮] হাজার হাজার বছর আগে, ঋষিরা এই অবিশ্বাসীদের দৈন্যের কথা বলেছেন, "এদের মধ্যে নেই বিস্ময়, নেই শক্তি" (ঋগ্‌বেদ, ৭.৬১.৫)।

প্রথম পর্যায় : কর্মধারা

শেষ পরিণতিগুলো হবে বিশেষভাবে দৃশ্য, কিন্তু তার জন্য যে কর্ম তা হবে নম্র, বিনীত, ধৈর্যশীল, যেমন একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর টেস্ট্‌ টিউব-এর সামনে; শ্রীমা বলছেন : *এক আণুবীক্ষণিক কর্ম।* কারণ প্রশ্ন নয় ক্ষণস্থায়ী অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার, বরং প্রশ্ন এক নতুন আধার তৈরি করবার, প্রত্যেক

অণু ও প্রত্যেক কোষিকায় নিহিত চিৎশক্তিকে মুক্ত করে। তা হলে আমরা ভাবতে পারি যে, শরীর-সম্বন্ধীয় এই সাধনায় হঠযোগের মতো শারীরিক-মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে; কিন্তু তা নয়। চেতনাই হচ্ছে প্রধান উপায় : *চেতনার পরিবর্তন হল মুখ্য উপাদান, প্রারম্ভিক গতি, দৈহিক পরিবর্তন হল গৌণ উপাদান, এক পরিণতি।*[৯] এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছতার সঙ্গে আমাদের উপস্থাপিত করছেন সরল সত্যের সম্মুখে : *বিবর্তনের পূর্ববর্তী স্তরসমূহে প্রকৃতির প্রাথমিক সতর্কতা ও প্রয়াস ছিল শারীরিক গঠনে পরিবর্তন আনয়নের অভিমুখী, কারণ সেই উপায়েই চেতনার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল; যে শারীরিক গঠন তখন বিদ্যমান ছিল, সেখানে চেতনার শক্তি যথেষ্ট ছিল না, সে কারণেই প্রকৃতির এই প্রয়াসের প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছিল, শরীরে পরিবর্তন আনবার জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে এক বৈপরীত্য সম্ভব, বস্তুত অনিবার্য; কারণ তার চেতনার মাধ্যমে, চেতনার রূপান্তরের মাধ্যমেই বিবর্তন সংঘটিত হতে পারে, ও নিশ্চয় হবে, এক নতুন শারীরিক গঠনকে প্রাথমিক সাধনরূপে ব্যবহার করে, তার মাধ্যমে আর নয়। বস্তুসমূহের আন্তর-সত্যে, চেতনার পরিবর্তন সবসময়ই ছিল এক প্রধান ঘটনা, বিবর্তনের এক আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সবসময়ই ছিল, এবং শারীরিক পরিবর্তন শুধু ছিল যান্ত্রিক। কিন্তু এই সম্পর্কটি লুক্কায়িত ছিল এ দুটি উপাদানের অস্বাভাবিক বিষমতার জন্য; আধ্যাত্মিক উপাদান হতে, সচেতন সত্তা হতে, বাইরের নিশ্চেতনার শরীর গুরুত্বে অধিকতর ছিল এবং তাকে অস্পষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু একবার যখন বৈষম্যটি দূর হয়ে গেছে, তখন চেতনার পরিবর্তনের পূর্বে শরীরের পরিবর্তনের প্রয়োজন আর নেই। চেতনা নিজেই তার পরিবর্তনের সাহায্যে শরীরের যা-কিছু রূপান্তরের প্রয়োজন তাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে ও সংঘটিত করবে।*[১০]

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের আবিষ্কারের অগ্রগতি অনুযায়ী, আমরা এই কর্মধারাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। মনে হয়, এই তিনটি ধারা উজ্জ্বলতা হতে অস্পষ্টতা পর্যন্ত, অলৌকিকতা হতে পরিমিত সাধারণতা পর্যন্ত, ব্যক্তিগত কোষিকা হতে পৃথিবী পর্যন্ত গতি করে। প্রথম পর্যায়ে, আমরা চেতনার শক্তিসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন হওয়া প্রত্যক্ষ করি। কিছু শিষ্য একেই বলতেন, "উজ্জ্বল সময়"; এ সময় ছিল ১৯২০ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত, যে-বছর শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে সম্পূর্ণ নির্জনতায় প্রত্যাহৃত করে নিলেন, চব্বিশ বছরের জন্য, সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে ব্যাপৃত করবার জন্য। যে নতুন অতিমানস শক্তি তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, তাই নিয়ে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে তাঁদের নিজেদের শরীরের উপর প্রয়োগের এক ক্রম চালিয়েছিলেন— শ্রীঅরবিন্দের ব্যবহৃত শব্দাবলীতে "পরীক্ষা"[†] একটি মুখ্য শব্দ, যেমন

[†] পরীক্ষা : testing.

"প্রয়োগ"† শব্দটিও। *ভৌতিক*†† *স্তরে কোনো বৈজ্ঞানিক তাঁর মতবাদ বা তাঁর পদ্ধতির উপর যে পরীক্ষা চালিয়েছেন, তার চেয়ে আরও বেশি সাবধানতার সঙ্গে আমি পরীক্ষা চালিয়েছি, দিনরাত, বছরের পর বছর।*[১১] প্রয়োগের এই বিশাল স্তূপের সন্ধান আমরা পাই শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলী ও পত্রাবলীর সকল অংশে; তা থেকে আমরা চারটি প্রতীকাত্মক ঘটনা বেছে নিতে পারি, শ্রীঅরবিন্দের চেতনার শক্তি ও "পরীক্ষার" উদাহরণ দেওয়ার জন্য; এবং এ কথাও আমরা বলছি যে, এরকম ঘটনা আরও শত শত আছে, এবং শ্রীঅরবিন্দ কিংবা শ্রীমা কেউই এ-সবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন না। আকস্মিক কথাবার্তা বা চিঠিপত্র ব্যতীত আমরা কখনো এ-সব জানতে পারতাম না। পণ্ডিচেরীতে পদার্পণের অব্যবহিত পরেই তিনি দীর্ঘসময়ের জন্য উপবাস করেছিলেন, "শুধু অভিজ্ঞতালাভের জন্য"। কয়েক বছর পর, যখন একজন শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আহারত্যাগ সম্ভব কি না, তখন সেই শিষ্যকে বলা হয়েছিল : *হ্যাঁ, তা সম্ভব। যখন আমি প্রায় তেইশ দিনের জন্য উপবাস করেছিলাম, তখন সমস্যাটির সমাধান আমি প্রায় করেই ফেলেছিলাম। দৈনিক প্রায় আট ঘণ্টা আমি পদচারণা করতে পারতাম, সব দিনের মতো। আমার মানসিক কাজ ও সাধনাও আমি সচরাচরের মতো করে চললাম, এবং আমি দেখলাম যে তেইশ দিনের পর আমি মোটেই দুর্বল হই নি। কিন্তু শরীর ক্ষীণতর হয়ে যেতে আরম্ভ করল, অথচ আমি মোটেই জানতে পারলাম না, শরীরের ঠিক যে উপাদানটি ক্ষীণতর হয়ে যায় তাকে কীভাবে পুনর্বার আনা যায়। দীর্ঘকাল উপবাসী লোকেরা অল্প খাদ্য গ্রহণ করবার যে নিয়মটি মেনে চলেন, তাও আমি মানলাম না যখন উপবাস ভঙ্গ করলাম। পূর্বে যে পরিমাণে আহার আমি গ্রহণ করতাম, সেই পরিমাণেই আবার আহার শুরু করলাম। কারাবাসের সময় একবার আমি পরীক্ষামূলকভাবে উপবাস করেছিলাম, কিন্তু তা ছিল দশ দিনের জন্য। তিন রাত্রে আমি শুধু একবারই নিদ্রা যেতাম। আমি দশ পাউণ্ড ওজন হারিয়েছিলাম, কিন্তু দশ দিনের পর, আমি উপবাস আরম্ভের পূর্বের অপেক্ষা নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী অনুভব করলাম। উপবাসের পূর্বে আমি যে ওজন ওঠাতে পারতাম না, পরে তা ওঠাতে পেরেছিলাম।*[১২] আলিপুর জেল-এ অবস্থানকালীন অন্য একটি ঘটনা : *আমি একাগ্র হয়ে ছিলাম। আমার মনে প্রশ্ন জাগরূক ছিল, উত্থাপন-সিদ্ধির মতো ব্যাপার কি সম্ভব? তারপর হঠাৎ দেখলাম, আমি নিজেই উত্থাপিত হয়ে উপরে আছি। ইচ্ছা করলেও আমি শরীরকে স্বাভাবিকভাবে রাখতে পারছিলাম না। এটাও দেখলাম যে, শরীর সেইভাবে শূন্যে ঝুলে থাকল, আমার কোনো প্রচেষ্টা*

---

† **প্রয়োগ** : experiment.

†† **ভৌতিক** : physical.

ব্যতীত।[১৩] একবার শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীর বাজার থেকে প্রচুর মাত্রায় আফিম কিনে আনলেন যা অনেক লোককে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনো কুপ্রভাবই পড়ল না। এর উদ্দেশ্য তাঁর চেতনার নিয়ন্ত্রণ শক্তির পরীক্ষা। চতুর্থ ঘটনাটি আমরা জানতে পেরেছি শিষ্যদের অধৈর্যের জন্য; তাঁরা তাঁদের চিঠির উত্তর যথেষ্ট শীঘ্র না পাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন; শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন : *তোমরা বুঝতে পারছ না যে আমাকে বারো ঘণ্টা অতিবাহিত করতে হয় সাধারণ চিঠিপত্র ও বিভিন্ন বিবরণী ইত্যাদির উপর। অপরাহ্নে তিন ঘণ্টা এবং সারা রাত সকাল ছটা পর্যন্ত আমাকে এজন্য কাজ করতে হয়। তোমরা যদি আমাকে দেখতে কীভাবে আমি আজকাল কাগজের মধ্যে নাক ডুবিয়ে থাকি অপরাহ্ন থেকে সকাল পর্যন্ত, তা হলে যে-কোনো শিষ্যের পাথরের হৃদয়কেও তা স্পর্শ করত।*[১৪]

নিদ্রা, আহার, মাধ্যাকর্ষণ, কারণ ও পরিণাম : একে একে সবগুলি তথাকথিত প্রাকৃতিক নিয়মই শ্রীঅরবিন্দ পরীক্ষা করে দেখলেন, এবং জানতে পারলেন যে, সেগুলো বলবৎ থাকে যে-পর্যন্ত আমরা তাদের বলবত্তায় বিশ্বাস করি; যদি চেতনার পরিবর্তন হয়, তা হলে "বিবরেরও" পরিবর্তন হয়। আমাদের সকল নিয়ম শুধুই "অভ্যাস"।

তাঁর দৃঢ় স্থির সব অভ্যাস নিয়মের অনুকারী।[১৫] এ হল *সাবিত্রীর* বাণী প্রকৃতির উপর। কারণ, শুধুই একটি সত্যকারের নিয়ম আছে, পরমাত্মার নিয়ম, যা প্রকৃতির সকল নিম্নতর অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারে। *প্রকৃতির যে নিয়ম সর্বাপেক্ষা অধিকতম বাধ্যতামূলক, তা শুধু এক স্থির প্রক্রিয়া। পরমাত্মা তা প্রস্তুত করেছেন এবং তিনিই তা অতিক্রম করতে পারবেন, কিন্তু সর্বপ্রথমে আমাদের কারাগারের দ্বার আমাদেরই উন্মুক্ত করা উচিত, এবং শেখা উচিত, প্রকৃতির মধ্যে আত্মার চেয়ে কম বাস করা।*[১৬] শ্রীঅরবিন্দের কোনো অলৌকিক প্রণালী ছিল না, ছিল না হাতের কোনো জাদুকরী কৌশল; আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত তাঁর যোগ নির্ভর করেছে এক অতি সহজ দ্বিবিধ নিশ্চয়তার উপর, আমাদের অন্তরে নিহিত আত্মার নিশ্চয়তার উপর, এবং পৃথিবীর উপর আত্মার অভিব্যক্তির নিশ্চয়তার উপর— সেই হল একমাত্র উত্তোলক, তাঁর কর্মের প্রকৃত উত্তোলক : *প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একজন ভগবান্ আছেন, এবং তাঁকে অভিব্যক্ত করাই দিব্যজীবনের লক্ষ্য। আমরা সকলেই তা করতে পারব।*[১৭] জনৈক শিষ্য যখন এই যুক্তি উপস্থাপন করলেন যে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার মতো অসাধারণ সত্তাদের পক্ষেই সম্ভব প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা, কিন্তু বেচারা সাধারণ মৃত্যুশীল মানুষদের জন্য আছে শুধু সাধারণ উপায়গুলোই, তখন শ্রীঅরবিন্দ তা জোর দিয়ে অস্বীকার করলেন : *আমার সাধনা নয় প্রকৃতির নিয়মের বাইরে বা পৃথিবীর উপর জীবন ও চেতনার অবস্থার বাইরে এক উদ্ভট প্রক্রিয়া, কিংবা আসুরিক*

অস্বাভাবিকতা, কিংবা আলৌকিক ক্রিয়া। যদি আমি এ-সব কিছু করতে পারি বা এ-সব আমার যোগে সম্ভব, তার অর্থ এই যে এ-সব করা যেতে পারে, এবং সেই কারণে এ-সকল বিকাশ ও রূপান্তর পার্থিব চেতনায় সম্ভব। আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোনো প্রেরণা ছিল না, আমি আধ্যাত্মিকতায় বিকাশলাভ করলাম। দর্শন বোঝায় আমি অসমর্থ ছিলাম, আমি এক দার্শনিকে পরিণত হলাম। চিত্রকলার জন্য আমার কোনো দৃষ্টি ছিল না, যোগবলে আমি তার বিকাশ ঘটালাম। আমার স্বভাব যা ছিল, তা থেকে তাকে আমি রূপান্তরিত করলাম যা ছিল না তাতে। এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় আমি তা করলাম, অলৌকিক উপায়ে নয়, এবং আমি তা করলাম দেখাবার জন্য কী করা যেতে পারে এবং কীভাবে করা যেতে পারে। নিজের কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য আমি তা করি নি, কিংবা তা করি নি এক পদ্ধতিবিহীন অলৌকিক শক্তিবলে। আমি বলছি, যদি তা না হয়ে থাকে, তা হলে বৃথা আমার যোগ, এবং আমার জীবন এক ভুল— শুধু প্রকৃতির এক উদ্ভট সৃষ্টি, যার কোনো অর্থ নেই বা পরিণতি নেই।[১৮] শ্রীঅরবিন্দের জন্য, প্রকৃত সমাধান হল এ কথা হৃদয়ংগম করা যে, আত্মা জীবনের বিপরীত নয়, বরং জীবনের পূর্ণতা, এবং অন্তরের উপলব্ধিই বাইরের উপলব্ধির রহস্য :

স্বর্গের স্পর্শ ধরাকে করে পূর্ণ, করে না লোপ।[১৯]

যখন এই সরল উপায়টিকে মানবজাতি বুঝতে পারবে, যখন সে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে তার সুপ্রাচীন অভ্যাস হতে— যে অভ্যাসে সে আত্মাকে সীমিত করে দেয় স্বর্গের মধ্যে, এবং বিশ্বাস করে মৃত্যুতে, বিশ্বাস করে তার বিধানসমূহে, বিশ্বাস করে তার ক্ষুদ্রতায়— তখনই আমরা দিব্যজীবনের জন্য সুরক্ষিত ও প্রস্তুত হতে পারব। সর্বোপরি, এ কথাই শ্রীঅরবিন্দ আমাদের দেখাবার জন্য এসেছিলেন, এই *সত্য* যে আত্মার সন্ধানে স্বর্গে পলায়ন করবার কোনো প্রয়োজন নেই, এই *সত্য* যে আমরা মুক্ত, এই *সত্য* যে আমরা সকল নিয়মের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী, কারণ ভগবান্ আমাদের মধ্যে আছেন। শুধু এই সরল বিশ্বাস। কারণ বিশ্বাসই অবতরণ করায় জগতের রূপকথাকে। *এই সেই বস্তু যা আমাকে সব সময় রক্ষা করেছে, আমার বলার উদ্দেশ্য, এক পূর্ণ সুষমতা। সর্বপ্রথমে আমি বিশ্বাস করলাম যে কিছুই অসম্ভব নয়, এবং সেই একই সময়ে, আমি সব-কিছুকেই প্রশ্ন করতে পারতাম।*[২০] একবার যখন শ্রীঅরবিন্দকে জোর করা হল রাজনৈতিক সংগ্রামে আবার যোগদান করবার জন্য, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, *যা প্রয়োজন তা ব্রিটিশ সরকারে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, যা যে-কেউ করতে পারবে, বরং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধে এক বিপ্লব।*[২১]

এই প্রথম পর্যায়ে, শ্রীঅরবিন্দের স্বল্পসংখ্যক শিষ্য ছিলেন (তাঁরা প্রায়

পনেরো জন ছিলেন), এবং তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, সেখানে বিরাজমান থাকত এক অতি বিশেষ, অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত পরিবেশ। প্রায় বিনা প্রয়াসে তাঁরা বিস্ময়কর অনুভূতিসমূহ লাভ করতেন। দিব্য অভিব্যক্তি সংঘটিত হত। প্রকৃতির নিয়মাবলী কিছুটা বশ্যতা স্বীকার করেছিল— জড়জগৎ ও চেতনার অন্যান্য স্তরের অন্তর্বর্তী আবরণ সূক্ষ্মতর হয়ে আসছিল, এবং যে-সব সত্তাকে আমরা দেবতা অভিহিত করি, অথবা যাঁরা অধিমানসের শক্তি, তাঁরা অভিব্যক্ত হতেন, নিয়মাবলীর উপর হস্তক্ষেপ করতেন, এবং আমরা যে-সব ঘটনাকে অলৌকিক বলি, তা সংঘটিত করতেন। যদি এই গতিবিধি অবিরত থাকত, তা হলে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা এক নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হতেন, এবং আশ্রম হয়ে উঠত সেইসব নতুন "তীর্থস্থানসমূহের" মধ্যে একটি, যে-সবের আধ্যাত্মিক সুরভি সাধারণ নিম্নতর সুবাসকে আবৃত করে দেয়। কিন্তু একদিন যখন শ্রীমা এ-সব অধুনাতম অসাধারণ ঘটনার একটি বর্ণনা শ্রীঅরবিন্দের নিকট করলেন, তিনি কৌতুকচ্ছলে মন্তব্য করলেন : *হ্যাঁ, কথাটি খুবই চিত্তাকর্ষক, তুমি অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত করবে, যার ফলে আমরা হয়ে উঠব জগদ্‌বিখ্যাত, জাগতিক ঘটনাবলীতে তুমি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে, ভালো কথা* (শ্রীঅরবিন্দ স্মিতহাস্য করলেন), *এ এক বিরাট্ সাফল্য হবে।* তারপর তিনি আবার বললেন : *কিন্তু এ হচ্ছে এক অধিমানসিক সৃষ্টি, ঊর্ধ্বতম সত্য এ নয়। এবং যে সাফল্য আমরা চাই এ তা নয়, আমরা চাই পৃথিবীতে অতিমানসের প্রতিষ্ঠা, এক নতুন জগতের সৃষ্টি।* শ্রীমা বলছেন : *আধ ঘণ্টা পরে, সব-কিছু বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিছু বললাম না, একটি শব্দও না, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে সব-কিছু সমাপ্ত করে দিলাম, দেবতাদের ও শিষ্যদের মধ্যে যে সংযোগ ছিল তা বিচ্ছিন্ন করে দিলাম, সব-কিছু ধ্বংস করে দিলাম। কারণ, আমি জানতাম যে, এ-সব যতদিন থাকবে, ততদিনই আমরা এ-সবের আকর্ষণীয়তার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে থাকব, তা অব্যাহত রাখবার জন্য (আমরা সব সময়ই অনেক বিস্ময়জনক বিষয় দেখতাম), আমি সব-কিছুই সমাপ্ত করে দিলাম। তারপর, আমরা আবার আরম্ভ করলাম, অন্য এক মূলসূত্র নিয়ে।*

এই হল প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা চেতনার শক্তিকে পরীক্ষা করেছিলেন, এবং তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, "কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনার সংঘটন" বা চেতনার উচ্চতর শক্তির দ্বারা হস্তক্ষেপ শুধুই বস্তুকে স্বর্ণাভ করে বাইরে, তার সারতত্ত্বকে স্পর্শ করে না। জগতের রূপান্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ব্যর্থ। প্রকৃত সমস্যা, বা শ্রীমার ভাষায় *প্রকৃত* বস্তু নয় বহিঃপার্শ্ব হতে সাময়িক "অতিপ্রাকৃতিক" হস্তক্ষেপ দ্বারা জড়তত্ত্বের পরিবর্তন, বরং তা হল অভ্যন্তর হতে জড়তত্ত্বের পরিবর্তন, স্থায়ী-রূপে, এবং এক নতুন জড়তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতিস্থাপন। অতীতে আমরা অনেক পুণ্যতীর্থ

দেখেছি, এবং সে-সব হয়ে গেছে রিক্ত; দেবতাদের ও ধর্মের প্রতীকের আশ্রয়ে আমরা যথেষ্ট দীর্ঘ সময় জীবনযাপন করেছি; শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন : *পুরোনো চরম ব্যর্থতার এক নতুন সংস্করণকে স্বীকৃতিপ্রদান করবার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই, যা বহিঃপ্রকৃতির নিয়মে কোনো প্রকৃত ও মৌলিক পরিবর্তন না এনে এক আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী আধ্যাত্মিক উন্মীলন প্রদান করে।*[২২] উত্থাপন, এবং নিদ্রা, ক্ষুধা এমন-কি রোগের উপর বিজয়লাভ, শুধু সমস্যার উপরিভাগকে স্পর্শ করে। বস্তুসকলের প্রচলিত অবস্থার বিরোধে এ-সব শুধু এক নাস্তিবাচক ক্রিয়া, কিন্তু তথাপি তার অর্থ হল যে পুরোনো নিয়মকে সে-সব স্বীকার করে, যদিও বিপরীতভাবে, কিন্তু এই অবস্থাকেই পরিবর্তিত হতে হবে, তা ভালো হোক বা মন্দ হোক, কারণ ভালো অবশ্যই মন্দের সঙ্গে বিদ্যমান। সকল অলৌকিক ক্রিয়াই আমাদের দারিদ্র্যের অপরপার্শ্ব— কিংবা, তারই অভিমুখী। আমাদের যা প্রয়োজন তা এক উন্নততর জগৎ নয়, বরং এক নতুন জগৎ; বলা যেতে পারে যে, এক "অত্যন্ত ঘনীভূত" পরিবেশ নয়, বরং এক "স্বল্প ঘনীভূত" পরিবেশ। আমরা চাই, এখানে নিম্নে সর্বত্র সেই পুণ্যতীর্থ। সহসা, ২৪ নবেম্বর ১৯২৬এ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করলেন সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে তাঁর অবসরগ্রহণ; শ্রীমায়ের তত্ত্বাবধানে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হল। শিষ্যদের নিকট এ-কথা ব্যক্ত করবার কোনো প্রয়োজন হল না যে, এখন থেকে "অবচেতন ও নিশ্চেতনার মধ্যে" যোগসাধনা হবে; তাঁরা সকলেই তাঁদের উজ্জ্বল দীপ্তিশীল অনুভূতি হতে বিচ্যুত হলেন, এবং রূঢ়তর বাস্তবের সম্মুখীন হলেন। এভাবেই আরম্ভ হল রূপান্তর-ক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়।

মৌলিক অগ্নি

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বারদেশে, ১৯২৬এ, অবসরগ্রহণের স্বল্প-পূর্বে, আমরা দেখি একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের এক অদ্ভুত কথোপকথন। শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য সে-সময়ে রহস্যময় মনে হয়েছিল, এবং তা তাঁর অনুভূতির আভিমুখ্যের উপর অসাধারণভাবে আলোকপাত করে। বিষয়বস্তু ছিল "আধুনিক" বিজ্ঞান।

আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি পর্যবেক্ষণ একজন গূঢ়তত্ত্ববিদের হৃদয়তন্ত্রীতে গভীর ঝংকারের সৃষ্টি করবে :

১। সৌরজগতের মতো পরমাণুগুলিও ঘূর্ণায়মান এক-একটি পদ্ধতি।

২। প্রত্যেক উপাদানের পরমাণুগুলি একই তত্ত্বে গঠিত। ভিন্ন ভিন্ন গুণধর্মের একমাত্র কারণ হল ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস। যদি এই পর্যবেক্ষণগুলি যথার্থভাবে বিচার করা যায় তা হলে বিজ্ঞানকে তারা নিয়ে যাবে নতুন

আবিষ্কারসমূহের অভিমুখে, যার কোনো ধারণা এখন বিজ্ঞানের নেই, এবং যার তুলনায় এখনকার জ্ঞান অতি সামান্য।[২৩]

এ কথা স্মরণ করা যেতে পারে যে সে বছরটি ছিল ১৯২৬। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন :

প্রাচীন রোগীদের অনুভব অনুযায়ী অগ্নি ত্রিবিধ :

১। জড় অগ্নি

২। বৈদ্যুত অগ্নি

৩। সৌর অগ্নি

এ-সকল অগ্নির মধ্যে বিজ্ঞান সচেতন শুধু প্রথম দুটির বিষয়ে। বিজ্ঞান তৃতীয়টির বিষয়ে অজ্ঞ। পরমাণু সৌরজগতের মতো, এ তথ্যটি আমাদের নিয়ে যেতে পারে তৃতীয় অগ্নির অভিমুখে।[২৩]

শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য কী ছিল? আমাদের গবেষণাগারগুলি জানবার পূর্বে কীভাবে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যাকে আমরা সাধারণ অগ্নি বা বিদ্যুৎ অভিহিত করি তা থেকে ভিন্ন উৎস হতে উদ্‌ভূত সৌর অগ্নি (ছ হাজার বছর পূর্বের ঋষিদের কথা বলছি না)? কীভাবে তিনি জানলেন যে সৌর অগ্নি আণবিক বিভাজন দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং তার অন্তরালে যে শক্তি আছে আমাদের অণুগুলোর মধ্যেও সেই একই শক্তি বিদ্যমান? এ এক প্রকৃত সত্য— হয়তো তা বিজ্ঞানকে অপ্রতিভ করতে পারে, কারণ, বিজ্ঞান সব-কিছুকে "স্থূল" বাস্তবতা দিয়ে বিচার করে— যে, আমাদের সকল ভৌতিক বাস্তবতার অন্তর্দেশে আছে এক আন্তর বাস্তবতা, যা তাদের কারণ ও তাদের মূলভিত্তি; সকল জড় উপাদানের, এমন-কি ক্ষুদ্রতম উপাদানেরও অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা আছে; আমাদের নিজেদের শারীরিক যন্ত্রসমূহেরও এক আন্তর বাস্তবতা আছে; সে-সব শারীরিক যন্ত্র হল চেতনার বিভিন্ন কেন্দ্রের ভৌতিক আবরণ বা অবলম্বন। এখানে সব-কিছু হল অন্তরালবর্তী অন্য এক স্তরের এক আলোক বা শক্তির প্রক্ষিপ্ত ছায়া বা প্রতীকধর্মী রূপান্তর। সমগ্র এ জগৎ এক বিশাল প্রতীক। বিজ্ঞান সকল তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে, মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক বিভাজন ও একীকরণকে সমীকরণে প্রকাশ করে, কিন্তু দেখে শুধু পরিণামই, প্রকৃত কারণ কখনো দেখে না। যোগী পরিণামের পূর্বে কারণ দেখেন। বৈজ্ঞানিক পরিণাম হতে কারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; যোগী কারণ হতে পরিণামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে কারণ পূর্ব হতেই বিদ্যমান, তা থেকে, যে পরিণাম হয় নি, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, যেমন, দুর্ঘটনার যে শক্তি অন্তরালে আছে, তা থেকে যে দুর্ঘটনা আগামী কাল হবে তার অনুমান তিনি করতে পারেন। বৈজ্ঞানিক পরিণামে হস্তক্ষেপ করে মাঝে মাঝে ভয়ংকর বিপদের সৃষ্টি করেন। যোগী কারণকে প্রয়োগে এনে, অথবা পরমকারণের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে পরিণামে পরিবর্তন আনতে পারেন, অথবা শ্রীঅরবিন্দ

যেভাবে কথাটি উপস্থাপিত করেন, যোগী আনতে পারেন পরিবর্তন "অভ্যাসের" মধ্যে যাদের আমরা নিয়ম বলি। পরিশেষে, আমাদের সকল ভৌতিক পরিণাম, যাদের আমরা নিয়মে পরিণতি করেছি, তারা শুধু অন্তরালবর্তী শক্তিসমূহের প্রকাশের জন্য সুবিধাজনক অবলম্বন ব্যতীত অধিকতর কিছু নয়, ঠিক যেমন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রয়োজন কিছু আচারানুষ্ঠানগত অঙ্কন, কিছু উপাদান ও সূত্র, আহূত শক্তির প্রকাশের জন্য। এই সমগ্র জগৎ এক বিশাল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, এক শাশ্বত ইন্দ্রজাল। কিন্তু এই পৃথিবী-রূপক অঙ্কন, এবং আমরা যে-সব উপাদানকে এত যত্নের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় ভাবে নিয়মাবদ্ধ করেছি, সকলই শুধু এক পরম্পরা— পার্থিব প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হতে পারে, যদি পরিণামগুলির দ্বারা সম্মোহিত না হয়ে আমরা চলে যাই তাদের অন্তরালবর্তী কারণগুলির নিকটে পরম জাদুকরের সমীপে। একটি গল্প আছে এক ব্রাহ্মণের, যিনি প্রতিদিন যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় তাঁর পারিবারিক বিড়ালটিকে বেঁধে রাখতেন, যেন অনুষ্ঠানে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হল, বিড়ালটির মৃত্যু হল; তাঁর পুত্র তাঁর স্থানে পূজা করতেন; তিনি একটি বিড়াল কিনে এনে যজ্ঞস্থলীতে নিষ্ঠার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন! পিতা হতে পুত্র পর্যন্ত, অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য বিড়াল হয়ে উঠল এক অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের অলঙ্ঘনীয় নিয়মাবলীর মধ্যেও এমন অনেক ক্ষুদ্র বিড়াল লুকিয়ে থাকতে পারে। এই ভৌতিক অবলম্বনের পশ্চাতে লুক্কায়িত শক্তির নিকট আমরা যদি ফিরে যাই, ফিরে যাই যা শ্রীমার ভাষায় "সত্যকার গতিবিধি" তাতে, তখন আমরা আবিষ্কার করতে আরম্ভ করি সেই মহতী লীলা, যা অনেক ভিন্ন, আমরা তাতে যে অনমনীয়তা আরোপ করি, তা থেকে। কর্মকাণ্ডীয় এক পদ্ধতি অনুসারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অন্তরালে যা বিদ্যমান তাকে প্রাচীন ঋষিগণ অভিহিত করেছেন *বায়ু*, এবং সেই হল কারণ মাধ্যাকর্ষণের এবং বৈদ্যুত-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের (১৯২৬-এর কথোপকথনে এ বিষয়ও শ্রীঅরবিন্দ উল্লেখ করেছেন), এবং সেই কারণেই যোগিগণ মাধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে পারেন। সৌর অগ্নি বা আণবিক অগ্নির অন্তরালে আছে মৌলিক *অগ্নি*, আধ্যাত্মিক *অগ্নি* যা সর্বত্র বিদ্যমান; ঋগ্বেদ বলছেন : "তিনি জলরাশির শিশু, অরণ্যের শিশু, স্থাণু বস্তুসকলের শিশু, সকল সচল বস্তুরও শিশু। এমন-কি, প্রস্তরেও তিনি স্থিত" (১.৭০.২)। যে "উষ্ণ সুবর্ণের ধূলির" বিষয়ে শ্রীমা বলেছেন, তা এই একই অগ্নি; পরিণামের পশ্চাতে এই হল কারণ; জড়, পারমাণবিক অবলম্বনের পশ্চাতে এই হল আদি শক্তি, "অন্যান্য অগ্নিশিখা শুধু তোমারই উৎসপ্রসৃত শাখা-প্রশাখা" (ঋগ্বেদ, ১.৫৯.১)। এবং যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ ও ঋষিগণ জড়তত্ত্বের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক অগ্নিকে দেখেছিলেন, "অন্ধকারে নিহিত সূর্যকে" দেখেছিলেন, তাঁরা তার ভৌতিক ও আণবিক পরিণতির বিষয়ে, সৌর একীকরণের বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েছিলেন, আমাদের গবেষণাগারগুলির বহু পূর্বে। এই

কারণেও, কারণের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে তাঁরা রূপান্তরের কথা বলতে সাহস করেছিলেন।*

অবশেষে, ঊর্ধ্ব হতে অধঃ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব দিব্য চিৎ-শক্তির একমাত্র উপাদানে গঠিত; চেতনায় নিহিত বল বা শক্তির দিক্‌টিই *অগ্নি* : "হে শক্তির শিশু"— ঋগ্‌বেদের বাণী (৮.৮৪.৪)। এ হল শক্তি-চেতনা। এ এক উত্তাপ, শিখা, আমরা যে স্তরেই তাকে স্পর্শ করি-না-কেন। আমরা যখন মনে একাগ্র হই, তখন আমরা আবিষ্কার করি মানসিক শক্তি, মানসিক *অগ্নির* সূক্ষ্ম উত্তাপ; যখন আমরা হৃদয়ে একাগ্র হই, বা আবেগসমূহের উপর একাগ্র হই, তখন আমরা আবিষ্কার করি প্রাণিক শক্তি বা প্রাণিক *অগ্নির* সূক্ষ্ম উত্তাপ; যখন আমরা আত্মার গভীরে নিমগ্ন হই, তখন আমরা অনুভব করি আত্মার সূক্ষ্ম উত্তাপ বা চৈত্য *অগ্নি*; ঊর্ধ্ব হতে নিম্ন পর্যন্ত শুধু একই *অগ্নি* বিদ্যমান, চিৎশক্তির বা চিৎ-তপসের বা চিৎ-উত্তাপের এক অনন্য স্রোত, যা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন তীব্রতা গ্রহণ করে। এবং বিদ্যমান এক মৌলিক অগ্নি বা জড় *অগ্নি*, যা চেতনার শক্তির শেষ স্তর, জড়তত্ত্বে ঘনীভূত হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা। এই হল সেই স্তর যেখানে একে অন্যতে রূপান্তরিত হতে পারে। (আমরা শ্রীমার একটি অনুভূতির কথা স্মরণ করতে পারি : যে শক্তি বা সামর্থ্য কোষিকাসমূহকে একটি ব্যক্তিগতরূপে কেন্দ্রীভূত করে, তদপেক্ষ অধিকতর এক গতিবিধি"। আধুনিক বিজ্ঞানও উপলব্ধি করেছে যে জড়তত্ত্ব ও শক্তি— একে অন্য তত্ত্বে রূপান্তরিত হতে পারে : $E = mc^2$ বিজ্ঞানের মহান্ আবিষ্কার, কিন্তু তা দেখে নি যে, এই শক্তিই চেতনা, এই জড়তত্ত্বই চেতনা, এবং ফলস্বরূপ, চেতনার উপযোগ দ্বারা আমরা জড়তত্ত্ব ও শক্তির উপর সক্রিয় হতে পারব। জড়তত্ত্বকে শক্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান শুধু কয়েকটি ভৌতিক প্রক্রিয়া জানে যা অত্যধিক উত্তাপ উৎপন্ন করতে পারে, কিন্তু যদি আমরা শক্তি বা চিৎ-শক্তির মূলতত্ত্ব মৌলিক *অগ্নির* সঙ্গে পরিচিত হই, তা হলে তত্ত্বত আমরা জড়তত্ত্বের উপর সক্রিয় হতে পারব এবং আমাদের শরীরকে এক মানবীয় মশালে পরিণত না করেও রূপান্তর লাভ করতে পারব।

সুতরাং ১৯২৬-এর কথোপকথন আমাদের দুটো বস্তুগত তথ্যের (এবং তাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তির) সম্মুখে নিয়ে আসে, যা রূপান্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে

---

* জড় আলোক, যা চরমগতি ও স্থিরতার অন্য নাম, পরম-চেতনার এক উল্লেখনীয় প্রতীক; ঠিক তেমনই ভৌতিক সূর্যও পরমশক্তির অন্য এক প্রতীক— এ কথা অনেক পরম্পরাই দেখেছে, যে-সব আমরা যত শিশুসুলভ মনে করি, তার চেয়ে কম শিশুসুলভ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : "কিন্তু হিন্দু যোগিগণ এ-সব অনুভূতি উপলব্ধি করলেও তাদের বিশদ ব্যাখ্যা করেন নি বা তাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিণত করেন নি; তাঁদের সম্মুখে অন্যান্য কর্মক্ষেত্র ও জ্ঞানের উৎস উন্মুক্ত ছিল, সেজন্য অভিব্যক্তির বাহ্যতম দিক্‌রূপে যা তাঁদের নিকট প্রতিভাত হয়েছিল, তাঁরা সে-বিষয়ে অবহেলা করেছিলেন।"

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম তথ্যটি হল, সকল পার্থিব গঠন, সে যাই হোক-না-কেন, একই উপাদানরাজি দিয়ে গঠিত, ও তাদের বিভিন্ন গুণধর্ম উদ্‌ভূত হয় বিভিন্ন আণবিক বিন্যাস হতে। বিশ্বের দিব্য-একত্বের যে আধ্যাত্মিক সত্য, এ হল তার ভৌতিক প্রতিরূপ; একই উপাদানে এ বিশ্বজগৎ রচিত— দিব্য উপাদান। "তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার অথবা কুমারী, তুমিই জরাজীর্ণ যে দণ্ডের সাহায্যে নত হয়ে চলে, তুমিই পক্ষী, নীলবর্ণ, হরিদ্‌বর্ণ, এবং লোহিতাক্ষ। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪.৩, ৪)।" উপাদানের একত্ব ব্যতীত কোনো রূপান্তরই সম্ভব নয়, কারণ নতুন তত্ত্বকে বারংবার পরিবর্তিত হতে হবে। দ্বিতীয় তথ্যটি হল, জড়তত্ত্বে নিহিত সৌর অগ্নি মূল *অগ্নির* ভৌতিক প্রতিরূপ, যে মূল অগ্নি *সকল রূপের স্রষ্টা*; সেই কথোপকথনে শ্রীঅরবিন্দ এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন। *অগ্নিকে* নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ রূপের পরিবর্তন করা, জড়তত্ত্বের রূপান্তর করা। ঋগ্‌বেদের বাণী : "যে অপরিপক্ব ও যার শরীর অগ্নিতাপে তপ্ত হয় নি, সে আনন্দ আস্বাদন করতে পারবে না; যারা অগ্নিশিখার দ্বারা প্রস্তুত হয়েছে, তারাই শুধু সমর্থ হবে তাকে সহ্য ও আস্বাদন করতে (৯.৮৩.১)। এই উষ্ণ সুবর্ণের রেণু তার ভৌতিক প্রতিরূপকে, আমাদের শরীরের আণবিক রেণুকে রূপান্তরিত করবে : *সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া স্থূল প্রক্রিয়া অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হবে, যার ফলে অগ্নির এক সূক্ষ্ম ক্রিয়া এমন কাজ করতে সক্ষম হবে, যার জন্য এখন প্রয়োজন হবে বর্ধিত উত্তাপের মতো এক শারীরিক পরিবর্তন।*[২৪] আমাদের পরমাণুগুলিও শুধু শাশ্বত পদ্ধতির এক সুবিধাজনক পরিপ্রকাশ— কিছুই স্থির নয়, কিছুই অপরিহার্য নয়, সম্ভাব্য সংযোজনের কোনো পরিসমাপ্তি নেই, নতুন মানুষের কোনো শেষ নেই।

দ্বিতীয় পর্যায় : শরীর

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় ১৯২৬-এ, এবং তা বিস্তৃত হয় ১৯৪০ পর্যন্ত। এ ছিল শরীরের উপর ও অবচেতনায় ব্যক্তিগত সাধনার এক পর্যায়। এ পর্যন্ত, চেতনার অতিমানসিক রূপান্তরে আমাদের উপনীত হওয়ার জন্য সকল পথ, সকল সূত্র, আমাদের আছে; রূপান্তরের মূলনীতি আমরা জানি : *অগ্নি* "কর্মের কারক", ঋগ্‌বেদের বাণী (৪.১.১৪)। কিন্তু কার্যত কীভাবে *অগ্নি* জড়তত্ত্বের রূপান্তরসাধনে অগ্রসর হবে? আমরা এখনও বলতে পারি না, এ বিষয়ে আমাদের শুধু আংশিক জ্ঞানই আছে। শ্রীমা বলছেন, *যদি আমরা প্রক্রিয়াটি জানতাম, তা হলে কাজটি সংসিদ্ধ হয়ে যেত।* ভারতীয় পরম্পরায় অন্য সকল উপলব্ধিই ত্রুটিহীন নির্দিষ্টতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে, অসাধারণ প্রাচুর্যপূর্ণ নির্দিষ্টতার সহিত; আমরা উপায় জানি নির্বাণপ্রাপ্তির, বিশ্বময় পরমপুরুষের উপলব্ধির, আত্মোপলব্ধির,

মাধ্যাকর্ষণ, ক্ষুধা, শৈত্য, নিদ্রা, রোগের উপর জয়লাভের— প্রত্যেক ব্যক্তিই এ-সব লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে, সে-সব লক্ষ্যে যাওয়ার পথ উত্তমরূপে প্রদর্শিত হয়ে আছে, স্তরগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হয়ে আছে ঋষিদের দ্বারা বা হিন্দু শাস্ত্রগুলির দ্বারা হাজার হাজার বছর ধরে। এ হল প্রশ্ন অনুশীলন ও ধৈর্যের —এবং উপযুক্ত সময়েরও। কিন্তু রূপান্তর কেউ সংসিদ্ধ করেন নি, এ এক পথ যা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত, যেন এমন এক দেশের মধ্য দিয়ে যাওয়া, যার অস্তিত্ব এখনও নেই, জড়তত্ত্ব ও প্রাণের জগতে যখন প্রথম মানসিক রূপসমূহের উদ্‌ভব হল, তখন এমন কিছুই সংঘটিত হয়েছিল। সেই অর্ধপশুর অবয়ব, যা গ্রহণ করেছিল প্রথম মানসিক স্পন্দন, কীভাবে সেই অদ্ভুত ঘটনাকে বুঝেছিল ও বর্ণনা করেছিল, এবং সর্বোপরি, চিন্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য যা করা উচিত, কীভাবে সে তা বলতে পারত? শ্রীমা আরও বলেছেন : *আমরা জানি না এই অনুভূতি বা সেই অনুভূতি এ পথের অংশ কি না; এ কথাও জানি না আমরা অগ্রসর হচ্ছি কি না, কারণ, যদি জানতাম আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে, তা হলে তার অর্থ হত আমাদের পথের পরিচয়ও ছিল— কিন্তু কোনো পথ নেই! কেউ কখনো সেখানে যায় নি! কার্যটির সংসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত আমরা বলতে পারব না তা কী?* শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, এ *এক অভিযান অজানার মধ্যে।* এই নতুন সৃষ্টির সম্মুখে আমরা কিছুটা বানরদের মতো। সুতরাং এখন থেকে, আমরা শুধু অগ্রগতির, বা বরং অসুবিধারই কিছু স্থূল রেখাচিত্র দিতে পারব, এবং আমরা নিশ্চিত নই যে, সে-সব প্রকৃত পথ। অভিজ্ঞতাটি এখন পরীক্ষাধীন। যখন একবার এই পথ সফল হবে, একজন মানুষের মধ্যেও তখন রূপান্তরের সকল পরিবেশই পরিবর্তিত হয়ে যাবে, কারণ, তখন পথটি হবে পদচিহ্নিত, অঙ্কিত, এবং তখন মূল অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যাবে। যেদিন প্লেটো Phaedrus (ফিড্রাস্)-এর ধারণা করলেন, সেদিন সমগ্র মানবজাতিকে তিনি ফিড্রাসের সম্ভাবনায় উন্নীত করলেন; যেদিন একজন মানুষও রূপান্তরের অসুবিধার উপর জয়লাভ করবেন, সেদিন তিনি সমগ্র মানবজাতিকে উন্নীত করবেন এক জ্যোতির্ময়, সত্য, মৃত্যুহীন জীবনের সম্ভাবনায়।

যাই হোক, যে প্রধান সমস্যা সাধককে আহ্বান জানায়, সে-বিষয়ে আমরা একটা ধারণা করতে পারি। যখন এই *অগ্নি* আমাদের মনের মধ্যে প্রজ্বলিত হওয়া আরম্ভ করে, আমাদের উদ্দীপনার সকল মুহূর্তে, আমরা ভালোভাবেই জানি যে, তখন কীভাবে তা শুরু করে যথেষ্ট চাপ, প্রায় এক শারীরিক উত্তাপ; যখন তা আমাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়, আমাদের আত্মিক সব মুহূর্তে, আমরা জানি তখন আমাদের বক্ষস্থলে অনুভূতি হয় তীব্রভাবে উত্তপ্ত এক চুল্লির মতো, এত তীব্র যে ত্বক্-এর বর্ণও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, এবং এক অনভিজ্ঞ দৃষ্টিও দেখতে পারে এক জ্যোতিঃ এক ভাস্বর দীপ্তি যোগীর চতুর্দিকে; যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয় আমাদের প্রাণে, সেই-সব মুহূর্তে যখন আমরা শক্তিকে আবাহন করি, কিংবা

বিশ্বময়ের অভিমুখে উন্মুক্ত হই, নাভিস্তরে তখন এক ঘনীভূত স্পন্দন অনুভূত হয়, সমগ্র শরীরে প্রায় জ্বরের মতো এক কম্পনের সৃষ্টি হয়, কারণ এক অধিক পরিমাণের শক্তি এক ক্ষুদ্র পথে প্রবেশ করে; তা হলে, কী বলা উচিত আমাদের এই উষ্ণ সুবর্ণের রেণুর সম্বন্ধে, *কোষিকায় স্থিত বিদ্যুতের এই মদিরা*[২৫]-র সম্বন্ধে? শ্রীমা তাঁর সহজ ভাষায় বলছেন, *সর্বত্র তা টগ্‌বগ্ করে ফুটতে আরম্ভ করে, যেন বিস্ফোরণের অপেক্ষায় বয়লার।* ঋষিরাও বলেছিলেন, "অর্ধদগ্ধ পাত্রে"র বিধ্বস্ত হওয়ার কথা, অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি অতি দ্রুত অগ্রগতি আরম্ভ করে। তা ছাড়া প্রশ্নটি যদি শূন্য হতে আরম্ভ করবার হয়ে থাকত, তা হলে এ সমস্যা তুলনায় সহজতর হত। কিন্তু আমাদের আরম্ভ করতে হবে যা আমাদের আছে তাই নিয়ে, আমাদের বর্তমান অবস্থা হতে অন্য এক অবস্থায় *স্থানান্তরিত* হতে হবে, এক পুরোনো সংগঠন হতে অন্য এক সংগঠনে যেতে হবে : পুরোনো হৃৎপিণ্ড, পুরোনো শ্বাসযন্ত্র রয়েছে— বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রীমা প্রশ্ন করেন, কোন্ বিশেষ মুহূর্তে আমরা হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে শক্তির সঞ্চালন আরম্ভ করছি? এই পরিবর্তনটিই কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন অসংখ্য অনুভূতির পুনরাবৃত্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাত্রা, জীবকোষিকাদের এমনভাবে অভ্যস্ত করবার উদ্দেশ্যে, যেন তারা পরিবর্তনের সময় আতঙ্কিত না হয়। সুতরাং প্রথম সমস্যা হল শরীরকে উপযোগী করে তোলা, এবং তার জন্য প্রয়োজন বছরের পর বছর, বোধ হয়, কয়েক শতাব্দী। এই পরিবর্তনের জন্য শ্রীঅরবিন্দ সাধনা করেছেন চল্লিশ বছর, এবং শ্রীমা সাধনা করেছেন পঞ্চাশ বছর। তা হলে, ব্যবহারিক তাৎক্ষণিক প্রয়োজন হল দীর্ঘস্থায়ী হওয়া— মৃত্যুকে অতিক্রম করা। শ্রীমা বলেছেন : *রূপান্তরের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মৌলিক প্রশ্ন হল এ কথা জানা যে দুটোর মধ্যে প্রথমে কোন্‌টা আসবে, যে ব্যক্তিত্ব দিব্যসত্যের স্বরূপে নিজের শরীরকে রূপান্তরিত করতে চায়, কিংবা শরীরের ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ার পুরোনো অভ্যাস।*

কারণ, স্বাভাবিকরূপেই, কার্যটি এক জীবনকালের মধ্যেই হওয়া উচিত। এক জন্ম হতে অন্য জন্মে, আমাদের আত্মার, আমাদের মনের, এমন-কি আমাদের প্রাণের পূর্বার্জিত প্রগতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব; তা এ জন্মে পরিণত হবে স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণরূপে, সহজাত প্রতিভারূপে, কিংবা পূর্বার্জিত বিকাশরূপে। আমাদের প্রয়োজন শুধু দশ কিংবা বিশ বছরের অনুশীলন, পূর্বজন্মগুলির সূত্রটিকে পুনর্বার পাওয়ার জন্য— এক আকর্ষণীয় অনুভূতিও লাভ হয় আমরা যার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি ঠিক সেই বিন্দুটি যেখানে গতজন্মগুলিতে যা-কিছু সংসিদ্ধ হয়ে থাকে তা শেষ হয় এবং নতুন প্রগতি শুরু হয়। আমরা সূত্রটি আবার ধরি। কিন্তু শরীরের জন্য এ কথা পরিষ্কার যে, কোষিকার অগ্রগতি, শারীর চেতনার অগ্রগতি পরবর্তী জন্মে সঞ্চারিত হতে পারে না; সব-কিছুই বিনষ্ট হয়ে যায় শ্মশানের চিতায় অথবা কবরের মধ্যে। আমরা যদি নিরবচ্ছিন্ন মানবীয় বিবর্তন

চাই, আমরা যদি চাই যে আমাদের নিজেদের শরীরেই অতিমানস সত্তার অভিব্যক্তি হোক, তা হলে *একজন* মানুষকে *একই* জীবনের মধ্যে কার্যটি সংসিদ্ধ করতে হবে। যদি কার্যটি সফলতার সঙ্গে একবার সম্পন্ন হয়, তা হলে তা অন্যদের নিকটও সঞ্চারিত হতে পারবে (এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব)। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন— এবং তাঁর দৃষ্টি ছিল পরিষ্কার— এক জ্যোতির্ময়, লঘুভার, সম্পূর্ণ অতিমানস সত্তার আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজন হবে তিন শতাব্দীর, তাঁর যেমন বর্ণনার প্রয়াস আমরা করেছি। সেজন্য, আমাদের শরীরের মধ্যে এক মধ্যবর্তী সত্তার সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, যে সত্তা মানুষ ও অতিমানস সত্তার মধ্যস্থিত এক সংযোগ হবেন অর্থাৎ এক সত্তা যিনি শুধু অতিমানস উপলব্ধি প্রাপ্ত হবেন তাই নয়, বরং বলতে গেলে, তাঁর শরীরও হবে যথেষ্ট দীর্ঘসময় পর্যন্ত অমর, যেন তা এই সংক্রমণের সময়টি অতিক্রম করতে পারে, এবং সেই একই সময়ে হবে যথেষ্ট শক্তিশালী ও নমনীয় যেন তা নিজের রূপান্তর সংসিদ্ধ করতে পারে, অথবা তা সৃষ্টি করতে পারে, পার্থিব জন্মের সাধারণ পদ্ধতির মাধ্যম ছাড়াই, নিজের শক্তির সাহায্যে, এক অতিমানস সত্তা। কারণ, এই গুরুভার পাশব ও মানব বংশানুক্রমিকতা আমাদের অবচেতনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের স্থূল গর্ভাবস্থায় সঞ্চারিত হয়, এবং রূপান্তরের পথে কঠিনতম বাধাবিঘ্নের মধ্যে অন্যতম; ন্যূনতমভাবে, তা *অগ্নির* স্ফুটনের মতো দুরূহ, যদি তার চেয়ে বেশি না হয়। এই হল দ্বিতীয় সমস্যা। বস্তুত, বোধহয় এই হল প্রকৃত সমস্যা, যা শরীরের দৃষ্ট সমস্যাগুলির অপেক্ষা দুরূহতর। সুতরাং আমাদের সম্মুখে সাধকের দুটো মৌলিক সমস্যা : শরীরের কোষিকাগুলিকে প্রদান করা অমৃতত্বের চেতনা, যা পূর্ব হতেই বিদ্যমান আমাদের আত্মায়, এমন-কি আমাদের মনেও, এবং অবচেতনকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা। *মনে হয়*, শরীরের মধ্যে *অগ্নির* অগ্রগতি নির্ভর করে এ দুটো অবস্থার উপর। কর্মটি তা হলে চেতনারই কর্ম।

প্রথমে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সামর্থ্য। অভিজ্ঞতা হতে আমরা জানি যে, অমরত্বের প্রশ্নটি সত্যের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত : যা-কিছু অমর সেই সত্য। আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে সত্যময় হই, তা হলে আমরা হয়ে উঠব অমর, সম্পূর্ণরূপে, আপাদমস্তক। এ পর্যন্ত, আমাদের আত্মা ব্যতীত, প্রায় কোনো-কিছুই অমর নয়, কারণ, সেই হল আমাদের মধ্যে পরমাত্মার সত্য, একজন্ম হতে অন্য জন্ম পর্যন্ত এই আত্মাই সঞ্চারিত হয়, অভিবৃদ্ধ হয়। অগ্রগতি করে, অধিক হতে অধিকতর সচেতন হয়। মনও অমর হতে পারে, যখনই তা কেন্দ্রীয় সত্যের চারধারে সংগঠিত হয় যথেষ্টরূপে, যখনই তা সত্যময় চিন্তন করে এবং সত্যকে চায়, তখনই আমরা সহজেই অতীত গঠনগুলো পুনরুদ্ধার করি, কিছু কিছু সত্য অত্যন্ত পরিচিত মনে হয়, সত্যের জন্য কোনো কোনো তৃষ্ণা ব্যাখ্যাতীতভাবে অতিপ্রয়োজনীয় মনে হয়। সেইভাবে, প্রাণও অমরত্ব লাভে সমর্থ, যখনই তা

যথেষ্টভাবে কেন্দ্রীয়, চৈত্য সত্যের সঙ্গে যথেষ্টভাবে একীভূত হয়— আমরা অন্য এক "মাত্রায়"[†] আবির্ভূত হই, যা যুগসমূহের মতোই পরিচিত; কিন্তু তা কিছু কমই হয়, কারণ আমাদের প্রাণশক্তি সাধারণত অধিকতর নিমগ্ন থাকে সব রকমের আমোদপ্রমোদে, এক সত্যকার জীবনগানের সংকল্প অপেক্ষা। চেতনার স্তরক্রমে আমরা যত বেশি অবতরণ করি, মিথ্যা ততই বেশি ঘন হয়, এবং অবশ্যই, ততই বেশি মৃত্যুর শাসন, কারণ, মিথ্যা মূলত সব-কিছুরই পচন ঘটায়। যদি প্রাণ পূর্ব হতেই ভালোভাবে অস্পষ্ট থাকে, শরীর তা হলে হয় মিথ্যায় পূর্ণ। জরা ও ব্যাধি তার সর্বাপেক্ষা অধিকতম সুস্পষ্ট মিথ্যা— যা সত্য তা কীভাবে হয়ে ওঠে জরাজীর্ণ, কুৎসিত, শীর্ণ, রোগগ্রস্ত? সত্য হচ্ছে সমুজ্জ্বল; তা সুন্দর, জ্যোতির্ময়, শাশ্বত। তা সুস্পষ্ট। সত্য হল অজেয়; মৃত্যু ও জরা আমাদের স্পর্শ করে আমাদের সত্যের অভাবের জন্য।

স্বীকার করা যাক, দীর্ঘসময় পর্যন্ত মৃত্যু বিচক্ষণ। একজন অমর মিঃ স্মিথ্ অমরত্বের প্রকৃত অপচয় হবে। সব বিষয় বিচার করলে দেখা যাবে, মৃত্যু সত্যেরই বিশ্বস্ত প্রহরী। বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা দেখি, কীভাবে প্রত্যেক বস্তুরই দুটো দিক্ আছে, সর্বদা ও সর্বত্র। আমরা যখন একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি, তখন আমরা নিশ্চয়ই সংগ্রাম করি, সংঘর্ষ করি, "না" বলি; যখন আমরা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি, তখন শুধু ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, বারংবার "হ্যাঁ" বলি। আমাদের উচিত, উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখতে সমর্থ হওয়া। সুতরাং, একবার যখন ঊর্ধ্বতর মন ও প্রাণের রূপান্তরসাধন হয়, এবং সত্তার অবশিষ্ট অংশ সত্যে বসবাস করে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই, এক পরবর্তী স্তরে "শরীরের সকল মিথ্যা", রোগ নিশ্চেতনা ও বার্ধক্যের শিকার করা যেতে পারে। এ কথা চিন্তা করা এক বড়ো ভুল হবে যে, অন্য সকল স্তরের মধ্য দিয়ে গতি না করেই অতিমানস যোগ আরম্ভ করা যেতে পারে। নিম্নের সকল স্তরে উপনীত হতে হলে, ঊর্ধ্বের সকল স্তরে আমাদের উন্নীত হতেই হবে, এ কথা আমরা জানি।

যেমন মনের রূপান্তরের, মূল শর্তটি হল নীরবতা, এবং প্রাণের রূপান্তরের মূল শর্ত প্রশান্তি, তেমনই স্থিরতা শারীরিক রূপান্তরের মূল শর্ত— বাহ্য নিশ্চলতা নয়, বরং এক আন্তর স্থিরতা, কৌষিকীয় চেতনায়। মনের নীরবতায় ও প্রাণের প্রশান্তিতে আমরা বিশ্বের অসংখ্য স্পন্দনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছি। গোপন প্রভাবরাজির রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছি, যারা আমাদের কার্য, অনুভব ও চিন্তার জন্য প্রেরিত করে। একই ভাবে, শারীরিক চেতনার স্থিরতায় আমরা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে আরম্ভ করি অসংখ্য অদ্ভুত স্পন্দনরাজির, এবং জানতে আরম্ভ করি কোন্ উপাদানে আমরা গড়া। কৌষিকীয় স্তরে আমরা বাস করি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে : এ হল সংবেদনের এক ঘূর্ণিজল, প্রবল, মনোরম, ব্যথাপূর্ণ, তীব্র সংবেদনসমূহের,

[†] মাত্রা : dimension.

যারা কখনো ঊর্ধ্বে ছুটে যায়, বা নিম্নে নিমজ্জিত হয়, এবং যদি এক সেকেণ্ডের জন্যও ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে যেন সৃষ্টি হয় বিষাদের এক গভীর সঞ্চার, যাকে যে-কোনো উপায়ে পূর্ণ করতে হবে নতুন নতুন অনেক, আরও অনেক সংবেদন দ্বারা। শুধু যখন আমরা চঞ্চল, তখনই জীবন্ত বলে আমরা অনুভব করি। সুতরাং, যে কাজ করতে হবে, তার মূল ভিত্তি হল এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে পরিপূর্ণ স্থিরতা আনয়ন করা, আত্মার সমতা নয়, বরং এক কৌষিকীয়[†] সমতা। তখন আরম্ভ হবে সত্যময় এই কর্ম। এই কৌষিকীয় সমতায়, আমাদের শরীর হয়ে উঠবে এক স্বচ্ছ পুষ্করিণীর মতো, যেখানে স্বল্পতম স্পন্দনও প্রত্যক্ষীভূত হবে, ও আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। রোগ, ক্ষয় ও মিথ্যার সকল শক্তি, অবচেতনের সকল বিকৃত ও বিরূপতা, এবং তাদের সকল ক্ষুদ্র বংশজ, তখন এই স্বচ্ছতার মধ্যে *দৃশ্যমান* হয়ে সঞ্চরণ করবে, এবং আমরা তাদের কবলিত করতে সমর্থ হব। সর্বশেষে, *অগ্নির* পরিস্ফুটন কোষিকারাজির উপযোগী হওয়ার অসামর্থ্যের জন্য নয়, বরং তার কারণ আমাদের নিজেদের অস্পষ্টতা হতে জনিত প্রতিরোধ। শুধু এই বিশোধনকারী স্থিরতা পথ পরিষ্কার করতে পারে, এবং মুক্ত করতে পারে অগ্নির বিদ্যুদ্‌গতিকে, শরীরকে ঐকতানে স্পন্দিত না করে, আতঙ্কিত না করে, বা অত্যধিক উত্তাপ শরীরে সৃষ্টি না করে।

একবার এই কৌষিকীয় স্থিরতা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, আমরা এক প্রথম আবিষ্কার করব; আমরা এক বৃহৎ বাধার সম্মুখীন হব, যা রূপান্তরের কাজে এক বৃহৎ সাহায্যও হবে, কারণ, সবসময়ই, প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক বিরোধ ঠিক সেই শক্তির পরিমাপে হয়, যা প্রয়োজন অগ্রগতির উদ্দেশ্যে একটি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। তা উভয় এক গুরুভার এবং এক উত্তোলক[††]। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি, আমাদের চিন্তাশীল মনের নিম্নে এক "প্রাণময় মন" আছে, যা আমাদের সকল কামনার জন্য, সকল আবেগের জন্য, আশ্চর্যজনক যুক্তি উপস্থাপিত করে; তারপর আছে এক "শারীরিক মন" যা একই ঘটনাবলীকে সহস্রবার পুনরাবৃত্ত করে এক ভাঙা রেকর্ডের মতো। কিন্তু আরও এক গভীরতর স্তর আছে, এক আদিম মানসিক শিলাময় স্তর, যাকে শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেছেন *কৌষিকীয় মন*। প্রকৃতপক্ষে এ হল কোষিকাদের মন, অথবা কিছু কোষিকাপুঞ্জের মন, যা শারীরিক মনের মতোই একই ঘটনাকে বারংবার পুনরাবৃত্তি করে তার অফুরন্ত শক্তি নিয়ে, কিন্তু তা মস্তিষ্কের অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিংবা বিক্ষিপ্ত চিন্তার যান্ত্রিক চূর্ণনের মধ্যে সীমিত নয়। এ ব্যাপ্ত সমগ্র শরীরে, নিযুত নিযুত ক্ষুদ্র স্বরের মতো, যা আমরা শীঘ্রই শুনতে পাই; যখন মনের স্তরগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায়। অক্লান্তভাবে এ মন্থন করে, কিন্তু আমাদের সচেতন কার্যকলাপের অবশিষ্টকে আর নয়, বরং আমাদের সকল ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রভাবকে! যদি শুধু একবারই এক

† কৌষিকীয় : Cellular ; কোষিকা-সংক্রান্ত
†† উত্তোলক : Lever.

কোষিকাপুঞ্জ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কোনো প্রকারে কোনো ভয়ে, কোনো আঘাতে, কোনো অসুস্থতায়, তা হলে তারা অবিরাম পুনরাবৃত্তি করে সেই ভয়ের, সেই সংকোচনের, বিশৃঙ্খলার প্রতি তার প্রবণতার, অথবা তাদের অসুস্থতার স্মৃতির। এ এক যূথচর অযৌক্তিক মন, যা এক কোষিকাপুঞ্জ হতে পরবর্তী কোষিকাপুঞ্জ পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়, এবং স্পন্দিত হয়, স্পন্দিত হয় সর্বত্র, সীমাহীনভাবে, সবসময় একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে থাকে, বিলীন হওয়ার একই সঞ্চারিত ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, এবং একই উদ্দীপনার প্রত্যুত্তর দেয় সবসময়, পাব্‌লোব্‌-এর কুকুরের মতো, সে যেমন ঘণ্টাধ্বনির প্রত্যুত্তর দেয়। জীবনের জন্য এই ভয় জড়তত্ত্বের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। এ হল জড়তত্ত্বের প্রথম সচেতন চেষ্টা। স্বাভাবিকভাবেই, এর যা-কিছু সামান্য উদ্যম আছে তা নিঃশেষিত হয়ে যায় সব রকমের বিশৃঙ্খলাকে আহ্বান করে, এবং এর বিশ্রামের জন্য মৃত্যুর অচেতনাকে আহ্বান করে। কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে বিবেচনা করি, তা হলে দেখব যে, এই কৌষিকীয় মন ভয়ংকরভাবে শক্তিশালী, যেমন হস্তীর বিরুদ্ধে পিপীলিকার সৈন্যবাহিনী, এবং সে নিজের এই অদ্ভুত কার্যক্রম যেমন মিথ্যার সেবায় বিনিযুক্ত করতে পারে, তেমনই সত্যের সেবায়ও বিনিযুক্ত করতে পারে। যদি শুধু একবার তাকে আলোকের স্পন্দনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারি, তা হলে সে তার পুনরাবৃত্তি করবে অবিরতভাবে, দিবায় *এবং রাত্রিতে*।* বাইরে আমরা যা-কিছু করি-না-কেন, কাজ করি, কথাবার্তা করি, অথবা নিদ্রা যাই, কৌষিকীয় মন তার স্পন্দনের পুনরাবৃত্তি করে ক্রমাগত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বাধীনভাবে। সেজন্য, এর গুরুত্ব রূপান্তর-সাধনে যথেষ্ট, এবং অতিমানস-স্পন্দনকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ হতে পারে এক অনন্য উপায়। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : *শরীরে, কোষিকাদের, অণুদের ও কণিকাদের একটি অস্পষ্ট মন আছে। জার্মান জড়বাদী হেকেল্‌ কোনোখানে বলেছেন অণুর মধ্যে নিহিত ইচ্ছাশক্তির কথা, এবং আধুনিক বিজ্ঞান ইলেক্‌ট্রনের ক্রিয়ার অগণিত স্বতন্ত্র বিভিন্নতার বিষয়ে অনুধ্যান করে এই উপলব্ধিতে প্রায় উপনীত হয়েছে যে, এ এক আকৃতি নয়, বরং এক গোপন বাস্তবতা দ্বারা নিক্ষিপ্ত এক ছায়া মাত্র। এই শারীরিক মন এক বাস্তব সত্য; তার অস্পষ্টতা, অতীতের গতিবিধির প্রতি তার যান্ত্রিক আসক্তি, তার বিস্মৃতি, এবং নতুনের প্রতি তার অস্বীকৃতির জন্য আমরা এর মধ্যে পাই অতিমানস শক্তির পরিব্যাপ্তি ও শারীরিক ক্রিয়ার রূপান্তরের পথে প্রধান সকল অসুবিধা। অপরপক্ষে, একবার ফলপ্রদভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেলে, জড়প্রকৃতির মধ্যে অতিমানস আলোক ও শক্তির প্রতিষ্ঠায় এ হয়ে উঠবে মহামূল্যবান যন্ত্রসমূহের অন্যতম।*[২৬]

* এই হল উপযোগিতার কারণ মন্ত্রসমূহের, যা এক নির্দিষ্ট তীব্রতার স্পন্দনকে শরীরের যে কোনো অংশে বা সকল অংশেই প্রবাহিত করতে পারে, যদি কৌষিকীয় মন তা অধিকার করতে পারে।

এই কর্মের বিষয়ে আমরা কী বলব? এ হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এবং এই কর্মের সংসাধনের একমাত্র উপায় হল গভীর ধ্যানে মগ্ন না হওয়া, যা শুধু আমাদের সত্তার উচ্চতম শিখরকে স্পর্শ করে, অসাধারণ একাগ্রতা বা সমাধিতে প্রবেশ না করা, বরং বস্তুসকলের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়া। সেই কারণেই, শ্রীঅরবিন্দ অনেক জোর দিয়েছেন বাইরের কাজ ও একেবারে সাধারণ শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তার উপর, কারণ সেই হল জড়তত্ত্বের সম্মুখীন হওয়ার ও তার মধ্যে সত্যকার চেতনার এক সামান্য ক্ষুদ্র অংশ প্রবেশ করবার অথবা *অগ্নিকে* উন্মুক্ত করবার একমাত্র পথ। সেই কারণেই, প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পায়চারি করতেন এবং রাত্রিতে কাজ করতেন সারা সময়। বাইরের এই কাজের মধ্যে, এবং *তারই জন্য*, সাধক দেখবেন মিথ্যা সকল স্পন্দন বহিঃপ্রকাশিত হয়, যা শ্রীমার ভাষায় *মন্দ অভ্যাস*। এবং সকল মিথ্যা স্পন্দনের সংশোধন করতে হবে। কিন্তু এভাবে বলাটা নকারাত্মক। প্রকৃতপক্ষে; বিশ্বজগতে ও সকলবস্তুতে শুধু একটিই মহৎ স্পন্দন আছে দিব্য আনন্দের— সেই হল স্পন্দন— কারণ ভগবান্‌ই আনন্দ। যখনই মিথ্যার প্রবেশ হয়, সেই স্পন্দনটি কলুষিত হতে আরম্ভ করে, কঠিন ও সংকুচিত হতে আরম্ভ করে— সব-কিছু কর্কশ হয়ে যায়। যন্ত্রণা মিথ্যার সুনিশ্চিত চিহ্ন। যন্ত্রণা জগতের মিথ্যা। তা হলে, সাধকের কাজ ততটা নয় এ-সকল তথাকথিত মিথ্যাস্পন্দনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, বরং তা হল শরীরের মধ্যে সত্য স্পন্দনকে, দিব্য আনন্দকে ধারণ করা, কারণ এই আনন্দেরই শক্তি আছে যা সব-কিছু শৃঙ্খলিত করে, সহজ করে, ছন্দোময় করে, এবং আরোগ্য করে এই সব ভিড়-করা, বিরক্তিকর, মিথ্যা ছোটো ছোটো স্পন্দনকে, যাদের মধ্যে আমাদের কোষিকারাজি বাস করে নিরন্তর। শরীরের এই সব অসংখ্য ছোটো ছোটো মিথ্যার মধ্যে দিয়েই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু প্রবেশ করে— তাদের বর্ণনা করাও ততই বিরক্তিকর, যত বিরক্তিকর তাদের উপরে কাজ করা। শ্রীমা বলেছেন, *প্রত্যেক কাজ যথার্থভাবে করা উচিত। এবং ক্ষুদ্রতম দৈনন্দিন অঙ্গভঙ্গিও অসংখ্য মিথ্যাপূর্ণ উপায়ে করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কাজটির অনেক দিকের মধ্যে একটি বিষয়ে শুধু জোর দিয়ে বলা যেতে পারে এখানে : আমরা সব-কিছুই করি মানসিক চাপের অবস্থায়, ত্বরান্বিতভাবে, অযত্নের সহিত, অচেতনভাবে; বহির্জীবনের সহস্রাধিক প্রণোদনের উত্তরে, তার আঘাতসমূহের কথা না বললেও, আমরা শারীরিকভাবে এমন ব্যবহার করি, যেন আমরা দন্তচিকিৎসকের চেয়ারে বসে-থাকা এক রোগীর মতো। আমরা কঠিন চাপে পীড়িত হয়ে যাই, অন্তর্মুখ হয়ে যাই, ত্বরা, অথবা ভয়, অথবা উদ্‌বেগ কিংবা লোভের জন্য। এই হল কয়েক নিযুত বছরের পশুত্বের উত্তরাধিকার-প্রাপ্তি : আমাদের উপাদান বহন করে জীবনধারণের জন্য কৃত সংগ্রামের স্মৃতি, এবং নিজেকে অবিরত কঠিন করে তোলে। এই কাঠিন্য মৃত্যুর অন্যতম কারণ,*

এবং সত্যকারের স্পন্দনের প্রতিষ্ঠার পথে এক বিরাট্‌ অন্তরায়। কোনো এক আঘাতে যখন আমরা অনমনীয় ও কঠিন হয়ে যাই, তখন আমরা একটি বিন্দুতে আমাদের প্রাণিক শক্তি একত্রীভূত করি, প্রতিরোধের জন্য; এক বিশাল স্রোত হঠাৎ প্রবাহিত হয় এক ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে, যা হয়ে যায় তপ্ত রক্তবর্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক। আমরা যদি আমাদের শারীরিক চেতনাকে প্রসারিত করবার ও সেই আঘাতকে প্রত্যাখ্যান না করে গ্রহণ করে নেওয়ার শিক্ষা লাভ করি, আমরা তা হলে যন্ত্রণা পাব না— সকল স্তরে চেতনার সংকীর্ণতাই যন্ত্রণা। সুতরাং এটা বেঝা যায় যে, যদি এই উষ্ণ সুবর্ণ অতিমানস রেণু হঠাৎ আমাদের কোষিকাসমূহে প্রবেশ করে এবং শরীর প্রতিক্রিয়া দেখায় তার সচরাচর-ঘটিত কাঠিন্য দ্বারা, তা হলে সব-কিছু বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। অন্য ভাবে বলা যায়, আমাদের মানসিক ও প্রাণিক চেতনার মতো, আমাদের কৌষিকীয় চেতনারও প্রসারিত ও বিশ্বজনীন হওয়ার শিক্ষালাভ করা উচিত। সেখানেও বিশ্বজনীন চেতনা উপলব্ধ হওয়া উচিত। মনের নীরবতায় মানসিক চেতনা বিশ্বজনীন হয়; প্রাণের প্রশান্তিতে প্রাণিক চেতনা বিশ্বজনীন হয়; শরীরের স্থিরতায় শারীরিক চেতনা বিশ্বজনীন হয়। স্থিরতা, গ্রহণশীলতা ও কৌষিকীয় বিস্তৃতি হল মৌলিক আবশ্যকতা, শারীরিক উপাদানের স্থায়ী হওয়ার জন্য *অগ্নিকে* সহ্য করে।

কিন্তু হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় এক বিরাট্‌ অসুবিধা। শারীরিক চেতনার বিশ্বব্যাপ্তিসাধন? কিন্তু যখন *একটিই* শরীর অবশিষ্ট, তখন অন্য সমস্ত শরীরই কঠোরতা প্রদর্শন করে, জগতের সকল মিথ্যা সেখানে উপস্থিত হয়! এ আর একজন মানুষের সংগ্রাম হয়ে থাকে না, হয়ে যায় সমগ্র জগতের সংগ্রাম। আমরা এখন প্রকৃত সমস্যাটির সম্মুখীন হচ্ছি। এই শারীরিক বিশুদ্ধীকরণে, সাধক অন্য এক আবিষ্কার করেন, যা কিছুটা রূঢ়। তাঁর সমস্ত যৌগিক শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। রোগের উপর তিনি বিজয়লাভ করেছিলেন, শরীরের কার্যকলাপের উপর তিনি নিয়ন্ত্রণলাভ করেছিলেন, বোধ হয় মাধ্যাকর্ষণের উপরও; তিনি বিষও ভক্ষণ করতে পারতেন, কোনো প্রকার কুফল ভোগ না করেই; সংক্ষেপে, তিনিই তাঁর ভবনের কর্তা ছিলেন, কারণ তাঁর চেতনাই ছিল নিয়ন্ত্রক। কিন্তু, হঠাৎ যে মুহূর্তে তিনি স্থির করেন এই শরীরের রূপান্তরের জন্য, তাঁর সকল শক্তি অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন বালুকার মধ্যে জল বিলীন হয়ে যায়। বিভিন্ন রোগ তাঁকে আক্রমণ করে, যেন তিনি সাধনা আরম্ভ করেছেন এইমাত্র; তাঁর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবনতি ঘটে, সব-কিছু বিকৃত হয়ে যায়। সব-কিছু আবার নতুনভাবে শেখার জন্য, মনে হয়, শরীরকে ভুলতে হবে, তার পুরোনো সকল মিথ্যা কার্যকলাপ, যা তাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। এবং তখন রঙ্গমঞ্চে আসে মৃত্যু। এই দ্বিবিধ কার্যকলাপ— পুরোনো কার্যকলাপ, এবং নতুন কার্যকলাপ যা নিশ্চয়ই প্রতীকধর্মী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সত্য স্পন্দনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করবে— উভয়ের মধ্যে

যে রেখা জীবনকে মৃত্যু হতে পৃথক করে, তা কখনো কখনো অত্যন্ত ক্ষীণ। বোধ হয়, আমাদের নিশ্চয়ই এই রেখা অতিক্রম করবার জন্য সমর্থ হতে হবে, এবং ফিরে আসতে হবে প্রকৃতপক্ষে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য? একেই শ্রীমা বলতেন *মৃত্যুর নিকট মৃত হওয়া*, তাঁর সেইসব অনুভূতির পর যার একটি হতে তিনি আর প্রায় ফিরে আসতেন না। এর অর্থ, আমাদের সব-কিছুরই সম্মুখীন হতে হবে, এবং সব-কিছুই প্রতিরোধ করে। চেতনার উচ্চতর স্তরসমূহে আমরা এই ঘটনার সঙ্গে পূর্বেই পরিচিত হয়েছি : সাধক যখনই এই পথে তাঁর যাত্রা আরম্ভ করেন, সব-কিছুই বিকৃত হয়ে যায় : যদি তিনি চিন্তা করে থাকেন যে তাঁর মন সত্যের মধ্যে দৃঢ় ভাবে আশ্রিত হয়ে আছে, তা হলে তিনি এখন দেখেন তীব্রতমভাবে আক্রমণকারী ধারণা ও সংশয়ের এক স্রোত; যদি তিনি মনে করেন তিনি নিষ্কলুষ ও অত্যন্ত সাধু, তা হলে হঠাৎ তিনি সম্মুখীন হন প্রাণিক ভয়ের এক সমগ্র সুবিন্যস্ত সমূহের, যা এই জগতের ও জগতের বাইরের নিকৃষ্টতম শঠ ব্যক্তিদেরও ভয়ভীত করতে পারে। অন্য শব্দে, শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন, কোনো স্তরেই, আমরা কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারি না, লক্ষ্যের সকল বিপরীতের সম্মুখীন না হয়ে। তা না হলে, এ বিজয় হবে না, হবে এক দমন। কোনো স্তরে, কোনো স্থানে মন্দকে বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নই ওঠে না, বরং তার মধ্যে তারই নিজস্ব আলোকের বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাতে হবে। যোগী তাঁর শক্তিবলে রোগ দূর করেন, কিন্তু তিনি সমস্যাটির সমাধান করেন নি : তিনি শুধু রোগশক্তির কণ্ঠরোধ করেছিলেন। এবং আমরা সহজেই এ কথা বুঝতে পারি যে, কোনো রূপান্তরই সম্ভব নয় যদি শক্তিগুলোকে নীরব করা হয় ও তারা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় অন্ধকার কোণে চুপিসারে ঘুরে বেড়ায়। বিশ্বজগৎ হতে কোনো কিছু বিযুক্ত হতে পারবে না; সেজন্য তাদের নিশ্চয়ই পরিবর্তিত করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? মৃত্যু ও রোগ সর্বত্র বিদ্যমান, তারা আছে আমাদের শরীরের, জগতের সকল শরীরের অবচেতনে। যে যোগী রোগের উপর জয়লাভ করেছেন, ও মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন (সুদীর্ঘকালের জন্য নয়, এবং সেই ভালো), তাঁর জয়লাভ শুধু নিজের জন্য, এবং সেজন্য তিনি প্রকৃতরূপে জয়লাভ করতে পারেন নি— হে বিধির প্রজ্ঞা! যোগী প্রস্তুত করেছিলেন এক রক্ষাকারী আবরণ, নিজেকে এক আলোক-শিশুর মতো তার মধ্যে আবদ্ধ করেছিলেন, এবং অন্যান্য সব-কিছুকেই পূর্বের মতো লক্ষ্যহীন ঘূর্ণনের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই আবরণটি উন্মুক্ত হয়, সব-কিছু তীব্রবেগে প্রবেশ করে : শুধু একটি শরীরই আছে! নিকটস্থ বলদের উপর চাবুকের প্রহার শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কেও আঘাত করেছিল, কিংবা কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থিত শিষ্যের রক্তক্ষরণের বিরুদ্ধে শ্রীমা সংঘর্ষরত, সে-বিষয়ে কিছু না জেনেই— এ-সব আমাদের অবস্থাপিত করে সমস্যাটির সামগ্রিকতার উপর— *শরীর সর্বত্র বিদ্যমান*, শ্রীমা ঘোষণা করেছেন।

আমাদের বিজয়লাভ করতে হবে সর্বত্র, সকল শরীরের জন্য, সমগ্র পৃথিবীর জন্য। সব-কিছুর রূপান্তরসাধন না করলে আমরা কিছুরই রূপান্তরসাধন করতে পারব না। অন্যথা, আমরা রয়ে যাব একাকী আমাদের ক্ষুদ্র আলোকের গর্তে। এতে ভালো কী হবে? একজন মানুষের রূপান্তরে ভালো কী হবে, যদি অবশিষ্ট মানবজাতি বারংবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়? সেজন্য, রূপান্তরের অগ্রদূতের শরীর এক যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, তার মধ্যে বিশ্বজগতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়; সব-কিছু এখানে সম্মিলিত হয়, সব-কিছু এখানে বাধা দেয়। নিম্নতম স্তরে একটি কেন্দ্রীয় *বিন্দু* আছে, যা জীবন ও মৃত্যুর গ্রন্থি, যেখানে বিশ্বের নিয়তির লীলা সংঘটিত হয়। সব-কিছুই একটি *বিন্দুতে* সংগৃহীত হয়।

খনন করে চলেছি আমি সুদূর গভীরে,
পঙ্ক আর কর্দমের বিভীষিকা মাঝে,
স্বর্ণ নদীর গানের তরে শয্যা এক,
মৃত্যুবিহীন অগ্নি-তরে এক নিবাস...
উন্মুক্ত ক্ষত আমার সহস্রাধিক...।[২৭]

অগ্রদূতকে সম্মুখীন হতে হয় প্রত্যেক অসুবিধা, এমন-কি মৃত্যুও তাকে ধ্বংস করবার জন্য নয়, বরং তার পরিবর্তনের জন্য। কোনো কিছুরই রূপান্তর সম্ভব নয়, তাকে নিজের উপর না নিয়ে। সাবিত্রীর বাণী :

সহন করবে তুমি সবই, তাদের রূপান্তর-তরে।[২৮]

এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করলেন ডিসেম্বর ৫, ১৯৫০এ, যার ঘোষিত কারণ ছিল যুরিমিয়া, যদিও শ্রীঅরবিন্দ এক সেকেন্ড-এর মধ্যেও অন্যদের রোগমুক্ত করতেন। এ কথা নিশ্চিত যে, ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করা মর্মস্পর্শী, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধতা যখন পূজিত হয়, তখন মৃত্যুর বিধানকেই শুধু তা দীর্ঘস্থায়ী করে। শ্রীমা বলেছেন, *এক ক্রুশবিদ্ধ শরীর নয়, বরং এক মহিমময় শরীরই জগতের উদ্ধার করবে।*

না, এ কোনো দর্শনীয় কার্য নয়, প্রকৃতপক্ষে এ এক "আণুবীক্ষণিক কর্ম", এবং জগতের কর্দমের মধ্যেই আছে, আমাদের খনন করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায় : অবচেতনা

এইভাবে, অন্য এক শ্রেণীর অসুবিধা আছে (যা সেই একই অসুবিধা অন্য মুখোশের অন্তরালে) যা উদ্‌ভূত হয় না ব্যক্তির, শারীরিক পদার্থের, প্রতিরোধ হতে, বরং উদ্‌ভূত হয় সমগ্র পৃথিবীর অবচেতন প্রতিরোধ হতে। এখানেই শ্রীঅরবিন্দ মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এবং এখানেই শ্রীমা সেই কর্মের ক্রম অব্যাহত রেখেছেন। আমরা যদি বুঝতে চাই সমগ্র ব্যাপারটি— আমাদের ব্যাপারটি— কোথায় কার্যকরী হচ্ছে, এবং কার্যপ্রণালীটি অনুসরণ করতে চাই, তা হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। বিবর্তনে যখনই এক নতুন ক্রমের উদ্ভব হয়েছে, জড়তত্ত্বে প্রাণের উদ্ভব হোক বা প্রাণতত্ত্বে মনের উদ্ভব হোক, তা সবসময় সম্ভব হয়েছে এক দ্বিবিধ চাপের ফলে : অভ্যন্তর হতে বা নিম্ন হতে এক চাপ যা সৃষ্ট হয় প্রকাশেচ্ছু নিবর্তিত তত্ত্ব দ্বারা, এবং "বহির্দেশ" হতে বা "ঊর্ধ্ব" হতে এক চাপ, যা সেই তত্ত্বই প্রদান করে তার নিজস্ব স্তর হতে যেখানে তা পূর্ব হতেই বিদ্যমান। এই দ্বিবিধ চাপের সংযোগের ফলে, উদাহরণস্বরূপ, কিছু নির্দিষ্ট জীবন্ত আকারের মধ্যে নিবর্তিত মন, এবং বিবর্তনের অবরোহণের পথে, তার নিজের স্তরে গঠিত মন, এ উভয়ের চাপের ফলে, কালক্রমে হঠাৎ একদিন প্রাণের সীমা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ও প্রাণের মধ্যে হঠাৎ মনের উদ্ভব হয়। সব-কিছুই অন্তর্নিহিত, পূর্ব হতেই বিদ্যমান জড়তত্ত্বের মধ্যে, কিন্তু এই নিবর্তনের উন্মোচন ঊর্ধ্বের চাপ বিনা অসম্ভব, এবং ঊর্ধ্বের চাপ নিম্নের আবাহনেরই উত্তর দেয়, এবং আবরণ মুক্ত করে, যেমন সূর্য উন্মুক্ত করে বীজের আবরণ। এখন, জড়ের মধ্যে নিহিত অতিমানস অভ্যন্তর হতে চাপ দিচ্ছে অমরত্ব, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি মানবীয় আস্পৃহা, আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার আকারে; একই সঙ্গে, সে ঊর্ধ্ব হতে তার নিজের শাশ্বত স্তর হতে চাপ দিচ্ছে বোধি, অন্তঃপ্রকাশ ও প্রদীপ্তি রূপে। এ কথা শাস্ত্রগুলিতেও ব্যক্ত হয়েছে, তাদের নিজস্ব পন্থায়, যখন তারা "নতুন পৃথিবীর" আবির্ভাবের প্রশ্ন জড়িত করেছে "নতুন স্বর্গের" আবির্ভাবের প্রশ্নের সঙ্গে ("নতুন স্বর্গসমূহ ও এক নতুন পৃথিবী যেখানে বাস করে সত্য"), কারণ নতুন স্বর্গ ব্যতীত, অথবা চেতনার নতুন অতিমানস স্তর ব্যতীত, নতুন পৃথিবীর আবির্ভাব অসম্ভব। নতুন পৃথিবী হবে অতিমানস চেতনার নতুন "স্বর্গের" সৃষ্টি, ঠিক যেমন এখনকার পৃথিবী পুরোনো মানস বা অধিমানস স্বর্গের সৃষ্টি, যে স্বর্গ দেবতাদের তথা ধর্মসমূহের। সমস্ত বিবর্তনীয় স্তরের বিষয়ে একই কথা : ঊর্ধ্ব ও নিম্ন একই সঙ্গে সক্রিয় হয়। কিন্তু বিবর্তনের এক নির্দিষ্ট স্তরে এক নতুন ঊর্ধ্বদেশ বা চেতনার এক নতুন ক্রমের আবির্ভাব এক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নয়, যা হঠাৎ পূর্ববর্তী সকল ক্রমকে পরিবর্তিত করে দেবে। প্রাণিক স্বর্গের নিম্নে প্রথম অ্যামিবা† (আণুবীক্ষণিক প্রাণী) হতে

† amoeba.

আরম্ভ করে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত, আমরা জানি, নিযুত নিযুত বছরের প্রয়োজন হয়েছিল জড়তত্ত্বের জড়ত্বকে জয় করে তাকে "জীবন্ত" করে তোলার জন্য। অনুরূপভাবে, নিয়ান্ডার্থাল্[†] (প্রত্নপ্রস্তরযুগীয়) মানব হতে শুরু করে প্লেটো পর্যন্ত, হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন হয়েছিল পূর্ববর্তী দুটি ক্রমের প্রতিরোধকে জয় করে প্রাণকে "মনোময়" করে তোলার জন্য, সম্পূর্ণ মানসিক মানব হয়ে ওঠার জন্য। আজও, কজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানস চিহ্নের নিচে বাস করেন, প্রাণিক কামনা-বাসনার অধীনস্থ না হয়ে? যে-কোনো স্তরে বিবর্তনের অগ্রদূতের কাজ হল নতুন ঊর্ধ্বকে পূর্বতন নিম্নের সঙ্গে সংযুক্ত করা; যখন ঊর্ধ্ব নিম্নের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখন বিবর্তনের এক যুগচক্রের সমাপ্তি হয়। সুতরাং, মানসিক বিবর্তনের অগ্রদূত যখন হঠাৎ অতিমানসে প্রবেশ করেন, তাঁর আবিষ্কার তখন এক আকস্মিক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নয়, যা সকল পুরোনো নিয়ম ভেঙে ফেলে; তিনি সম্পূর্ণ অতিমানস মানবত্বে লম্ফ দেন না, যেমন প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় মানব প্লেটো পর্যন্ত লম্ফ দেয় নি। তাঁকে সকল পূর্ববর্তী স্তরকে "অতিমানসময়" করতে হবে। নিঃসন্দেহে, তাঁর চেতনায় পরমোচ্চ শিখর ও পরম নিম্নদেশের, আত্মা ও জড়ের, অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচকের সংযোগ হয়, এবং স্বভাবত তাঁর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে যথেষ্টভাবে, কিন্তু পরিশেষে, তিনি যে শক্তিরোধের সম্মুখীন হবেন সেই অনুপাতেই তাঁর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। কারণ বিবর্তনের অগ্রগতি যত হয়, ততই গভীরতর স্তর তা স্পর্শ করে। প্রাণতত্ত্ব বিশ্বজগতের শুধু জড় আবরণের উপর উপনিবেশ স্থাপন করতে পেরেছে, এবং মানসতত্ত্ব উপনিবেশ স্থাপন করেছে তার অব্যবহিত অতীতের উপর, মানসিক অবচেতন ও প্রাণের পুরোনো বিশৃঙ্খলার উপর; অতিমানসতত্ত্বের সম্বন্ধে বলা যায়, তা শুধু যে মানসিক ও প্রাণিক অবচেতনের সম্মুখীন হয় তা নয়, বরং আরও সুদূর অতীতের, শারীরিক অবচেতনা ও নিশ্চেতনারও সম্মুখীন হয়। যত ঊর্ধ্বে আমরা উত্থিত হই, ততই নিম্নে আমরা অবনমিত হই। বিবর্তন শুধু ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় না, সর্বদা আরও স্বর্গীয় স্বর্গে, বরং তা গতি করে গভীরে, আরও গভীরে; এবং প্রত্যেক বিবর্তনীয় চক্র বা বৃত্ত শেষ হয় আরও কিছু নিম্নে, কেন্দ্রের আরও কিছু নিকটবর্তী হয়ে, যে কেন্দ্রে পরমোচ্চ ও পরম নিম্ন, স্বর্গ ও পৃথিবী, অবশেষে সম্মিলিত হয়। অগ্রদূত সেজন্য সকল মধ্যবর্তী মানসিক, প্রাণিক ও ভৌতিক ক্ষেত্রকে পরিশুদ্ধ করবেন, যেন উভয় মেরু ফলপ্রসূভাবে সম্মিলিত হতে পারে। যখন সংযোগ হয়, শুধু মানসিক ও প্রাণিক ভাবে নয়, বরং জড়তত্ত্বে, তখন আত্মার আবির্ভাব হয় জড়তত্ত্বে, এক সম্পূর্ণ অতিমানস সত্তায়, এবং এক অতিমানস শরীরে।

[†] Neanderthal.

সমগ্র ধরিত্রী হবে আত্মার ব্যক্ত নিবাস।[২৯]

মধ্যবর্তী ক্ষেত্রের এই বিশুদ্ধীকরণই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের সম্পূর্ণ কাহিনী। অতিমানস *অগ্নির* জন্য শরীরকে উপযোগী করে তোলার অসুবিধাগুলি পরিশেষে বিবেচিত ও প্রয়োজনীয় হতে পারে। বোধ হয়, কোনো ভৌতিক অসুবিধার প্রশ্ন ততটা নয় এ, বরং এ যেন এক কৌশলগত অসুবিধা। কারণ, এই দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা উপলব্ধি করেছিলেন যে, রূপান্তর এক ব্যক্তিগত সমস্যাই শুধু নয়, বরং তা এক পার্থিব সমস্যা। এবং কোনো ব্যক্তিগত রূপান্তর সম্ভব নয় (অথবা সম্পূর্ণ নয়), এক ন্যূনতম সামূহিক রূপান্তর ব্যতীত। সামূহিক বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশে যথেষ্ট অগ্রগতি যে দিন হবে, এ কথা সম্ভব যে তখন রূপান্তরের পথে এখনকার ভৌতিক অসুবিধাগুলি, যা মনে হয় অনতিক্রমণীয়, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। কিছুই অসম্ভব নয়, কখনো নয়; সময় এসে গেছে, কিংবা হয়তো আসে নি। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সকল বাধা-বিঘ্ন, যে-প্রকারেরই হোক-না-কেন, সবসময় পরিশেষে হয়ে ওঠে কোনো এক সত্যের মূল্যবান্ সাহায্যকারী— যে সত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমরা এখনও জানতে পারি নি। আমাদের বাইরের অগভীর দৃষ্টিতে, রূপান্তর মনে হয় প্রকাণ্ডরূপে ভৌতিকস্তরের এক সমস্যা, কারণ আমরা সবসময়ই ঘোড়ার সামনে গাড়িকে রাখি, কিন্তু বস্তুত সকল সমস্যাই অভ্যন্তরীণ ও মনস্তাত্ত্বিক। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব, উত্তপ্ত *অগ্নির* উপযোগী হয়ে-ওঠা শরীরের সকল দৃশ্য অসুবিধাগুলো সম্ভবত ততটা ব্যবহারিক বা ভৌতিক সমস্যা নয়, বরং তা সমগ্র পার্থিব চেতনার এক সমস্যা। কিন্তু আমরা প্রহেলিকাময় ভাষা ব্যবহার করছি। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা অতিশীঘ্রই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার উপর আমরা আরও আলোকপাত করবার জন্য কোনো এক শিষ্যের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের প্রদত্ত এক সহজ মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করছি : *অবচেতনের কর্দম আমি খনন করে চলেছিলাম। নবেম্বর ১৯৩৪-এর পূর্বে অতিমানস আলোক অবতরণ করত, কিন্তু তারপর শুধু কর্দমই উত্থিত হল, এবং আলোক স্তব্ধ হয়ে গেল।*[৩০] শ্রীঅরবিন্দ পরীক্ষা করে দেখলেন, এবার ব্যক্তিগতভাবে নয়, সামূহিকভাবে— যদি কেউ সামান্য তীব্রতর আলোক আকর্ষণ করে আনেন, তা হলে নিম্নের সকল অন্ধকার গর্জন করে ওঠে, যেন সে লাঞ্ছিত। আশ্চর্যের কথা এই যে, যতবার শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা কিছু নতুন অনুভূতি লাভ করেছেন যা রূপান্তরকার্যে কিছু প্রগতির সূচক, তার পরিণামে ততবারই শিষ্যদের চেতনায়, তাঁদের অজ্ঞাতে, বাধাবিঘ্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, এমন-কি, কখনো কখনো রোগ ও বিদ্রোহও সঞ্জাত হয়েছে, যেন সব-কিছুই হয়ে উঠত বিরক্তিকর। সুতরাং, তারপর আমরা বুঝতে পারলাম কাজটির সংশোধনের উপায়। যদি আমরা কোনো পিগ্‌মিকে কোনো

সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের সহজ আলোকের অধীনে আনি, আমরা বোধ হয় তার মধ্যে দেখতে পাব অন্তর্বিদ্রোহ, যা হয়তো তাকে মানসিক আঘাত দেবে, করে দেবে উন্মাদগ্রস্ত। এখনও নিম্নদেশে অনেক অরণ্য আছে। জগৎ এখনও অরণ্যে পরিপূর্ণ। সংক্ষেপে, সেই হল সম্পূর্ণ সমস্যা। আমাদের মানসিক উপনিবেশ এক সদ্য শুষ্ক ভূতাত্ত্বিক চতুর্থ যুগের উপর এক অতি ক্ষীণ আবরণ।

অবচেতন শক্তিরাজি বা সত্তাসমূহের বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈদিক ঋষিগণ তাদের অভিহিত করতেন "আচ্ছাদনকারী (বৃত্র)", "ছিন্নকারী (বৃক)", "সূর্যের অপহরণকারী"। এর চেয়ে ভালোভাবে তাদের বর্ণনা করা যেতে পারে না, কারণ তারা ভয়ংকর অপহরণকারী : যখনই আমরা কিছুটা অগ্রগতি করি, নতুন আলোককে আকৃষ্ট করি, সামান্য তীব্রতম স্পন্দনকে আকৃষ্ট করি, তখনই হঠাৎ যেন আমাদের ধরে টেনে নেওয়া হয় এক শ্বাসরুদ্ধকারী বেল্‌জার্‌[†]-এর মধ্যে, যেখানে সব-কিছুই এক ভয়ংকর কুয়াশার মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে যায়; বিগত দিনের সুষমাময় স্পন্দন, যা ছিল এত স্বচ্ছ, এত জ্যোতির্ময়, এত নমনীয়, তা হঠাৎ আবৃত হয়ে যায় এক ঘন ও আঠালো প্রলেপ দ্বারা, যেন আমাদের কষ্টের সঙ্গে অতিক্রম করতে হবে মাইলের পর মাইল সমুদ্রশৈবাল, স্বল্প আলোকের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য। যা-কিছু আমরা দেখি, স্পর্শ করি, বা যে কাজ আমরা করি তা মনে হয় নষ্ট হয়ে যায়, পচে যায়, নিম্নদেশের সেই আক্রমণে। কোনো কিছুরই আর কোনো অর্থ থাকে না। তথাপি, বহির্দৃষ্টিতে মনে হয়, অবস্থা একরকমই আছে, কিছুই পরিবর্তিত হয় নি। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন : *কিছুটা অবরুদ্ধ এক সংগ্রাম চলতে থাকে, যেখানে কোনো পক্ষ বিশেষ কিছু অগ্রগতি করতে পারে না (কিছুটা য়ুরোপের ট্রেঞ্চ যুদ্ধের মতো)। আধ্যাত্মিক শক্তি ভৌতিক জগতের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে জোর দেয়, যে প্রতিরোধ প্রতিটি ইঞ্চিতে বিবাদরত, এবং ন্যূনাধিক ফলপ্রসূ প্রতি-আক্রমণে সক্রিয়। এবং যদি শক্তি ও আনন্দ অন্তর্নিহিত না হত, কাজটি হত নিগ্রহকারক তথা বিরক্তিকর।*[৩১] এবং মনে হয়, সংগ্রামটি বিরামবিহীন। ঋষিদের উক্তি, ব্যক্তি "অবিরত খননে রত হয়", এবং ব্যক্তি যতই অধিকতর খনন করে, ততই নিম্নদেশ আরও দূরে অপসৃত হয়। "অনেক শরৎ আমি পরিশ্রম করে চলেছি দিনরাত, অনেক উষাকাল আমাকে বয়োবৃদ্ধা করে তুলেছে। বয়স আমাদের শরীরের মহিমার হ্রাস করছে", হাজার হাজার বছর আগে ঋষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন এইভাবে; ঋষি অগস্ত্যও রূপান্তরের অন্বেষী ছিলেন। লোপামুদ্রা আরও বলেছিলেন : "এমন-কি প্রাচীন যুগের মানবেরাও, যাঁরা ছিলেন সত্যের জ্ঞানে প্রাজ্ঞ, এবং যাঁরা দেবতাদের সঙ্গে কথোপকথন করতেন, তাঁরাও উপনীত হন নি লক্ষ্যে।" কিন্তু অগস্ত্য সহজে হতোৎসাহ হন নি, এবং তাঁর উত্তরও বিজয়ী ঋষিদের মহত্ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অনুসারী : "বৃথা নয় এই শ্রম যা দেবগণ সংরক্ষিত

করেন। সকল বিবদমান শক্তিও আস্বাদিত হোক আমাদের দ্বারা, প্রকৃত জয় লাভ করা যাক এখানেও, সংগ্রামরূপী শত আভিমুখ্যের এই ধাবনে আমরা যেন ধাবিত হই" (ঋগ্‌বেদ ১।১৭৯)। এবং যথার্থই এ এক বহুশীর্ষ সর্পের মতো। রাতের পর রাত, নিদ্রায় অথবা জাগ্রত নয়নে সাধক আবিষ্কার করেন অনেক বিস্ময়জনক জগৎ। মানুষের বিকৃতির, মানুষের যুদ্ধের, মানুষের কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প-এর সকল জন্মস্থান একের পর এক তিনি আবিষ্কার করেন— এই হল "সেইস্থান" যেখানে "এইস্থান" প্রস্তুত হয়— এবং তাদেরই গুপ্ত নিবাসে তিনি হতচকিত করে দেন সেইসব নীচ শক্তিদের যারা সংকীর্ণমনা ও নিষ্ঠুর লোকেদের পরিচালিত করে।

একাকী আবিষ্কারক তিনি সেসব ভীতির রাজ্যে,
রবিতাপ হতে রক্ষিত বল্মীকনগরের মতো,[৩২]

যত বেশি আলোক আমরা পাই, তত বেশি অন্ধকার আমরা আবিষ্কার করি। রাতের পর রাত আমরা খুঁজে বের করি সেইসব পচনশীল গোপন বস্তু যে-সব চেষ্টা করে জীবনের ধ্বংসসাধনের জন্য— এই পচনরূপ ব্যাধি থাকা পর্যন্ত আমরা কোনো কিছুর রূপান্তরসাধন করতে পারব কীভাবে? যেহেতু সাধনার এ অবস্থায় আমাদের মন ও প্রাণ ভালোভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভালোভাবে বিশুদ্ধ হয়েছে এবং এ-সব অন্তর্ভৌম শক্তি তাদের স্পর্শ করতে পারবে না, সেজন্য শরীরই আক্রান্ত হয়; কারণ সেই হল মিথ্যার শেষ গুপ্ত আশ্রয়স্থল। তখন আমরা খুবই স্পষ্টরূপে দেখতে পাই সকল জটিলতা যাদের মাধ্যমে শরীরে রোগ ও মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে— সেখানকার প্রত্যেক পরাজয়, এখানকারও একটি পরাজয়। এবং আমরা স্পষ্টভাবে, প্রত্যক্ষভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝতে পারি তাদের বিশাল মিথ্যাদর্প যারা বাইরের উপায় ও নতুন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জগৎকে আরোগ্য করবার জন্য মিথ্যা দাবি করে। কোনো অশুভের কোনো এক স্থানে আরোগ্য হলে বা কোথাও বিনাশ হলে, তা অন্যত্র পুনরাবির্ভূত হয়, অন্য কোনো কোণে, অন্য কোনো রূপে। অশুভ বাইরে নেই, তা অন্তরেই বিদ্যমান, নিম্নদেশে, এবং যে পর্যন্ত এই রোগের আরোগ্য হয় নি, জগৎ আরোগ্যলাভ করবে না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : *পুরাতন দেবতারা জানেন ভালোভাবে, কীভাবে দেহান্তরিত হতে হয়।*[৩৩]

নিম্নতম দেশে, বিশৃঙ্খলাকে অতিক্রম করে, ভয়কে অতিক্রম করে— গভীরতার মধ্যে অধ্যক্ষতা করে এক বিরাট্ ভয়— আমরা দেখতে পাই এক মহতী ক্লান্তি, এমন কিছু যা প্রত্যাখ্যান করে এইসব জীবনযন্ত্রণাকে, আলোকের উপর এ-সব বলাৎকারকে যা অস্বীকার করে "না" বলে; আমরা জানতে পারি, সেখানে

অবতরণ করলে, এই "না"র শেষে উপনীত হলে, আমরা শুধুই প্রস্তরের এক মহামুক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যাব, যেমন উর্ধ্বের চরমানন্দ আলোকের এক মহামুক্তি। মৃত্যু নয় জীবনের বিপরীত! জ্যোতির্ময় অতিচৈতন্যের তা ভিন্ন পার্শ্ব, অথবা তার অভিমুখী এক দ্বার। "না"র শেষতম বিন্দুতে, আছে "হ্যাঁ" আবারও "হ্যাঁ", যা আমাদের প্রচালিত করে এক শরীর হতে অন্য শরীরে, বারংবার, আনন্দপ্রাপ্তির জন্য। এই "হ্যাঁ"র দুঃখপ্রকাশ ব্যতীত মৃত্যু আর কিছুই নয়। নিম্নতম দেশের এই মহতী ক্লান্তি, পরমানন্দের এক অনুকরণ মাত্র। মৃত্যু নয় জীবনের বিপরীত! শাশ্বত আনন্দে এক জ্যোতির্ময় মুক্তি যে শরীর প্রাপ্ত হয় নি, এ সেই শরীরের এক অন্ধকারময় মুক্তি। যখন শরীর নিজের মধ্যে, এবং উর্ধ্বেও, আবিষ্কার করে এই পরমানন্দ, আলোকের এই তীব্রতা ও অন্তর্নিহিত গভীর আনন্দ, তখনই এর আর মৃত্যুর প্রয়োজন হবে না।

এ সব-কিছুর মধ্যে কোথায় "আমি", কোথায় "আমাকে"? কোথায় "আমার" বিপদ্, "আমার" মৃত্যু, আমার "রূপান্তর"? ব্যক্তিগত অবচেতনের অতি ক্ষীণ আবরণ সাধক বিদীর্ণ করেছেন, জগতের সর্বত্র তিনি বিরাজমান— সমগ্র জগৎই প্রতিরোধ করে : আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করি না, প্রত্যেক বস্তুই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে! আমরা চিন্তা করি আমরা পৃথক, আমরা প্রত্যেকে চর্ম-আবরণের মধ্যে আছি, "অন্তরংশ" ও "বহিরংশে"র সঙ্গে, এক ব্যক্তিত্ব ও এক সামূহিকতার সঙ্গে, যেমন আমাদের দেশসমূহের চতুর্দিকে বিদ্যমান তুচ্ছ অর্থহীন সীমা— কিন্তু সব-কিছুই সংযুক্ত হয়ে আছে! এ জগতে কোনো বিকৃতি, কোনো লজ্জা নেই, যার মূল আমাদের মধ্যে নেই; কোনো মৃত্যু নেই যার মধ্যে আমাদের সহযোগ নেই। আমরা সকলেই দোষী ও জড়িত, কারও উদ্ধার নেই, প্রত্যেকেরই উদ্ধার না-হওয়া পর্যন্ত! সমস্যা *একটি* শরীরের নয়। সমস্যা শরীরের, শ্রীমা বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা এইভাবে বস্তুগতরূপে, পরীক্ষমূলকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন জগতের উপাদানের একত্ব : সকল বিন্দুকে স্পর্শ না করে একটি বিন্দুকে স্পর্শ করা যেতে পারে না; সম্মুখে বা উর্ধ্বে আমরা একটিও পদক্ষেপ নিতে পারব না, যদি অবশিষ্ট জগৎও সম্মুখে বা উর্ধ্বে একটি পদক্ষেপ না নেয়। আমরা কিছু সময় পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম এক "কৌশলগত" সমস্যার; এ কথা হতে পারে যে দিব্য কৌশল চায় না একটি বিন্দুর অগ্রগতি, অন্য সকল বিন্দু ব্যতীত। এই কারণেই বৈদিক ঋষিগণ বিফল হয়েছিলেন ছ হাজার বছর আগে। ন্যূনতম জাগতিক রূপান্তর ব্যতীত এক সম্পূর্ণ ও স্থায়ী ব্যক্তিগত রূপান্তর সম্ভব নয়।

এইভাবে রূপান্তর-ক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়টি সমাপ্ত হয়। ১৯২৬ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত, ১৪ বছর ধরে, কয়েকজন মুষ্টিমেয় মনোনীত শিষ্যের সঙ্গে একাগ্রভাবে সাধনা করবার পর, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যেন এক প্রাচীরের সম্মুখে

উপস্থিত হলেন। যখনই অতিমানস আলোক পৃথিবীর সমীপবর্তী হল, জড়তত্ত্বে অন্তর্নিহিত অতিমানস আলোকের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করবার জন্য সামূহিক অবচেতন হতে উত্থিত হল কর্দমের প্রবল স্রোত, এবং সব-কিছু তাতে নিমজ্জিত হয়ে গেল, পুনর্বার। শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য : *মানবজাতিকে সাহায্য করবার জন্য, কোনো ব্যক্তির পক্ষে একাকী পরম সমাধান লাভ করা যথেষ্ট নয়, তিনি যতই মহান্ হোন-না-কেন, কারণ আলোক অবতরণের জন্য প্রস্তুত থাকলেও তা স্থায়ীরূপে অবস্থানের জন্য আসতে পারে না, যে-পর্যন্ত নিম্নস্তর সেই অবতরণের চাপ সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত না হয়।*[৩৪] এ কথা গুরুত্বপূর্ণ (বোধ হয়, যা মনে হয় তার চেয়ে বেশি) যে, রূপান্তরকার্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ একই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। যখন মানবজাতির মধ্যে একটি শরীরের উপর আলোকের চাপ অবতীর্ণ হয়, জাগতিক শরীরও জ্বলন্ত লোহিতবর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা কতটাই বা জানি জগতের মঙ্গলের বিষয়ে বা তার অমঙ্গলের বিষয়ে?

সমস্ত সামূহিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হলেন; তাঁরা চিন্তা করলেন যে, তাঁরা অবশিষ্ট জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অল্প কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে অগ্রসর হবেন ও রূপান্তর সংসিদ্ধ করবেন, এবং তারপর সামূহিক সংসিদ্ধির জন্য ফিরে আসবেন, যে রূপান্তর তাঁদের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে (বা আংশিকরূপে সম্পন্ন হয়েছে) তা অবশিষ্ট পৃথিবীতে প্রসারিত করবার জন্য। (এই একই ধারণা অসংখ্য আধ্যাত্মিক, তান্ত্রিক, বীরব্রতী ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্ররোচিত করেছে জগৎ হতে দূরে, সামূহিক স্পন্দনের ক্ষয়কারী ক্রিয়া হতে সুরক্ষিত এক নিভৃত স্থান মনোনীত করে তাঁদের কাজ করবার জন্য।) কিন্তু তাঁরা খুব শীঘ্রই উপলব্ধি করলেন যে, এ এক বিভ্রান্তি, এবং পরবর্তী সময়ে এই নতুন সিদ্ধি ও পুরোনো জগতের মধ্যে স্থিত গভীর গহ্বর, বা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, *পারিপার্শ্বিক ব্যবধান*[৩৫] এত বিরাট হয়ে উঠবে, তাকে আর কখনো সেতুবন্ধনে সংযুক্ত করা যাবে না। এক ব্যক্তিগত সফলতার কী প্রয়োজন, যদি তা অবশিষ্ট জগতের মধ্যে সঞ্চারিত না হতে পারে? আমরা তখন হয়ে উঠব অ্যাণ্ডার্‌সেন্-এর সম্রাটের মতো, যার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। যদি এক অতিমানস সত্তা হঠাৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, কেউ তাঁকে দেখতেই পারবে না। জীবনের অন্য এক প্রণালীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথমে উন্মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীমা বলেছেন : *যদি তুমি সেই পথে চলো যা প্রস্তুত (যেমন সত্তাসমূহের বিষয়ে সত্য, তেমনই সত্য পথের বিষয়ে : কিছু সত্তা বা পথ প্রস্তুত), এবং অবশিষ্ট সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্য তোমার না থাকে, অর্থাৎ যদি তুমি বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির তুলনায় সত্যের অতি নিকটবর্তী কিছু উপলব্ধি করো, তা হলে কী হবে? এক সমগ্রতার সংহতিনাশ, শুধু শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত, তাই*

নয়, ভারসাম্যেও ব্যাঘাত, কারণ সৃষ্টির এক সমগ্র অংশ অনুসরণ করতে পারবে না। এবং ভগবানের এক সম্পূর্ণ উপলব্ধির পরিবর্তে তুমি এক স্থানীয় ক্ষুদ্র উপলব্ধি লাভ করো, অতিক্ষুদ্র, এবং কালক্রমে যে উপলব্ধি নিশ্চিতভাবে হওয়ার কথা, তা হবে না। শ্রীমা আরও জোর দিয়ে বলেছেন : *যদি তুমি এ কাজ একাকী করতে চাও, সমগ্রভাবে তা করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, কারণ প্রত্যেক শরীরধারী সত্তা, যতই সম্পূর্ণ হোক-না-কেন, এমন-কি তিনি যদি সম্পূর্ণরূপে এক উচ্চগুণের সত্তা হয়ে থাকেন, এবং তাঁর সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, তিনি নিশ্চয় সীমিত ও আংশিক হবেন। জগতে একটি সত্যেরই, একটি নিয়মেরই প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি— তা খুবই জটিল এক নিয়ম হতে পারে, কিন্তু তা শুধু একটিই নিয়ম— এবং শুধু তাঁরই মাধ্যমে, শুধু একটি শরীরের মাধ্যমে, রূপান্তরের সম্পূর্ণতা সংসিদ্ধ করা যেতে পারবে না। একাকী তুমি নিজের পূর্ণতার উপলব্ধি করতে পারবে; তোমার চেতনায় তুমি অসীম ও পূর্ণ হতে পারবে। আন্তর উপলব্ধির কোনো সীমা নেই। কিন্তু অপরপক্ষে, বাহ্য উপলব্ধি অপরিহার্যরূপে সীমিত, ফলত তুমি যদি এক সর্বজনীন কার্য চাও, তা হলে তোমার প্রয়োজন এক ন্যূনতম সংখ্যায় শরীরধারী ব্যক্তি।*

১৯৪০-এ, ১৪ বছর ধরে ব্যক্তিগত সাধনার পর শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা তাঁদের আশ্রমের দ্বার প্রসারিত করলেন। আরম্ভ হল রূপান্তরের তৃতীয় পর্যায়, বিস্তৃতির এক পর্যায়; এ পর্যায়ে আরব্ধ পার্থিব কার্য আজও অবিচ্ছিন্ন।

ভারতবর্ষে, আশ্রম এক আধ্যাত্মিক বা ধার্মিক সম্প্রদায়, যার সদস্যেরা একজন গুরুর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হন ও সংসার-পরিত্যাগপূর্বক ধ্যান, একাগ্রতা, যোগাসনের অভ্যাস করেন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হন। এ কথা বোধগম্য যে

শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমের এই সংজ্ঞার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু এই সত্য ব্যতীত যে, শিষ্যেরা শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয়ে ছিলেন। কোনো প্রকার অদ্ভুত সন্ন্যাসী-মঠ, কিংবা আশ্রয় বা শান্তি লাভের স্থান তা ছিল না। বরং তা ছিল এক কামারশালার মতো : *এই আশ্রম সৃষ্টি হয় নি সংসার-ত্যাগের জন্য, বরং তা সৃষ্টি হয়েছে, অন্য এক প্রকার ও অন্য এক রূপের জীবনের বিবর্তনের জন্য সাধনার কেন্দ্র ও ক্ষেত্র রূপে।*[৩৬] এমন-কি, যখন তিনি বঙ্গে ছিলেন, এমন এক সময়ে যখন এক আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা তিনি চিন্তাও করেন নি, তখনও শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন : *যে ব্যক্তি সাধারণ মানবিক জীবন যাপন করেন যোগশক্তিবলে, তাঁর মধ্যেই আধ্যাত্মিক জীবন অধিকতম শক্তিশালীরূপে অভিব্যক্ত হয়। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের এপ্রকার সংযোগ দ্বারাই মানবজাতি কালক্রমে ঊর্ধ্বায়িত হবে এবং হয়ে উঠবে শক্তিশালী ও দিব্য।*[৩৭] এইভাবে তাঁর আশ্রম পূর্ণরূপে সংমিশ্রিত হয়ে উঠল দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে, সাধারণ জাগতিক মিশ্রণের ঠিক মধ্যে, কারণ সেখানেই রূপান্তর সংঘটিত হতে হবে, হিমালয়ের কোনো শৃঙ্গে নয়। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যেখানে বাস করতেন সেই মুখ্য অট্টালিকা ব্যতীত, আরও ১২০০-র অধিক শিষ্য, সকল জাতির, সকল সামাজিক পরিবেশের পুরুষ ও নারী, এবং চার-পাঁচশো শিশু, সমগ্র পণ্ডিচেরী নগরেব মধ্যে ছড়িয়ে থাকতেন তিনশো-এর অধিক ভিন্ন ঘরে। চারদিকে কোনো নিরাপত্তামূলক প্রাচীর ছিল না, অন্তরের আলোক ব্যতীত। বাজার ছিল নিকটেই।

সুতরাং, যে পাশ্চাত্যবাসী সেখানে এসেছিলেন শান্তি ও "যোগশিক্ষা" পাওয়ার ধারণায়, তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। প্রথমত, তাঁকে কেউ কিছু শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেন না (বরং যা প্রয়োজন তা হল "শিক্ষা হতে মুক্তি"), কোনো অধ্যয়নশ্রেণী ছিল না, শুধু শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থাবলী এবং শ্রীমার প্রশ্নোত্তর ব্যতীত, যা সবারই আয়ত্তে ছিল (যেমন ছিল অন্যান্য পারম্পরিক ও অ-পারম্পরিক উপদেশাবলী)। তা ছাড়া, কোনো নিয়মাবলীও ছিল না। শিষ্যকে সব-কিছু নিজেই করতে হত, নিজের অভ্যন্তরে, এক অসাধারণভাবে কর্মময় বাহ্যজীবনের মধ্যে। তাঁকে নিজের কথা নিজেই বুঝতে হত। তা ছাড়া, কেমনভাবে বা কেউ কোনো নিয়মাবলী রচনা করতে পারবে এমন এক সাধনার জন্য যা বিবর্তনের সকল স্তরকে পরিবেষ্টিত করে— মানসিক, প্রাণিক ও চৈত্যকেন্দ্রীয় —সকল প্রকার মানুষ ও সকল পরম্পরার সঙ্গে (কোনো কোনো শিষ্য খৃস্টধর্মে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, অন্যেরা তাও, ইস্‌লাম, বৌদ্ধ মতাবলম্বী বা নাস্তিক ছিলেন)? প্রত্যেককে আবিষ্কার করতে হবে তাঁর নিজের সত্য, যা তাঁর প্রতিবেশীর সত্য হতে পৃথক্। কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন তপশ্চর্যার গুণাবলীতে — শ্রীঅরবিন্দ সে-বিষয়ে যা যা বলেছেন তা সত্ত্বেও— এবং তপস্বীদের মতো একান্তবাস করতেন; অন্য কেউ কেউ জুডো কিংবা ফুটবল খেলতেন; অন্যেরা

অধ্যয়নে বিশ্বাস করতেন, কেউ কেউ করতেন না; তা ছাড়া, কেউ কেউ ব্যবসায় করতেন, স্টেন্‌লেস্ স্টিল উৎপাদন করতেন, অথবা সুগন্ধি প্রস্তুত করতেন, কিংবা কেউ হয়তো এক আধুনিক চিনি কারখানায় টন টন চিনি উৎপাদন করতেন। প্রত্যেক অভিরুচির জন্য কিছু-না-কিছু ছিল। যাঁরা চিত্রশিল্প ভালোবাসতেন তাঁরা চিত্রাঙ্কন করতেন; যাঁরা সংগীতপ্রিয় ছিলেন তাঁদের জন্য ছিল সকল সম্ভাব্য যন্ত্র, ভারতীয় তথা পাশ্চাত্য; যাঁরা অধ্যাপনা ভালোবাসতেন তাঁরা অধ্যাপনা করলেন আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে, যেখানে কিণ্ডারগার্টেন্ থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া, সেখানে ছিল ছাপাখানা, গবেষণাগার, বাগান, ধানক্ষেত, কার্, ট্র্যাক্টর, ট্রাকের জন্য কর্মশালা, এক্‌স্‌রে পরীক্ষাগার, ও অস্ত্রোপচারের জন্য প্রকোষ্ঠ। সকল সম্ভাব্য কার্যকলাপ সেখানে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এ ছিল এক ক্ষুদ্র জগৎ। যদি কেউ সহজ কাজ করতে ভালোবাসতেন তা হলে তিনি রুটি প্রস্তুত করতে পারতেন, কিংবা বাগান পরিষ্কার করতে পারতেন, অথবা কাঠের কাজও করতে পারতেন। তা ছাড়া এ-সব কার্যকলাপের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না, কোনো কাজের জন্য পারিশ্রমিক ছিল না, কিংবা কাউকে অন্য কারও অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ মনে করা হত না। জীবনের সকল আবশ্যকতা শ্রীমা পূর্ণ করতেন, প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী। প্রকৃত কাজ ছিল স্বীয় সত্তার সত্যকে আবিষ্কার করা, যার জন্য বাইরের কাজ ছিল এক উপায় মাত্র। চেতনার জাগরণের পর কারও কারও কর্মের পরিবর্তন উল্লেখনীয়ভাবে দেখা গেছে; অতি শীঘ্র পুরোনো কর্মের প্রতি প্রদত্ত সকল মূল্য কমে যায়; এবং যেহেতু অর্থের কোনো তাৎপর্য ছিল না, সেজন্য যে-ব্যক্তি নিজেকে ডাক্তার মনে করতেন, শিল্পী হয়ে-ওঠা তিনি আরও আনন্দদায়ক মনে করলেন। একজন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে হঠাৎ চিত্রকলা বা কবিতার প্রতিভা প্রকাশিত হল, বা তিনি সংস্কৃত বা আয়ুর্বেদের অধ্যয়নে নিজেকে মগ্ন করলেন। এ ছিল আন্তর মানদণ্ড অনুযায়ী বাহ্যমূল্যের পুনর্নির্ধারণ। একবার একজন শিষ্য শ্রীমাকে প্রশ্ন করেছিলেন অতিমানস রূপান্তরে সহযোগ করবার শ্রেষ্ঠ উপায়ের সম্বন্ধে; তাঁকে এই উত্তর দেওয়া হয়েছিল : *সবসময় একই কথা; নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করো, যে-কোনো রূপে, যে-কোনো উপায়ে— তাতে কিছু যায় আসে না। সেই হল একমাত্র পথ। প্রত্যেক ব্যক্তি তার মধ্যে একটি সত্য বহন করে, এবং সেই সত্যের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত হতে হবে। এই সত্যকে জীবনে ধারণ করতে হবে। যে উপায়, যে পথ সে অনুসরণ করে এই সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য, তাকে উপলব্ধি করবার জন্য, সেই পথই নিয়ে আসবে তাকে রূপান্তরের নিকটতম সামীপ্যে। অন্য কথায়, উভয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত : ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধি ও রূপান্তর। এমন-কি এটাও হতে পারে যে, আভিমুখ্যের বহুত্ব এনে দেবে রহস্যের সমাধান ও দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে, কে জানে?*

কোনো সামূহিক জীবনও নেই, শুধু অন্তরের যোগাযোগ ব্যতীত। আশ্রমের শিশুদের সঙ্গে শ্রীমার কথোপকথনের সময় থেকে কিছু শিষ্য সপ্তাহে দুবার সামূহিক ধ্যানের জন্য সম্মিলিত হওয়ার অভ্যাস রেখেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি খেলাধুলোর জন্যই তাঁরা সম্মিলিত হতেন (একটি সাধারণ ভোজনকক্ষ ছিল, কিন্তু অনেকেই পছন্দ করতেন নিজ আবাসে পরিবারের সঙ্গে বা একাকী ভোজন করা)। সকল প্রকারেরই খেলাধুলা ছিল, পরম্পরাগত হঠযোগ থেকে শুরু করে টেনিস ও মুষ্টিযুদ্ধ পর্যন্ত, এবং প্রত্যেক শিষ্যই প্রতিদিন দু-এক ঘণ্টা ব্যয় করতেন এ-সবের জন্য। সমুদ্রে নিকটেই অবস্থিত, কিন্তু অলিম্পিক আকারের এক সুইমিং পুল্‌ও ছিল; এবং ছিল বাস্কেটবল ও ভলিবল কোর্ট, ছিল দৌড়ের জন্য রাস্তা, জিম্‌ন্যাসিয়াম্‌, মুষ্টিযুদ্ধের রিং, জুডো শিক্ষার স্থান ডোজো ইত্যাদি। সকল সম্ভাব্য ব্যায়ামের অভ্যাস সেখানে হত, পাঁচ বছর থেকে পঁচাশি বছর বয়স পর্যন্ত। একটি থিয়েটার ও একটি সিনেমাহলও ছিল। কিন্তু খেলাধুলা, বা অন্য কিছু, ছিল না বিশ্বাসের সঙ্গে পালনীয় কোনো বিধিনির্দেশ; *শুধু এক বিশ্বাস অবশ্য ছিল মানুষের সকল দিব্য সম্ভাবনায় এবং পৃথিবীতে এক অধিকতর সত্যময় জীবনে। সর্বকনিষ্ঠদের মা বলতেন : আমার শিশুগণ, তোমরা সকলেই অসাধারণ স্বাধীনতার মধ্যে আছ। কোনো সামাজিক বাধা নেই, কোনো নৈতিক বাধা নেই, কোনো বৌদ্ধিক বাধা নেই, কোনো নিয়ম নেই; কোনো কিছু নেই, এখানে শুধু আছে এক দিব্য আলোক।* কিন্তু এ আলোকের বেশ-কিছু দাবি ছিল। পার্থিব কর্মটির এই ছিল সূত্রপাত।

কীভাবে বলা যেতে পারে "পার্থিব" কর্মের কথা, ১২০০ জন শিষ্য নিয়ে, কিংবা এক লক্ষ শিষ্য নিয়ে? আমাদের স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আশ্রম শুধু এই কর্মটির জন্য একটি কেন্দ্রীভূত বিন্দু— বস্তুত জগতে যেখানে লোকেরা অধিকতর সত্যময় জীবনে বিশ্বাস করেন, তাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে জানুন বা না জানুন, সেখানেই "আশ্রম" অবস্থিত, কারণ তাদের আন্তর আভিমুখ্য বা সংকল্প এমন এক একাগ্রতা বা প্রয়োজনের প্রতিনিধিত্ব করে, যা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপিত করে এই অগ্নিপরীক্ষায়। রূপান্তর কারও ব্যক্তিগত অধিকার নয়, পক্ষান্তরে অনেক মানুষ তার প্রয়োজন, যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যের সঙ্গে। সুতরাং আশ্রম ছিল এক প্রতীকাত্মক বিন্দু, কিছুটা যেমন এক পরীক্ষাগার, এক প্রতীকাত্মক পরীক্ষার ক্ষেত্র কোনো এক প্রতিষেধক টীকার, যা পরবর্তী সময়ে নিযুত নিযুত লোকের উপর কাজ করবে। শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই আশ্রমকে *পরীক্ষাগার* বলতেন। এ কথা বললে স্পষ্টতরভাবে বোঝা যাবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট স্পন্দনের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং অবচেতনের এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে তার প্রবেশ আছে। এ-সব জগৎ অসাধারণভাবে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত, এবং তাদের প্রত্যেকটি অল্পকিছু বিশেষ স্পন্দন দ্বারা গঠিত; কোনো এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের অগণিত রূপ (অথবা বলা

যেতে পারে বিরূপ), অগণিত সত্তা, স্থান ও ঘটনাবলী একই স্পন্দনের ছদ্মবেশ মাত্র। যখনই আমরা কিছুটা সচেতন হয়ে উঠি ও হতবুদ্ধি না হয়ে অবচেতনে অবতরণ করা শুরু করি, সেখানে সাধনা করবার জন্য, তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, প্রায় মনোরঞ্জন লাভ করি, এ কথা লক্ষ্য ক'রে যে, যে-সব ব্যক্তিদের আমরা শারীরিকভাবে জানি, এবং যারা বাইরের দিক থেকে পরস্পর হতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাদের যখন আমরা মানসিক বা প্রাণিক স্তরে দেখি, তারা অবচেতনে প্রায় একসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়, পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় হয়ে যায়! একজনকে অন্যজন হতে পৃথক্ করা কষ্টকর হয়। এইভাবে, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, এমন-কি বিভিন্ন নৈতিকতায় পৃথক্ মানুষেরা অবচেতনে একই *প্রকারের* অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ সদৃশ হতে পারে; শ্রীমা বলছেন, যেন একজনের মধ্য দিয়ে তুমি অন্যজনকে দেখতে পাবে। এ এক অদ্ভুত প্রকারের অধ্যারোপণ। আমাদের দৃষ্টি সীমিত হওয়ার ফলে আমরা শুধু দুই-তিন জনকে দেখতে পারি, একজনের মধ্য দিয়ে অন্যজনকে; কিন্তু যদি আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকত তা হলে তাদের পশ্চাতে আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আরও হাজার হাজার ব্যক্তিকে দেখতে পেতাম। কয়েকজন ব্যক্তিকে অবচেতনে মোটেই একসঙ্গে দেখা যায় না, যদিও বহির্জীবনে তারা অন্তরঙ্গ। এবং এর বিপরীতও হতে পারে। তা হলে পৃথিবীতে যে কাজটি হবে তা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে; শ্রীমা বলেছেন : *প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ এক নির্দিষ্ট স্পন্দনসমষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী এক যন্ত্র।* আমাদের সুগুণ *এবং আমাদের দুর্গুণের* জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রবেশাধিকার আছে পার্থিব চেতনার এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে যা সামূহিক রূপান্তরে আমাদের অংশটির প্রতিনিধিত্ব করে। সেজন্য আমরা বুঝতে পারি কীজন্য একমাত্র ব্যক্তির মধ্যে রূপান্তর সংসিদ্ধ হতে পারে না, কারণ সে ব্যক্তি যতই মহান্ হোন-না-কেন, যতই বিরাট্ হোন-না-কেন, তাঁর আন্তর সংগঠন এবং তাঁর মানসিক, প্রাণিক তথা অবচেতন উপনিবেশ, তিনি শুধু এক নির্দিষ্ট স্পন্দনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করেন, তারই রূপান্তরসাধন তিনি করতে পারবেন— যদিও তাও সুনিশ্চিত নয়, কারণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সব-কিছু পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন। আমরা আরও বুঝতে পারি, কীজন্য রূপান্তরসাধন হতে পারবে না ক্ষুদ্রকায় পুণ্যাত্মাদের দ্বারা : পুণ্যাত্মতা দ্বারা কোনো প্রতিষেধক প্রস্তুত হয় না, প্রস্তুত হয় মানবীয় ব্যাধির আংশিক দায়িত্ব নিজেদের উপর গ্রহণ করবার যে সাহস আমাদের আছে তার দ্বারা। যাই হোক, ব্যাধি আছে, কিন্তু এক ক্ষেত্রে তার প্রতি দৃষ্টি নিমীলিত করে আনন্দসমাধিতে নিমগ্ন হয়ে যাই, এবং অন্য ক্ষেত্রে, আমরা আস্তিন গুটিয়ে আমাদের টেস্ট্ টিউব-এর গণনা আরম্ভ করি। একবার একজন পুরোনো শিষ্য তিক্তভাবে অভিযোগ করলেন আশ্রমের মানবীয় মিশ্রণ ও সেখানে স্থিত "অসম্ভব" ব্যক্তিদের বিষয়ে; শ্রীঅরবিন্দ তার উত্তর দিলেন :

এ কথা প্রয়োজনীয়, বা বরং অপরিহার্য যে, এক আশ্রমে, যা এক আধ্যাত্মিক ও অতিমানস যোগের "পরীক্ষাগার", মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব বিভিন্নভাবে হবে। কারণ রূপান্তরের সমস্যার জন্য অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় উপাদান নিয়েই কাজ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একই মানুষ তার মধ্যে বহন ক'রে চলে এই দ্বিবিধ বস্তু। যদি শুধু সাত্ত্বিক ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরাই যোগসাধনার উদ্দেশ্যে আসেন, তা হলে পার্থিব প্রকৃতিতে প্রাণিক অসুবিধার সম্মুখে যাওয়া হবে না এবং তার উপর জয়লাভ হবে না, এবং এ কথা ভালোভাবেই সম্ভব যে প্রয়াসটি ব্যর্থ হবে।[৩৮] অন্য একজন শিষ্য, যিনি অনুশোচনাপরায়ণ ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দকে লিখলেন, "আমরা কেমন শিষ্য! আমি ভাবি আপনার উচিত ছিল উন্নততর মানুষ গ্রহণ করা, জেড়-এর মতো।" শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন : *শিষ্যদের বিষয়ে, আমি স্বীকার করি। হ্যাঁ, কিন্তু উন্নততর মানুষ, মনে করা যাক তারা আছে, মানবজাতির প্রতিনিধিত্বমূলক হতে পারবে কি? কয়েকজন ব্যতিক্রমকে নিয়ে কাজ করলে, সমস্যার সমাধান হবে না। তারা আমার পথ অনুসরণ করতে রাজী হবে কি? —তাও এক প্রশ্ন। এবং যদি তাদের পরীক্ষা করা যায়, তা হলে তাদের মধ্যে হঠাৎ সাধারণ মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়ে যাবে না কি?— তা অন্য এক প্রশ্ন।*[৩৯] *শত সহস্র শিষ্য আমার প্রয়োজন নেই। আমি যদি একশত সম্পূর্ণ মনুষ্য পাই, যারা ক্ষুদ্র অহংকার হতে মুক্ত, এবং ভগবানের যন্ত্র হতে পারবে, তাই হবে যথেষ্ট।*[৪০]

ব্যবহারিকভাবে কাজটি হয় আমাদের সকল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার মাধ্যমে, যে-সবের প্রত্যেকটি হল জগতের মধ্যে স্থিত অনুরূপ সমস্যার প্রতীকস্বরূপ —যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে এক নির্দিষ্ট স্পন্দন স্পর্শ করা হয়, তা হলে সমগ্র জগতের মধ্যে সেই স্পন্দন স্পর্শ পায়। শ্রীমা বলেছেন, *তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে সমস্যাসকলের এক-একটির প্রতিনিধিত্ব করো, যে-সকল সমস্যাকে বিজিত করতে হবে রূপান্তরের জন্য— অর্থাৎ, অনেক সমস্যা! সমস্যার চেয়ে তা আরও বেশি কিছু : আমার মনে হয় আমি আগেও বলেছি, প্রত্যেকে এক অসম্ভবত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, যার সমাধান করতে হবে; যখন সকল অসম্ভবত্বের সমাধান হবে, তখনই এই কার্যটি সংসিদ্ধ হবে।* যেমন আমরা জানি, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি ছায়া আছে, যা তাকে অনুধাবন করে, ও মনে হয় যেন তা তার অস্তিত্বের লক্ষ্যকেই বিরোধ করে। এই হল সেই নির্দিষ্ট স্পন্দন যাকে তার রূপান্তরিত করা উচিত, এই তার কর্মক্ষেত্র, তার অসম্ভবত্ব। যুগপৎভাবে, এ তার জীবনের আহ্বান এবং তার জীবনের বিজয়। পৃথিবীর সামগ্রিক বিবর্তনের অগ্রগতিতে এই তার অংশ। কিন্তু আমাদের পরীক্ষাগারে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে : আমাদের সাধারণ জীবনে, কিংবা ব্যক্তিগত যোগে, এই ছায়া ন্যূনাধিক সুপ্ত থাকে, ন্যূনাধিক বিরক্তিকর, এবং ঘটনাক্রমে বিলীন হয়ে যায়, অথবা নিম্নে নিমজ্জিত হয়ে যায়, বিস্মৃতির মধ্যে; কিন্তু যখনই আমরা এক পৃথিবীময় যোগের সূত্রপাত

করি, আমরা দেখি যে, এ মোটেই নিম্নে নিমজ্জিত হয় না; বার বার তা ফিরে আসে, ক্লান্তিহীনভাবে তীব্র হয়ে, যেন যুদ্ধে কখনো জয়লাভ হয় নি; প্রকৃতপক্ষে, যেন যুদ্ধ করতেই হবে এই নির্দিষ্ট স্পন্দনশীল ক্ষেত্রে, সমগ্র পৃথিবীর জন্য। মনে হয় যেন সাধক হয়ে ওঠেন এক বিশেষ, তীব্র যুদ্ধের ক্ষেত্র, যে একই যুদ্ধ মানবজাতির অবশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখচেতনার অন্তরালে, সেই ছায়াময় অংশে, তারই প্রতীকস্বরূপ এক যুদ্ধের ক্ষেত্র। শ্রীমা বলছেন : *তোমার নিজের জন্য তুমি আর যোগসাধনা করছ না, তুমি তা করছ সকলের জন্য, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে।* জগতের বাস্তব একত্বকে সাধক *জীবন্তরূপে* প্রতিপন্ন করেন : নিজের মধ্যে একটি একক স্পন্দনকে তিনি যদি যথাস্থানে স্থাপিত করতে চান, তা হলে সমগ্র জগতে অনুরূপ অসংখ্য ছোটো ছোটো স্পন্দন প্রতিরোধ আরম্ভ করে। একেই শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেন "পার্থিব চেতনার জন্য যোগ"।[৪১] *জীবনকে গ্রহণ করে তিনি [পূর্ণযোগের সাধক] শুধু নিজেরই বোঝা বহন করেন তাই নয়, তার সঙ্গে তিনি জগতের এক বৃহদংশের ভারও বহন করেন, তাঁর নিজের যথেষ্ট গুরুভার বোঝার সঙ্গে। সুতরাং অন্যান্য যোগ অপেক্ষা তাঁর যোগে যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য আছে অধিকতর ভাবে; কিন্তু এ শুধু এক ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়, এ এক সামূহিক যুদ্ধ, যা পরিচালিত বিশাল এক দেশের বিরুদ্ধে। শুধু যে নিজের মধ্যে অহংকারপ্রসূত মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলার উপর তাঁকে জয়লাভ করতে হবে, তাই নয়, বরং পৃথিবীতে বিদ্যমান একই বিরোধী ও অফুরন্ত শক্তির প্রতিনিধিরূপে তাদের জয় করতে হবে। তাদের এই প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য তাদের প্রদান করে এক অত্যন্ত দুর্দমনীয় প্রতিরোধের শক্তি, পুনরভ্যুদয়ের জন্য প্রায় অশেষ এক অধিকার। প্রায়ই তিনি দেখতে পান যে, তাঁর ব্যক্তিগত যুদ্ধে অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়লাভ করবার পরও তাঁকে সমাপ্তিবিহীন এই যুদ্ধে আবারও বারংবার জয়লাভ করতে হয়, কারণ তাঁর আন্তর অস্তিত্ব ইতিমধ্যে এত প্রসারিত হয়ে যায় যে, তা শুধু তার সুনির্দিষ্ট সকল প্রয়োজন ও অনুভূতিকে ধারণ করে তাই নয়, বরং অন্যসকলের সত্তার সঙ্গেও অভিন্নতা রক্ষা করে, কারণ তাঁর নিজের মধ্যে তিনি বিশ্বকে ধারণ করেন।*[৪২]

আমরা কি কখনো এই কার্যের সমাপ্তিতে উপনীত হতে পারব? আমরা মনে করতে পারি যে, অবচেতন এক শেষহীন জঘন্য স্থান— ঋষিগণ তাকে অভিহিত করতেন "অতল গহ্বর"— এবং আমরা যদি অতিমানস রূপান্তর-লাভের পূর্বে অবচেতনের বিশুদ্ধীকরণের জন্য অপেক্ষা করি, তা হলে আমাদের অতি দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হতে পারে। কিন্তু এ শুধু এক আপাতপ্রতীতি। প্রত্যেক নতুন ব্যক্তির জন্ম অবচেতনা বা নিশ্চেতনার নতুন উপাদান আনে না : সে শুধু একই উৎস হতে সব-কিছু গ্রহণ করে, সেই একই স্পন্দনের পুনরাবৃত্তি করে, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিরামবিহীনভাবে ঘূর্ণায়মান। মানুষ যতটুকু আলোক সৃষ্টি

করতে পারে, তার চেয়ে বেশি অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে না; সে শুধু এক যন্ত্র, সচেতন কিংবা অচেতন, একটির অথবা অন্যটির (এবং অধিকাংশ সময় উভয়েরই)। কোনো নতুন স্পন্দন জগতে আনীত হয় না, অতিচেতন ভবিষ্যতের স্পন্দন ব্যতীত, যা ক্রমশ হয়ে যায় বর্তমান এবং আমাদের বিবর্তনীয় অতীতের স্পন্দনগুলিকে বিলীন করে দেয়, নতুবা রূপান্তরিত করে দেয়। আজকের অবচেতন এবং নিশ্চেতন, তারা দু হাজার বছর পূর্বে যেমন ছিল, তার চেয়ে স্পষ্টত কম অবচেতন বা নিশ্চেতন, এবং এর জন্য আমাদের সকলেরই অবদান আছে। বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের এই অধঃক্ষেপণই হল বিশ্বের রূপান্তরের মূলসূত্র। যোগই সেই কর্ম যেখানে ভবিষ্যৎ ত্বরান্বিত হয়; বিবর্তনের অগ্রদূত সেই যন্ত্র যিনি অধিক হতে অধিকতর শক্তিশালী স্পন্দনসমূহকে আকর্ষণ করেন। সুতরাং সাধকের কর্তব্য ততটা নয় অবচেতনের বিশুদ্ধীকরণের মতো এক নিষেধাত্মক ক্রিয়া, যতটা আলোককে আকর্ষণ করা; তিনি ভবিষ্যতের স্পন্দনকে নিম্নে অবতীর্ণ করান বিশুদ্ধীকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবার জন্য। একেই শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেছেন "অবতরণ", এবং তাঁর যোগের এই হল মুখ্য বৈশিষ্ট্য, যে-কথা আমরা বলেছি। *অন্যান্য যোগে যদি "অবতরণ" থাকে, তা হল শুধু আরোহণের পথে বা আরোহণের ফলে এক ঘটনা— আরোহণই প্রকৃত বিষয়। এখানে আরোহণ প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু তা অবতরণের এক উপায়। আরোহণের দ্বারা প্রাপ্ত নব চেতনার অবতরণই হল সাধনার মুদ্রাঙ্কন ও সীলমোহর। এখানে জীবনের দিব্য পরিপূর্ণতাই লক্ষ্য।*[৪৩] শ্রীঅরবিন্দ যখন "অবতরণের" কথা বলেন, আমাদের বুঝতে হবে যে, তিনি তখন বলেন নি তীরবেগে আরোহণপূর্বক তীরবেগে অবরোহণের কথা; সীমিত শ্রম দ্বারা গভীরতায় সামান্য পরিষ্কার তার অভিপ্রেত নয়; তাঁর উদ্দেশ্য, গভীর অঞ্চলগুলি আর গভীর হয়ে থাকবে না। এক গদ্যময় উদাহরণ নেওয়া যাক— ভগবান্ জানেন এই রূপান্তরসাধন কত বেশি গদ্যময়— হয়তো আমরা বাজারে কেনাকাটা করতে পারি, অস্বচ্ছ মানুষদের মধ্যে যাদের মধ্যে আছে পচনের স্পন্দন; অথবা রাত্রিতে আমরা অবচেতনের কোনো অমঙ্গলময় অঞ্চলে ভ্রমণ করতে পারি, এবং এই উভয় কর্ম আমরা করি চেতনার সেই একই তীব্রতা, আলোক ও প্রশান্তি সহকারে, যেমন আমরা করি, যখন আমরা নিজেদের প্রকোষ্ঠে নিমীলিতনয়নে গভীর ধ্যানে মগ্ন। এই হল "অবতরণের" অর্থ। আর কোনো পার্থক্য নেই, ঊর্ধ্ব ও নিম্ন সমভাবে জ্যোতির্ময় ও প্রশান্ত। এবং এইভাবেই পার্থিব রূপান্তর সংসিদ্ধ হয়, জাগতিক উপাদানের একত্ব উভয়ভাবেই ক্রিয়া করে। জগতের সকল ছায়াকে স্পর্শ না করে আমরা যেমন কোনো এক ছায়াকেও স্পর্শ করতে পারি না, তেমনই বিপরীতভাবে, কোনো আলোককেও স্পর্শ করতে পারি না তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ছায়াকে পরিবর্তিত না করে। সকল স্পন্দনই সংক্রামক, ভালো স্পন্দনও। প্রত্যেক বিজয় সকলের

জন্য বিজয়। যদি তা না হত, তা হলে তা হত আশ্চর্যজনক : *সকলই সেই এক সত্তা!* শ্রীমা ঘোষণা করেছেন; শুধু একই চেতনা, একই উপাদান, একই শক্তি ও একই শরীর বিদ্যমান। এবং সেই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ও শ্রীমার শরীরের বিষয়ে বলেছেন : *যদি অতিমানস আমাদের শরীরে অবতরণ করে, তা হলে তার অর্থ হবে তা জড়তত্ত্বে অবতীর্ণ হয়েছে, এবং এমন কোনো কারণ নেই যে তা সাধকদের (শিষ্যদের) মধ্যে অভিব্যক্ত হবে না।*[৪৪]

সাধক যতই ঊর্ধ্বে গতি করেন, নিম্ন অঞ্চলসমূহে তাঁর প্রবেশ ততই অধিকতর হয়— ভবিষ্যৎকে তিনি যত আবিষ্কার করেন, সেই পরিমাণেই অতীতের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত হন— এবং সামূহিক রূপান্তরের জন্য তাঁর শক্তি অধিকতর হয়। এ পর্যন্ত যে শক্তির অবতারণ হয়েছিল তা হল মানসিক শক্তি, অথবা খুব বেশি হলে অধিমানসিক শক্তি, যা শুধু অগভীর গভীরতাই স্পর্শ করেছিল; কিন্তু এখন যখন এক অতিমানস শক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার উপলব্ধির মাধ্যমে পার্থিব চেতনায় অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তা হলে ধারণা করতে পারি যে, এই পরম ভবিষ্য পরম গভীরতাকে স্পর্শ করবে এবং বিশুদ্ধীকরণকে ত্বরান্বিত করবে, অর্থাৎ পরিশেষে, সমগ্র মানবজাতির বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে। যোগ ত্বরান্বিত বিবর্তনের এক প্রক্রিয়া, এবং অগ্রগতি হয় জ্যামিতিক : *বিবর্তনীয় শক্তির প্রথম অস্পষ্ট ভৌতিক গতির বৈশিষ্ট্য ছিল মহাযুগীয় ধীর ক্রমান্বয়তা; প্রাণিক প্রগতির গতিও ধীর ছিল, কিন্তু তথাপি দ্রুততর ছিল তার পদক্ষেপ, সহস্রাব্দের সংখ্যার মধ্যে তা সংকেন্দ্রিত হয়েছিল; সময়ের বিলম্বিত মন্থরতাকে মন আরও ঘনীভূত করে শতাব্দীর দীর্ঘ পদক্ষেপ নিতে পারে; কিন্তু যখন সচেতন আত্মা হস্তক্ষেপ করে, তখন বিবর্তনীয় শীঘ্রতার এক পরম ঘনীভূত পদক্ষেপ সম্ভব হয়।*[৪৫] আমরা এখন সেই সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি। অবতরণশীল চাপ দ্রুততর হচ্ছে এবং আমরা এক সত্যকারের সমাধানের অভিমুখে যাচ্ছি, আধুনিক জগতের প্রবল আলোড়নগুলি নিঃসন্দেহে তার চিহ্ন। *এমনও হতে পারে যে, এই অতিপ্রয়াস তার প্রথম নির্ণায়ক পর্যায়ের অভিমুখে দ্রুতগতিতে অগ্রসর নাও হতে পারে; এমন হতে পারে যে, একপ্রকার স্থায়ী জন্মের জন্য বহু শতাব্দীর প্রয়াসের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তা অপরিহার্য নয়, কারণ প্রকৃতিতে এ প্রকার পরিবর্তনের নিয়ম, মনে হয়, এক দীর্ঘ অস্পষ্ট প্রস্তুতির পর উপাদানগুলির দ্রুত সমাবেশ ও এক নতুন জন্মের মধ্যে অধঃক্ষেপণ, এক দ্রুত পরিবর্তন, এক রূপান্তর যা তার উজ্জ্বল মুহূর্তে মনে হয় এক অলৌকিক ক্রিয়া। এমন-কি, যখন প্রথম নির্ণায়ক পরিবর্তন উপনীত হয়, এ কথা সুনিশ্চিত যে সমগ্র মানবজাতি সেই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে না। যারা সেই আধ্যাত্মিক স্তরে বাস করতে সমর্থ হবে এবং যারা শুধু মানস-স্তরে অবতরণশীল আলোকে বাস করতে পারবে, তাদের মধ্যে এক বিভাজন অব্যর্থভাবে সৃষ্টি হবে। এদের*

নিম্নেও বিশাল জনসমূহ থাকবে, যারা ঊর্ধ্ব হতে প্রভাবান্বিত হবে, কিন্তু আলোকের জন্য প্রস্তুত থাকবে না। কিন্তু তাও হবে এক রূপান্তর, এবং এক প্রারম্ভ, যা এখনও যা-কিছু সংসিদ্ধ হয়েছে তা থেকে বহুদূরে। আমাদের এখনকার প্রাণিক জীবনযাপনে যেমন উন্নততর শ্রেণী অনুন্নতের উপর অহংকারপ্রসূত আধিপত্য বিস্তার করে, এই শ্রেণীক্রম সেরূপ হবে না; বরং তা হবে প্রজাতির মধ্যে অগ্রজ ভ্রাতাদ্বারা অনুজদের পথপ্রদর্শন, এবং এক অবিরত সক্রিয়তা, এক বিশালতর আধ্যাত্মিক স্তরে ও বিস্তৃততর দিগ্‌বলয়ে তাদের উন্নীত করবার জন্য। এবং অগ্রণীদের জন্যও প্রাথমিক আধ্যাত্মিক স্তরে এই আরোহণ দিব্য অভিযানের শেষ নয়, তা এক চরমোৎকর্ষ নয়, যার পর পৃথিবীতে আর-কিছুই থাকবে না সংসাধনের জন্য। কারণ অতিমানস রাজ্যে আরও উচ্চতর স্তরসমূহ বিদ্যমান, যে কথা প্রাচীন বৈদিক কবিগণ জানতেন, সেজন্য তাঁরা বলতেন আধ্যাত্মিক জীবন এক শাশ্বত আরোহণ—*

"হে শতশক্তিবিশিষ্ট,
তোমায় আরোহণ করে
জগতের পুরোহিতগণ
সোপানের মতো।
শিখরের পর শিখর
কেউ যখন আরোহণ করে
তখন স্পষ্ট হয়ে যায়
*আরও কিছু আছে করণীয়**।"* [৪৬]

পরিশেষে, আমরা এ-সকল শতাব্দী ব্যয় করেছি মূলভিত্তির প্রস্তুতির জন্য। আমাদের বিজ্ঞানের মাধ্যমে সুরক্ষা ও হিতের মূলভিত্তি, আমাদের ধর্ম ও নৈতিকতার মাধ্যমে উদারতার মূলভিত্তি, আমাদের শিল্পকলার মাধ্যমে সৌন্দর্য ও সংহতির মূলভিত্তি, এবং সতর্ক নির্দিষ্টতার এক মানসিক মূলভিত্তি— কিন্তু এ মূলভিত্তি *অন্য-কিছুর* জন্য। পূর্ণতার জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় মগ্ন হয়ে আমরা বিরাট্ কর্মটির শুধু একটিই দৃষ্টিকোণ দেখি— ঋষিদের মতো পৃথিবীতে অমরত্বের দৃষ্টিকোণ, বুদ্ধের মতো শাশ্বত স্থায়িত্বের দৃষ্টিকোণ, উদারতার দৃষ্টিকোণ, কল্যাণের দৃষ্টিকোণ, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ— কিন্তু আমরা তো শিশুদের মতো সবসময় অট্টালিকা-

---

* অতিমানস চেতনার তিনটি ক্রম বা স্তরের বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ উল্লেখ করেছেন। তাদের বিবরণী এখানে দেওয়া অনাবশ্যক।

** ঋগ্‌বেদ, ১.১০।

নির্মাণের খেলনা দিয়ে খেলব না! কিছুই এ-সবের শেষ নয়, খেলার এ শুধু এক নাস্তিবাচক অবস্থা। এখনও কিছুই আরম্ভ হয় নি। কী আরম্ভ হয়েছে? এই খেলার আরম্ভের জন্য আমাদের সে-বিষয়ে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। জুল্ ভার্ন-এর সময় থেকে আমরা অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছি, যেসব আমাদের চোখের সামনেই ধীরে ধীরে সমাপ্ত হয়ে গেছে। কোন্ যুদ্ধ, কোন্ বিপ্লব এখনও আমাদের রক্তদানের যোগ্য? আমাদের এভারেস্ট্গুলোর বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হয়ে গেছে, গভীর সমুদ্রগুলো বেশ ভালোভাবে প্রহ্বারক্ষিত— সব-কিছুই সুবিবেচিত, সব-কিছুই সুনিয়ন্ত্রিত, এমন-কি মধ্যাকাশ† পর্যন্ত। ক্রমবর্ধমানরূপে শ্বাসরুদ্ধকারী এই জগতে, এ কথা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কি অবশিষ্ট একমাত্র উন্মীলনের অভিমুখে? আমরা ভেবেছিলাম, আমরা কতগুলি অদূরদর্শী ক্ষুদ্র গন্ধমূষিক এই গ্রহে, এবং আমরা আমাদের অন্তরস্থ মহতী দৃষ্টির এবং আমাদের বিশ্বপ্রসারী পাখার সংশোধন করেছি ইস্পাতের সাহায্যে, যা আমাদের অবিরত পেষণ করছে। বোধ হয়, এর উদ্দেশ্য আমাদের বাধ্য করা নিজেদের উপরে ততটাই বিশ্বাস করবার জন্য, যতটা আমরা যন্ত্রের উপর বিশ্বাস করি, এবং এ কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে, যন্ত্রের চেয়ে আমরা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারি। বহুদিন পূর্বে উপনিষদ্ বলেছেন : "তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ক্রমাগত ভ্রাম্যমাণ, যেন অন্ধেরা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত" [মুণ্ডকোপনিষদ্ ১.২.৮]। সময় কি আসে নি, আমাদের ক্ষুদ্র নির্মাণরাজির বাইরে দৃষ্টিপাত করবার জন্য, এবং খেলা আরম্ভ করবার জন্য? কোদাল-গাঁইতি, তথা নীতিবাণী এবং নিউট্রন ব্যবহার করবার পরিবর্তে, আমাদের উচিত চেতনার কর্ষণ করা এবং সময়ের ক্ষেত্রে বীজবপন করা, এবং জীবনকে আরম্ভ হতে দেওয়া।

ওহে শক্তি-তাড়িত নিয়তি-চালিত পার্থিব জাতি,
হে ক্ষুদ্র অভিযাত্রিগণ এক সীমাহীন বিশ্বে,
এক খর্বকায় মনুষ্যত্বের বন্দী তোমরা,
মনের বৃত্তপথে যাত্রা করবে আর কত কাল,
ক্ষুদ্র অহং আর তুচ্ছ বস্তুসকলেরে ঘিরে?
পরিবর্তনহীন ক্ষুদ্রতার তরে তোমরা নও,
নির্মিত নও তোমরা বৃথা পুনরাবৃত্তির তরে...
প্রকৃতির কোষিকায় রুদ্ধ সর্বক্ষম শক্তি।
প্রতীক্ষায় বৃহত্তর নিয়তি সমুখে তোমাদের...
তোমাদের জীবনেই লুক্কায়িত, যে আলোক তোমরা।[৪৭]

† Stratosphere : মধ্যাকাশ।

যদি আমরা প্রাচীরের অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করি, তা হলে দেখি সব-কিছুই সেখানে আছে, পূর্ব হতেই, শুধু আমাদের চাওয়ার অপেক্ষা।

দেখলাম আমি তারা পার হল গোধূলি এক যুগের,
অরুণনয়ন শিশুগণ আশ্চর্য এক উষার...
শক্তিশালী চূর্ণকারী জগতের বাধাবিঘ্নের...
অবিনশ্বরতার স্থাপত্যশিল্পীবৃন্দ তারা...
আত্মার আলোকে শরীর হল সৌন্দর্যে পূর্ণ,
ধারণ করে শব্দ মায়াময়, অগ্নি অতীন্দ্রিয়,
ধারণ করে ডায়োনিসিয়ার হরষের পানপাত্র...[৪৮]

লৌহযুগের সমাপ্তি হল।[৪৯]

সত্যযুগের শর্তগুলি মনে হতে পারে কঠিন— নিশ্চেতনার মধ্যে বিপৎপূর্ণ অবতরণ; অন্ধকারের বিরুদ্ধে, অশুভ মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু আমরা কি এর অপেক্ষা তুচ্ছতর প্রয়াসে আমাদের জীবন বিপন্ন করি নি? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, *মানুষের মহত্ত্ব, সে যা তাতে নেই, বরং সে যা সম্ভব করেছে তাতেই আছে।*[৫০] *একবার মাত্র* সংসিদ্ধ করতে করতে হবে বিজয় একটি শরীরের মধ্যে। যখন একজন মানুষ এই বিজয় সংসিদ্ধ করেন, তা হবে সকল মানুষের জন্য, ও সকল জগতের জন্য এক বিজয়। কারণ, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যত অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও, তা এক যুদ্ধের প্রতীক ক্ষেত্র, যে যুদ্ধ সকল বিশ্বময় শ্রেণীক্রমের মধ্যে চলেছে, যেমন একজন সচেতন মানুষ সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের প্রতীক ক্ষেত্র— যদি আমরা এখানে বিজয়লাভ করি, তা হলে সর্বত্র বিজয়লাভ করব; *আমরাই* মৃতদের উদ্ধারকারী, *আমরাই* জীবনের উদ্ধারকারী। সচেতন হয়ে, আমরা প্রত্যেকেই হয়ে যাই স্বর্গের নির্মাতা ও পৃথিবীর ত্রাণকর্তা। এই কারণেই পৃথিবীর উপর এই জীবন অন্য সমস্ত প্রকার জীবনের মধ্যে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে; এই কারণেই মিথ্যার তত্ত্বাবধায়কেরা পরলোকের বিষয়ে আমাদের নিকট প্রচাররত। শ্রীমা বলেছেন : *আমাদের কাজটি এখানেই ত্বরান্বিতভাবে আমাদের করা উচিত, কারণ এখানেই আমরা প্রকৃতরূপে কাজটি সংসিদ্ধ করতে পারব। মৃত্যু হতে কিছু আশা কোরো না; জীবনই তোমাদের মুক্তি। জীবনেই আমাদের নিজেদের রূপান্তরিত করতে হবে; পৃথিবীতেই আমরা অগ্রগতি করি, পৃথিবীতেই আমরা উপলব্ধি করি। শরীরেই আমরা বিজয়লাভ করি।* তখনই বিবর্তনের নিয়ম আর সেই নিয়ম হয়ে থাকবে না, যেখানে বিপরীতদ্বয় আমাদের তাড়না করে আমাদের মানবীয় শৈশব হতে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য। বিজয়

একবার মাত্র অর্জন করতে হবে। শুধু *একটি* মহিমময় শরীর, শুধু একটি শরীরই সমস্ত শরীরের জন্য লৌহ নিয়মের উপর বিজয়লাভ করবে। সেই একটি বিজয় সংসিদ্ধ করবার জন্য প্রয়োজন সকল মানুষের সহযোগ। রূপান্তরের কৌশল-সংক্রান্ত বাধাবিঘ্ন সম্পূর্ণরূপে আমাদের সম্মুখে। *যদি পৃথিবী আহ্বান করে এবং পরম উত্তর দেন, তা হলে দেবমুহূর্ত এখনও আসতে পারে।*[৫১]

*

সমাপন

যে সমাপ্তির আরম্ভ হয় বারংবার *

বৈদিক ঋষিদের উপলব্ধি সামূহিক হয়ে গেছে। অতিমানস পার্থিব চেতনায় প্রবেশ করেছে, অবতরণ করেছে ভৌতিক অবচেতনায়, জড়তত্ত্বের সীমার মধ্যে। সংযোগটি স্থাপন করবার জন্য শুধু একটিই সেতু অতিক্রম করতে হবে। শ্রীমা বলেছেন : *এক নতুন জগৎ জন্মগ্রহণ করেছে। এখন আমরা এক পরিবর্তনকালীন সময়ের মধ্যে আছি, যেখানে উভয় জগৎ পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছি : পুরোনো জগৎ এখনও আছে, এখনও সর্বশক্তিমান, এখনও সাধারণ চেতনার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে; সেই সময়ে, নতুন জগৎ চুপিসারে প্রবেশ করছে, এখনও অত্যন্ত নম্র, এত অলক্ষ্যে প্রবেশ করছে যে তা বাহ্যত বেশি পরিবর্তন করছে না, সাময়িকভাবে। তথাপি এ ক্রিয়াশীল, বিকাশশীল, যে-দিন পর্যন্ত না এ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে নিজেকে দৃশ্যমানরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।*

সকল বাধাবিঘ্ন অবচেতন হতে উদ্‌ভূত নয়। বিশেষত, তাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত সচেতন এবং নতুন জগৎকে প্রতিরোধ করে একটি ব্রোঞ্জ্ দ্বারের মতো :

---

* সাবিত্রী : ২৮.২৯৫।

তা আমাদের জড়বাদ নয়, যেমন আমরা মনে করি— যদি বৈজ্ঞানিকদের আন্তরিকতা থাকে, তা হলে তাঁরাই প্রথমে সত্যের প্রতি উন্মুক্ত হবেন— তা হল সেই বিরাট্ আধ্যাত্মিক শক্ত বহিরাবরণ, যার নিচে আমরা আত্মাকে সমাহিত করেছি। শয়তানেব প্রকৃত উপায় নয় অ্যাটিলা[†] বা নাজিদের মতো মিথ্যা বা ঘৃণাকে আঁকড়ে ধরে সারা জগতে তার বীজ বপন করা— সে-বিষয়ে সে খুবই চালাক— তার উপায় হল প্রকৃত সত্যের এক ক্ষুদ্রাংশকে কিছু বিকৃত করে দেওয়া। এক বিকৃত সত্য অপেক্ষা কিছুই কঠিনতর নয়। মিথ্যা যে সত্যকে বন্দী করে, তার সকল শক্তি প্রাপ্ত হয়। আমাদের বারংবার বলা হয়েছে, মুক্তি আছে স্বর্গে— এবং তা সত্য, যে-পর্যন্ত মানুষ তার নাক ডুবিয়ে রাখে জড়তত্ত্বে, তার মুক্তি সে-পর্যন্ত নেই। তার মুক্তি আছে এক অতিচেতন স্বর্গে, এবং বোধ হয় স্বর্গের বিষয়ে আমাদের কাছে প্রচার করবার প্রয়োজন ছিল, প্রথম বিবর্তনীয় আধার হতে আমাদের টেনে বার করবার জন্য— কিন্তু তা বিবর্তনের প্রথম অবস্থা মাত্র, যাকে আমরা পরিণত করেছি চূড়ান্ত লক্ষ্যে, যা পাথরের মতো অনমনীয়। এখন এই লক্ষ্য আমাদেরই বিরোধী হয়ে উঠছে। জড়তত্ত্বে দিব্যতাকে অস্বীকার ক'রে, আমরা তাকে আমাদের পুণ্যতীর্থগুলিতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি, এবং জড়তত্ত্ব এখন তার প্রতিশোধ নিচ্ছে— আমরা তাকে আখ্যা দিয়েছি অশোধিত, এবং তা অশোধিতই হয়েছে। যে-পর্যন্ত আমরা এই বৈষম্য সহ্য করব, সে-পর্যন্ত পৃথিবীর জন্য কোনো আশা নেই : আমরা আন্দোলিত হতে থাকব এক মেরু হতে অন্য মেরু পর্যন্ত— উভয়ই সমানভাবে মিথ্যা— জাগতিক উপভোগ হতে আধ্যাত্মিক তপস্যা পর্যন্ত, কখনো পূর্ণতা লাভ করব না। *য়ুরোপের প্রাচীন বৌদ্ধিক সংস্কৃতিসমূহের সমাপ্তি হয়েছিল বিভেদকারীর সন্দেহ ও সংশয়ী নিষ্ক্রিয়তায়, এশিয়ার ধর্মনিষ্ঠার সমাপ্তি হয়েছিল গতিহীনতা ও পতনে।*[১] * জড়ের শক্তি ও আত্মার বিশুদ্ধ জল, উভয়ই আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের জড়বাদসমূহ আমাদের হতবুদ্ধি করে দেয়, এবং আমাদের বিশ্বাসসমূহ অবিশ্বাসসমূহেরই বিপরীত। *নাস্তিক স্বয়ং ঈশ্বর, যে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন; কিন্তু আস্তিক কি অন্য-কিছু? তাই বোধ হয়, কারণ তিনি ঈশ্বরের ছায়ার দর্শন লাভ করে তাকেই আঁকড়ে ধরেছেন।*[২]

যদি আমরা বৈষম্য দূর করতে চাই— আমাদের শরীরে, আমাদের সমাজে, কিংবা আমাদের জাগতিক চক্রে, যে-কোনো-কিছুরই সাম্যের অভাব, তারই বিনাশ হয়— তা হল আমাদের হতে হবে স্বচ্ছ। আমরা সংকেতশব্দ হারিয়ে ফেলেছি,

† Attila— হূন্‌দের সম্রাট্ (৪০৬-৪৫০ খৃ.) নিষ্ঠুরতা, বিধ্বংস ও লুণ্ঠনের জন্য বিদিত।

* ১৯১৮ খৃস্টাব্দে লিখিত। বোধ হয়, সে-সময়ের চেয়ে এখন অবস্থার উন্নতি হয়েছে? তা স্পষ্ট নয়।

তাই হলে আমাদের যুগের নিম্নরেখা। যন্ত্রকে আমরা আমাদের প্রকৃত শক্তির স্থানে রেখেছি, এবং অন্ধ মতবাদকে প্রকৃত জ্ঞানের স্থানে রেখেছি। প্রত্যেক স্তরে, বামন ভূতদের রাজত্ব চলেছে। এবং বামন ভূতদের শাসন আরও অধিকতর হবে, যে-পর্যন্ত না আমরা এ-সব অস্বস্তিকর অর্ধসত্যকে পরিত্যাগ করি, সেগুলো ঊর্ধ্বের হোক বা নিম্নের হোক, এবং যে-পর্যন্ত না আমরা ঝাঁপ দিই মূল উৎসে, অভ্যন্তরে, জড়তত্ত্বে আত্মার ব্যবহারিক রহস্যের পুনরুদ্ধার করবার জন্য। "যে মৃত্যুশীলদের মধ্যে অমৃতময়, সে একজন দেবতা, এবং অন্তর্নিহিত এক সক্রিয় শক্তিরূপে, আমাদের দিব্যশক্তির মধ্যে" (ঋগ্‌বেদ, ৪.২.১)। যেহেতু ঋষিগণ ও প্রাচীন রহস্যময় মতবাদসমূহের সাধুগণ এই রহস্য জানতেন, তাঁরা সেই ভয়ংকর বিভাজন করেন নি, যা গোপনে আমাদের ক্ষতিসাধন করে— "আকাশ আমাদের পিতা, পৃথিবী আমাদের মাতা"— সমস্যাটির সমাধান তাঁরা করেন নি আমাদের পূর্ণতার দায়িত্ব বিশ্বাতীতের উপর ন্যস্ত ক'রে : এখানেও আমাদের জয়লাভ করতে হবে, "শত পথের এই যুদ্ধ আমাদের দ্বারা পরিচালিত হোক"। চেতনার শীর্ষে উপনীত হয়ে তাঁরা এক বিবর্ণ চরমানন্দে বিলীন হয়ে যান নি : "পৃথিবীর পুত্র আমি, মাটিই আমার মা" (অথর্ববেদ, ১২.১.১২); অনন্তের সীমান্তে, তাঁবা এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকে ক্ষুদ্র মনে করেন নি : "হে দেব, অসীমকে আমাদের জন্য রক্ষা করো, এবং সসীমকে মুক্ত হস্তে প্রদান করো আমাদের," (ঋগ্‌বেদ, ৪.২.১১); "হে পৃথিবী, আমরা যেন তোমার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারি, যে সৌন্দর্য নিহিত তোমার গ্রামে, অরণ্যে, সভাসমিতিতে, যুদ্ধে, সংগ্রামে" (অথর্ববেদ, ১২.১.৫৬)। তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন অজেয়, কারণ তাঁরা জানতেন ভগবান্ আমাদের অন্তরে নিহিত : "হে তনুজ,... আনন্দময়, দ্যুতিময়, বিজয়শীল, তোমাকে আঘাত স্পর্শ করে না" (ঋগ্‌বেদ, ৪.২., ৯.১)। ঋজু মানবদের এক বিজয়ী সত্য, যাদের নিকট মৃত্যু এক মিথ্যা, এবং এক পরাজয়। পৃথিবীর উপর এক দিব্য আনন্দের সত্য। সম্ভবত তাঁদের সত্য য়ুরোপীয় জনসাধারণের নিকট অকালজাত ছিল, যাঁরা পৃথিবীর পূর্বে স্বর্গের কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করতেন। কিন্তু এখন বোধ হয় সময় এসে গেছে রহস্যসমূহের উদ্‌ঘাটনের জন্য— রহস্যসমূহ বৈদিক হোক বা অরফিক্[†], অ্যাল্‌কেমিস্ট্[††] কিংবা ক্যাথারিস্ট্ হোক— এবং উভয় মেরুর সত্যকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য, *এক তৃতীয় অবস্থিতিতে*, যা জড়বাদীরও নয়, কিংবা অধ্যাত্মবাদীরও নয় : *স্বর্গে মানুষের আরোহণ গূঢ়সূত্র নয়, বরং ইহলোকেই আত্মার মধ্যে আরোহণ ও আত্মার অবতরণ তার স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের মধ্যে, এবং পার্থিব প্রকৃতির*

[†] Orphic—অরফিক্ গ্রীসের পৌরাণিক সংগীতজ্ঞ ও কবি Orpheus (অরফিউস্) সংক্রান্ত।

[††] অ্যাল্‌কেমিস্ট্ (Alchemist)

রূপান্তরই গূঢ়সূত্র। কারণ সেই হল প্রকৃত নবজন্ম, এবং মৃত্যুর পরবর্তী কোনো মোক্ষ নবজন্ম নয়, যার জন্য মানবজাতি ঈপ্সু, তার সুদীর্ঘ অস্পষ্ট যন্ত্রণাদায়ক যাত্রার পরম লক্ষ্যরূপে।[৩]

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের জন্য এক আশার বাণী এনেছেন। আমাদের বামনদের নিম্নরেখা পরিশেষে শুধু এক নতুন আবির্ভাবের লক্ষণ। আমাদের যত অন্ধকার ও পতন সব সময় এক মহত্তর আলোকের সম্ভাবনার সূচক, যে আলোকের অবতরণ প্রয়োজনীয়, সীমাভঙ্গ করবার জন্য। এবং এই সীমাভঙ্গ করবার দুটি পথ আছে, আলোকের আতিশয্য অথবা অন্ধকারের আতিশয্য। কিন্তু একটি পথ আমাদের অন্ধকারকে আলোকের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে তাকে দ্রবীভূত করে, অন্যটি আলোককে আমাদের অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করায় এবং তাকে রূপান্তরিত করে। প্রথমটি কয়েকজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, অন্যটি সমগ্র জগৎকে মুক্তি দেয়। দশ হাজার বছর পূর্বে কয়েকজন মহাপুরুষ জগতের গূঢ় রহস্য নিঃসন্দেহে ছাড়িয়ে এনেছিলেন, কিন্তু তা ছিল শুধু এক মুষ্টিমেয় দীক্ষিত শিষ্যের সুযোগ, এখন আমাদের সকলকেই দীক্ষিত হতে হবে। দশ হাজার বছর পূর্বে আমরা স্বর্ণযুগে বাস করতাম, কিন্তু এখন মনে হয় সব-কিছুই রাত্রির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর উপর রাত্রির অবতরণ হয় নি, যে-কথা প্রলয়ের প্রচারকগণ আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন; আলোকই জগতের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেছে : গূঢ় রহস্যটি বিস্মিত হওয়ার ছিল। মানবজাতিকে অবতরণ করতে হয়েছিল যুক্তি ও ধর্মের যুগের অন্ধকারময় বক্রতায়, যেন সকল সাবালক মানুষ নিজেদের মধ্যে সেই রহস্যের পুনরুদ্ধার করতে পারে, এবং পুনরুদ্ধার করতে পারে আলোকের, সর্বত্র, সকল অন্ধকার, সকল দুঃখ, সকল সংকীর্ণতার মধ্যে, শুধু এক বৈদিক বা ইরানী উপসনালয়ে কোনো এক উচ্চ অগ্নিকুণ্ডের পরিবর্তে। আমরা সময়ের আরম্ভে আছি। বিবর্তনের গতি নয় ক্রমবর্ধমানরূপে উজ্জ্বল ও বিলীয়মান হয়ে উর্ধ্বে তীরবেগে ছুটে যাওয়া। এর গতি শঙ্খবৃত্তের মতো। *এ এক কুণ্ডলিত পথ নয়, যা আমাদের ফিরিয়ে আনে আরম্ভস্থলে, কিছুটা আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায়; বরং এ উদ্দেশ্য সমগ্রসৃষ্টিকে শেখানো অস্তিত্বের আনন্দ, অস্তিত্বের সৌন্দর্য, অস্তিত্বের মহত্ত্ব, এবং এই আনন্দের, এই সৌন্দর্যের, এই মহত্ত্বের শাশ্বতভাবে প্রগতিশীল শাশ্বত বিশ্ববিকাশ। তা হলেই সব-কিছুর অর্থ আছে।* এক শাশ্বত শঙ্খবৃত্তাকার গতি, যা ফিরে আসে না কোনো চরম বিন্দুতে— চরম বিশ্বের সর্বত্র আছেন, প্রত্যেক সত্তায়, প্রত্যেক শরীরে, প্রত্যেক অণুতে— কিন্তু তা এক আরোহণ, ক্রম হতে ক্রমে; তা উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতর স্তরে উপনীত হয়, নিম্নে অধিকতর অবতরণের জন্য, অধিকতর কিছুকে আলিঙ্গন করবার জন্য, অধিকতর কিছুকে প্রকাশ করবার জন্য। আমরা "বিরাট্"-এর আরম্ভ স্থলে আছি, যা শাশ্বতভাবে আরও বিরাট্ হবে। বিবর্তনের

অগ্রণীগণ ইতিমধ্যে অতিমানসের অন্যান্য ক্রম আবিষ্কার করেছেন, এবং আমরা চিরন্তন সম্ভূতির মধ্যে এক নতুন বক্রপথ শুরু করেছি। বিজিত প্রত্যেক উচ্চতায়, সব-কিছুই পরিবর্তিত হয়, চেতনার বিপরীতকরণ হয়, এক নতুন স্বর্গ, এক নতুন পৃথিবী আবির্ভূত হয়; এই ভৌতিক জগৎ আমাদের অবিশ্বাসী দৃষ্টির সম্মুখে শীঘ্রই পরিবর্তিত হবে। এবং তা হয়তো ইতিহাসের প্রথম পরিবর্তন হবে না— আমাদের পূর্বে ক'জন ছিলেন? আমাদের *সঙ্গে* আরো ক'জন আছেন, যদি আমরা শুধু সচেতন হওয়ার জন্য রাজী হই? *চেতনার অনুক্রমিক বৈপরীত্য, যা প্রত্যেক নতুন স্তরে নিয়ে আসবে সৃষ্টির এক চিরনূতন ঐশ্বর্য।* প্রত্যেক বার, আমাদের মধ্যে স্থিত প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিটি বিচিত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি ঘোরান এবং সব-কিছু হয়ে ওঠে আশাতীত, বিশালতর, সত্যতর, সুন্দরতর। সব-কিছু আমাদের উপর নির্ভর করে: বিশ্বের আনন্দ আমাদের দ্বারদেশে, যদি শুধু আমরা তা চাই।

পৃথিবীর ব্যথা তার বন্দী আনন্দের নিষ্ক্রয়।...
হর্ষের তবে পৃথিবী সৃষ্ট, দুঃখের তরে নয়।[৪]

এই হল রহস্য। তা বিদ্যমান এখানে, সর্বত্র, জগতের হৃদয়ে। এই হল "অশ্ম দ্বারা আবৃত মধু-নিঃসারী উৎস", "অসীমের শিশুসুলভ হাস্য" যা আমরা, এ হল উৎস সেই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যতের যা আমাদের অতীতকে দূরে অপসারিত করে। বিবর্তন সমাপ্ত হয় নি; তা এক অলীক নাগরদোলা নয়, পতন নয়, অহংকারের খেলাও নয়, তা হল

চেতনা ও হর্ষের অভিযান।[৫]†

---

† দ্রষ্টব্য— *সাবিত্রীর* মূল ইংরেজি পঙ্‌ক্তিটির শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য পৃথ্বীসিংহ নাহার -কৃত বঙ্গানুবাদ :

চেতনা ও হরষের অভিযানে করিয়া আহ্বান...।

সময়ানুক্রম

১৮৭২, আগস্ট ১৫	—	শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের প্রথম বছরগুলি অতিবাহিত হয় রঙপুরে।
১৮৭৭	—	মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী ঘোষিতা হন। শ্রীঅরবিন্দ দার্জিলিঙের লরেটো কন্‌ভেন্ট স্কুলে ভর্তি হলেন, তাঁর অগ্রজদের সঙ্গে।
১৮৭৮, ফেব্রুয়ারি ২১	—	শ্রীমা প্যারিস্-এ জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৭৯, জুন	—	শ্রীঅরবিন্দের পিতামাতা তাঁকে তাঁর অগ্রজদের সঙ্গে ইংল্যান্ড-এ নিয়ে এলেন। ম্যান্‌চেস্টার্-এর এক ড্রুয়েট্ পরিবারের উপর এই পুত্রত্রয়ের ভার ন্যস্ত করা হলো। ১৮৮৪ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ গৃহেই শিক্ষালাভ করেন।
১৮৮৪, সেপ্টেম্বর	—	শ্রীঅরবিন্দ লন্ডন-এর সেন্ট্ পল্‌স্ স্কুলে ভর্তি হন।
১৮৯০, জুলাই	—	কেম্‌ব্রিজ্-এর কিংস্ কলেজে ভর্তি হন শ্রীঅরবিন্দ, স্কলার্‌শিপ্ নিয়ে।
১৮৯১	—	কেম্‌ব্রিজ্-এ ইন্ডিয়ান্ মজলিস্-এর সৃষ্টি, যেখানে শ্রীঅরবিন্দ যোগদান করেন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমর্থনে বক্তৃতাপ্রদান করেন।
১৮৯২, নভেম্বর	—	অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উপস্থিত হতে না পারার পর, শ্রীঅরবিন্দ ইন্ডিয়ান্ সিভিল্ সার্ভিস্-এর জন্য অযোগ্য ঘোষিত হন।
ডিসেম্বর	—	বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড়-এর অধীনে সেবানিযুক্ত হলেন।
১৮৯৩, জানুয়ারি ১২	—	এস্. এস্. কার্থেনজ্-এ শ্রীঅরবিন্দ ইংল্যান্ড পরিত্যাগ করলেন।

১৮৯৩ ফেব্রুয়ারি ৬	—	শ্রীঅরবিন্দ বোম্বের অ্যাপোলো বন্দরে পদার্পণ করলেন। যেখানে "এক বিপুল প্রশান্তি" তাঁর উপর অবতরণ করল।
১৮৯৭	—	বরোদা কলেজে ফরাসি ভাষার অধ্যাপনা করলেন, তারপর ইংরেজি ভাষারও অধ্যাপনা করেছিলেন; উক্ত কলেজে ১৯০৫-এ তিনি উপাধ্যক্ষ হয়েছিলেন।
১৯০০	—	মহারাষ্ট্র ও বঙ্গের গুপ্ত সমিতিসমূহের সঙ্গে তিনি প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন।
১৯০১, এপ্রিল ৩০	—	মৃণালিনী দেবীকে শ্রীঅরবিন্দ বিবাহ করলেন।
১৯০৪	—	তাঁর যোগসাধনা আরম্ভ হল।
১৯০৫	—	বঙ্গভঙ্গ, ও স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ।
১৯০৬	—	শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজ পরিত্যাগ করে কলকাতায় এলেন, যেখানে তিনি দৈনিক *বন্দে মাতরম্* পত্রিকার দায়িত্বগ্রহণ করলেন।
১৯০৭, আগস্ট ১৬	—	রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন, কিন্তু এক মাস পরেই মুক্তি পেলেন।
ডিসেম্বর	—	সুরাট্ কংগ্রেস : শ্রীঅরবিন্দ অধ্যক্ষতা করেন জাতীয়তাবাদী দলের অধিবেশনে, যে দল মধ্যপন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
১৯০৮, জানুয়ারি	—	বরোদায় লেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল। নির্বাণের উপলব্ধি।
মে ২	—	আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন, এবং এক বছর কারাবাসের পর মে ৬, ১৯০৯, মুক্তিলাভ করলেন।
১৯০৯, মে ৩০	—	শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণ।
জুন ১৯	—	শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি সাপ্তাহিক *কর্মযোগিন্* (এবং আগস্ট ২৩-এ বাংলা সাপ্তাহিক *ধর্ম*) শুরু করলেন।
১৯১০, ফেব্রুয়ারি	—	সহসা কলকাতা পরিত্যাগ করে চন্দননগর

		পৌঁছলেন।
১৯১০ এপ্রিল ৪	—	শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌঁছলেন।
১৯১৪, মার্চ ২৯	—	শ্রীমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার।
আগস্ট ১৫	—	ইংরেজি মাসিক *আর্যের* প্রথম সংখ্যা— এই পত্রিকা ১৯২১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।
১৯২০, এপ্রিল ২০	—	জাপান থেকে শ্রীমার পণ্ডিচেরী প্রত্যাবর্তন।
১৯২৬, নভেম্বর ২৪	—	শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরালে প্রত্যাহৃত করলেন।
১৯৩৮, নভেম্বর ২৪	—	একাগ্র অবস্থায় পায়চারির সময় শ্রীঅরবিন্দ পা ভাঙলেন।
১৯৩৯, সেপ্টেম্বর	—	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।
১৯৪৭, আগস্ট ১৫	—	ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; শ্রীঅরবিন্দের ৭৫তম জন্মদিবস।
১৯৫০, ডিসেম্বর ৫	—	শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করলেন, এবং তাঁর কর্মধারার ক্রমবাহিকা হলেন শ্রীমা।

—

শব্দার্থ

(Glossary)

Above ঊর্ধ্ব
Absolute পরম, পরমতত্ত্ব
Absorption নিমজ্জন
Action কর্ম, ক্রিয়া, কর্মধারা
Advocate অধিবক্তা
Annex অনুবদ্ধ করা
Archetype আদিরূপ
Ascent আরোহণ, অধিরোহণ
Aspiration আস্পৃহা, অভীপ্সা
Austerity তপশ্চর্যা, তপস্যা

Becoming সম্ভূতি; হয়ে ওঠা।
Being সত্তা, অস্তিত্ব, পুরুষ
— Mental মানস সত্তা
— Physical শারীর সত্তা
— Psychic চৈত্য সত্তা
— Vital প্রাণিক সত্তা
Bliss আনন্দ, হর্ষ
Bottom নিম্নতম, নিম্নতম দেশ

Càthars, The : একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ফ্রান্সের এই ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যেরা সরল জীবনযাপন ও অকৃত্রিম আধ্যাত্মিকতার আদর্শ গ্রহণ করেন খৃস্টনীতি হতে প্রেরণা লাভ ক'রে, কিন্তু তাঁরা চার্চ-এর বিরোধিতা করেন, এবং চার্চ-কর্তৃক উৎপীড়িত ও অবদমিত হয়ে তাঁদের বিলুপ্তি হয়।
Cell কোষিকা
Cellular কৌষিকীয়
Chrysalis কোষাবরণ
Circumconscience পরিচেতনা
Circumconscient পরিচেতন
Concentrated ঘনীভূত, সংকেন্দ্রিত, কেন্দ্রীভূত
Concentration ঘনীভবন, সংকেন্দ্রীভবন, কেন্দ্রীভবন, একাগ্রতা
Configuration বহিরাকৃতি
Conscious চেতন, সচেতন
Consciousness চেতনা, চৈতন্য
Construction গঠন, নির্মাণ
Contradiction বিসদৃশ, বিরোধ
Cosmic বিশ্বময়, বিশ্বগত
Counterpart প্রতিরূপ

Degree ক্রম, মাত্রা
Descent অবতরণ, অবরোহণ
Determinism নিয়তি, নিয়তিবাদ, নিয়তত্ত্ববাদ
Devotution অববর্তন
Dimension পরিসর, মাত্রা
Dimensional মাত্রিক
— Three Dimensional ত্রি-মাত্রিক
— Fourth Dimension চতুর্থ মাত্রা
Divine দিব্য, ভাগবত
Dogmatic মতান্ধ
Dynamism সক্রিয়তা, ক্রিয়াশীলতা

Environmental Self পরিচেতন সত্তা

Etymology শব্দপ্রকরণ
Evolution বিবর্তন
Existence সৎ, অস্তিত্ব
Experience অনুভূতি, অভিজ্ঞতা
Exteriorization বহিরভিব্যক্তি

Fact তথ্য, সত্য
Fault স্তরচ্যুতি (ভূ-ত্বক্ সম্বন্ধীয়)
Feeling অনুভব
Fission একীকরণ
Force শক্তি, তপস (তপঃ)
Form রূপ, আকার, আকৃতি
Formation রূপায়ণ, গঠন
Fourierists, The : ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি সমাজবাদী সংস্কারক চার্ল্‌স্ ফোরিয়ার্-এর অনুগামীবৃন্দ
Freedom স্বাতন্ত্র্য, মুক্তি, স্বাধীনতা
Frontal Being সম্মুখ সত্তা
Frontal Man সম্মুখ মানব
Frontal Nature সম্মুখ প্রকৃতি
Frontal Personality সম্মুখ ব্যক্তিত্ব
Fusion বিভাজন

Gene বংশবীজ
Global বিশ্বব্যাপী
Glory মহিমা
Gradation ক্রম, স্তরক্রম
Gradation of planes স্তরক্রম, ভূমিসমূহের স্তরক্রম
Guardian প্রহরারত তত্ত্বাবধায়ক

Harmony ঐকতান, শৃঙ্খলা, সংহতি
He পুরুষ
Heaven স্বর্গ
Hierarchy শ্রেণীক্রম, ক্রমসোপান
Higher Mind ঊর্ধ্বমানস

Illumination দ্যুতি, প্রদীপ্তি, জ্ঞানজ্যোতিঃ, উদ্দীপ্তি
Illumined Mind জ্যোতির্মানস
Immobility নিশ্চলতা
Impersonal নৈর্ব্যক্তিক
Imperfect অপূর্ণ
Imperfection অপূর্ণতা
Inconscience নিশ্চেতনা, অচেতনা
Inconscient নিশ্চেতন, অচেতন
Individuality ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিত্ব
Inner আন্তর
Inner Reality আন্তর বাস্তবতা, অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা
Integral Yoga পূর্ণযোগ, পূর্ণাঙ্গ যোগ
Integration পূর্ণায়ন, পূর্ণীকরণ, সমন্বয়, একীকরণ
Intellect বুদ্ধি, ধী, ধীশক্তি
Intensity তীব্রতা
Intuition বোধি, সম্বোধি, অন্তর্বোধ, স্বতঃস্ফূরণ, স্বজ্ঞা
Intuitive Mind বোধিমানস, বোধি
Involution নিবর্তন
Irrefutable অখণ্ডনীয়

Joy আনন্দ, হর্ষ, উল্লাস

Key মুখ্য, চাবি, সমাধান-সূত্র
Knightly বীরব্রতী
Knowledge জ্ঞান

Laboratory গবেষণাগার, পরীক্ষাগার
Larva শূককীট, শুঁয়োপোকা
Law ধর্ম, বিধান, নিয়ম
Launching Pad প্রক্ষেপণ স্থান
Lever উত্তোলন দণ্ড, উত্তোলক
Linear রৈখিক, এক-রৈখিক, রেখাকৃতি

Machine যন্ত্র
Macrocosm মহাবিশ্ব
Mass পুঞ্জ
Mass of particles কণিকাপুঞ্জ
Material জড়, জড়তাত্ত্বিক, ভৌতিক
Matter জড়, জড়তত্ত্ব, পদার্থ
Mechanism প্রক্রিয়া, কার্যপ্রক্রিয়া
Medullary Canal সুষুম্না পথ
Mental মানস, মানসিক
Mental Being মানস সত্তা, মানসিক সত্তা
Mesenteric Plexus মধ্যান্ত্রিক স্নায়ুজাল
Microcosm অণুবিশ্ব
Mind মন, মানস
— Higher ঊর্ধ্ব মানস
— Illumined জ্যোতির্মানস
— Intuitive বোধিমানস
Mind-reader মানসাধ্যয়নকারী
Mode ধরন, প্রণালী

Naturalisation সহজীকরণ
Nature প্রকৃতি, স্বভাব
Negation অভাব, অস্বীকৃতি
Negative নাস্তিবাচক, নাস্তিধর্মী, নেতিমূলক, নিষেধাত্মক
Nescience অচেতন
Neutrality নিরপেক্ষতা
Night রাত্রি, অন্ধকার
No-man's-land জনহীন দেশ

Objective বিষয়নিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ
Objectivity বিষয়নিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠা
Oneness একত্ব
Opening উন্মীলন, উন্মোচন
Origin উৎস, মূল
Other-consciousness অন্য-চেতনা
Outgrowth উপবৃদ্ধি
Overmental অধিমানসিক
Overmind অধিমানস

Paradox বিরোধাভাস
Perceive প্রত্যক্ষ করা
Perception প্রত্যক্ষকরণ
Perfect পূর্ণ, ত্রুটিহীন, নিখুঁত
Perfection পূর্ণতা
Person ব্যক্তি, পুরুষ, পরম পুরুষ
Personality ব্যক্তিত্ব
Phenomenon ব্যাপার, ঘটনা
Physical ভৌতিক, শারীরিক, দৈহিক
Physical Being দৈহিক সত্তা, শারীর-সত্তা, শারীরিক সত্তা
Physical Nature জড় প্রকৃতি
Plane ভূমি, স্তর
Plasma প্রাণরস
Play লীলা, খেলা, ক্রীড়া
Player লীলাময়
Playground লীলাভূমি
Positive অস্তিবাচক, অস্তিধর্মী, নিশ্চয়াত্মক
Precipitation অধঃক্ষেপণ
Precipitator অধঃক্ষেপণকারী
Predisposition পূর্বপ্রবণতা
Premeditation প্রাঙ্‌মগ্নতা
Prism ত্রিপার্শ্ব কাচ
Property গুণধর্ম
Protoplasm প্রাণাংশ
Psyche অন্তরাত্মা
Psychic চৈত্য, চৈত্যিক
Psychic Being চৈত্যসত্তা, চৈত্যপুরুষ, অন্তরাত্মা
Psychicised চৈত্যপ্রভাবাপন্ন

Quest অন্বেষণ
Quieting প্রশান্তিময়

Range পরিসর, এলাকা
Real সদ্‌বস্তু, সত্য, বাস্তব
Reality সত্য, বাস্তবতা, সদ্‌বস্তু
Reflex প্রতিবর্তী ক্রিয়া
Reflex Action প্রতিবর্তী ক্রিয়া
Reintegrated পুনঃপূর্ণায়িত
Reintegration পুনঃপূর্ণায়ন, পুনঃপূর্ণীকরণ
Replace প্রতি-স্থাপিত করা
Replaced প্রতি-স্থাপিত
Replacement প্রতি-স্থাপন
Revelation অন্তঃপ্রকাশ
Romance কাল্পনিকতা
Romanticism কাল্পনিকতা

Secret রহস্য, পরম রহস্য
Seeker সাধক, অন্বেষী, অন্বেষক
Series পর্যায়, ধারা, ধারাক্রম
She প্রকৃতি
Sky Light আকাশবাতায়ন
Solid ঘনীভূত
Somnambulist নিদ্রাচর
— Somnambulist Consciousness নিদ্রাচর চেতনা
Soul আত্মা, অন্তরাত্মা
Space স্থান, ব্যাপ্তিস্থান, ব্যাপ্তি
Spark স্ফুলিঙ্গ
Sparkle স্ফুলিঙ্গায়ন
Sparkling স্ফুলিঙ্গায়ন
Sphere গোলক
Spherical গোলকাকার (গোলক + আকার)
Spherical Thinking গোলকাকার চিন্তন

Spirit আত্মা
Spiritual আধ্যাত্মিক
Stimulus উদ্দীপনা, উত্তেজনা
Stratosphere মধ্যাকাশ (মধ্য + আকাশ)
Stunned হতচেতন
Sub-conscience অবচেতনা, অবচৈতন্য
Sub-conscient অবচেতন
Sub-conscious অবচেতন
Subjective আত্মনিষ্ঠ
Subjectivity আত্মনিষ্ঠা
Subliminal মগ্নচেতন
Subterranean অন্তর্ভৌম
Superconscience অতিচেতনা, অতিচৈতন্য
Superconscient অতিচেতন
Superimposition অধ্যারোপণ
Superman অতিমানব
Supermind অতিমানস
Supernatural অতিপ্রাকৃতিক
Supernature অতিপ্রকৃতি
Supramental অতিমানসিক, অতিমানস
Supramental Being অতিমানস সত্তা
Supramental Consciousness অতিমানস চেতনা
Supramentalise অতিমানসময় করা
Surface সম্মুখ ভাগ, সম্মুখ তল, সম্মুখ ব্যক্তিত্ব
Sympathetic Nervous System সর্ববেদী স্নায়ুতন্ত্র
System পদ্ধতি, নিয়ম, তন্ত্র, প্রণালী
Systematic নিয়মাবদ্ধ

That তৎ
Thought চিন্তন, চিন্তা
Three Dimensional ত্রিমাত্রিক
Tranquility প্রশান্তি

Transcendent বিশ্বাতীত
Transcendental বিশ্বাতীত
Transcribing প্রতিলিপিকরণ
Transcription প্রতিলিপিকরণ
Transformation রূপান্তর
Transition সংক্রমণ, স্তরান্তর, সঞ্চার, স্তরসংক্রমণ, পরিবর্তন
Transitional পরিবর্তনকালীন
Translucent ঈষদচ্ছ
Transmutation তত্ত্বান্তর
Tropical উষ্ণমণ্ডলীয়
Truth সত্য
Truth-Consciousness ঋতচিৎ, সত্যচেতনা
Typal বৈশিষ্ট্যমূলক, বিশেষ
Type প্রকার

Understanding উপলব্ধি, বোধ
Uniform সমরূপ
Uniformity সমতা, সমরূপত্ব
Unity একত্ব, ঐক্য
Universal বিশ্বজনীন, বিশ্বময়
Universal Mind বিশ্বময় মন
Universal Vital বিশ্বময় প্রাণ
Universalised বিশ্বভাবাপন্ন
Universe বিশ্ব, জগৎ

Vastness বিরাট্
Vegetable past উদ্ভিদসুলভ অতীত
Violence হিংসা, হিংস্রতা
Virtue পুণ্য
Virus রোগবীজ
Vision অন্তর্দৃষ্টি, অন্তর্দৃশ্য, অন্তর্দর্শন, দৃষ্টি, দৃষ্টিশক্তি
Vital প্রাণ, প্রাণিক
Vital Being প্রাণিক সত্তা
Vital Force প্রাণিক শক্তি
Vital Mind প্রাণিক মন
Voice বাণী, স্বর, কণ্ঠস্বর
Void শূন্য

Wave length তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
Wisdom প্রজ্ঞা
Word শব্দ, বাণী
Work কর্ম, কর্মধারা, কার্য, কাজ, সাধনা
World জগৎ, বিশ্ব

Zone অঞ্চল

—